গডস্ টেরোরিস্ট

GOD'S TERRORISTS

ওয়াহ্হাবি ধর্মীয় মতবাদ এবং আধুনিক জিহাদের গুপ্তমূলপথ

চার্লস অ্যালেন

রূপান্তর   সরকার আলী মনজুর

রোদেলা

গডস্ টেরোরিস্ট
GOD'S TERRORISTS
চার্লস অ্যালেন
রূপান্তর : সরকার আলী মনজুর

স্বত্ব © প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৪

রোদেলা ২৯২

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল বইয়ের অবলম্বনে অনন্ত আকাশ

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭ ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য: ৫০০,০০ টাকা মাত্র

God's Terrorists by Charles Allen
Translated by Sarkar Ali Manjur
First Published Ekushe Boimela 2014
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 500.00 only US $ 10.00
ISBN: 978-984-906230-8-7 Code: 292

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃকল্প হাবিবুল্লাহ্ স্যারকে
যাঁর কাছ থেকে ইতিহাস বিষয়ে জানার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

প্রাক-কথন

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল সম্প্রদায় ধর্মীয় মৌলবাদ, নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদির দ্বারা তাড়িত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধ, স্নায়ু যুদ্ধ ও অস্ত্র-যুদ্ধে লিপ্ত। সে দিক থেকে বিচার করলে চার্লস অ্যালেনের গডস্ টেরোরিস্ট ঐ সকল সমস্যার সমাধানের দিক-নির্দেশনা দিয়ে একটি সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ। যদিও গ্রন্থটিতে ইসলাম ধর্মের ওয়াহ্হাবি মতবাদের বিষয়টির ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক এর ভেতর দিয়ে অতীত ও বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় ধর্মসমূহের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সহাবস্থান সম্পর্কে অবহিত হবেন।

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তিগুলো যে ভাবে দাঁড় করিয়ে গেছেন সেগুলো কিভাবে তাঁর প্রদর্শিত পথ ও মত থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং সেই বিচ্যুতির জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছে তা সুনিপুণতার সঙ্গে লেখক তুলে ধরেছেন। সুদূর আরব থেকে শুরু করে আফগানিস্তান-পাকিস্তান, ভারত এবং দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশে ইসলামের পুনর্জাগরণের বিষয় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের লেখকের লেখনী থেকে উদ্ধৃতিসহ তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এখানে তুলে ধরেছেন লেখক। তিনি দেখিয়েছেন ইসলামের মূল ধারা থেকে মুসলমানরা অপসারিত হয়ে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে হিন্দু, খ্রিষ্টানদের ধন-সম্পদ লুট-তরাজ ও তাদের ওপর নিম্মানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।

গ্রন্থটিতে প্রসঙ্গক্রমে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি, আমেরিকা, রাশিয়াসহ ইউরোপীয় শীর্ষদেশসমূহের কথা এসেছে। বিধৃত হয়েছেন মিশরীয় চিকিৎসক ইসলামি ভাববাদী আয়মান-আল-জওয়াহরি যাঁর মতাদর্শকে অনুসরণ করে ওসামা বিন লাদেন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্য আধুনিক ওয়াহ্হাবি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। তিনি তালিবান ও আল কায়েদা বাহিনীর জন্য তাঁর ধন-সম্পদ সর্বস্ব বিলিয়ে উক্ত আন্দোলনকে বেগবান করার প্রয়াস চালান। মোল্লা ওমর তিতুমীরসহ ইসলামি বিশ্বের অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও অনালোচিত থাকেনি।

এখানে বিশেষত আরব, আফগানিস্তান, মিশর, পাকিস্তান, ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ইসলামি পুনর্জাগরণের আন্দোলনে উত্থান-পতন, ধর্মীয় গোঁড়ামি, মৌলবাদিতা, কট্টরপন্থা, সংস্কার-কুসংস্কার-পুনঃসংস্কারের বিষয়াবলি পক্ষপাতহীনভাবে বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থাভ্যন্তরের পুর্ণাঙ্গ পাঠে নিবিষ্ট পাঠক ইসলামের মূলধারা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারবেন। গ্রন্থটি ইসলাম ধর্মের ওয়াহ্হাবি ধর্মমতের উপর রচিত হলেও পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দ তাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত হতে পারবেন। কেননা এখানে অত্রাঞ্চলের হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টানদের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে ইসলামি ধর্মান্ধ উগ্রবাদীরা উক্ত ধর্মাবলম্বীদের ওপর অন্যায়-নিপীড়ন চালিয়েছে।

পরিশেষে, ইসলাম ধর্ম কখনও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় নি। পবিত্র কোরান ও নবী (সা.)র বাণীতেও সহিংসতা প্রশ্রয় পায় নি। পরধর্ম সহিষ্ণুতার কথাই বলা হয়েছে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে। কোরানে তরবারি বিষয়ে একটি সুরা রয়েছে। উগ্রবাদীরা এটিকে অপব্যাখ্যা করে ভুল পথে চালিত হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। কিছু কট্টরপন্থী মুসলমান বিশ্বব্যাপী তাঁদের ধর্মান্ধতার বীজ বপন করে চলেছে আর তাদের ভাবধারাকে লক্ষ্য করে নিরীহ মুসলমানগণ হয়তো ভাবে এই বুঝি ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উপায়। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ইসলামকে পুনর্জাগরণের মাধ্যমে বিশ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে অনুগ্র ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রসার ঘটিয়ে। এই গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠক মহলে বিপুল ভাবে সমাদৃত হয়েছে লেখকের সুনিপুণ কাহিনি বয়ানের গুণে। আমার এই অনূদিত গ্রন্থটিও বাংলা ভাষা-ভাষীর চিত্ত জয় করবে—এই আমার বিশ্বাস। ইসলামের ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী, সকল মসজিদের পাঠাগার ও সকল ধর্মাবলম্বী সাধারণ পাঠকদের জন্য অবশ্য পাঠ্য এই অনূদিত গ্রন্থটি। গ্রন্থটি পাঠে মুসলিমরা ইসলামের মূলধারা অনুসরণ করে তাঁরা ইসলামের হীরকসন্নিভ সঠিক পথে চালিত হবে—এই আমার প্রত্যাশা। সদা আল্লাহ্ ও নবী (সা.)র নাম বিশ্বে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক। জগতে ইসলামি মূল ধারার বিকাশ নিষ্কন্ট ও শান্তিপূর্ণ হোক।

অতঃপর ঋণ স্বীকার গ্রন্থটি অনুবাদ করার ব্যাপারে প্রথমেই স্বীকার করতে হয়, রোদেলা প্রকাশনীর স্বত্ত্বাধিকারী রিয়াজ খানের কাছে। তিনি আমাকে গ্রন্থটি অনুবাদ করার জন্য বলেন। এ সম্বন্ধে আমার জানা ছিল না, সে জন্য তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মূল্যায়ন কর্মকর্তা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার নিয়মিত নিবন্ধ প্রবন্ধ কলাম লেখক অগ্রজ প্রতিম ইউসুফ আজাদ, বুদ্ধি পরামর্শ ও অনুবাদ কর্মে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সে জন্য আমি তাঁর কাছে অশেষ ঋণী। আমার

সহধর্মিণী মমতাজ ইয়াসমিন সর্বদাই আমাকে অনুপ্রেরণা ও সেবা দিয়ে আমাকে উৎসাহ এবং সমর্থ দান করেছে, এ মুহূর্তে তাকেও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। এছাড়া রাজশাহী লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম মাওলানা মুস্তাক আহমদ, গণিত শিক্ষক মোঃ আবুল কাসেম সিনিয়র শিক্ষকদ্বয়ের কাছ থেকে আরবি উচ্চারণ ও ধর্মীয় বিষয়ে অন্যান্য পরামর্শও গ্রন্থটি অনুবাদ করতে সহায়ক হওয়ায় তাঁদেরকে জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে অশেষ প্রীতি ও অনন্ত ভালবাসা। সর্বোপরি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুস সোবহান ও সিনিয়র শিক্ষক মোঃ ইকবাল আখতার খান সাহেবের সহযোগিতার কথা পরম কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি—গ্যাপ ক্লাসের সময়ে বিদ্যালয়ে বসে এই গ্রন্থটির বহুল অংশ অনুবাদ করার সুযোগ করে দিয়ে ছিলেন তাঁরা। সবশেষে গ্রন্থটি পাঠে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের মূলধারা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের ধর্মীয় ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে লৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সুখ-শন্তি সমৃদ্ধি লাভ করুন—এই প্রত্যাশায়—

সরকার আলী মনজুর
সরকার নিবাস
হাতেম খাঁ (সজীপাড়া)
রাজশাহী
১২/১১/২০১৩

'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই, আর মোহাম্মদ আল্লাহ্র প্রেরিত পয়গম্বর।' এই সেই ডাক যা সারা বিশ্বব্যাপী পঁচিশ কোটি মুসলমানকে বিমোহিত করে। এই সেই ডাক যা তাদেরকে এমনভাবে আন্দোলিত করে যে তারা একতাবদ্ধ হয়ে ধর্মযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং উন্মত্ত অবস্থায় তারা খ্রিস্টান ও হিন্দু এবং অবিশ্বাসীদের নিধন করে স্বর্গারোহণের সহজ পথ বেছে নেবার প্রয়াস পায়। এই ডাক ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাহাড়-পর্বতে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়। এই ডাকই আফগানিস্তানে মৌলবাদীরা গ্রামে, গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়ে জনগণকে জাগ্রত করে ধর্মযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে। এই ডাকে সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকে একতাবদ্ধ করার ক্ষমতা প্রকাশ করে এবং তাদের মতাদর্শকে বিরোধীদের ধর্মযুদ্ধে দীক্ষিত করার ক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মুসলমানদের মধ্যে এই উগ্র ধর্মবাদের প্রভাবটা বেশি দেখা যায়—একে ধর্মান্ধতা বা মৌলবাদ যা-ই বলা হোক—যাহোক তাদের মধ্যে এই ক্ষমতার বিকাশ অন্যান্য সবকিছুকে অতিক্রম করে।

থিওডোর পেনেল,

বান্নুর মিশনারী ডাক্তার, এ্যামং দ্য ওয়াইল্ড ট্রাইবস অব দ্য আফগান ফ্রন্টিয়ার, ১৯০৯

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক ১৭
কৃতজ্ঞতাস্বীকার ১৯

অবতরণিকা/আমি কি পাখতুন নই? ২৩
অধ্যায় এক : জনৈক কমিশনারের মৃত্যু ৪৩
অধ্যায় দুই : মরুঅঞ্চলের বিশুদ্ধবাদী ৬০
অধ্যায় তিন : ইমাম মাহ্‌দির আবির্ভাবের প্রত্যাশা ৮৫
অধ্যায় চার : ইমাম মাহ্‌দির আহ্বান ১০৭
অধ্যায় পাঁচ : ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ১৩০
অধ্যায় ছয় ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মের শেষভাগ ১৫৬
অধ্যায় সাত : আমবেলা বিপর্যয় ১৭৬
অধ্যায় আট : বিচারাধীন ওয়াহ্‌হাবিগণ ১৯৮
অধ্যায় নয় : অগ্নিঝরা সীমান্ত ২২৩
অধ্যায় দশ : ভ্রাতৃত্ব ২৫১
অধ্যায় এগারো : একত্রে আগমন ২৭৫
অধ্যায় বারো : অশুভ আঁতাত ৩০১

নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ৩১০
পরিশিষ্ট ১ : আল-সৌদ-আল-ওয়াহ্‌হাব পরিবারের মৈত্রীর ভিত্তি ৩১৬
পরিশিষ্ট ২ ভারত ' ওয়াহ্‌হাবি' বংশ তালিকা ৩১৮
পারিভাষিক শব্দকোষ ৩২০
সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি ৩৩৬
নির্ঘণ্ট ৩৫৭

মানচিত্র

মানচিত্র এক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত ও আফগানিস্তান ২১
মানচিত্র দুই ‘পেশোয়ার উপত্যকা’ ৩৫
মানচিত্র তিন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব ৬১
মানচিত্র চার ১৮৯৮ সাল থেকে ‘মহমন্দ, সোয়াত ও বুনার’-এর মানচিত্র ২৩২
মানচিত্র পাঁচ ১৯৩০ দশকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ২৮২

প্রারম্ভিক

৯/১১ থেকে বৈশ্বিক জিহাদ সম্বন্ধে প্রচুর বলা ও লেখা হয়েছে, ইসলামি আন্তর্জাতিক দর্শন সকলের মাঝে ইসলামি পুনর্জাগরণের এই বিপ্লব সৃষ্টি করে ইসলামি ও অ-ইসলামি বিশ্বের দুই শক্তিকে মুখোমুখি এক সংঘাতের মুখে ঠেলে দেয়। দৃশ্যত বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনাবলিকে কাজে লাগানো হয় এবং এ বিষয়ে কোথা থেকের চাইতে কেন, কিভাবে, কি ঘটছে এই দিকটির উপরে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। এই গ্রন্থটি বর্তমান সময় নিয়ে নয়। এটি আধুনিক জিহাদের লক্ষ্য মৌলবাদের এবং বিশেষভাবে উক্ত দর্শনের একটি ইতিহাস, ওয়াহ্হাবিবাদ ধারণ করে ইতিহাসের একটি বিশেষ ধারা। প্রাথমিকভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, আরবে এর সূচনা হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করতে দেখা যায়। এর লক্ষ্যবস্তু ছিল শিখ সম্প্রদায়, ব্রিটিশগণ ও মূল ধারার মুসলমান সমাজ। পুনঃপুনঃ এটিকে দমন করা হয়েছিল এবং প্রতিবারে এটি পুনর্জাগরিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে এটিকে দানা বাঁধতে দেখা যায়। এই ইতিহাস কোন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আসে না। এর মাধ্যমে ব্যবহারিক জীবনে এটি সফলতা ও ব্যর্থতা অনেক ক্ষেত্রকে বোঝায় যার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আহরণ করা যায়।

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে বেশ কিছু নামের উল্লেখ করা হয়েছে যা মুসলমান ঐতিহ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হতে পারে, যেখানে আরবীয় ইসলাম ধর্মীয় গাম্ভীর্যের ইঙ্গিতে নামকরণ করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'মুহম্মদ'-এর স্খলিত নাম 'আহমদ' দিয়ে নামকরণ করা যায় যাদের উভয়েরই অর্থ 'প্রশংসিত।' তাদের অনিবার্য দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে ইসলামি প্রথায় বিভিন্ন খেতাব (উদাহরণ স্বরূপ সম্মানসূচক শেখ অর্থাৎ শিক্ষিত লোক, পেশা ভিত্তিক মৌলানা অর্থাৎ বিজ্ঞ যাজক, স্থানবাচক দেহলভি অর্থাৎ দিল্লির, পিতৃপরিচয় জ্ঞাপক ইবনে, বিন অর্থাৎ এর পুত্র, মর্যাদা জ্ঞাপক শহীদ অর্থাৎ ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী) সমূহের কৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে এবং যে সমস্ত শব্দের ব্যক্তিগত প্রকাশ করে তার ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবশ্যিকভাবে ছদ্মনামও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অরুশীয় পাঠকদের তলস্তয়ের উপন্যাস পড়ার তাগিদে বিশেষ ধৈর্য ধারণ

করতে হয়। সহায়তার জন্যে প্রথমবার এক প্রখ্যাত মুসলিম ব্যক্তির নাম আনা যায় (বা দীর্ঘছেদ দিয়ে পুনর্বার আনা যায়)। তার নামে সংক্ষিপ্ত বানান লক্ষণীয় হলো। উদাহারণ স্বরূপ আমির-উল-মোমিনীন শাহ্ সৈয়দ আহমদ বারেলভি শহীদ (বিশ্বাসীদের সেনাপতি বেরিলির শহীদ রাজা সৈয়দ আহমদ)। পাঠকদের এই খনি অঞ্চলে চলার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত মুসলিম ব্যক্তিত্বদের নামের তালিকা দিয়ে এক দিক নির্দেশনা দেয়া হলো। এই বইয়ের পেছনে দুটি নক্সা প্রদান করা হলো। প্রথমটিতে দুটি পরিবারের সম্পর্কের ধারা বিবরণী দেয়া হলো। যার সর্বপ্রথমটি ভারতভূমিতে ওয়াহ্হাবিবাদের গোড়া পত্তন করেছিল দ্বিতীয়টি যাকে আমি ভারতের ওয়াহ্হাবি বংশের তালিকা—পথিকৃৎ হিসেবে বর্ণনা দিয়েছি। এতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহ্হাবিতত্ত্ব পুনর্জাগরণে নেতৃত্বদানকারী প্রধান চরিত্রগুলির ধারা বর্ণিত হয়েছে। একটি সূচি নির্দেশিকা সংযোজিত হলো।

ইংরেজি ভাষায় আরবি, ফারসি, পশতু আর হিন্দুস্তানি নাম এবং শব্দের বানান সর্বদাই সমস্যাসংকুল, আধুনিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় ইংরেজি বানান ও অক্ষরান্তরণও কম সমস্যার বিষয় নয়। উদাহরণ স্বরূপ নবী (সা.)র বংশধরের ক্ষেত্রে আরবি শব্দ সাধারণতঃ 'সাইয়েদ' (Saiyyed) লেখা হয় তবে 'সায়েদ' (Sayyed), সায়িদ (Sayyid), 'সৈয়দ' (Syed), সৈয়াদ (Syad) অথবা 'সৈয়দ' (Said) লেখা হয়। এখানে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও লোকের দলসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'সাইদ' (Sayyid) নামকে কেন্দ্রীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে– 'সায়েদ' (Sayyed) কে আবার দেখানো হয়েছে দক্ষিণ হাজারার কাগান উপত্যকা ও সিন্ধু উপত্যকা সিত্তানার উপজাতিদের দুই ধারার প্রধান হিসেবে। 'সায়িদ' (Sayyid))কে আবার দিল্লির মুহাদ্দিস সায়িদ নাজির হুসেন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাকে ১৮৫৭ সালের ও পরবর্তীতে দিল্লিতে ওয়াহ্হাবি বিপ্লবী হিসেবে সন্দেহ করা হয়। 'সৈয়াদ' (Syad) আবার ইসলামের আধুনিকতাবাদের নেতা আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ খান অতঃপর ভারতীয় বিপ্লবী ও ইসলামী পুনর্জাগরণের নেতা সৈয়াদ আহমদ। অনেকটা একই ধারায় 'শাহ্' অর্থে রাজকীয় সম্মানসূচক কোন কিছুকে বোঝায় এবং এটিকে একটি সমীহ উদ্রেককারী খেতাবেও ব্যবহার করা হয়। এখানে বিশেষ করে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌কে পরিচিত করানো হয়েছে।

আরও অনেক তথ্য উপাত্ত যা সংগ্রহে রয়েছে তা দিয়ে নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই ইতিহাস একটি অগ্রসরমান কর্মযজ্ঞ। যদি পাঠকদের দৃষ্টিতে কোন সংশোধনযোগ্য ভুল ধরা পড়ে অথবা এ বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যায় তা আমার প্রদত্ত ওয়েবসাইট www.godsterrorist.co.uk-এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

চার্লস অ্যালেন, ২০০৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নাম প্রকাশে অনেচ্ছু কয়েকজন তথ্যদাতা তথ্যগত ভুল সংশোধনে সহায়তা করেছেন। আমার সবিশেষ ধন্যবাদ তাঁদেরকে আর বশির আহমদ খান, ওমর খান আফ্রিদি, মেজর তারিক মাহমুদ, রহিমুল্লা ইউসুফজাই, গুলজার খান, হিউজ লীচ, রন রসনার, সুয়ে ফ্যারিংটন, থিওন ও রোজমেরী উইলকিনসন; নরম্যান ক্যামেরন, এশিয়ান এ্যাফেয়ার্সের রয়্যাল সোসাইটির সেক্রেটারি; ডঃ পিটার বয়ডেন, সহকারি পরিচালক, এবং জাতীয় সেনা জাদুঘরের কর্মচারীবৃন্দ, নিকোলাস বার্নার্ড, দক্ষিণ এশীয় বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক, ও টিম স্ট্যানলি, এশীয় বিভাগ, ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট জাদুঘর, অ্যালিসন অহটা, তত্ত্বাবধায়ক এবং ক্যাথি ল্যাজেনবাট, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারি গ্রন্থাগারিক মহোদয়া; মুহাম্মদ ঈশা ওয়ালি, পার্সিয়ান এ্যান্ড টার্কিশ কালেকশনস এ্যাট দ্য ব্রিটিশ লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক; রয়্যাল আর্টিলারি জাদুঘরের ম্যাথু বাক; হেলেন জর্জ, প্রিন্টস এ্যাণ্ড ড্রয়িংস, এবং পরিচালক ও ব্রিটিশ লাইব্রেরীর ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড ইন্ডিয়া অফিস কালেকশনের কর্মচারীবৃন্দ; সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের কেমব্রিজ সেন্টারের পরিচালক এবং কর্মচারীবৃন্দ এদের সকলকেও ধন্যবাদ। আমার পাণ্ডুলিপি পঠনের ও তথ্যগত ভুল সংশোধনের জন্য আমি বিশেষভাবে ডেভিড লয়নের কাছে কৃতজ্ঞ। যখনই যে উপদেশ তাঁর কাছে চেয়েছি তা পেয়েছি এবং একাগ্রচিত্তে শুনেছি, অকপটে বলতে চাই এই গ্রন্থ সম্পর্কিত সকল ধ্যান-ধারণা ও পর্যবেক্ষণসমূহ আমার নিজের।

আমার সহৃদয় ধন্যবাদ সেই সমস্ত হৃদয়বান ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা আমার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে স্মরণীয় ভ্রমণে সহায়তা করেছেন। আমি স্বীকার করছি তাঁদের পাকিস্তান ও তাঁদের আফগানিস্তান এই গ্রন্থে তেমন প্রাধান্য পায়নি, তবে তাঁরা এবং তাঁদের মত অনেকে নিজেদের মাঝে ইসলামের গুণাবলি ধারণ করেন।

পরিশেষে আমার সার্বক্ষণিক ধন্যবাদ সেই সমস্ত আভ্যন্তরীণ সহযোগি ব্যক্তিবর্গের প্রতি যাঁদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন কিছু করাই সম্ভব ছিল

না। আমার সম্পাদক মহোদয়া লিজ রবিনসন তাঁর অনমনীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাকে লেখাপড়ার পথে নিয়োজিত রেখেছিলেন, টাইম ওয়ার্নারে আমার কমিশনিং এজেন্ট এডিটর জিম হুইটিং আমার প্রতি আস্থা রেখে কাজটি আমাকে অর্পণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ লিন্ডা সিলভারম্যান, ভিভিয়েন গ্রিনকে সর্বদা মানসিকভাবে আমাকে সহায়তা দানের জন্য, আমার জীবন সঙ্গিনী লিজকে ধন্যবাদ এই কর্মে আমাকে সার্বক্ষণিকভাবে সঙ্গ দানের জন্যে। বিস্‌মিল্লাহ্‌।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারত ও আফগানিস্তান

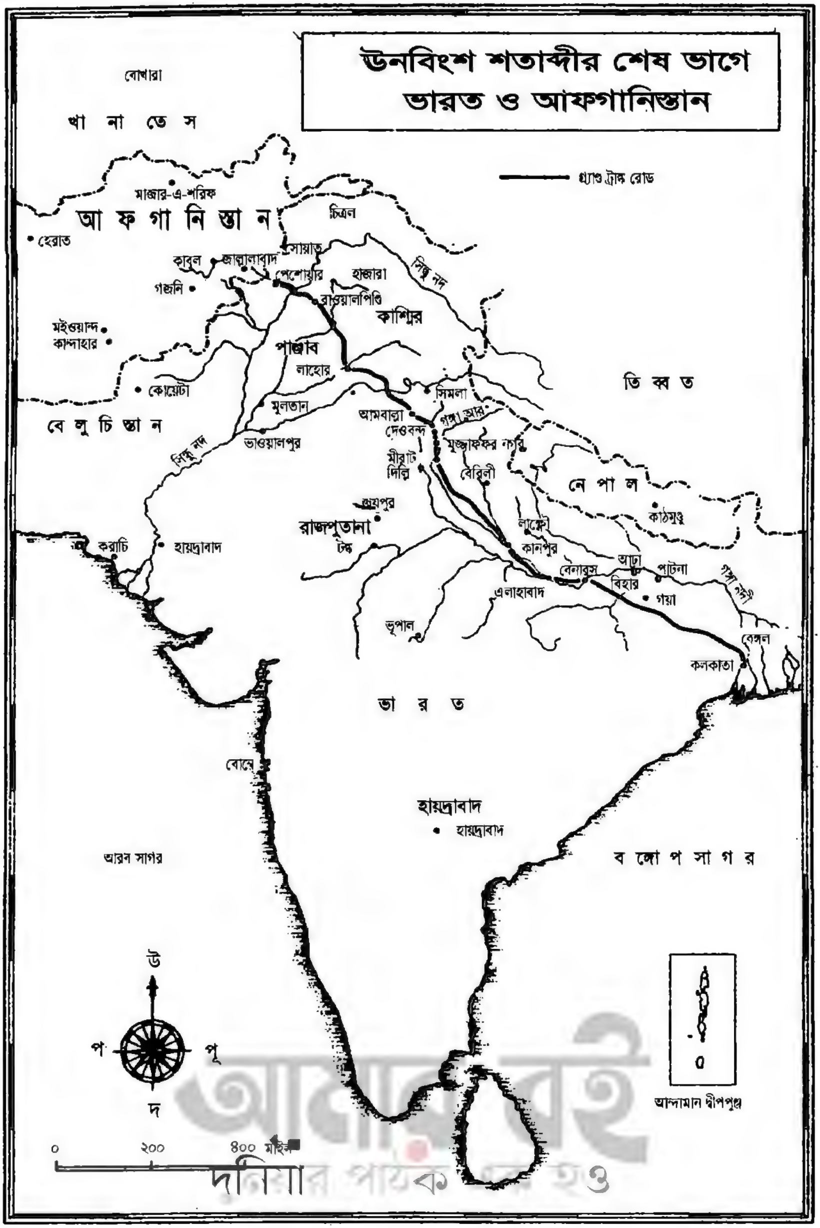
গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড
বোখারা
খানাতেস
মাজার-এ-শরিফ
আফগানিস্তান
হেরাত
চিত্রল
সোয়াত
কাবুল
জালালাবাদ
পেশোয়ার
হাজারা
সিন্ধু নদ
গজনি
রাওয়ালপিণ্ডি
কাশ্মির
মইওয়ান্দ
কান্দাহার
পাঞ্জাব
লাহোর
তিব্বত
কোয়েটা
সিমলা
মুলতান
আমবাল্লা
গঙ্গা খাল
বেলুচিস্তান
দেওবন্দ
মুজাফফর নগর
ভাওয়ালপুর
সিন্ধু নদ
মীরাট
দিল্লি
বেরিলী
নেপাল
জয়পুর
কাঠমুণ্ডু
লাক্ষ্ণৌ
রাজপুতানা
টঙ্ক
করাচি
হায়দ্রাবাদ
কানপুর
আগ্রা
পাটনা
বেনারস
বিহার
গঙ্গা নদী
এলাহাবাদ
গয়া
ভূপাল
বেঙ্গল
কলকাতা
ভারত
বোম্বে
হায়দ্রাবাদ
হায়দ্রাবাদ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
উ
প
পূ
দ
০
২০০
৪০০ মাইল
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

অবতরণিকা

> আমি কি পাখতুন নই?
> যখন পাঠান শিশুকে ওর মা বলেন, “কাপুরুষ মারা যায় কিন্তু তার তীক্ষ্ণ চিৎকার রয়ে যায় তার পরেও দীর্ঘ দিন”, তখন আর সে চিৎকার করা শেখে না। তাকে দেখানো হয় তার জীবনের থেকে শ্রেয়তর ডজন ডজন জিনিস যাতে সে নিজে মরতে বা অন্যকে হত্যা করতে দ্বিধা না করে। তাকে রঙ্গীন পোশাক-আশাক পরতে নিষেধ করা হয় বা বিদেশী সঙ্গীত শুনতে, এই জন্যে যে ওগুলো তার বাহুকে দুর্বল করে দেবে ও দৃষ্টিকে করে দেবে কোমল। তাকে শিক্ষা দেওয়া হয় বাজপাখির দিকে চেয়ে থাকতে আর ভুলতে বলা হয় গানের বুলবুল পাখিকে। তাকে বলা হয় তার প্রিয়তম পাত্রকে হত্যা করতে মায়ের ছেলেমেয়েদেরকে রক্ষা করার জন্য। এটা শাশ্বত সমর্পণ—একটা অনন্ত ত্যাগ মানব থেকে মানবে ও তাদের বিজ্জোচিত ভ্রান্তিসমূহে।
>
> গনি খান, দ্য পাঠানস, ১৯৪৭

কয়েক বছর পূর্বে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করছিলাম যে খাইবার পাস ভারত বর্ষের সমতল ভূমিকে কলুষিত করে সেখান দিয়ে আমি তখন কাবুলে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ করেছিলাম। যখন থেকে এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী এক পতাকাতলে তাদের সমগ্র আন্দোলন পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল তখন থেকে এই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অঞ্চলগুলি সহিংস উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হয়েছিল। প্রস্তরাকীর্ণ গিরিপথে অভিযানের ঢেউ তুলে, তিনটি ঐতিহ্যবাহী পুরস্কার অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে তারা অগ্রসর হতো *জান, জার, জমিন*—নারী, স্বর্ণ আর ভূমি। ঐসব আক্রমণকারীদের মধ্যে বর্তমানে ন্যস্ত রয়েছে আফগানিস্তানের পূর্ব দিকে আর পাকিস্তানের পশ্চিমে সীমান্ত দুই ডজন উপজাতির দল, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। যখন প্রত্যেক অঞ্চল দৃঢ়ভাবে তাদের নিজেদের উপজাতীয় পরিচিতি ধরে রেখেছিল তখন তারা নিজেদের সমবেতভাবে উল্লেখ করেছিল *পাখতুনা* বা *পাশতুনা,* যা পশ্চিমাদের কাছে পাঠান নামে সমধিক পরিচিত। সকলেই বংশধর হিসেবে দাবি করে একজন বা তিনজন পুত্র তাদের

অনুমিত পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে, কায়েস বিন রশিদ, যিনি গোড় থেকে আফগানিস্তান যান সেখান থেকে আরবে গিয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর নিকটে। যদিও মুসলমানরা তাদের নিজস্ব নৈতিকতার বিধান অনুসরণ করত, তারপরেও তারা *পাখতুনওয়ালি* নামে পরিচিত ছিল, যা ঐতিহ্য করে নেয় শ্রেষ্ঠত্বে এমন কি ইসলামি বিধানের উপরেও যা পরিচিত *শরিয়া* হিসেবে। একটি সাধারণ পাঠান প্রবাদ বাক্য রয়েছে, 'মোল্লার শিক্ষা মেনে চলো কিন্তু তিনি যা করেন তা করো না।'

আমার ভ্রমণকালে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারা প্রায় সবাই পাঠান ছিল, আমার গাইড ও বিজ্ঞ পরামর্শদাতা হিসেবে একজন ভদ্র, পণ্ডিতস্মন্য পেশোয়ার ভিত্তিক সাংবাদিক রহিমুল্লা ইউসুফজাই ছিলেন। পেশোয়ার একটি প্রাচীন সীমান্তবর্তী শহর যাকে গোড়ার দিককার একজন ব্রিটিশ প্রশাসক বহুদিন পূর্বে 'এশিয়ার পিকাডিলি' নামে অভিহিত করেন। যখন আমি তাঁর বাড়িতে উপনীত হই তখন রহিমুল্লাহ সাংবাদিকদের মধ্যেও বেশ স্বনামধন্য এবং বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যেও—এবং আজও সমধিক সুপরিচিত। যেহেতু তিনি বিবিসি সম্প্রচারের পশতু বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন সেহেতু সীমান্তের উভয় দিকে তাঁর কণ্ঠের এত পরিচিতি ছিল যে কেবল একটি কণ্ঠনিঃসৃত সামান্য শব্দ আতঙ্কিত সশস্ত্র প্রহরীদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনত। যখন তারা চেকপোস্টে কালাশনিকভস রাইফেল দিয়ে আমাদের গাড়ির জানালা খোচাচ্ছিলঃ 'আহ্, রহিমুল্লাহ ইউসুফজাই' তারা চিৎকার করে বলল, তাদের অস্ত্র কাঁধে ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে স্মিত হাস্যে চাইলো। 'ভেতরে এসে এক কাপ চা পান করে যাও।'

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত বাহিনী প্রত্যাহারের প্রাক্কাল থেকে রহিমুল্লাহ্ ইউসুফজাই আফগানিস্তান যুদ্ধের ধারাবাহিকতা অনুসরণ ও বার্তাস্থ করছিলেন এবং আফগানিস্তানে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল যেখানে নাস্তিক সোভিয়েত সেনাদের পরাভূত করতে সম্মিলিতভাবে ত্যাগ করেছিল এই *মুজাহিদীন* বাহিনী (যারা ধর্ম যুদ্ধে নিয়োজিত থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদেরকে 'ধর্মযোদ্ধা' বলে অভিহিত করা হয়) ধর্মের বিভিন্ন স্ববিরোধী ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে হানাহানি শুরু করে দেয় এবং এই ভাবে তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে আত্মঘাতি সংঘাতের দেশে পরিণত করেছিল, যুদ্ধবাজ সেনাধ্যক্ষরা একে অপরের নিধনের প্রচেষ্টায় সাধারণ জনজীবনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল।

রহিমুল্লার যোগাযোগের পরিধি ছিল কিংবদন্তীর মত ব্যাপক, কাজেই অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সকলের আগে তাঁর নিকটে এই বার্তাগুলো পৌঁছে যেত। আফগান প্রেক্ষাপটে ১৯৯৪ সালের শরৎকালে

আফগানিস্তানে যা যা সংঘটিত হয়েছিল সাংবাদিক হিসেবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই নতুন অস্বাভাবিক বিষয়টা আগ্রহভরে আপন করে নিয়েছিল সেই সব তরুণরা যারা ছিল অপ্রফুল্ল, নিরানন্দে থাকার কারণে দাড়ি ছাঁটত না, প্রায় প্রতিনিয়ত একই ভাবে সঙ্গে হয় কালাশানিকভ অটোমেটিক রাইফেল অথবা ক্ষুদ্র বোমা নিক্ষেপকারী যন্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তারা নিজেদের পরিচয় দান করত 'তালিবান' বা জ্ঞানান্বেষণকারী বলে আর তারা অনুগত ছিল নাবকান এক সাধারণ বা উপজাতীয় নেতার নিকটে। তারা অনুগত ছিল এক চোখওয়ালা ধর্মীয় নেতা মোল্লা মুহম্মদ ওমরের নিকটে। রহিমুল্লা ইউসুফজাই এবং বিবিসির প্রতিবেদক ডেভিড লয়েনের হাতে ছিল এই নতুন বিদ্রোহীদের দ্রুত কান্দাহার থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রতিবেদন রচনার কাজ। তারা যখন পথ করার জন্য কাবুলের নদী তীরবর্তী এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি এলাকায় যুদ্ধ করে পথ করেছিল তাঁরা তখন তাদেরকে অনুসরণ করছিলেন আর লক্ষ্য করছিলেন কি অসম সাহসিকতায় অদক্ষ সেনাদেরকে সংঘবদ্ধ করছিল তারা, কোন কৌশল অবলম্বন করে বা আত্মরক্ষার চিন্তা না করে শত্রুদেরকে আক্রমণ করে যাচ্ছিল, এই বিশ্বাসে যে তাদের মৃত্যু হবে জিহাদ করে (যুদ্ধটা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বিরোধীদের বিরুদ্ধে) আর তাদের মৃত্যু হলে তারা শহীদের মর্যাদা (শহীদরা মৃত্যুর পরে সরাসরি বেহেশতে যাবে) পাবে। এই ধর্মীয় উম্মাদনাই দিক পরিবর্তন করার কারণে বহু সংখ্যক শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করতে পেরেছিল তারা। তাদের নেতা মোল্লা ওমর সম্বন্ধে সামন্যই জানা যায় যে, তিনি রুশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর এক চোখ খোয়ান, আর তিনি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের পূর্বে ও পরে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাসমূহে বা ধর্মীয় বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলে তাকে নবী মুহম্মদ (সা.) স্বপ্নে দেখা দিয়ে আদেশ করেন আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে যুদ্ধে ফিরে যেতে। অন্যরা বলে তিনি যুদ্ধবাজদের কলুষতায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন—বিশেষ করে, এক সামরিক নেতা যখন তার এক রক্ষিতাকে বিয়ে করে তখনই তিনি পাকিস্তানের আই এস আই গুপ্তচর বাহিনীর ক্রীড়ানকে পরিণত হন। যে কারণেই হোক ১৯৯৬ সালে মোল্লা ওমর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে মোল্লাদের একটা বিশাল সামাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন, ইসলামের নবীর স্মৃতি বিজড়িত লাল চাদরে মোড়া স্মৃতিফলক প্রদর্শন করে তিনি পক্ষান্তরে নিজ প্রশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হন। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি বস্তুত ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাবের ৬৩৭ সালে তাঁর ধবল উটে উপবিষ্ট হয়ে জেরুজালেম অভিযানের পূর্বাহ্নে ইসলামি বিশ্বে নিজ নেতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে যজ্ঞ পালন

করেছিলেন এটি মোল্লা ওমরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনারই অনুকরণে করা হয়েছে। একইভাবে এই মতকে শক্তিশালী করলেন যখন উচ্চ কণ্ঠে মোল্লা ওমর নিজেকে জাহির করলেন আমির-উল-মোমিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) বলে, ইসলামের স্বর্ণ যুগে এই খেতাব খলিফাদের কর্তৃক প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে কাবুল তালিবানদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমির-উল-মোমিনীন মিনিভ্যানে চড়ে নগরে প্রবেশ করে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা চ্যুত করে একটি ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেন আর আফগানিস্তানকে একটি ইসলামি আইন দ্বারা শাসনের লক্ষ্যে ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। (শরিয়া) আমাদের ভ্রমণ আমাদেরকে গৃহযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সেনাপতিদের দ্বারা লুণ্ঠিত গ্রামের মধ্যে দিয়ে কাবুলে নিয়ে গেল। রাস্তার প্রতিটি পদক্ষেপে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ছড়ানো ছিটানো ছিল ব্যবহৃত বোমা আর তালিবান শহীদদের কবর। সাম্প্রতিক সময়ে শহীদদের মধ্যে খ্যাতিমান একজনের কবর চুনকাম করা ও একটি খুঁটির উপরে সবুজ পতাকা উড়ছিল আর ওটিতে আরবি অক্ষরে লেখা ছিল তাঁর নাম। রহিমুল্লা আমাকে অনুবাদ করে শোনালেন হাজি মোল্লা বুরজান, তালিবান ইসলামি আন্দোলনের সেনাপতি, এই সিল্কগর্জে আফগানিস্তানে শরিয়া আনয়নের জন্যে দুস্কৃতিকারী ও অবৈধ রাবানির সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে শহীদ হন। এক বছর পূর্বে মোল্লা বুরজান এখানে দাঁড়িয়ে পথরুদ্ধ করে আত্মঘাতি হামলার পূর্বে রহিমুল্লা এবং বিবিসির ডেভিড লয়েনকে এক সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

যখন আমরা গেলাম তখন বিষয়টি পরিস্কার হলো যে, তালিবানেরা আজকালকার নায়ক, তারা দেশে শান্তি এনেছে আর আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে—অবশ্য তাদের মধ্যে প্রশংসা করার অনেক কিছুই ছিল। মিলিশিয়া সৈন্যবাহিনী চেক পোস্টে থাকত আর তারা হোটেলের দেখভাল করত যেন সঠিকভাবে সেখানে খাওয়া-দাওয়া ও সেবার কাজ প্রতিপালিত হয়। যারা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইত তারা প্রবীণ সৈনিকদের মত আমাদের নিকটে আসত কিন্তু সরলতার সঙ্গে আর বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে না জানার ভাব নিয়ে আসত। যেটি রেড গার্ডসের কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৬৬-৭ সালে চৈনিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় আমি যেমনটি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। যেটিতে পার্থক্য লক্ষণীয়ভাবে দেখা গিয়েছিল সেটি হলো কর্ম বিরতির সময় তারা ভিন্ন আচরণ করত। কখনও কখনও তারা পকেট থেকে আয়না, চিমটা, কসমেটিক্স দ্রব্যাদি বের করে নিজেদেরকে পরিপাটি করে সাজাতে লাগত আর এ থেকেই বোঝা যায় তারা স্পষ্টতই রেড গার্ডসদের থেকে আলাদা ছিল।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

রহিমুল্লার ব্যাখ্যা ছিল যে, তালিবানরা অনেকেই যুদ্ধে এতিম বালকে পরিণত হয়েছিল। তারা লালিত-পালিত হয় সৌদি আরবের প্রেরিত অর্থে পাকিস্তানের ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলোতে। বহু সহস্র তরুণ পাঠানদের মাদ্রাসাই ছিল তাদের বাড়িঘর আর এর পুরুষ শিক্ষকরা—মোল্লা ওমরের মত ছিলেন তাদের পিতা-মাতার ভূমিকায়। এখানে একই বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ও উদ্দেশ্য ভাগাভাগি করে তারা দৃঢ় গতিতে এগিয়ে যেত যা তাদেরকে দিয়েছিল 'সত্যান্বেষণকারীদের' অপরাজেয় প্রভা। কারণ মাদ্রাসা সঠিক বিদ্যালয় ছিল না। ওখানে কেবল ধর্মীয় ও কোরানিক পাঠ্যক্রমানুসারে শিক্ষা দান করা হতো। এখানে তারা যৌবনকালটা দুর্বোধ্য আরবী কিতাব দুলে দুলে আবৃত্তি করে শিক্ষার্জন করে অতিবাহিত করত কিন্তু যা তারা জানত সামাজিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত কর্তৃত্বের সর্বময় দায়ভার তাদের দেওয়া হয়েছিল। আফগানিস্তানে আমাদের সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যখন আমরা দক্ষিণে জালালাবাদ থেকে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ অভিমুখে যাচ্ছিলাম যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্বে তখনই শুধু একবার তালিবান মিলিশিয়া বাহিনীর লোকেরা শত্রুতার মনোভাব প্রদর্শন করেছিল আমাদেরকে। এখানে আমরা অস্বাভাবিক বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনী দেখলাম আর তারা আমাদেরকে যে পথে এসেছিলাম সে পথে ফিরে যেতে বলল। শুধুমাত্র পরে ভালভাবে জানালাম যেন ১৯৯৬ সালে মোল্লা ওমরের তালিবান সরকার জনৈক ইয়েমেনী বংশোদ্ভূত সৌদি নাগরিককে আশ্রয়দান করেছিল যার হাতে পর্যাপ্ত পেট্রোডলার ছিল যা তিনি আফগানিস্তানে দখলদার রুশ বাহিনীকে উৎখাতের সংগ্রামে ব্যয় করেছিলেন। তাকেই এই পবিত্র স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ওসামা বিন লাদেন এবং তিনি সম্প্রতি মিশরীয় চিকিৎসক আয়মন আল-জয়াহরির দলে যোগদান করেছেন।

১৯৯৭ সালে কাবুল ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরী, চারিদিকে মাইন ও অবিস্ফোরিত গোলাবারুদে ছিল পরিপূর্ণ, শহরতলিতে বেওয়ারিশ কুকুর ব্যতীত কোন মানুষের বসবাসই ছিল না। আমরা খুব শিগগির পেশোয়ারে ফিরে এলাম, এখানে কোন বিরোধ দেখা গেল না। কারণ এটি আক্ষরিকভাবে মানবতায় ফেটে পড়েছিল সেই নগরী যখন আমি ১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে এসেছিলাম তখন এর জনসংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ আর এখন সেই সংখ্যা দশগুণ বেড়ে গেছে। তখন এটা দুটি স্পষ্ট চিহ্নিত এলাকায় বিভক্ত ছিলঃ একটি পুরনো নগরী যা কয়েক শতাব্দী পূর্বের জরাজীর্ণ দেয়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; আর বেসামরিক কর্মস্থান নগর দেয়ালের বাইরে ব্রিটিশ রাজ্যের কারুকার্যের নকশা অনুসরণ করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শহরতলি এলাকা, কিন্তু

বিশেষত উত্তর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যা সংযুক্ত পেশোয়ার থেকে নওশেরা আর ইসলামাবাদ পর্যন্ত। পঁচিশ বছর পূর্বের কর্ষিত জমি এখন দূরবর্তী পেশোয়ার উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত টিনের চালা বিশিষ্ট ও মাটির দেয়ালযুক্ত বাড়ি-ঘরে আকীর্ণ বস্তিতে পরিণত হয়েছে। এই আফগান উপনিবেশই হচ্ছে বিশ লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয়স্থল।

আমার ভ্রমণ আমাকে পেশোয়ার থেকে হটি মরদনে উত্তরদিকে নিয়ে গেল, যেটি অবস্থিত উপত্যকার প্রায় মধ্যবর্তী স্থলে যার একদিকে রয়েছে সোয়াত এবং বুনারের পর্বত শ্রেণী আর অন্যদিকে রয়েছে কাবুল ও সিন্ধুনদ এলাকা। হটি মরদন এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থল, কিন্তু একশত বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত সৈন্যবাহিনী, রানির নিজস্ব সেনাদল যারা ১৮৪৭ সালে ছাব্বিশ বছর বয়স্ক লেফটেন্যান্ট হ্যারি লামসডেন ও তাঁর দ্বারা সংগৃহীত আশপাশের উপজাতি স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা গঠিত পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল কর্তৃক পরিচালিত হতো। যখন রাজা ৭ম হেনরি ইংল্যাণ্ডে তার কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে ব্যস্ত ছিলেন তখন এই অনিয়মিত সেনাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন ইউসুফজাই বা 'জোসেফের পুত্র', দক্ষিণ আফগানিস্তানের মূলত কান্দাহার থেকে আগত একজন উপজাতি পাঠান যাকে নিয়ে উক্ত স্থানের উপজাতিদের সহযোগিতায় একটি অনিয়মিত সেনা বাহিনীর গোড়াপত্তন করছিলেন।

এখন পাঠান উপজাতিদের মধ্যে ইউসুফজাইরা একটি বৃহত্তম উপজাতি আর তাদের এলাকা উত্তর দিকে এক শ' মাইল ব্যাপী প্রসারিত যা কাবুল নদী থেকে সোয়াত ও বুনারের পার্বত্য অঞ্চল পরিবেষ্টিত। তাদেরকে পাঠান বংশে বিশুদ্ধ রক্তের অধিকারী হিসেবে সমীহ করা হয়।

ইউসুফজাইরা আমার বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়েছিল যেহেতু তারা প্রথম ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এসেছিল যখন ১৮৪০ দশকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পাঞ্জাব নদী অতিক্রম করে উত্তরদিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কারণ ব্রিটিশরা যে শিখদের দ্বারা পাঠানদের নির্যাতন করত তাদেরকে পরাজিত করে পেশোয়ার উপত্যকায় এসেছিলেন। যখন ব্রিটিশরা শিখদের কাছ থেকে পেশোওয়ারের শাসনভার নিয়ে নিল তখন তারা তাদেরকে তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। আর তারা আশ-পাশের গ্রামাঞ্চল শাসন-পরিচালনা করতে লাগল। তরুণ ব্রিটিশ অফিসাররা যে সব উপজাতি ও গোষ্ঠী অর্থাৎ খান ও মালিকদের সর্দার ও নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে আসত তারা নম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের আচরণ এতই সহজ-সরল ও সততাপূর্ণ ছিল যে তাঁরা (ব্রিটিশরা) বুঝে গিয়েছিল যে, তাদের সঙ্গে তাঁদের মিথ্যাচারণ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

করা সম্ভব নয়। এই প্রথম দিককার রাজনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ ইউসুফজাইদের পথ সম্বন্ধে জানার ব্যাপারে অতি কৌতুহলী ছিল আর, অধিকন্তু তাঁরা পাঠানদেরকে জেনেছিলেন আহ্‌লে কিতাব হিসেবে অর্থাৎ বইয়ের জনগণ যারা তাঁদের সঙ্গে প্রথম যুগের নবীদের ঐশী বিষয়গুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। তারা ইসলামের শত্রু ম্লেচ্ছ কাফির শিখদের মত ছিল না।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দূত মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন পৌঁছিয়ে এতদাঞ্চলের কাবুলের আমিরের নিকটে দূতিয়ালি করেছিলেন। তিনি দেখেন অনেকে ইউসুফজাইয়ের প্রশংসা করছে এবং অন্যান্য পাঠান উপজাতীয়দের চরিত্রের বিশেষ গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসার ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। তারা স্বাধীনতা ভালবাসে, বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ত, তাদের ওপর নির্ভরশীলদের প্রতি সদয়, অতিথি পরায়ণ, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী এবং বিচক্ষণ। কিন্তু এলফিনস্টোন একজন অতিথি ও বিশিষ্ট মিত্র হিসেবে পেশোয়ারে আগমন করেন, যেখানে ব্রিটিশরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদী অনুচর হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন কিন্তু যা উক্ত সময়ে একটা প্রাগ্রসর নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হত। সিন্ধু নদ পার হয়ে ব্রিটিশদের সীমান্তরেখা সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেখানে কোন শূন্যতার সুযোগ নিয়ে দখল করে নিতে না পারে। যেমন—রাশিয়া বা ফ্রান্স। হ্যারি লামসডেন ও তাঁর সহকর্মী রাজনীতিকগণের নিকটে পাঠানরা ছিল সহজ-সরল প্রজা আর ওদের শক্তি ও দুর্বলতাগুলিকে ঐ আলোকেই দেখা হত। ডক্টর হেনরি বিলিউ হটি মরদনে লামসডেনের সঙ্গে বহু বছর যাবত গাইডসের সেনাদলে সার্জন হিসেবে কাজ করেছেন। বিলিউ ছিলেন একজন সুবিদিত ভাষাবিদ আর তিনি ইউসুফজাইদেরকে ভালভাবেই জেনেছিলেন। পরবর্তীতে তাদেরকে নিয়ে মানবজাতিসমূহের বিবরণ সম্বলিত একটি বই লেখেন যা এখনও এ জাতীয় বইয়ের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ সাহিত্যে পরিণত হয়ে রয়েছে। তার পূর্বের এলফিনস্টোনের মত ডাক্তার পাঠানদের তেজী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে প্রভাবিত হন। ‘প্রত্যেক উপজাতিই তার নিজের প্রধানের অধীনে স্বাধীন জনগণ’, তিনি লিখেছেন, ‘সামগ্রিকভাবে একে অপরের শত্রু না হলেও প্রতিদ্বন্দ্বি বটে। প্রতিটি মানুষ মাত্রই তার নিজের প্রভু। তাদের খান ও মালিকরা মিশ্র জনগোষ্ঠী থেকে কর আদায়ের ক্ষমতা ব্যবহার করত। তারা নিজেদের গোত্রীয় ধারার ব্যাপারে গর্বিত। যেমন ভাবে অস্ত্র পরিচালনার দক্ষতাতেও তারা গর্বানুভব করে যা এই প্রশ্নটির সম্মুখীন করে, “আমি কি পাখতুন নই?”

বিলিউ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ আমলারা আরও যা আবিষ্কার করেছিল সেটি হলো যে পাঠানদের হিংস্রতার সাথে সাথে তাদের গর্বও হাত ধরাধরি করে

চলত। 'এটা মনে হতো যে উপত্যকার প্রায় সকল মানুষের হৃদয়েই সুপ্ত ছিল হত্যা করার বাসনা,' জজ এলসমি যখন তাঁর 'নোটস অন সাম অব দ্য ক্যারেকটারস্টিক্স অভ ক্রাইম এ্যাণ্ড ক্রিমিন্যালস ইন দ্য পেশোয়ার ডিভিসন অভ দ্য পাঞ্জাব, ১৮৭২ টু ১৮৭৭' লিখতে আসেন তখন সেটা লক্ষ্য করেন। 'হত্যা এর সর্বস্তরে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রত্যক্ষদর্শীদের সম্মুখে নির্লজ্জ হত্যাকাণ্ড; মাঝরাত্রে ঘুমন্ত শিকারকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা, ডাকাতি করে হত্যা, দাঙ্গায় হত্যা, বিষপ্রয়োগে হত্যা, বালকদের দ্বারা হত্যা, এমনকি মহিলাদের দ্বারাও হত্যা... নিকৃষ্টতম অকল্পনীয় অপরাধ সংঘটন পাঠান জনগণের মধ্যে প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।' যাহোক, তাদের সঙ্গের উপজাতি জনগণ ব্যাপারটা খুবই ভিন্ন দৃষ্টিতে নিল।

পেশোয়ার উপত্যকায় বসবাসরত ইউসুফজাই উপজাতিদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। খাজনা পরিশোধে বাধ্য করা হতো এবং ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে বলা হতো আর সেটি যাতে মাত্রাতিরিক্তভাবে দণ্ডমূলক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হতো। যাহোক তাদের পাহাড়ি সঙ্গী উপজাতিরা ব্যাপারটিকে অন্যভাবে নিল। অন্যান্য বৃহৎ উপজাতিদের মত ইউসুফজাইরা বুনার ও সোয়াত উপত্যকার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে যে মুহূর্তে ব্রিটিশরা তাদের উপরে আধিপত্য বিস্তার করা শুরু করে তখন মহান মুঘল সম্রাটের উত্তম প্রয়াসকে সমর্থন করে ব্রিটিশদের প্রতিহত করার জন্যে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল। আর একইভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। পেশোয়ার উপত্যকাকে লক্ষ্য করে পাহাড়ি অঞ্চলে ব্রিটিশদের যে ঘাঁটিগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি ব্রিটিশ চৈতন্যে বিশেষভাবে অনুরণিত হতো। কেননা ঐ অঞ্চলে 'আমবেলা' ও 'মালাকন্দ' দখলের জন্য ব্রিটিশদের শক্ত প্রতিরোধের মুখে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য স্থলযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল তারা।

ডকটর বিলিউ ইউসুফজাইদের সর্বোত্তম ও নিকৃষ্টতম কাজ করতে দেখেছিলেন আর বহু বছর পরে প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করেছিলেন যে তাদের নিকৃষ্টতম কাজগুলো সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর :

> তারা জন্মগতভাবে যে পরিবেশে বাস করে সেটি দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী গুণাবলির—একটি সৎ-অসৎ বিমিশ্রিত পরিবেশ। এভাবে তারা কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও গর্বিত। একই সঙ্গে তারা ধর্মহীন, ধূর্ত আর বিশ্বাসঘাতক। নিজেদের আচরণে মিতব্যয়ী, আগন্তুকদের প্রতি অতিথিবৎসল এবং ভিখিরীদের প্রতি দানশীল। শরণার্থীদের তারা নিজেদের জীবন দিয়ে প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ করবে কিন্তু তারা আনন্দোৎসব করে নিরাপরাধ পথচারীদের হত্যা

> করে তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র লুন্ঠন করে নেবে। অধিক মাত্রায় দেশপ্রেমিক ও স্বজাতির ব্যাপারে গর্ব থাকা সত্ত্বেও কেবল স্বর্ণের জন্য তারা তাদের পবিত্র ইচ্ছা বা নিকটতম আত্মীয়ের ক্ষতিসাধন করতে একটুও পিছপা হবে না। অভিভাবকহীন পরিবারে পরস্পরের সঙ্গে বিরামহীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে শত্রুতা তো রয়েছেই। তাদের সঙ্গে খুনোখুনি ও দস্যুতা করাটা তাদের কেবল সময় কাটানোর ব্যাপার। প্রতিশোধ এবং লুন্ঠনই তাদের জীবনের একমাত্র পেশা। পাহাড়ের নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থেকে তারা তাদের সকল পূর্বাপর সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সফলতার সাথে মোকাবিলা করত ও কর্তৃপক্ষের অবৈধ বিধিবিধান লঙ্ঘন করত। ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নিল সোয়াতের ইউসুফজাই ও বুনার গোষ্ঠী শুধু নয়, পাহাড়ি ও পাঠনদেরকেও বর্জন করতে হবে। তাদেরকে বশীভূত করা যাবে না বুঝে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ সরকার একটি কৌশল অবলম্বন করে যা বাস্তব অবস্থায় প্রতিফলিত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হবার ধারণা করা হলেও এটি জনঅধ্যুষিত সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই এলাকায় যেসব উপজাতি জনগণের গ্রাম ছিল তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের প্রত্যাশা করা হয়েছিল আর তারা যেন কিছু পরিবর্তন সাপেক্ষে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসরণ করে চলে। তবে জনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলগুলি বাইরে ও উত্তর এবং পশ্চিম পাহাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল; এই অঞ্চলগুলিই 'উপজাতীয় এলাকা' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। ১৮৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত আফগানিস্তান ও ব্রিটিশ ভারতের মাঝে কোনরূপ নির্ধারিত সীমান্ত স্থাপন করা সম্ভব হয়নি, অতঃপর কাবুলের আমিরের সাথে আলোচনাক্রমে ব্রিটিশ অফিসার কর্তৃক ডুরাণ্ড লাইন নির্ধারণ করা হয়; বর্তমানে এটিকে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্রিটিশদের এই দায় পাঠান অধ্যুষিত অঞ্চলের বুক চিরে চলে গিয়েছিল আর বর্তমানে যা খন্ড বিখন্ড এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। এটা সদা সর্বদা ও বর্তমানে বহিরাগতদের জন্য একটি নিষিদ্ধ এলাকা।

আমবেলা (এটি পরবর্তীতে আমবাল্লা শহরের সাথে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যাবে না) ও মালাকান্দের যুদ্ধক্ষেত্র ঘোরার পর আমি পশ্চিম দিকের পাহাড়ি গ্রাম হাজারার দিকে গেলাম। আমি রহিমুল্লা ইউসুফজাই-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীমান্ত সম্পর্কিত ইতিহাস সংগ্রহের জন্য বশির আহমেদ খান সরবরাহকৃত গাড়িতে চড়ে উক্ত অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলাম। বশির আহমেদ খান যিনি অতীতে একজন অফিসার ও কূটনীতিক ছিলেন, যার ইউসুফজাই সোয়াতীর পূর্বসূরীরা সিন্ধুনদ অতিক্রম করে উত্তরদিকস্থ হাজারার মনশেরা উপত্যকা দখল

করে নিয়েছিল। আর চির উদার বশির খান আমাকে বিস্তর তথ্যভিত্তিক ঐতিহাসিক নোটগুলি প্রদান করেছিলেন যার অন্বেষায় আমি বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম।

হাজারার প্রবেশ পথে আমাকে বুনারের পাহাড়ি উপত্যকা অতিক্রম করতে হয়েছিল, যা সিন্ধু উপত্যকার প্রবেশমুখে ঠিক দক্ষিণদিকে পেশোয়ার উপত্যকায় বৃহৎ শৈলশ্রেণীর মধ্য হতে উদ্গত একটি মুষ্টিবদ্ধ পর্বতের মতো। এটাই সেই মহাবন পর্বত; প্রকৃতপক্ষে এটি ত্রিশ মাইল প্রশস্ত ও পনের মাইল প্রস্থ গভীর যা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, গুহা এবং সুড়ঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। (২নং মানচিত্র দেখুন, 'দ্য পেশোয়ার ভ্যালী') মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে এটিকে বৌদ্ধরা উদিয়ানা নামে মান্য করত, স্বর্গীয় উদ্যান, আর হিন্দুরা এটিকে গ্রেট ফরেস্ট (মহাবন) বলে জ্ঞান করত, ঋষিবর্গের ও সন্ন্যাসীদের একটি প্রিয় নিরাপদ স্থান। মুসলমানদের মধ্যেও এটিকে পৃথক পবিত্রস্থান হিসেবে মনে করা হতো যার ফলশ্রুতিতে বহুপীর (পবিত্র মানুষ)কে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। 'এটি সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী স্থানে পরিণত হয়', লিখেছেন জন অ্যাডি, প্রথম দিককার ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাদের একজন যিনি ১৮৬৩ সালে প্রথম এই দুর্ভেদ্য পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন :

> এই পাহাড়ি অঞ্চলের অধিকাংশ বিস্তীর্ণ এলাকা দুর্ভেদ্য উন্মুক্ত ফার বন, খাদ, অসমতল প্রস্তরাকীর্ণ বিরানভূমি ও সারা শীত জুড়ে তুষারাচ্ছাদিত শৃঙ্গ পরিবেষ্টিত। অবশ্য এখানে আর যা ঘিরে উপজাতিরা অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম গড়ে তুলেছে এবং কোন কোন অংশে দেখা যায় ঘন ঘন বন নিম্নমুখে সমতল ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। রাস্তাপথ খুবই কম আর খারাপ, প্রকৃতপক্ষে গ্রামগুলোতে যাওয়া-আসার জন্য রয়েছে শুধুই সংকীর্ণ পথ। পাহাড়ের পূর্বদিকটা আকস্মিকভাবেই শুরু হয়েছে এবং এটি হাজারা প্রদেশ থেকে সিন্ধু নদ দ্বারা দুইভাগে দ্বিখন্ডিত; যেখানে একইভাবে ঢালুটা বিস্তৃত হয়েছে সেটি ইউসুফজাই সমতল ভূখন্ড নামে পরিচিত।

ছয়টি পাঠান উপজাতি ও উপ-উপজাতির মধুবন পর্বতে বাস করে। ইউসুফজাই চামলওয়ালরা উত্তর-পশ্চিমে; ইউসুফজাই খুদু খেলরা পশ্চিমে; গাদুনরা দক্ষিনে; ওয়াজিরি উতমানজাইরা দক্ষিণ-পূর্বদিকে; ইউসুফজাই ইসাজাইরা উত্তর-পূর্বদিকে; আর শেষেরটি ইউসুফজাই আমাজাই চামলাওয়ালস ও ইসাজাইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

মহাবন পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল যেখান থেকে সিন্ধু নদ বিভক্ত হয়ে একটি শাখা সরাসরি সমতলভূমির দিকে ধাবিত হয়েছে। এই অঞ্চলটি উতমানজাই উপজাতিদের দখলে ছিল। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তান সরকার এখানে তারবেলা বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন যার পানি এখন উত্তরদিকে বিস্তৃত

হয়ে গিরিখাত বরাবর কয়েক মাইলব্যাপী প্রবাহিত হয়। বাঁধের ঠিক নীচ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ঠিক এই পর্বে বশির খানের বর্ণনানুসারে জানা যায় মহাবন পাহাড়ের বামপার্শ্বে, বর্তমানে সেটা তারবেলা হ্রদের কারণে পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। বশির খান সেই স্থানটিকে 'হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের আস্তানা' হিসেবে উল্লেখ করেন যার পূর্ব নাম ছিল সিত্তানা।

সেই সময়ে 'হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধ' শব্দটির সাথে আমি পরিচিত ছিলাম না কিন্তু এখানে ঘন্টাধ্বনি বাজার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। কারণ আমি আমার গবেষণা থেকে জানতে পারি যে, হ্যারি লামস্‌ডেন তার চব্বিশ বছর বয়সে অগ্রদূত বাহিনী গঠন করার পূর্বে তিনি হাজারা অঞ্চলে তিন সহস্র পদাতিক সৈন্য সহযোগে দক্ষিণ হাজারার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। যে অঞ্চলটি ছিল অবশ্য নামকাওয়াস্তে শিখদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি স্থানীয় উপজাতীয়দের চরম প্রতিরোধের মুখে পড়েছিলেন, কাগান উপত্যকার সৈয়দদের প্রতিরোধ কতিপয় হিন্দুস্তানি, ব্যাখ্যা মতে হিন্দু নয় কিন্তু কতিপয় মুসলিম কর্তৃক ভীষণভাবে সমর্থিত হয়েছিল, জায়গাটি ছিল সিন্ধুনদের পূর্বদিকে। তিনি এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন যে, এই হিন্দুস্তানিরা যুদ্ধে সৈয়দদের নেতৃত্ব দান করেছিল আর তারা ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করেছিল। কিছু যোদ্ধাকে বন্দী করা হয়েছিল এবং তাদেরকে কঠোর প্রহরায় পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে প্রেরণ করা হয়েছিল। সেখানে হ্যারি ল্যামসডেনের প্রধান হেনরি লরেন্স তাদেরকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। আর তাদের সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করেছিলেন। দেখা যায় এই বাহিনীর প্রায় সকল সদস্যই পাটনা থেকে এসেছিল। পাটনা শহরটি ছিল গঙ্গা তীরবর্তী বেনারস ও কলকাতার মধ্যখানে। তারা যে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা পরিচালিত হতো তারাও ছিল পাটনার অধিবাসী। তারা ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে পরবর্তীকালে সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তারা তাদের ভারতের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি পেয়েছিল।

অনেক রহস্য সমাধানের সূত্র ছিল তার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিলাম আমি। সেগুলোর মধ্যে সদা হাস্যোজ্জ্বল হাজারার প্রথম ব্রিটিশ সেনা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জেমস অ্যাবোট সাহেব লিখিত একটি আকর্ষণীয় দলিল যেটি এই অঞ্চলের উপজাতীয় সকল প্রধানদের মেজাজ ও চরিত্রের দুর্বলতার একটি নিখুঁত কলমী চিত্র দান করে। অ্যাবোট সাহেব কিছু নোট ও পুনশ্চ অংশ জুড়ে দেন আর সেগুলোর একটি খণ্ডিত আকারে পড়া যায়। 'কাগান একাধিক ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রের সংলগ্ন হওয়ায় সামরিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর এতদসহ হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের অবস্থানের কারণেও বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করে, যারা আহমদ শাহের বিশেষ অনুসারী; এবং এটিকে অস্ত্র সংরক্ষণের ঘাঁটিতে পরিণত করে। আমি বুঝতে পারি এখনও কিছু হিন্দুস্তানিকে সৈয়দ

জমিন শাহ্ লালন পালন করেন আর এই সামাজিক মেলামেশা করা হয় সিত্তানায় সৈয়দদের এবং ধর্মান্ধদের মধ্যে।'

প্রথমে আমি যা লিপিবদ্ধ করতে পারি নি তা হলো অ্যাবোট সাহেবের অসংখ্য চিঠিপত্র যেগুলোতে এই সমস্ত ঘটনাবলি সম্বন্ধে পূর্বেই লিখিত হয়েছিল। এই সমস্ত চিঠিপত্রে হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের চরিত্র সবিস্তারে বর্ণিত ছিল। অ্যাবোট সাহেব একটি গোপনীয় সরবরাহ শৃঙ্খল সম্বন্ধে বিশেষভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন, যার মাধ্যমে অর্থ, অস্ত্র ও জনশক্তি ভারতের সমতল ভূমি থেকে সিত্তানা পর্যন্ত চোরাচালানি করা হতো। তাঁর লোকজন অগ্রদূতদের বাঁশের চোঙার ভেতরে গোপন করে আর কোমর কোটের নিচে স্বর্ণমুদ্রা লুকিয়ে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করত। তরুণ মুসলিম জনগণ টঙ্ক, রোহিলখন্দ এবং এ রকম আরও জায়গা থেকে 'ভিখিরী ও ছাত্রের ছদ্মবেশে' সিন্ধুনদের তীরবর্তী অ্যাটক পার হচ্ছিল আর তারপর উত্তরে মহাবন পাহাড়ের দিকে যাবার পথ তৈরি করছিল। সেখানে তাদের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে অস্ত্র তুলে নিত তারা। সিত্তানাতেই খাদ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হচ্ছিল যেখানে উটের কাফেলায় পণ্য পরিবহন করা হতো। ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫৩ সাল চার বছরেরও অধিক সময় অ্যাবোট সাহেব তার নিজ জেলা হাজারার আশ-পাশের জনগোষ্ঠীর নিকট হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ান, তিনি এ কারণে সিন্ধুনদের কূলবর্তী স্থানে একটি সশস্ত্র তল্লাশি ফাঁড়ি স্থাপনের জন্যে কর্তৃপক্ষের নিকটে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। এই জন্যে যে, 'ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত শত্রু সম্প্রতি পরাজিত হয়েছে।'

পরিশেষে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা তথাকথিত ভারতীয় বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার সময় কিছু বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাঁচাই বাছাইয়ের সময় পেশোয়ারের কর্তৃপক্ষ সে কাজে বাধা প্রদান করেন। পেশোয়ার বিভাগের পাঞ্জাব গেজেটে যেমন বর্ণিত রয়েছে, এই চিঠিপত্রগুলো পাটনা ও থানেশ্বর থেকে মুহাম্মদী ধর্মান্ধরা ৬৪তম স্বদেশী পদাতিক বাহিনীর নিকটে পাঠায়। চিঠিগুলোতে প্রকাশ পায় যে, হিন্দুস্তানে 'নাজারীনদের' (খ্রিস্টানদের) লোকজন, নারী ও শিশুদের উপর আনন্দ-উল্লাস করে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। এবং তাদের মায়েদেরকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে পাঠানো হয়েছিল তারা যেন একই পন্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যদি তারা এতে ব্যর্থ হয় তাহলেও তারা নিদেন পক্ষে স্বর্গবাসী হবে আর একাজে যদি তাদের মৃত্যু ঘটে তবে তা নিজেদের দেশে শুভবার্তা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই পত্রগুলো পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে যে, এগুলো দীর্ঘ সময় ব্যাপী সোয়াত ও সিত্তানার ধর্মান্ধ ব্যক্তিবর্গসহ ৬৪তম স্বদেশী পদাতিক বাহিনীর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

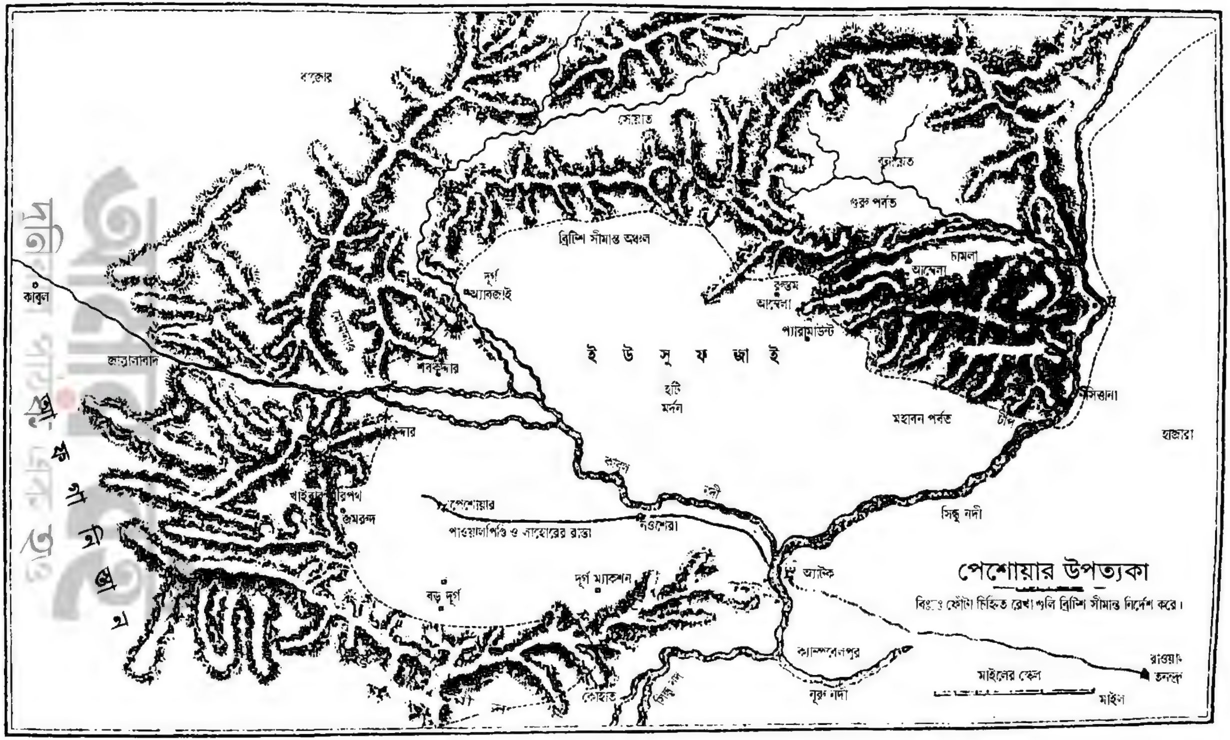
পেশোয়ার উপত্যকা
বিন্দু ফোঁটা চিহ্নিত রেখাগুলি ব্রিটিশ সীমান্ত নির্দেশ করে।
মাইলের স্কেল
মাইল
বক্তার
সোয়াত
বুনায়েত
গুরু পর্বত
ব্রিটিশ সীমান্ত অঞ্চল
চামলা
আম্বেলা
রুস্তম
আম্বেলা
প্যারামাউন্ট
দুর্গ
অ্যাবজাই
কাবুল
জালালাবাদ
শবকদ্দার
ই উ সু ফ জা ই
হটি
মর্দন
সিত্তানা
মহাবন পর্বত
চীপ
হাজারা
কাবুল
নদী
খাইবার গিরিপথ
জমরুদ
পেশোয়ার
পাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরের রাস্তা
নওশেরা
সিন্ধু নদী
অ্যাটক
বড় দুর্গ
দুর্গ ম্যাকশন
ক্যাম্বেলপুর
কোহাট
নূরু নদী
রাওয়াল
পিন্ডি
আ ফ গা নি স্তা ন

'পেশোয়ার উপত্যকা' ঃ ১৮৬৩ সালের জন অ্যাডির মানচিত্র ইউসুফজাই গ্রাম ও মহাবন পার্বত্যাঞ্চল

আমার ভ্রমণের এবং গবেষণার ফল সোলজার সাহিবস 'দ্য মেন হু মেড দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার' ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি অগ্রদূত রাজনৈতিক কর্মকর্তার গল্প বলে যেটি একত্রে 'হেনরি লরেন্সের তরুণেরা' নামে পরিচিত। তরুণ সেনা কর্মকর্তারা যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লরেন্সের অধীনে কাজ করেন সেটি পরে ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হয়ে যায়। হ্যারি লামসডেন ও জেমস অ্যাবোট ব্যতীত এই সীমান্ত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে হার্বার্ট এডওয়ার্ডস, জন নিকলসন, রেয়নেল টেলর ও নেভিল চেম্বারলিন, তারা সকলে অত্যন্ত খ্যাতি ও গৌরবের সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পাঠানদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সীমান্তে কিংবদন্তীর মত সমাদৃত হয়েছিলেন। তখন থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে মানুষের মনে একটা শিহরণ সৃষ্টি হয়েছিল যা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্যদের প্রভাবিত করত। আমি বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সর্বশেষ বড়লাট স্যার ওলাফ ক্যারোর কথা মনে করছি (১৯৪৬-৪৭), নিম্নলিখিত ভাবে তিনি তাঁর মনোভাব আমার নিকটে ব্যক্ত করেছিলেন–

> পাঠানরা যে অঞ্চলে বাস করত প্রকৃতি সেখানে রুক্ষ-রুদ্র ছিল। সেই সুবাদে তাদের জীবন ধারাও ছিল কর্কশ। এই ধরনের বৈপরীত্য কখনো কখনো অসহনীয় ছিল, কিন্তু সম্ভবত এটি এই যে সেটি ভালবাসার বন্ধনে আমাদের বেঁধে রাখে। পাঠানদের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য ইংরেজরা বা স্কটরা লক্ষ্য করেছিলেন যা তারা স্পষ্টভাবে সরাসরি কারো মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাদের মধ্যে সবকিছু স্পষ্ট এবং কোন কিছু গোপনীয় ছিল না এবং তারা কোনরূপ ভ্রু কুঁচকানোর তোয়াক্কা করত না। যখন আমরা অ্যাটকে সেতুটি পার হলাম তখন মনে হলো আমরা বাড়িতে এসেছি।

আরবের মরুভূমির উপজাতিদের সঙ্গে ব্রিটেনের আচরণ একই রকম দেখা গেল। প্রথম দিককার দুঃসাহসিক কর্মীরা যেমন ডটি, বার্টন, ও পলগ্রেভ এবং পরবর্তীতে রাজনৈতিক কর্মী সেন্ট জন ফিলবি আর টি.ই.লরেন্স নির্বুদ্ধিতার সাথে ষড়যন্ত্র করে বিরল বিক্ষিপ্তভাবে সাহসী বাদাউইন যা বর্তমানে বেদূঈন নামে সমধিক পরিচিত তাদের অধ্যুষিত এলাকার চিত্র এঁকে ফেলেন, যাদের কঠোর নৈতিক বিধানসমূহ পাঠান দর্শনের প্রায় সার্বিক ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত হিসেবে ধরা যেতে পারে। এটা বলা অতিরিক্ত হবে যে দুই অঞ্চলের দুই জনগোষ্ঠীকে পূর্ব-ধারণা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মূল্যায়ন করলে পরিণামে বাস্তবতার ধারণা অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হার্বার্ট এডওয়ার্ডস প্রথম একজন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা পাঠানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে রোমাঞ্চকর ধারণা নিয়ে 'এ ইয়ার অন দ্য পাঞ্জাব'

নামে একটি বই ১৮৫১ সালে প্রকাশ করেন। এডওয়ার্ডস তবুও সত্যতা স্বীকার করেন যে, তিনি পাঠানদের যে গুণাবলির প্রশংসা করেন তা ছিল দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও বীরত্ব ছিল প্রচন্ড আত্মাহমিকা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার দ্বারা চালিত। প্রবল উপজাতীয় পরিচিতির অর্থ ছিল সমগ্র উপজাতীয় শত্রুতা। বন্ধুত্ব ও আতিথেয়তার গুণাবলি ঠিক একইভাবে শঠতা আর বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে নির্ণয় করা যেত। কিন্তু সম্ভবত সর্বাধিক আকর্ষণীয় আপাত বিরোধী সত্য ছিল এই যে, পাঠানরা বিস্ময়কর মাত্রার ধর্মীয় অধীনতার দ্বারা চালিত হয়ে খুব স্বাধীন প্রকৃতির বলে গর্ব অনুভব করত। এডওয়ার্ডস ছিলেন একজন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক। তিনি তাঁর ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যা নিশ্চিত রূপে আধুনিক সভ্যতায় সুস্পষ্ট সফলতার সাথে গৃহীত হয়েছে তা সেখানে চালু করতে চেয়েছেন। পাঠানদের ধর্মীয় বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তাঁর ধারণা তেমন সুখকর নয়, যা তাঁর মতে তাঁদেরকে উলেমা, ‘যাঁরা ইসলামের পথে চলা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ’ সেই সকল ধর্মযাজকদের নিকটে জিম্মিতে পরিণত করেছিল। মোল্লা ও কাজী, পীর আর সৈয়দরা স্মাইলিং ভেলে (হাসির উপত্যকায়) উপনীত হয়েছিলেন। দক্ষিণের ওয়াজিরিস্তান সম্বন্ধে লিখেছেন হার্বার্ট এডওয়ার্ডস।

> সাথে করে আনেন তাঁদের চশমা এবং প্যাঁচার মত চেহারা, তসবিহ-তাবিজ আর ইসলামের নবী মোহাম্মদ (সা.) থেকে শুরু করে তাদের নিজস্ব বংশের কোষ্ঠী। প্রত্যেক নবাগত পিটারের মত বোঝাতে চাইত তাদের হাতে স্বর্গের চাবিকাঠি রয়েছে। তারা আইরিশ ভিক্ষুদের মত যারা তাদের ভিক্ষা দিত, তাদের আশীর্বাদ করত আর যারা ভিক্ষা দিত না তাদেরকে অভিশম্পাত করত। তারা আরবি ভাষায় তাদের অভিশাপ দিত, অথবা আরবির মত শোনা যায় এমন ভাষায় তাদের অভিশাপ দিত, অথবা আরবির মত শোনা যায় এমন ভাষা ব্যবহার করত এবং বলত যারা মহানবীর এই উত্তরসূরীদের কোন কিছু দিতে অনীহা প্রকাশ করবে তাদের আত্মায় একটা কালো দাগ পড়ে যাবে, ভিক্ষে না পাওয়া ধার্মিক ব্যক্তি মানুষের দরজায় রেগে থুতু ফেলে চলে যেত, অথবা একজন হাজি যে তিনবার হজ্জব্রত পালন করেছেন তাঁকে দেখা যেত বসে থেকে তার উট ও ভেড়াগুলোকে চুলকে আনন্দ দান করছে। এই জিনিসগুলোই শঙ্কিত বন্য মানুষগুলোর মধ্যে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল যাতে করে তার হাতের খড়গ খসে মাটিতে পড়ে যেত। তার হাঁটু দুটি আপনা-আপনি ঠক ঠক করে বাড়ি খেত, প্লীহা চমকে উঠত এবং তার মুখ দিয়ে এই বিধর্মীয় দাবির কাছে অবনত হওয়ার মত কোন ভাষা থাকত না।

গাইডস সাহেবের সেনাবাহিনীর সার্জন ডক্টর হেনরি বিলিউ আরও উল্লেখ করেন ইউসুফজাইদের মধ্যে একই ধর্মীয় অভীষ্টে পৌছানোর জন্য স্বাভাবিক

প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি ঘোষণা করেন, 'তারা সামগ্রিকভাবে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতদের নিয়ন্ত্রণাধীন আর তারা সদাসর্বদা কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে জাহাদের (জিহাদ) জন্য প্রস্তুত থাকত। ধর্মীয় পন্ডিতদের জন্য অপরিমিত ভক্তি সার্বজনীন, আর অদ্ভুতভাবে অসম্ভব বিপরীতমুখী নীতিবাক্য গৃহীত হয় আর তদানুযায়ী আগ্রহের সঙ্গে এই বিশ্বাস মতে তারা চলে। অর্ধশতাব্দী পরে তখন উইন্সটন চার্চিল একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা ৪র্থ হুসারসহ ঠিক একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি পাঠানদের সম্বন্ধে লেখেন, 'তাদের কুসংস্কার তাদেরকে অসংখ্য মৌলভিগিরিতে অত্যাচারী ও প্রচন্ড লালসায় আসক্ত ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করে—মোল্লাবর্গ, সাহিবজাদাগণ, আখন্দবৃন্দ, কাফিররা আর বহু সংখ্যক ভ্রমণরত তালিব-উল-উলমস যারা তুরস্কের ধর্মতত্ত্বের বিদ্যার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তারা জনগণের অর্থে মুক্ত জীবন যাপন করে।

যখন ডক্টর বিলিউ ১৮৬৪ সালে ইউসুফজাইদের ওপর সাধারণ প্রতিবেদন দাখিল করতে আসেন তখন তিনি তাঁর বর্ণনায় এই দুই ধর্ম যাজককে ধর্মীয় দাবি করে পাঠানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করত। প্রথমদের মধ্যে ছিলেন সাঈদরা, যারা আরবের বংশোদ্ভূত এবং তারা মহানবী (সা.)-এর জামাতা আলীর সরাসরি বংশধর বলে বিশ্বাস করত। 'তাদের উৎপত্তি এমনই একটি পবিত্র স্থান থেকে ঘটেছে যে তাদেরকে অস্বাভাবিকভাবে পবিত্র মানুষ হিসেবে জ্ঞান করা হতো, তাদের দৃঢ় ও দর্শনীয় চারিত্রিক গুণাবলি এবং অজ্ঞতা থেকে আহরিত বিরোধী আচরণসমূহ অজ্ঞ মানুষদের বিশেষভাবে সমীহ জাগাত। তারা এই পরিচিতি নিজেদের সুবিধা পাবার জন্য ব্যবহার করে এবং আফগানদের (পাঠানদের) নিকট থেকে পর্যাপ্ত ভূমি চিরস্থায়ীভাবে বংশপরম্পরা ভোগ করার নিমিত্তে বন্দোবস্ত করে নেয়।

বিলিউর দ্বিতীয় দল যাজকদের সর্বাধিক অংশ প্রদান করেছিলেন। প্রতি মসজিদে নামাযের জামাতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন করে ইমাম ছিলেন। অধিকতর বড় মসজিদে কোরান-হাদিস-নামায সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক যাঁরা বিভিন্নভাবে মোল্লা, মৌলভি বা মৌলানা নামে পরিচিত ছিলেন। 'তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তালিব-উল-উলম কোরান, নামায আদায় করার কায়দা- কানুন, আর ইসলামের নীতি আদর্শ শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকতেন এবং গ্রামের ছেলেমেয়েদেরকে বারে বারে 'ধর্মীয়' বাণী উচ্চারণ করাতেন ও তাদের নামায পড়াতেন। ড. বিলিউর 'তালিব-উল-উলম' অধিকতর সঠিকভাবে 'তালিবান-উল-উলম' যার শাব্দিক অর্থ 'জ্ঞানান্বেষণকারী' বা ধর্মীয় ছাত্রবৃন্দ। তিনি তাদেরকে এই শ্রেণীতে বিভাজিত করেছেন 'একটি ভবঘুরে ও অলসতাপূর্ণ তরুণবৃন্দের মিশ্রিত শ্রেণী নিজেদেরকে ধর্মের পথে উৎসর্গ করার

ভান করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সামগ্রিকভাবে তারা একটি সুখকর ও সহজ জীবন যাপন করে। তারা যেখানেই যায় সেখানেই মসজিদে তারা আশ্রয় নেয় আর তারা চাওয়া মাত্র সর্বদাই পর্যাপ্ত খাবার পেয়ে যায়। সাধারণতঃ তারা খুব অজ্ঞ এবং আশ্চর্যজনকভাবে সংকীর্ণ চেতা ও গোঁড়া।'

এডওয়ার্ডস, বিলিউ এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তা যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছিল তারা এই সৈয়দদেরকে, ইমামগণকে, মোল্লাবৃন্দকে, মৌলভিবর্গকে মৌলানাদেরকে ও তালিবানদেরকে একইভাবে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে দেখেছিল। তাঁরা উলেমাদের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি হুমকিরূপে দেখেছিলেন কারণ তাদের (উলেমাদের) দলের উপর প্রভাব ছিল। অপর পক্ষে ব্রিটিশদের উপজাতি জনগণের ওপর কোন প্রভাবই ছিল না। সেই বিতৃষ্ণা একই ভাবে ফিরে এসেছিল ব্রিটিশদের ওপর যদিও অধিক মাত্রায় নয়। সৈয়দরা, মোল্লাবৃন্দ, মৌলভিগণ, মৌলানারা এবং তালিবানরা ব্রিটিশদেরকে তাদের নেতাদের ওপর কেবল হুমকি হিসেবেই দেখে নি তাদের ধর্মের ওপরও হুমকি মনে করেছে। ১৮৪৭ সালে একজন সন্দেহভাজন হত্যাকারীকে হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের প্রহরীরা ধরে নিরস্ত্র করেছিল এবং জানা গেল সে একজন মোল্লার নির্দেশে একাজে লিপ্ত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে জন নিকলসন তাঁকে আক্রমণের জন্য অগ্রসরমান একজন তরবারিধারি ব্যক্তিকে গুলি করেন। কেন সে তাঁর দিকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তীতে এই আক্রমণকারীকে তিনি 'ধর্মীয় পাগল' হিসেবে বর্ণনা করেন। এই ব্যক্তিকেও নিকলসন তাঁর বর্ণনায় 'ধর্মীয় শিক্ষক' হিসেবে দেখান। যেমন করে পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু এবং এরকম অন্যান্য স্থানের খ্রিস্টান গোরস্থানের সমাধির ফলকগুলো প্রমাণ করে, পরবর্তী শতাব্দী জুড়ে ব্যক্তিগত ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপর অসংখ্য সন্ত্রাসী ক্রিয়া-কান্ড সংঘটিত হয়েছিল। আমার সর্বকনিষ্ঠ কন্যার গলায় বাঁধা একটি সোনালি সুতার রুমাল আছে। সেটি এক সময় একজন ইংরেজ ডাক্তার ফ্লোরা বুচারের কাছে ছিল। মিস বুচার ব্রিটেনে এমন এক সময় ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন যখন মেয়েদেরকে উক্ত পেশায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না, কাজেই তিনি ডাক্তারি পড়তে বেলজিয়ামে যান। ডাক্তার হওয়ার পর তিনি ভারতে ডাক্তারি করার আশা পোষণ করেছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ কাজটি করার অনুমতি দেন নি। অকুতোভয়ে তিনি খাইবার পাস পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে উপজাতিদের অঞ্চলে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এখানে তিনি নিজে এবং একটি ক্ষুদ্র ভারতীয় নিবেদিত প্রাণ পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় বিপুল কৃতকার্যতার সাথে উপজাতি লোকজনদের চিকিৎসা সেবা দান করতে থাকেন। ১৯২৭ সালের শেষের দিকে তার সরবরাহকারী ঘোড়ার বহর না এসে পৌঁছানোর জন্যে বিশেষভাবে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। পরে তদন্ত করে দেখা

গেল মিস বুচার ও তার অধিকাংশ আরোহীরাই নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। তিনিই অসংখ্য ডাক্তারদের মধ্যে একমাত্র অভীষ্ট ডাক্তার ছিলেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল তখন যখন ব্রিটিশরা উপজাতিদেরকে 'গোঁড়া ধার্মিক' নামে অভিহিত করেছিলেন।

'সোলজার সাহিবস' গ্রন্থে আমি উপজাতি লোকজনদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসমূহ তাদের সন্ত্রাসী কাজের প্রতি পাঠানদের ঐতিহ্যগত প্রবণতা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এবং বাইরের হস্তক্ষেপকে তারা তীব্র ঘৃণা করত এই মর্মে ব্যাখ্যা করেছিলাম। আমি বড় ভুল করেছিলাম। আমি যেটা হারিয়েছি সেটা আরও অসীম সঙ্কটজনকঃ আমি যেটা হারিয়েছি সেটা সীমাহীনভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ; ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিদ্রোহীরা ধারাবাহিকভাবে বিদ্রোহ ও হত্যার ঘটনা ঘটিয়ে চলেছিল কিন্তু যারা ছিল (এখনও রয়েছে) তারা গভীরভাবে নিজেদের ধর্মে বিরুদ্ধাচারণ করত। এ আন্দোলন শুধু ইসলামের স্বার্থেই ছিল না যা এর অনুসারীরা বোঝাতে চাইত (এখনও চায়), বস্তুতপক্ষে নিজেদের ছাড়া অন্য সকলের মতাদর্শ ধ্বংস করার কাজেই নিয়োজিত ছিল; এই আন্দোলন সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করত, যেটা ১৮৫৭ সালে অস্বীকৃতভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনকে উৎখাত করার লক্ষ্যে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এ আন্দোলন বহুবার প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল কিন্তু এ আদর্শ সর্বদাই উজ্জীবিত ছিল; এবং যা বর্তমানে স্বরূপে ফিরেই আসে নি বরং যার আবেদন ও অনুপ্রেরণা ইতিপূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয়নি।

এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নিজেকে দেখলেন একজন সংস্কারক এবং যারা তার শিক্ষার আদর্শ অনুসরণ করছিল তাদেরকে বর্ণনা করলেন আল-মুয়াহিদুন, বা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসীগণ। কিন্তু তারা তাদের আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার পর তাদের শত্রুদের নিকটে আল ওয়াহ্হাবি—ওয়াহ্হাবিগণ নামে পরিগণিত হলো। তাদের অনেক কৌতূহলী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরবর্তীকালের ইতিহাসে আমার প্রপিতামহের সময়ে এই বৈশিষ্ট্যটি ছিল যে তারা জনগণের নিকট ওয়াহ্হাবিরা খুব পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, বড়লাট লর্ড মায়োর ১৮৭১ সালে ওয়াহ্হাবি পরিচালিত হত্যাকারীর দ্বারা যখন ছুরিকাহত হন তখন আমার প্রপিতামহদের মধ্যে একজন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহ্হাবিরা ব্রিটিশ প্রশাসকদের নিকটে হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধ বলে সমধিক পরিচিত ছিলেন, আর তাদের পাহাড় ভিত্তিক লড়াইস্থলকে সর্বদা 'ধর্মান্ধ শিবির' বলা হতো। এক প্রজন্ম পরে, আমার পিতামহ পিতামহীর সময়ে একই আন্দোলন আরবে পুনর্জ্জীবিত হয় এবং এখন এটিকে বলা হচ্ছে আল-ইখোয়ান—ভ্রাতৃত্ব। ইতিমধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে আরও সম্মানীয় আকারে ওয়াহ্হাবিবাদ পরিবর্তিত হয়েছিল, এখন পুনরায় ধর্মীয় মতাদর্শ 'সালাফি বা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ' নামে তাঁরা এই আন্দোলন অব্যাহতভাবে

চালিয়ে যাচ্ছেন। অতঃপর আমাদের নিজেদের সময়ে আল ওয়াহ্হাবিদের দুটি ধারা পরবর্তীতে রাজনৈতিক নতুন মতাদর্শ, জাতীয়তাবাদী চেতনা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে পাক-আফগান সীমান্ত বরাবর সংগঠিত হয়েছিল। দুটো ধারার এক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছে। একটি ধারা এলাকা ভিত্তিক কঠোর প্রয়াসী তাত্ত্বিক ধারা ও অপরটি বিশ্বব্যাপী ইসলামি জাগরণ সৃষ্টির প্রত্যাশায় শিথিলভাবে গড়ে তোলা একটি সংগঠনের ধারা যার নেতৃত্বে রয়েছে তালিবান এবং আল কায়েদাবাদী দুটি সংগঠন যারা একে অপরের পরিপূরক।

ওয়াহ্হাবি মতবাদের অনুসারীরা উক্ত মতবাদ ঘোষণা করে ইসলামের বিশুদ্ধ ধারা, মূল ধারা অনুসরণ না করে, আর 'তালিবান' বা 'আল-কায়েদা'-এর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতিরেকেই। কতিপয় বিজ্ঞ তাত্ত্বিক ব্যক্তিবর্গ ও রাজনৈতিক দার্শনিকগণ একই মত পোষণ করেন। তাঁদের মূল্যায়নানুযায়ী দেখা যায় যে, ওয়াহ্হাবি মতবাদ ইসলামের মধ্যে একটি বিশুদ্ধবাদী তাত্ত্বিক ধারা যার প্রবক্তা ছিলেন ইয়েমেনি ওসামা বিন লাদেন, মিশরীয় আয়মান আল জওয়াহরি, আফগান মোল্লা ওমর এবং জর্দানীয় আবু মুসাব আল-জারকোয়ায়িদের মত ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা কেবল সশস্ত্র সন্ত্রাসের ওপর নির্ভর করে শক্তিমত্তার দাপটে এটিকে বাস্তবায়নের সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে।

ওয়াহ্হাবি মতবাদ প্রতিষ্ঠাতা ইসলামে বিদ্যমান কলুষতার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করে নিজেকে সংস্কারক ও ধর্মীয় জাগরণের সমর্থক হিসেবে দেখলেন। তিনি ঐ সকল কলুষতার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তাঁর মুসলমি অনুসারীদেরকে তাতে অংশ নিতে বললেন। কিন্তু তাঁর ওয়াহ্হাবি মতবাদ খুব দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে, এটি গড়ে তোলে রাজনীতি ও ধর্মীয় মতাদর্শ যার চারপাশে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান, যিনি একই সঙ্গে ইহলৌকিক ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন। এটি মূলতঃ একটি ধর্মীয় মতবাদ হয়ে যায়।

ওয়াহ্হাবি মতবাদ কখনই জনসমর্থন পুষ্ট হয়নি। এর মতাদর্শ সর্বদাই সন্ত্রাসী অসহিষ্ণুতায় পরিকীর্ণ ছিল যার কিছু মুগ্ধতা রয়েছে অধিকাংশ মানুষের কাছে। অন্যান্য সকল চরমপন্থী ধর্মীয় মতবাদের মতো এটিও পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই মতবাদ ধর্মীয় মূল্যবোধের একমাত্র প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হয় যেখানে বিশ্ব ইসলামি সমাজের মনে প্রশ্ন জাগে কেন এটি কিতাবে (কোরান) উল্লিখিত ব্যাখ্যা মতে পরিচালিত হচ্ছে না।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মোঙ্গলদের আগমনে ইসলাম ধর্মের প্রথম বিরাট সংকট সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ও আরও গভীর সংকট শুরু হয়েছিল পশ্চিমা পুঁজিবাদের উত্থানে। তুরস্ক সাম্রাজের মহান নৃপতি সুলতান সোলাইমান অজেয়ভাবে আবির্ভূত হন। একটি বিভাজিত ধর্মের বিশ্ব যা একজন কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা, খলিফার অধীন এক আইন, শরিয়া অনুসারে মুসলমানদের সকল আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। এটিই ছিল 'দার-উল

ইসলাম' বা 'ইসলামের রাজ্য', এই রাজ্যে তারাই থাকত যারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে, সব দিকে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত 'দার-উল হার্ব' বা 'শত্রুতার রাজ্যে'র, যারা অবিশ্বাসী ছিল তারা অবশেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে শরিয়া অনুসারে জীবন যাপন করেছিল। তবে ১৬৬৩ সালে ভিয়েনার অবরোধ ঠেকাতে না পেরে খ্রিস্টান ইউরোপে অগ্রযাত্রার পূর্বে তুর্কীরা দীর্ঘ, ধীরগতিতে অপসারিত হয়েছিল। সেই অগ্রযাত্রা ছিল নির্দয় সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও ভয়াবহ। ডক্টর থিওডোর পেনেলের ১৯০৯ সালে লিখিত গ্রন্থের আস্ফালনপূর্ণ ভাষায় বর্ণিত মতে দেখা যায়, 'গোঁড়া হিন্দুবাদ ও মুসলিমবাদী তত্ত্বগুলি অবক্ষয়মুখী হয়ে পড়ে যখন পশ্চিমা বিশ্বের গণতান্ত্রিক ধারা উদার চেতনা, বিশ্ব বাণিজ্যের ক্রমবৃদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, ধন-সম্পদ ও বিলাসিতা আহরণের লালসা পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক প্রাচ্যে সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।'

'কিভাবে এটা হতে পারে?' এবং 'আমরা কি করতে পারি?' সাধারণ মুসলমানরা এই প্রশ্নগুলো বারে বারে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামকে খিলাফতের নামে প্রতিরোধ করে এসেছেন স্থানীয় শাসনকর্তা, আমির এবং নবাবগণ। তবে এই ধর্ম নিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দ খ্রিস্টান শাসনকর্তাগণকে পথ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে উলেমারাই জনগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। একটি উত্তর হলো ইসলামি পুনর্জাগরণ তার আদি নাম 'সর্ব-ইসলামবাদ' হিসেবে আজও বিরাজমান। এই চেতনার উদ্দেশ্য হলো ইসলামি আন্দোলনকে পুনর্বিন্যাস করা, যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইসলাম পসন্দ দলগুলো আরাম-আয়াস ও মুক্তির জন্য ঝুঁকে পড়ছে। এটাকে প্রকৃতপক্ষে আইনানুগ আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এটা কট্টোরপন্থী খ্রিস্টীয় পন্থা থেকে আলাদা কোনোকিছু নয়। যেমন খ্রিস্টানরা তাদের অনুসারীদের নিরাপদ দেখতে চাইত এবং প্রয়োজনে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসীকর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদেরকে নিজ আদর্শে দীক্ষিত করা হতো। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যত না আবেদন সৃষ্টি করেছিল, ধর্মীয় অনুভূতি যা ওয়াহ্‌হাবিবাদে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আর তার দ্বারা ভক্তরা অনুরক্ত হয়েছিল।

এখন পশ্চিমাদের প্রশ্ন করার পালা। ৯/১১-এর পৈশাচিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা চরমপন্থী ইসলামবাদীদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। এই কারণে প্রতিরক্ষা এবং অসামরিক বুদ্ধিজীবী মহলে বিষয়গুলির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অসংখ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। অতি সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করার জন্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে মূল বিষয়ের উৎসের ব্যাপারে তেমন কোন গভীর আগ্রহ দেখানো হচ্ছে না। ওয়াহ্‌হাবিবাদ এর উত্তরে একটি অংশ বিশেষ হলেও এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে এ যাবৎকাল উপেক্ষা করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি বোঝার এই শূন্যতা পূরণের কিছুটা দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

অধ্যায় এক

জনৈক কমিশনারের মৃত্যু

> তিনি একজন আদর্শ সৈনিকের প্রতিরূপ ছিলেন—গভীর ধীশক্তি কর্মে বলীয়ান ও সমীহ জাগানো সাহসের অধিকারী ছিলেন। খাইবার গিরিপথের গভীর খাদ এবং কালা পাহাড়ের তীক্ষ্ণ চূড়া আজও তাঁর শৌর্যগাথা সাহসিকতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্ণেল ম্যাকসনের জীবনাবসানকে বিজয় হিসেবে দেখা হতোঃ এমনভাবে একটা ঘৃণ্য আততায়ীর হাতে হারানো বৃটিশ প্রশাসনের জন্য একটা হতাশার প্রগাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু নয়। কেননা তাঁকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহসী ও বীর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য করা হতো।
>
> এই মন্তব্য কর্ণেল ফ্রেডারিক ম্যাকসনের স্মরণে লেখা লর্ড
> ডালহৌসির শ্রদ্ধাঞ্জলির অংশ বিশেষ,
> পেশোয়ারের কমিশনার, মৃত্যু ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

১৮৫৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে পেশোয়ারের বেসামরিক বিভাগের বাংলোর বারান্দায় কর্ণেল ফ্রেডারিক ম্যাকসন কাজ করছিলেন। ম্যাকসন পেশোয়ারের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্রিটিশ আমলা হিসেবে পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক ডজন বা অনুরূপ সংখ্যক সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ তত্ত্বাবধান করছিলেন। তিনি এতদাঞ্চলে সর্বাভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মকর্তাও ছিলেন। পাঠানদেরকে এবং তাদের গতিবিধিকে জানা—এটিকে তিনি একটি কাজ হিসেবে নিয়েছিলেন। আর সে জন্যে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ কর্মকর্তা আর উপজাতীয় সর্দারদের নিকটে সমাদৃত ও সম্মানিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে তিনি 'কিশিন কাকা' বা 'ম্যাকসন চাচা' নামে পরিচিত ও ভালবাসায় সিক্ত হয়েছিলেন। চাকুরী প্রাপ্তির পর প্রথম দুই বছরে তাঁর কাজগুলোর মধ্যে প্রথম যে কাজটি ছিল সেটি হলো আবাসিক বাংলো নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন কাচারী বা অফিস নির্মাণ করা। এই কোয়ার্টারগুলো পেশোয়ার নগরীর উন্মুক্ত

জায়গায় ছিল। যে জায়গায় বাস করত স্থানীয় অধিবাসীরা আর ক্যান্টনমেন্টের কোয়ার্টারে থাকতেন ব্রিটিশ রাজনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দ, সেনা কর্মকর্তাবৃন্দ ও সৈন্যদলের সদস্যবৃন্দ। তাঁদের প্রধান হেনরি লরেন্সের রাজনৈতিক দর্শন হৃদয়ে ধারণ করে ম্যাকসন ও তাঁর সঙ্গী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে তাঁরা সর্বক্ষণ শত্রু শিবিরে কাচারীতে তাঁর দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে ম্যাকসন কাগজপত্রের কাজের জন্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে তাঁর বাংলোতে গিয়েছিলেন। আবেদনকারীদের সঙ্গে তিনি সকালে সাক্ষাৎ করতেন—এটাই তাঁর নিয়ম ছিল। কাজেই একজন উপজাতীয় লোক যখন একগাদা কাগজ নিয়ে এগিয়ে এলো তখন ম্যাকসন তাকে পরের দিন সকালে আসতে বললেন। সে ম্যাকসনের কর্মচারীদের কাছে অপরিচিত ছিল কিন্তু প্রথম থেকেই দেখা গেল সে অফিসের বাইরে থেকে চেষ্টা করছে ভেতরে আসার। সিডনি কটন নামে নবাগত এক কর্মকর্তা যিনি নতুন সীমান্তে নতুন এসেছেন তাঁর বর্ণনা মতে, আগন্তুক কমিশনার সাহেবের পায়ে পড়ে হাত জোড় করে তার হাতের দরখাস্ত খানা পড়ার জন্যে কাকুতি মিনতি শুরু করে দেয়। 'কর্ণেল ম্যাকসন তার দরখাস্তটি নিয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়তে লাগলেন, দরখাস্তের বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন, এমন সময় স্থানীয় লোকটি আচমকা কর্ণেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিল।' কমিশনার চারদিন পরে মারা যান।

আক্রমণকারীকে বন্দি করা হলো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। সে ব্রিটিশ অধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরের সোয়াতের একটি গ্রাম থেকে এসেছে, নিজেকে তালিব বলে পরিচয় দিল, আর যে ব্রিটিশরা তাদের দেশকে আক্রমণ করছে সেই আক্রমণকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে সে কাজ করছে বলে দাবি করল। পুনরায় প্রশ্ন করা হলে 'ধর্মীয় উন্মত্ত' বলে সে নিজেকে প্রকাশ করল, যে শহীদ হওয়ার ব্রত নিয়ে নিজেকে একজন মুজাহিদীন হিসেবে দেখেছে। তার নিয়মানুযায়ী বিচার কার্য সমাধা হলো। আর তাতে তার ফাঁসি হলো। কটনের বর্ণনানুসারে সে মারা গেল, 'রক্তের আখরে তার মৃত্যু মহিমান্বিত হয়েছিল।' পাছে তার কবর পবিত্র স্থান হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় তাকে কবরস্থ না করে পুড়িয়ে ফেলা হয় আর তার দেহাবশেষগুলো নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

হতভাগ্য ম্যাকসনের দুঃখজনক জীবনাবসান যা তাঁর নিজেরই সৃষ্ট তাঁকে খ্রিস্টান সমাধিস্থল যেটা ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছিল সেখানে নয়, দূরবর্তী কোম্পানি বাগ নামে পরিচিত একটি বাগানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর সমাধিতে কালো মার্বেল পাথরে নির্মিত একটি চতুষ্কোণ স্মৃতি ফলকে মহারাজ্যপাল লর্ড ডালহৌসি স্বয়ং অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখে দেন।

ম্যাকসনের নামেরই কারণে উপজাতিদের মধ্যে, তাঁর বন্ধুরা তাঁর হত্যাকাণ্ডটিকে ধারণাতীত হিসেবে দেখল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল, রাগতভাবে

প্রত্যাখ্যান করা হলো তাকে এই মর্মে যে, কমিশনার পাঠানদের ধর্মীয় বাধা নিষেধ লঙ্ঘন করে তাদের একজন মহিলার দিকে অগ্রসর হন। একটা ফতোয়া বা ধর্মীয় নির্দেশের কথাও ঘোষিত হলো, আর তাঁর মাথার জন্যে পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে প্রচারিত হলো। বাস্তবতা হলো এই যে, এই হত্যাকাণ্ডটি উভয়ই একটি প্রতিশোধ গ্রহণ আর অপরটি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্ত সংগঠন কর্তৃক বিপ্লবের অভিপ্রায়ে প্রথম সফল আঘাত।

এই সংগঠন সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে অবগত হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে লেফটেন্যান্ট হ্যারি লামসডেন ফিরে এসে হাজারার সৈয়দ উপজাতিদের মধ্যে যে হিন্দুস্তানি বহিরাগতরা মিলেমিশে রয়েছে সেই বিষয়টির প্রতিবেদন দাখিল করেন। তিনি তাদের দুই নেতাকে ধরেন—আলী ভ্রাতৃদ্বয় যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর কঠোর প্রহরায় পাটনায় তাঁদের নিজ গৃহে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ১৮৫২ সালের অগাস্ট মাসে পাটনার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস কারন্যাক তাঁর নগরীতে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের এক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন মহারাজ্যপালের সমীপে প্রেরণ করেন। 'যারা সিত্তানা ও সোয়াতের দূরবর্তী পাহাড়ি এলাকার মুসলিম ধর্মান্ধদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।' একগুচ্ছ চিঠিপত্র আলাদা করা হয়েছিল যেগুলো প্রকাশ করে যে, 'রাষ্ট্রদ্রোহমূলক আলাপ-আলোচনা সম্পৃক্ত।' এই পাহাড়ি ধর্মান্ধদের এবং পাটনা জেলার সাদিকপুরের বিখ্যাত মুসলিম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই চিঠিপত্রগুলোর আদান-প্রদান করা হতো। ভারতীয় ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে পাটনা থেকে গুপ্ত পথে কাফেলা বা উষ্ট্রবাহিনীর মাধ্যমে সমর সম্ভার ও বিদ্রোহীদের প্রেরণ করা হতো। গুপ্ত পথটি পাটনা থেকে শুরু হয়ে আমবাল্লা, মিরাট হয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে উপনীত হয়।

এই তথ্যের ভিত্তিতে মিঃ কারন্যাক সাদিকপুরের সংবাদ আদান-প্রদানের আস্তানায় হামলা করে দেখেন ওখানকার লোকজন পূর্বে খবর পেয়ে তাদের সকল চিঠিপত্র ধ্বংস করে দিয়েছে। যাহোক, এক পরিবারের প্রধান, জনৈক মৌলভি আহমদউল্লাহ্ পরবর্তীকালে তার গৃহ-প্রাঙ্গণে কয়েক শত সশস্ত্র লোককে সমবেত করে ঘোষণা দেন যে, 'ম্যাজিস্ট্রেটের যে কোন তদন্তের অভিযোগকে পুনরায় প্রতিহত করতে তিনি প্রস্তুত, আর যদি তাঁদেরকে আক্রমণ করা হয়, তবে তাঁরা সমুচিত বিপ্লবের মাধ্যমে তাদেরকে জবাব দেবেন।'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং তাঁর পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে লর্ড ডালহৌসি তখন একটি আনুষ্ঠানিক কার্যবিবরণী পাঠান যাতে তিনি স্বয়ং সন্তুষ্ট হয়ে জানান যে, উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোন কারণ নেই। কয়েক বছর যাবত এই ধর্মান্ধরা তাদের সর্বোত্তম চেষ্টা চালাতে থাকল, 'ভারতে

মুসলমানদেরকে ধর্মীয় যুদ্ধে লিপ্ত করতে' আর এতে কোন ফলোৎপাদনই হলো না। উদ্ধারকৃত চিঠিপত্রগুলো থেকে আমার এখন মনে হয় যে, তাদের প্রয়াস : সফলতার মুখ সামান্যই দেখেছিল। তারা চায় টাকা, অস্ত্রশস্ত্র ও নতুন সেনানী চায় তারা, আর শর্তগুলি যাতে তারা লিখে আমার মনে হয় যে প্রকৃত ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা একজনের নিকট থেকে খুব সামান্যই অর্জন করেছে ও অন্যের নিকটে খুবই অল্প পরিমাণ। মহারাজ্যপাল স্বয়ং 'এক ধরনের গাথা গায়ক দল'কে কলকাতার পেছনের রাস্তায় যেতে দেখেছেন। সেই গাথায় আদেশ করা হয়, 'প্রকৃত মুসলমানদেরকে ধর্মের সঠিক পথে যোগ দিতে আর নাস্তিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।' কিন্তু ঐ ধরনের জিনিস কেবলমাত্র প্রত্যাশায় করা যায়। তিনি (জাঁহাপনা/হুজুর) দেখতে পেলেন 'ভারতে সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে যা আশা করা হয় তার তুলনায় কোন আন্দোলন বা ষড়যন্ত্রের কোন কারণ আছে বলে মনে করলেন না।'

অতঃপর ১৮৫২ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম কার্যবিবরণীর অনুসরণে দ্বিতীয়বার ডালহৌসি পুনরায় রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যাবলি অনুসন্ধান করার জন্য লিখলেন। এখন পাঞ্জাবে কর্মরত বাংলার স্বদেশী পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সেপাইদেরকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন তাঁরা। আবার, স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান অবস্থা নির্দেশ করে একদল মুসলিম মোল্লা পাটনায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গভীরভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু ডালহৌসির মতে, সরকার এই অবস্থার বহু ঊর্ধ্বে রয়েছে আর প্রচলিত আইন এই ব্যাপারটি পরিপূর্ণভাবে সামলাতে সক্ষম। পরবর্তীকালে এই ধরনের মামলাগুলো কিভাবে সমাধান করতে হবে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ শাসনাধীন সকল প্রদেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণকে নির্দেশনাসমূহ প্রেরণ করা হয়। যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র হচ্ছে এটা প্রমাণিত হত, সেখানে ষড়যন্ত্রের দলপতিকে কোনরূপ নমনীয় অনুকম্পা দেখান হতো না—কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্থানীয় লোকজনের নিকটে অত্যাচারী ব্যাপার হিসেবে দেখা দেবে এ রকম কোন কাজের ব্যাপারে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেন না। যেমন সিত্তানার মধুবন পাহাড়ের ধর্মান্ধদেরকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 'যেহেতু তারা অকিঞ্চিৎকর, যতক্ষণ তারা শান্ত থাকত ততক্ষণ তাদের কেউ উৎপাত করত না। যে কোনভাবে এই ধরনের আন্দোলনের জন্য সময় শুভকর নয়। ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আমাদের অস্ত্রে যথেষ্ট লোহা রয়েছে যা আমরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে গরম করতে চাই না।'

কেবল আট সপ্তাহ পরে মহারাজ্যপাল এই দ্বিতীয় কার্য বিবরণী নথিভূক্ত করেন, কমিশনার ম্যাকসন স্বয়ং সিন্ধু নদের বিপরীতে ব্রিটিশ অঞ্চল থেকে হাজারায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে একটি সৈন্যবাহিনীর দল প্রেরণ করেন।

এটি ছিল স্থানীয় উপজাতীয় সর্দার আম্বের খানের সনির্বন্ধ আবেদনের প্রেক্ষিতে সাড়া দিয়ে কাজ করা। কিছু হিন্দুস্তানি বিদেশীরা তার সিন্ধু নদের তীরবর্তী দূর্গ দখল করে নেয়ায় সে তাদেরকে বিতাড়িত করার জন্য ইংরেজদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এই হিন্দুস্তানিরা সিত্তানার একই মুসলিম ধর্মান্ধ ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট আঠার মাস পূর্বে অভিযুক্ত করেছিলেন। ম্যাকসনের সঙ্গে থাকা যেসব কর্মকর্তা যাঁরা এই অপ্রত্যাশিত হামলায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৪১তম বাংলার স্বদেশী পদাতিক বাহিনীর তরুণ লেফটেন্যান্ট জর্জ রোক্রফট ছিলেন। তাঁর কাছে এটি ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণের প্রথম স্বাদ। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'সিত্তানা এমন একটা জায়গা যেখানে হিন্দুস্তানি মোহাম্মদী ও বাঙ্গালীরা বসবাসের জন্য বসতি গড়ে তোলে; শরণার্থীরা ও বেআইনী কাজে লিপ্ত লোকজন, সেইসব লোক যারা হয় ব্রিটিশ অঞ্চল থেকে পলায়ন করেছে অথবা ধর্মান্ধরা যারা ফিরিঙ্গীদের (ব্রিটিশ) অস্বীকার করেছে তারা থাকত ওখানে। তারা সীমান্তে বেসামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিকটে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তারা বারে বারে সিন্ধু নদের তীরবর্তী ব্রিটিশ জনগণ অধ্যুষিত অঞ্চলে হামলা করত, তারা প্রায়ই আমাদের প্রজাবৃন্দ সাধারণতঃ হিন্দু বণিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায়ে সফলকাম হতো। 'একজন অপহৃত ব্যক্তির জন্যে তার আত্মীয়-স্বজনের নিকটে মুক্তিপণ দাবি করে একটি পত্র প্রেরণ করা হতো, যদি এতে তারা সাড়া না দিত, তবে তারা ঐ ব্যক্তির কর্তিত কান সহযোগে দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করত। পুনরায় মুক্তিপণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে উক্ত ব্যক্তি অপহৃত ব্যক্তির কর্তিত মুণ্ডু পাঠানো হবে—এ ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক পত্র প্রেরণ করত। আর এতে করে শিকারকে খাওয়ানোর খরচ উসুল হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করত তারা।'

ম্যাকসন হিন্দুস্তানি দখলদারদের আম্বের খানদের দূর্গ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলে তারা অস্বীকৃতি জানিয়ে একটি চিঠি লেখে। তাতে তারা জানায় তারা প্রথমে মারা যাবে। তবু তারা ওই দূর্গ ছেড়ে যাবে না। কিন্তু এখানেও হিন্দুস্তানিরা চারিদিকে ছড়ানো উঁচু-নিচু পাহাড় ও গিরি খাদের পেছনে পশ্চাৎ রক্ষী সৈন্যদেরকে দিয়ে হামলাকারীদের দূরে সরিয়ে রাখে। জর্জ রোক্রাফটের বর্ণনা মতে, এই সময়ে শিখরা উপনীত হলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। 'সিত্তানায় পৌঁছিয়ে—আংশিকভাবে সংরক্ষিত একটি গ্রাম ঘন কাঁটার ঝাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত—সেখানে দেখা গেল সবলদেহী দখলদারদের অংশ পালিয়েছে, আর সামান্য কিছুকে (বারোজন বা পনেরজন অসুস্থ ও আহত) ফেলে গেছে, অতি দ্রুততার সাথে বীর তুনওয়ালিদের দ্বারা রেহাই পেয়েছিল তারা।

আহত বন্দিদের স্থানান্তরিত করে সিত্তানা ঘাঁটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, কাঁটার বেষ্টনী আক্রান্ত হয়েছিল এবং অভিযান প্রত্যাহৃত হয়েছিল। পেশোয়ারে গাইডসের সহকারি সার্জন ডাক্তার লয়েল এইসব আহত লোকদের চিকিৎসা করেন আর তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা এবং কথা বলাতে অস্বীকৃতির বিষয়টিতে তাঁর মন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। শুধু একজন সেবিকা পরে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে আর তখনই তারা নিজেদের এবং সংগঠনের তথ্য দেয় যার ফলে পরিষ্কার হয় যে তারা অন্যায়কারী লোকজন নয়। তবে নিয়মতান্ত্রিক সেনাদলের সদস্যবৃন্দ, সুপরিকল্পিত কার্যসূচি সমেত সুসংগঠিত। এই সংগঠনটির একটা সুশৃঙ্খল কর্তৃত্বের অবকাঠামো ছিল যা বর্তমানে বড় ভাইয়ের মৃত্যুর কারণে ছোট ভাই আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। যদিও তারা স্বল্প জ্বালে সিদ্ধ মটর, শিম ও খামির বিহীন রুটি খেয়ে বেঁচে থাকত, সমতলের তাদের সমর্থকরা তাদেরকে ভালভাবে অশ্বারোহী সৈন্যের বন্দুক ও অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করত। বন্দিরা দম্ভ করেছিল যে, অনেক পূত ধার্মিক মুসলমান এবং ভারতের দেশীয় মুসলিম রাজন্যগণ তাদেরকে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

ম্যাকসন সিত্তানায় ১৮৫৩ সালে জানুয়ারি মাসে হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের একটা পরিসমাপ্তি টানতে পারতেন। কিন্তু তিনি মহারাজ্যপালের একটি কার্যাদেশ পান, তাতে তাঁকে বলা হয় যে অবস্থায় যা কিছু রয়েছে সেইভাবে ছেড়ে আসার জন্য। সুতরাং তিনি পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ দেন নি, পরে তিনি তাঁর নিষ্ক্রিয়তার কারণসমূহ বিচার করে দেখেন যে তার উপর অর্পিত সমুদয় কাজই সম্পাদন করেছেন। তিনি তাদের বিনা প্রতিরোধে পলায়নকে নির্যাতন করার চেয়ে শ্রেয় মনে করেছিলেন। কারণ এই পলায়নপর মানসিকতা তাদের সম্প্রদায় কর্তৃক একটা ঘৃণ্য ভীরুতার শামিল ছিল, যা নির্যাতন করে অন্যদের মধ্যে সহানুভূতি ও একাত্মতা সৃষ্টি করাকে উৎকৃষ্ট কৌশল হিসেবে নিয়েছিল।

ম্যাকসনের হামলা করায় ব্যর্থতাকেই সম্ভবত তাঁর জীবন দিয়ে শুধতে হয়েছিল। যদি তাই-ই করে থাকতেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইতিহাস খুবই ভিন্নরকম হতে পারত। কিন্তু তাঁর পূর্বের লর্ড ডালহৌসি এবং পরবর্তীতে যাঁরা অনেকে এসেছেন তাঁদের মত ফ্রেডারিক ম্যাকসন হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদেরকে কম গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্যে তথ্য টিকেছিল, তবে এই তথ্যকে অবজ্ঞা করা হয়েছিল। এটাই হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদেরকে ফাঁদে ফেলা বন্ধ করা প্রথম ছিল না, এবং এটি শেষও ছিল না।

ব্রিটিশরা যা জানতে পারল সেটি হলো সিত্তানায় ধর্মান্ধদের শিবির স্থাপিত হয়েছিল প্রায় সিকি শতাব্দী পূর্বে মহাবন পাহাড়ের পাদদেশে যেখান থেকে সিন্ধু উপত্যকা দেখা যেত। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পীর বাবা নামে

একজন প্রখ্যাত সাধু ব্যক্তি যিনি মহানবী (সা.)র বংশোদ্ভূত একজন সৈয়দ তাঁকে ইউসুফজাইরা স্থানীয় জমিটাকে ধর্মীয় দান হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে দিয়েছিলেন। হাজারা এবং পেশোয়ার উপত্যকায় শিখরা একসঙ্গে বসবাস শুরু করলে সিত্তানা বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধকারীদের একত্র করার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়—অথবা, ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা লেখেন, বেআইনী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ও ইউসুফজাই এবং হাজারার আইন লঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল, আর অতৃপ্ত খানদের ও তাদের অনুসারীদের মিলনস্থলে পরিণত হয়। তারপর ১৮২৭-৮ সালের শীতের মাসগুলিতে একটা খুবই ভিন্ন ধরনের প্রতিরোধকারী আবির্ভূত হলেন : রায়বেরিলির হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ।

১৭৮৬ সালে সৈয়দ গোলাম মুহাম্মদ নামে অযোধ্যা রাজ্যের গঙ্গার সমতল ভূমির লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদের মধ্যবর্তী শহর রায়বেরিলিতে সৈয়দ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁর প্রথম নাম অর্থ প্রকাশ করে, তার পরিবার দাবি করে যে তারা মহানবী (সা.)র বংশোদ্ভূত, যা তাঁকে সহজাত পবিত্রতার গুণে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় আর তাঁকে সম্মানসূচক শাহ্ (রাজা) সম্বোধনে ভূষিত করা যায়। তাঁর কিছু জীবনীকারের মতে, তিনি বেড়ে ওঠেন পরিপূর্ণতার প্রতিরূপ হিসেবে লম্বা, বলবান ও সুন্দর, ঘন ভ্রু যুগল, আর দীর্ঘ ও ঘন দাড়ি। তাঁকে বলা হতো তাঁর শারীরিক ক্রীড়া কসরতের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মেছিল। তাদের মধ্যে ছিল কুস্তি, সাঁতার, ধনুর্বিদ্যা, আর বন্দুক ছোড়া। এটি তাকে দিয়েছিল কর্তৃত্বব্যঞ্জক শরীর যা তাঁকে অধিকাংশ যাজকদের থেকে দূরে রাখত, তবুও তিনি ছিলেন স্পষ্টতই স্বল্পভাষী আর আচরণে ভদ্র। তিনি শান্ত স্বরে কথা বলতেন যারা তাঁর কথা শুনতে চাইত তারা সবাই শুনতে পেত। এক জীবনী গ্রন্থে এটা উল্লেখ করে, 'সকল পরিপূর্ণতা তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই এই পবিত্র মানুষটির মধ্যে রোপিত হয়েছিল। প্রমাণ হিসেবে দেখা যায় তিনি শৈশব থেকে ধর্মচর্চা ও সদগুণাবলির অনুশীলন করে আনন্দ লাভ করতেন।' নবী (সা.)র মত তিনি সময়ে সময়ে উৎফুল্লজনক মোহে পড়তেন, নির্দেশ করে বলতেন যে তাঁর সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে।

তাঁর বাবার ১৮০০ সালে মৃত্যুর পর চৌদ্দ বছর বয়সে তালিব হওয়ার জন্যে তিনি দিল্লি চলে যান। তিনি সেখানে পুরাতন নগরীর পেছনের রাস্তার একপ্রান্তে স্বল্প পরিসর জায়গায় অবস্থিত একটি ছোট কিন্তু খুবই প্রসিদ্ধ ধর্মীয় বিদ্যালয় মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়ার তৎকালীন অধ্যক্ষ ও শীর্ষস্থানীয় পন্ডিত শাহ্ আব্দুল আজিজের শিক্ষানবীশী গ্রহণ করেন। জীবনীগ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত 'সিরাত-উল-মুস্তাকিন' গ্রন্থের লেখকের মতানুসারে, যখন তিনি শ্রদ্ধেয় আব্দুল আজিজের সমাজে ভর্তি হন তখন তিনি তাঁকে নাকশবন্দিয়া বিদ্যালয়ের

শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, আর তাঁর আলোকিত শিক্ষকের অনুকূল শিক্ষার ফলাফলে ও প্রভাবে তাঁর চরিত্রের গুপ্ত মহত্ত্বের দিকগুলি উন্নত হয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। এই বিস্ময়গুলির মধ্যে ছিল তিনটি স্বপ্ন। প্রথমটিতে মহানবী (সা.) ছেলেটিকে তিনটি খেজুর খাওয়ান; দ্বিতীয়টিতে মহানবীর কন্যা ফাতিমা ছেলেটিকে গোসল করান, ধৌত করান ও তাকে খুব দামী পোশাক পরিয়ে দেন; তৃতীয়টিতে আল্লাহ্ তাঁর ডান হাতে তাঁকে ঠাঁই দেন, তাঁকে তাঁর সঞ্চিত সম্পদ দেখিয়ে বলেন 'এটি আমি তোমাকে দিয়েছি, আর এর পরেও আমি তোমাকে আরও দেব।' পরিষ্কারভাবে সৈয়দ আহমদ এক বিশাল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন—যদিও একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে তাঁর জীবনবেত্তাদের মতে দেখা যায় সৈয়দ আহমদের স্তুতির অনুশীলন তাঁর অকাল প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়েছিল।

সৈয়দ আহমদ খুবই ভাগ্যবান বনে যান শাহ আব্দুল আজিজকে তাঁর শিক্ষক হিসেবে পেয়ে। এই জন্যে যে, তিনি দিল্লির প্রখ্যাত সুফি পন্ডিত ও সংস্কারক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ধর্মীয় উত্তরসূরি ছিলেন। একজন শীর্ষস্থানীয় আধুনিক ইতিহাসবেত্তা শাহ্ওয়ালিউল্লাহ্র বিষয়ে বর্ণনা করেন, 'ভারতে মধ্যযুগ ও আধুনিককালের মধ্যে ইসলাম ধর্মের সেতু' হিসেবে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর ওপরে নাজিল হওয়া আল্লাহ্র বাণী সম্বলিত কিতাব পবিত্র কোরান অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার নিমিত্তে আরবি ভাষা থেকে ফারসি ভাষায় রূপান্তরের কাজে যাত্রা শুরু করেন। তিনি নৈতিক সংস্কার ও কোরানে নির্দেশিত ইসলামের মৌলিক বিধানাবলিতে আর নবী (সা.) র যেসব ক্রিয়াকর্ম ও বাণী সংকলিত হাদিসে যা তাঁর সাহাবীগণ অনুসরণ করতেন তাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য সকলকে আহ্বানও জানান। সংস্কার প্রকল্পের অংশ হিসেবে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ পূর্বতন পথ থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন ধারা প্রবর্তনের পথিকৃৎ (মুজতাহিদ) হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন, তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মের প্রতিষ্ঠিত ধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেন।

যাহোক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ভারতে ইসলাম শাসন প্রতিষ্ঠার নিষ্ফল প্রয়াসের জন্য জনমনে সর্বাধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। আফগান শাসনকর্তা আহমদ শাহ্ আবদালিকে ভারত আক্রমণের জন্য সুবিদিত অনুরোধ করেন; হিন্দু মারাঠাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আমলের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। এই ঘটনায় আহমদ শাহ্ আফগানিস্তানে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছিলেন আর মারাঠারা পুনরায় উত্তর ভারতের প্রবল ক্ষমতাশালী হতে পেরেছিল। কিন্তু ভারতের ইসলামি পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র চার পুত্র শরিয়ার অধীনে জিইয়ে রেখেছিলেন। যার স্বীকৃতরূপ

মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া সমগ্র ভারতে সর্বাধিক প্রভাবশালী ধর্মীয় শিক্ষালয়। সিন্ধু নদের পূর্বদিকে ইসলামের মূল ধারায় যা অনুসৃত হতো তা থেকে ভিন্ন ধারায় উন্নত হয়েছিল। এটি উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই পৌঁছিয়েছিল, কিন্তু পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) তুলনায় সর্বত্রই সংখ্যা লঘু ধর্ম ছিল আর সম্ভবত দিল্লি, লক্ষ্নৌ আর হায়দ্রাবাদের মত জায়গায় তাদের আঞ্চলিক আস্তানা ছিল। অনেক রক্ষণশীল হিন্দু ইতিহাসবেত্তাগণ যা বোঝাতে চেয়েছেন, যে ইসলামে ধর্মান্তরকরণ বাধ্যতামূলকভাবে ঘটানো হয়েছিল। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, মুসলিম সুফি সাধকদের প্রচারিত ইসলামি সাম্যবাদের দৃষ্টান্ত এবং হিন্দু বর্ণ বৈষম্যবাদের অমানবিকতার কুপ্রভাবে নীচ শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায় অতিষ্ঠ হয়ে ব্যাপকহারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে একটি বিরল সুযোগ এনে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় পূর্ব বাংলার সর্বনিম্ন পর্যায়ের জনগণ যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তাঁতী ও কারিগর শ্রেণীর জনগোষ্ঠী। হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশদের মতে ধারণা জন্মায় যে যদি অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে ইসলামের নবী (সা.) ও তাঁর যথার্থ অনুসারীদের প্রকৃতভাবে সংরক্ষণ ও সমর্থন করা যায় তাহলে একটি জটিল অবস্থার শান্তিময় সুরাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব। আফগান-তুর্কী আক্রমণকারী যারা উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেন তাঁরা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল আবার অধিকাংশই হানাফি ছিল এবং পারস্য থেকে মুঘলদের সঙ্গে যারা এসেছিল তারা প্রধানত শিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত উভয়ের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যা লঘু ছিল। তারা ইমাম আলীর অনুসারী ছিল আর তারা হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশধর দাবি করে পরবর্তী ধারাকে প্রকৃত আইনানুগ ইসলামি ধারা হিসেবে গর্ববোধ করে ও এটি ধর্মীয় কর্তৃত্বের একমাত্র উৎস। এই বিশ্বাস গোঁড়া সুন্নিরা বিধর্মোচিত হিসেবে আখ্যায়িত করে। যাহোক, শতাব্দীকাল ব্যাপী হিন্দু মতধারার সংস্পর্শে সুন্নি ও শিয়া মতাদর্শের একটা অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এই চেতনা প্রসূত ভাবধারার সমন্বয় ও ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠান গোঁড়া মুসলিমবেত্তা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও তাঁর পুত্রদের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল।

জাতিবাদের উপাদানও কার্যকর করা হয়। যদিও ইসলাম মানুষের কাছে সাম্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে, মুসলিম সম্প্রদায় ভারতে এমন এক সাম্প্রদায়িক উপধারা রচনা করেছিল যাতে হিন্দু বর্ণবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যেত, এই সুবাদে ভারতীয় ধর্মান্তরিত হিন্দুদেরকে বর্ণ ঘরানার সর্বনিম্নে ও আরবীয় প্রকৃত মুসলমানদের সর্বশীর্ষে স্থান দেওয়া হত। এই প্রথা নিবিড়ভাবে মুঘল, পারস্য ও আফগান শাসক শ্রেণী কর্তৃক প্রতিপালিত হত। এই শ্রেণী বিভাজনের সর্বশীর্ষে সৈয়দ বংশীয় যাঁরা হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশোদ্ভূত

তাদের সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা হত। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে তারা সমাজে সহনীয় প্রভাব বিস্তার করত এবং বিভিন্ন বিচারিক কার্যকলাপ, বিবাদ মীমাংসায় মধ্যস্থতা ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদান করত। এই ব্যবস্থা মুসলিম বনেদী গোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছিল। তাঁদের মতে এটি ইসলামের রক্ষণশীল ধারার পরিপন্থী যা ইসলামের মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় থেকে প্রদর্শিত পথের বিচ্যুতিও বটে। অনেকেই সুফি মরমীবাদকে গ্রহণও করে। ধর্ম সংস্কারক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ নিজে সুফি নাকশবন্দির সুফি তালিকাভূক্ত ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে বোখরাকেন্দ্রিক এক আন্দোলনের প্রভাবে গীত-বাদ্য ও নৃত্য বাতিল করে প্রাথমিক ইসলামের ধারানুযায়ী নামায পড়া ও ব্যক্তিগত ধ্যানের মাধ্যমে ধর্ম অনুশীলনের প্রতি তিনি এই প্রেক্ষিতে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যাহোক, কেবল সুফি আর সুফি। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র পূর্বে ভারতে সুপরিচিত নাকশবন্দি সুফি ছিলেন শেখ আহমদ সরহিন্দ, যিনি সম্রাট আকবরের ধর্মীয় সহাবস্থানের উদারনীতিতে বিক্ষুব্ধ হন এবং যখন জাহাঙ্গীর তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের প্রকৃত মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই মূল্যবোধগুলো তৌহিদের সমগ্র প্রয়াসী। সর্বপ্রয়াসী বাণী নির্ভর, নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদ, ধর্মের কথিত ভিত্তি প্রতিস্থাপন এবং তৌহিদের যে কোন প্রকার অপব্যাখ্যা রোধকরণ, এটি শুধু শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃকই নয় বরং বহু শতাব্দী ব্যাপী সুন্নি মুসলমানদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম অনুশীলনে প্রতপালিত হত। আহমদ সরহিন্দের সুফি তরিকা সুন্নি সংস্কারবাদী শিয়া এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁর উগ্রপন্থী ইসলাম প্রতিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তী বছরগুলোতে সরহিন্দি আন্দোলন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুন্নি মৌলবাদীদেরকে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস চালাতে থাকে—তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্, তাঁর চার পুত্র আর যাঁরা তাঁর দিল্লির 'মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া'য় তাঁদের অধীনে বিদ্যার্জন করতেন।

এভাবে কিশোর সৈয়দ আহমদ সম্ভবত ভারতের সবচাইতে মৌলিক ও উগ্রপন্থী শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থী হন সেই সময় যখন উম্মা বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় মহান খানদের সময় থেকে এমন বিপন্ন অবস্থায় কোনো কালেও নিপতিত হয় নি। তুরস্ক সাম্রাজ্য শতাব্দীকাল ব্যাপী পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়া জুড়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা ধীরে ধীরে নানা প্রতিকূলতার মুখে পতনোন্মুখ হয়ে পড়েছিল। যেমন রুশ, অস্ট্রিয়া ও ফরাসীদের শত্রুতা অন্তর্নিহিত কোন্দল ও একের পর এক আঞ্চলিক প্রভাবশালী প্রশাসনের মুখে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে উঠেছিল। ভারতে একই কাহিনী যখন মুঘল শক্তি হ্রাস পেল তখন স্থানীয় রাজ্যপালগণ মুঘলদেরকে ত্যাগ করে নিজেদের আঞ্চলিক শাসন

প্রতিষ্ঠা করতে লাগল। এই সুযোগ একের পর এক স্থানগুলি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দখল করে নিচ্ছিল যা বাংলা ও কর্ণাটকের অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত ব্রিটিশদের দখলে চলে যাচ্ছিল। ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতান সেরিনগপতমের রণক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হন। ১৮০৩ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রো-প্রো-দৌহিত্র সম্রাট শাহ্ আলম সর্বশেষ পরাজয় বরণ করে নেন এবং সামান্য মাসিক ভাতার বিনিময়ে তাঁর সর্বশেষ কর্তৃত্বের দলিল হস্তান্তরে স্বাক্ষর করে আত্ম-অবমাননা মেনে নিতে বাধ্য হন।

ইউরোপের বর্ধিষ্ণু সেনাবাহিনী ও অর্থনৈতিক শক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বিভিন্ন আঙ্গিকে ইসলাম ধর্ম পুনঃপ্রবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে থাকল। ব্রিটিশরা যখন ভীরু সম্রাটের নিকট থেকে তাঁর নগরীর দায়িত্বভার বুঝে নেয় তখন সৈয়দ আহমদের শিক্ষক শাহ্ আব্দুল আজিজ এই মর্মে ফতোয়া দেন যে দিল্লি পরাভূত হয়েছে। 'এই নগরীতে ইমাম উল-মুসলিমিনের (মুসলমানদের নেতা; এভাবে মুঘল সম্রাট) শাসন করার কোন কর্তৃত্ব নেই।' তিনি ঘোষণা করেন। প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হাতে। তাদের ওপর কোন দমন নীতির প্রয়োগ নেই, আর কুফরের (পৌত্তলিকতা) প্রকাশ্য আদেশ ঘোষণার অর্থ এই যে, প্রশাসনে ও বিচারিক কাজে, আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে, বাণিজ্যক্ষেত্রে, অর্থ ও রাজস্ব সংগ্রহে—সর্বত্রই ক্ষমতায় রয়েছে কুফার (পৌত্তলিক নাস্তিকরা)।' অতঃপর তিনি হিন্দুস্তানকে 'শত্রুর রাজ্য (দার উল-হার্ব) হিসেবে ঘোষণা দেন, আর এই সময় থেকে ভারতকে কঠোর সংগ্রাম দিয়ে পুনরুদ্ধার করে পূর্ব কালের সেই সুখী রাষ্ট্রে পরিণত করা—সকল মুসলমানের ওপর ফরজ কাজ হিসেবে ন্যস্ত হয়।

এ ফতোয়া রূপক অর্থে কর্তৃত্ব উপেক্ষার এক নজীর। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই সৈয়দ আহমদ গোঁড়া ধর্মবাদে দীক্ষিত হয়ে 'মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া' ত্যাগ করেন এবং নিশ্চিতভাবে ধারণা প্রসূত হন যে অনৈসলামিক কার্যকলাপ তাঁর নিজের ঈমানের প্রতি একটা বাধা। একটি ঘোষণায় এই উগ্রপন্থীভুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিন্দাকারী হিসেবে 'মুহাম্মদ' নামটি পরিত্যাগ করেন, আর হয়ে যান সৈয়দ আহমদ।

সৈয়দ আহমদের জীবনী গ্রন্থ থেকে অবগত হওয়া যায় আট বছর দিল্লিতে লেখাপড়া শেষে তিনি বিয়ে করেন এবং তাঁর নিজ বাসভূমি উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলিতে ফিরে গিয়ে মোল্লা হিসেবে ধর্মীয় পেশায় নিয়োজিত হন। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক রচিত তাঁর অন্য এক জীবনী গ্রন্থে ব্যাপকভাবে ভিন্ন ধরনের বর্ণনা ও তারিখ সম্বন্ধে জানান। উক্ত গ্রন্থে তিনি দেখান অন্য লেখকগণ তাঁর সম্বন্ধে খুবই ভিন্ন মতের বর্ণনা দিয়েছেন। এটির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় যে, আহমদ তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় ইসলামের বিভিন্ন খন্ডিত দল ও

শ্রেণীকে সমবেত করেন যা তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত এই খন্ডিত বিভিন্ন মতাদর্শী দলগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদসমূহ দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনেকে নিজের পথ চলার দীক্ষা নেয়। সৈয়দ আহমদ তাঁর অনূর্ধ্ব বিশ বছরের পূর্ব জীবনে দিল্লিতে পড়পাশোনা ত্যাগ করে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লুণ্ঠনকারী আমির খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আফগানিস্তানের অধিকাংশ জীবনীগ্রন্থের বর্ণনাতে মেনে নিতে দেখা যায় যে সৈয়দ আহমদ প্রকৃতই তাঁর সময় অতিবাহিত করেন আমির খানের সঙ্গে, যদিও দাবি করা হয় যে তিনি পেশ-ইমাম বা ধর্মীয় পুরোহিত হিসেবে সেনাদলে কাজ করেন। উক্ত সময়ে তিনি আমির খানের পাঠান সৈন্যদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেন, তাছাড়া তিনি কিছু অলৌকিক কাজের সমাধাও করেন। যা দোষ কমানোর জন্য বলা হয় যে জনৈক আমির খান যে একজন ভাড়াটে যোদ্ধা ছিল। তাঁর ইসলামের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কোনরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল না, বুনারের ইউসুফজাই আসলে অনুরূপভাবে আর্থিক প্ররোচনায় যুদ্ধ করত এবং এ বিষয়ে সর্বোচ্চ অর্থ প্রদানকারীদের পক্ষেই থাকত। এই সময়ে আমির খান অর্ধ-উম্মাদ মারাঠার সামরিক নেতা যশবন্ত রাও হলকারের অশ্বারোহী সৈন্যদলকে আদেশ করেন, বস্তুত, সে এক হিন্দুকে কেন্দ্রীয় ভারতকে লুন্ঠন করতে সাহায্য করছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের দৃষ্টিতে আমির খান এবং তার পাঠান সঙ্গীরা পিণ্ডারিস বা লুষ্ঠনকারীর চাইতে কোন অংশে কম ছিল না, তাদের নিষ্ঠুর কর্মে এবং লুণ্ঠনে তারা ছিল কুখ্যাত। কর্ণেল জেমস টড প্রথমে আমির খানের লুণ্ঠন কর্ম প্রত্যক্ষ করে তাঁর রাজস্থানের বর্ষ বিবরণীতে বর্ণনা করেন, 'এ রকম কুখ্যাত দুর্বৃত্ত লোক ভারত কমই জন্ম দিয়েছে।' এতদ সত্ত্বেও বাংলার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ভারতে আদেশ আনার নিমিত্তে আমির খানের সঙ্গে চুক্তির পূর্বে আলোচনার জন্যে প্রবেশ করেন, আর ১৮১৭ সালে টঙ্ক নামে এক নতুন রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হিসেবে আমির খানকে মেনে নেন তাঁরা।

ব্রিটিশদের সঙ্গে এই সম্বন্ধ সৈয়দ আহমদ প্রতারণাপূর্ণ কাজ হিসেবে দেখেন। তিনি আমির খানকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে দিল্লিতে মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়ায় ফিরিয়ে আনেন। এখানে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র শিক্ষালয়ে শাহ্ আব্দুল আজিজের সকল বিদ্যার্থীদের জন্যে কয়েকজন মৌলবাদী শিক্ষকের মধ্যে তিনি একজন হিসেবে নিয়োজিত হন। শীঘ্রই দেখা গেল সৈয়দ আহমদ তাঁর প্রভাব বলয়ে স্থান গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিজ খ্যাতি প্রসারের জন্য তাঁর বাগ্মিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে ধর্মীয় প্রচারাভিযান চালাতে থাকেন এবং একই সাথে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে তাঁর নিজ প্রভাব বলয় বিস্তার করতে থাকেন। তাঁর প্রাক্তন দীক্ষাদানকারী পৃষ্ঠপোষককে ত্যাগ করে তিনি এককভাবে বিখ্যাত দিল্লির লাল কেল্লার সন্নিকটবর্তী আকবর আবাদি মসজিদে অবস্থান গ্রহণ

করেন যেখানে তাঁর ধর্মীয় বক্তব্য শোনার জন্য অসংখ্য জনসমাগম হত। অনেকের মধ্যে তাঁর থেকে সাত বছরের বড় শাহ্ আব্দুল আজিজের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ্ আব্দুল ইসমাইল তাঁর ধর্মপ্রচার শুনতে এসেছিলেন। এক সন্ধ্যায় সৈয়দ আহমদের বক্তৃতা শুনতে এলে, তিনি মুহাম্মদ ইসমাইলকে তাঁর কক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে বলেন, যেখানে তাঁরা দুজন হৃষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র ধ্যানে দুই রাত্রি অতিবাহিত করেন। শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল অতঃপর ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করে বায়াত নামে পরিচিত সৈয়দ আহমদের শিক্ষালয়ে আনুগত্য স্বীকার করে প্রথম শিষ্য হন। শিগগিরি শাহ্ আব্দুল আজিজের জামাতা শাহ্ আব্দুল হাই সৈয়দ আহমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিষ্য হিসেবে যোগদান করেন। কথিত আছে যে, এই দুইজন সৈয়দ আহমদের 'প্রেমিক', তাঁর কথাগুলো যদিও সুফি ধারা অনুযায়ী নিজ দীক্ষাগুরুর প্রতি সর্বাত্মক উৎসর্গ করে নিবেদিত। শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইলের লেখনী অনুযায়ী দেখা যায় এই নিবেদিত ভক্তি প্রসারের জন্য উৎস ছিল সৈয়দ আহমদের কিছু প্রকাশিত পুস্তক এবং সৈয়দ আহমদের প্রথম জীবনী লেখাতে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবিক এখানে একটা ভাল উদাহরণ রয়েছে যে একজন গুরুর কর্ম পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বোঝা যায় যে একজন শিষ্যের হাত রয়েছে। সৈয়দ আহমদ একজন প্রকৃত কাজের মানুষ ছিলেন যিনি আবেগ দিয়ে কথা বলতেন, মাথা দিয়ে নয়। তিনি তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন।

১৮১৮ সাল থেকে আগামী দিনগুলোতে সৈয়দ আহমদ তাঁর সুশিক্ষিত শিষ্যদের ব্যাপক সহযোগিতায় তাঁর নাম ও ইসলামি সংস্কার এবং পুনর্জাগরণের কথা সুন্নি মসজিদে ও জনসভা স্থলসমূহে শোনা যেতে লাগল। যখন তিনি উত্তরের সমতল গ্রামে আর যমুনা নদীর পশ্চিমে ভ্রমণ করেন তখন শত শত জনতা নিজেরা তাঁর বায়াতের নামে শপথ নিয়ে তাঁর ধর্মপ্রচারে সঙ্গী হওয়ার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। যদিও এই সময় মনে হয় সৈয়দ আহমদ সুফি দর্শনের প্রতি সমঝোতা করার প্রয়াসে সচেষ্ট ছিলেন। নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁর আদর্শিক গুরু প্রদর্শিত নাকশবন্দি তরিকা ছাড়াও সুফিবাদের অপর তিনটি তরিকারও শপথ গ্রহণ করেন। পরিণতিতে এর অনুসন্ধানী আত্ম নিবেদন তাঁর মনে যে নির্মমতার জন্ম দিয়েছিল ও সুফিবাদের মাঝে গড়ে ওঠা প্রতিমা পূজার আরাধনা করার প্রবণতাকে বিসর্জন দিতে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল।

সৈয়দ আহমদ তাঁর ধর্মপ্রচারের কোন এক পর্যায়ে লক্ষ্ণৌ শহরে পৌছান, তখন ইসলাম বিশৃঙ্খলার নিম্ন পর্যায়ে ছিল। তবে এখনও দিল্লি নগরীর বাইরে মুসলমানদের অধিকাংশ অবস্থান রয়েছে। এখানে তাঁর ধর্মোপদেশ শুনে পাটনার অষ্টাদশ বা উনবিংশবর্ষী বেলায়েত আলী নামে এক তরুণ তাঁর মন

জয় করেন আর যথাযথভাবে তাঁর নিকট শপথপূর্বক আনুগত্য স্বীকার করে নেন। এটি ঐ ব্যক্তিটির সৈয়দ আহমদের আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার লিখিত বৃত্তান্ত যে সৈয়দ আহমদকে আন্দোলনে এক অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা হিসেবে অনুসরণ করতেন। এ সম্পর্কে অবশ্য পরবর্তীতে প্রাপ্ত একটি বিকল্প তথ্য পাওয়া যায়।

প্রায় ১৮১৯ সালে সৈয়দ আহমদের প্রথম শিষ্য শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল তাঁর শিক্ষকের ধর্মমতের উপরে 'সিরাত-উল-মুস্তাকিম' (সরল পথ) নামে একটি বই লেখেন। এখানে আল্লাহ্র একত্ব বিষয়ে প্রবল চাপ দেওয়া হয়, আর প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধীদের নতুন ধর্ম প্রবর্তনের (বিদাত) বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। এটি ঘোষণা করে এরপরে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিধান দুটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ইবাদত করা যাবে না (তাওহিদ); এবং দ্বিতীয়, মহানবীর এবং তাঁর উত্তরসূরি খলিফাদের আমলে (বিদাত) আবিষ্কৃত হয়নি এমন কোন কিছুর উপাসনা করা যাবে না। প্রথমটি হলো ফেরেশতারা, আত্মারা, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকবৃন্দ, শিষ্যবৃন্দ, শিক্ষকগণ, ছাত্রবৃন্দ, নবীগণ বা সাধু-সন্তরা, মানুষেরা দুঃখ-দুর্দশা দূর করে—এতে অবিশ্বাস করা। এই তথা কথিত আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কারোই কোন বাসনা পূরণ ও ক্ষতিকারক কিছু দূর করার ক্ষমতা নেই। আর ঐ সমস্ত শক্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান। সত্য ও নির্মল ধর্ম যা হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় মানব জীবনের সকল আরাধনা ও অনুশীলনে প্রবলভাবে অসংলগ্ন থাকতে দেখা গেছে। ইসলামের কিছু কুসংস্কার বিশেষভাবে লক্ষণীয় আচার-অনুষ্ঠান যেমন—বিবাহ উৎসব, শোকসভা, সমাধিসজ্জা, সমাধিস্থলে ফলক তৈরি, এবং মৃতদের জন্য বার্ষিক উৎসবে বিস্তর ব্যয়বহুল আয়োজন, পথশোভা ও আলোকসজ্জা, এবং এই অপসংস্কৃতি বন্ধের জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা চালানো।

ঠিক এই ধরনের ধর্ম শিক্ষাই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র বিদ্যাপীঠে একজন ছাত্রের নিকটে আশা করা হত। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে সৈয়দ আহ্মদ এবং তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে তিনি তাঁর ধর্মীয় বার্তা মসজিদ, মাদ্রাসা আর পথে সীমাবদ্ধ না রেখে সাহসিকতার সঙ্গে সর্বত্রই প্রচার করেন। তিনি ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ ছিলেন প্রথম যাঁরা মত পাল্টিয়ে বাংলার খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের নেতৃত্ব নিয়ে নতুন মাধ্যম ছাপাখানা ধর্মপ্রচার কার্যে ব্যবহার করেন। এই মুদ্রিত পুস্তিকাদি অধিকাংশই লিখিত ছিল উদূর্তে, যা ফারসি অথবা আরবির তুলনায় অধিকতর জনগোষ্ঠীর ভাষা।

এই সমস্ত নতুন প্রকাশনায় লক্ষণীয়ভাবে জিহাদের আহ্বানের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ছিল। ১৮২১ সালে সৈয়দ আহমদের নামে একটি মুদ্রিত আবেদনে জিহাদ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়, 'বিরাট লাভের একটি কাজ; ঠিক যেমন বৃষ্টি মানব, পশু, আর উদ্ভিদের কল্যাণ সাধন করে, তেমনি সকল ব্যক্তিবর্গ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে সুবিধা নেয়।' এটি বিশ্বাসীগণকে বর্তমান হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের কার্যাবলির সঙ্গে শাহ্জাহান ও আওরঙ্গজেবের যুগের তুলনা করতে বলে, আর তাঁদেরকে দেশে বিদ্যমান সমস্ত ইসলাম বিরোধী কার্যাবলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আহ্বান জানায়। যাহোক, এই আহ্বান জিহাদ সৃষ্টির মত এত দূরে পৌঁছাতে পারেনি, ইসলামি ফিকাশাস্ত্রানুসারে সৈয়দ আহ্মদ তাদেরকে বুঝেছিলেন যে এই বাণী শুধু একজন ইমামই ঘোষণা করতে পারেন— যা তিনি নিজেকে এর যোগ্য মনে করেন নি। একজন আমির বা ধর্মনিরপেক্ষ নেতার সহায়তায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও প্রধান খলিফা বা তুর্কী খিলাফতের বড়লাট হিসেবে দ্বৈত ভূমিকার কারণে, ভারতে জিহাদ ঘোষণার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার একমাত্র অধিকারী ছিলেন দিল্লির সম্রাট। আবার একটি জটিলতা ছিল যে সেই দেশ থেকে জিহাদ ঘোষণা করা যেত যে দেশে ইসলামি কায়দা-কানুন প্রচলিত ছিল। একটি দার উল-ইসলাম (বিশ্বাস বা ধর্মের রাজ্য)—আর, সৈয়দ আহমদের দৃষ্টিতে ভারত শত্রুতার রাজ্য ব্যতীত আর ধর্মের রাজ্য নয়। যদি জিহাদ করতেই হত তবে সেটি হিন্দুস্তানের বাইরে থেকে করতে হত, ঠিক যেমন হজরত মুহাম্মদ বহুদিন পূর্বে ধর্মের নগরী মদিনা থেকে শত্রুতার নগরী মক্কায় জিহাদ করেছিলেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অলক্ষ্যে সৈয়দ আহ্মদের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও জিহাদের আহ্বান সকলের নিকট পৌঁছে গেল। ভারতীয় বেসামরিক চাকুরে এবং ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম হান্টার পরবর্তীতে লিখেছেন, 'তিনি তাঁর নিবেদিত অনুচরবর্গসহ একটি প্রদেশ ভ্রমণ করে তাঁর ধর্মমতে হাজার হাজার জনগণকে দীক্ষা দেন এবং ধর্মশালার জন্য একটি কর ব্যবস্থা চালু করেন, বেসামরিক সরকার ব্যবস্থা এবং মহানবী (সা.)র প্রথম শিষ্যগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে দিয়ে অধ্যাত্ম কর্তৃত্বের অক্ষুন্ন পারম্পর্য রক্ষা করার প্রয়াস চালান। ইতিমধ্যে আমাদের কর্মকর্তাবৃন্দ রাজস্ব আদায় করতেন, ন্যায় বিচার পরিচালনা করতেন, এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীকে কুচকাওয়াজ করাতেন। আর এগুলো সবই সন্দেহাতীতভাবে চলতো তাঁদের চারপাশে তরঙ্গায়িত মহাধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যেই।'

১৮২১ সালের গোড়ার দিকে সৈয়দ আহমদ মক্কায় হজ্জে যাবার নিমিত্তে তীর্থযাত্রা করবেন বলে ঘোষণা দেন। হজ্জ ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে

একটি। তিনি তাঁর সঙ্গে যোগদানের জন্যে তাঁর অনুসারীদের আমন্ত্রণ জানালে চার শত অনুসারী সমবেত হয়ে তাঁকে গঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে নৌকা যোগে নিয়ে যেতে থাকেন আর সব বড় বড় নগরীতে নোঙ্গর করেন।

কলকাতার পথে তিনি দিল্লি ও কলকাতার মধ্যবর্তী অর্ধেক গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন নগরী পাটনায় যে সম্বর্ধনা পান তা অভূতপূর্ব। এই নগরীতেই তাঁর নবীন শিষ্য বেলায়েত আলীর বসবাস ছিল। এবং এটা সম্ভব যে তিনি তাঁর একুশ বছর বয়সে তাঁর তিন বছরের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা আঠারো বছর বয়সী ইনায়েত আলী তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের সংগঠিত করে সারিবদ্ধভাবে এই অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। পাটনার মুসলিম সমাজ তাঁকে একজন বড় নবীর মত গ্রহণ করার জন্যে তাঁর দিকে দলবেঁধে ছুটে যায়। যখন তাঁকে নগরীর পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন নগরীর শীর্ষস্থানীয় মুসলমানগণ তাঁদের পাদুকা জোড়া খুলে তাঁর পালঙ্কের পাশে ছুটছিল। তাঁর অভ্যর্থনা এতই উষ্ণ ছিল যে ধর্মপ্রচারক পাটনার এক বড় ধনীর গৃহে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অতিথি হিসেবে রয়ে গেলেন। ফতেহ আলী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ও সাধু ব্যক্তিবর্গের উত্তরসূরি এবং 'আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের' পিতা যারা পরবর্তীতে কুখ্যাত হয়েছিল। ফতেহ আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমসাময়িক এলাহী বক্স, ডাক্তার, পুস্তক-প্রেমিক এবং বিশ্ব প্রেমিক যাঁর চার পুত্র সৈয়দ আহমদের প্রতিনিধি হয়েছিলেন। এবং এলাহি বক্সের ভগ্নিপতি সাদিক পুরের সৈয়দ মুহাম্মদ হুসেন যাঁর কন্যারা এলাহী বক্সের পুত্রদেরকে বিয়ে করেছিল আর যাঁর পাটনার সাদিকপুর লেনের গৃহ এবং সরাই (আবাসিক হোটেল) আন্দোলনের হেডকোয়ার্টারস ও শিক্ষাস্থল হয়ে উঠেছিল। (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য, ভারতে ওয়াহ্হাবি বংশের কোষ্ঠি)। তাদের মধ্যে তিন পরিবারের তিন প্রধান ব্যক্তি ভারতের ওয়াহ্হাবিবাদ বিস্তারে ঘাঁটি গড়তে একত্রিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে শীর্ষ ব্যক্তিত্ব ফতেহ আলীর বংশের উদ্ভব হয়েছিল সুফিবাদ ও ইসলামি আদি পুরুষ থেকে।

তিন প্রজন্ম যাবৎ এই তিন গৃহের পুরুষ সদস্যবৃন্দ সৈয়দ আহমদের শুরু করা এই আন্দোলন চালিয়ে যান, প্রথম দিকে তাঁর পরামর্শদাতা ও প্রতিনিধি হিসেবে এবং পরবর্তীতে তাঁর ধর্মীয় মতবাদে নিবেদিত অনুরক্ত হিসেবে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদেরকে সাধুসন্ত ও শহীদ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে তবে সিসিলির এবং আমেরিকার মাফিয়া পরিবারবর্গের সঙ্গে তুলনা করলে সমধিক সূক্ষ্ম হতো। দুই সংগঠনই সন্ত্রাস ও দাঙ্গাবাজি এবং বিরোধীদের নির্মূল করার চক্রান্ত করে তাদের নিজস্ব দর্শন চাপিয়ে দেবার কাজে লিপ্ত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল শুধু শাসক নাজরানিই (খ্রিস্টান) নয় বরং হিন্দু, শিখ, শিয়া ও সুন্নিবাদী দার্শনিক ধারার সকলকেই এর অন্তর্ভূক্ত করা

হয়েছিল। উভয় সংগঠনই কাজ করত গোপনে, তাদের নেতার প্রতি অনুগত থাকার জন্যে শপথ গ্রহণ করত, তাদের নিজেদের সামাজিক রীতিনীতির নৈতিক বিধানকে মান্য করে চলত এবং নিজেদেরকে আল্লাহ্-ভীরু বলে বিশ্বাস করত। একমাত্র পার্থক্য এটাই হলো যে, একদল তাদের পারিবারিক প্রধানের উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে, ও অন্যটি তাদের ধর্মগুরুর দীক্ষা গ্রহণ করে।

সৈয়দ আহমদ পাটনা থেকে কলকাতার নদীমুখ পর্যন্ত তাঁর বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখেন, যেখানে তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় এত বিশ্বাসীরা সমবেত হয়েছিল যে তিনি তাদের প্রত্যেককে নিজ হাতে দীক্ষিত করতে পারেন নি আর তারা তাঁর খোলা পাগড়ির পাট ছুঁয়ে নিজেরাই দীক্ষিত হয়েছিল। এই জনসমাবেশে এতই উত্তেজনা ও আলোড়ন দেখা দিয়েছিল যে দৃশ্যতঃ 'ধর্মানুগত' মুসলমানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনায় সৈয়দ আহ্মদ কর্তৃক নিয়োজিত মর্মে পুলিশের নিকটে একটি দরখাস্ত পেশ করে। সৈয়দ আহ্মদের সাড়ে আটশত তীর্থ যাত্রীকে মক্কা যাওয়ার লক্ষ্যে সৈয়দ আহমদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮২১ সালের (বা সম্ভবতঃ পরবর্তী বছরে) বসন্তকালে দশটি নৌকায় চড়ে তাঁরা জেদ্দার লোহিত সাগরের বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।

সৈয়দ আহমদ সম্ভবতঃ দেড় বছর ভারত থেকে দূরে ছিলেন। তিনি বিবদমান ইসলামি ভাবধারা নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন যা মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভাজিত করেছিল।

অধ্যায় দুই

মরু অঞ্চলের বিশুদ্ধবাদী

> মরুভূমির এই বিশুদ্ধবাদী যিনি নিঃসন্দেহে একজন সংস্কারক, মুহাম্মদ (সা.) এর প্রথম দিককার শিক্ষায় বিশ্বাস করে ইসলামের প্রাচীন সরলতাকে ইসলামি দেশে ফিরিয়ে আনতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। বিপুল সংখ্যক অনুসারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইসলামে বিভিন্ন কুসংস্কার ও দুর্নীতিকে ভীষণভাবে তিরস্কার করত, সৈয়দ আহমদ অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে অনৈসলামিক বিভিন্ন অনুশীলনের সমাধি সৌধ বিধ্বংস করে উচ্চ নৈতিকতার বাণী সকলের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট করতে থাকে। এই প্রত্যয়ী সংগ্রামে তিনি ইসলামের নবী (সা.) এবং তার দৌহিত্র হোসেনকেও ছাড় দিতে নারাজ ছিলেন।
>
> উইলিয়াম উইং লরিং
> এ কনফাডারেট সোলজার ইন ঈজিপ্ট, ১৮৮৪

যে লোকটি ইসলামের এই নতুন ধারার নাম দিয়েছেন, তিনি একজন আরব, মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাব, ১৭০২ বা ১৭০৩ সালে মরুভূমি নেজদ দেশের আরবীয় উপদ্বীপের কঙ্করময় মালভূমির পশ্চাদভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। যাহোক, ওয়াহ্হাবিবাদের প্রকৃত পথ সুদূর অতীতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মোঙ্গলদের আক্রমণে ইসলামের হৃৎপিণ্ডস্থল (মধ্য ভূখণ্ড) আক্রান্ত হয়েছিল এবং তখনই ইসলাম তার বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠায় প্রথম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ১২৫৮ সালে মোঙ্গলরা বাগদাদের ঐতিহাসিক খিলাফতকে বিপর্যস্ত করে তারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহকে গ্রেট খানদের অধীনে নিয়ে নিতে লাগল। যুদ্ধকালে বন্দিদের মধ্যে শেখ ইবনে তায়মিয়া নামে এক ব্যক্তি ধরা পড়েন। তিনি ছিলেন ইসলামি আইনবিদ ও ১২৬৩ সালে সিরিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। ১২৫৯ সালে তাঁর পিতা বিধ্বস্ত দামেস্কের শরণার্থী ছিলেন, এবং তিনি বয়োপ্রাপ্ত হন মোঙ্গলদেরকে শত্রু মনে করে।

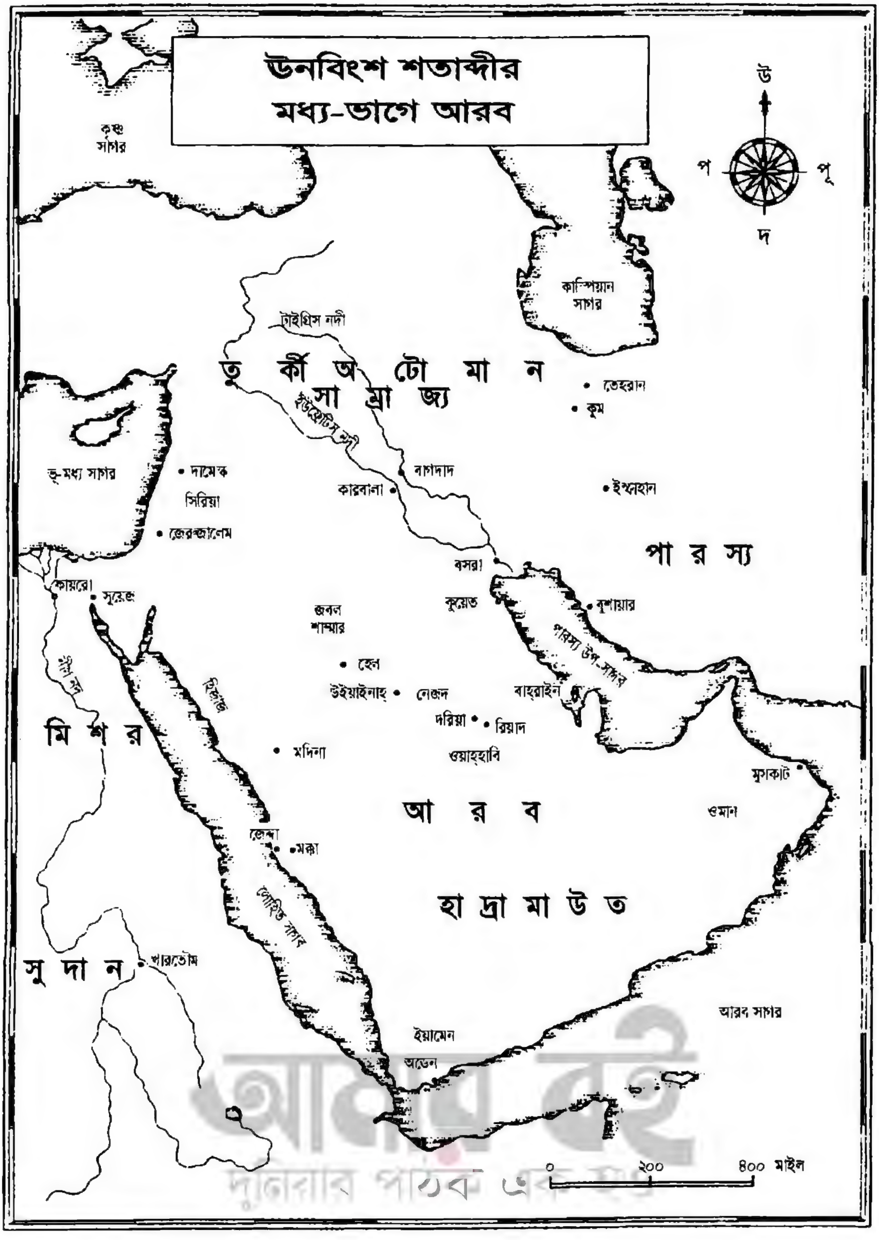

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে আরব

কৃষ্ণ সাগর
উ
প
পূ
দ
কাস্পিয়ান সাগর
টাইগ্রিস নদী
তুর্কী অটোমান
সাম্রাজ্য
তেহরান
কুম
ইউফ্রেটিস নদী
ভূ-মধ্য সাগর
দামেস্ক
সিরিয়া
বাগদাদ
কারবালা
ইস্ফাহান
জেরুজালেম
পারস্য
বসরা
কায়রো
সুয়েজ
জবল শাম্মার
কুয়েত
বুশায়ার
পারস্য উপ-সাগর
হেল
উইয়াইনাহ্
নেজদ
বাহরাইন
দরিয়া
রিয়াদ
নীল নদ
হিজাজ
মিশর
মদিনা
ওয়াহ্হাবি
মাসকাট
ওমান
আরব
জেদ্দা
মক্কা
লোহিত সাগর
হাদ্রামাউত
সুদান
খারতৌম
আরব সাগর
ইয়ামেন
অডেন
০ ২০০ ৪০০ মাইল

খিলাফতের ধ্বংসস্তূপ থেকে এক উজ্জ্বল ধারা মোঙ্গলদের অধীন পুষ্পিত হতে দেখা যায় যা পরবর্তীতে ইরানে সুফি মতবাদ এবং প্রবলভাবে শিয়া হিসেবে বিকশিত হয়। ইবনে তায়মিয়া এবং ইসলামি আইন শাস্ত্রের হানাবলি ধারা অনুসারীদের—সর্বশেষ সুন্নি দর্শনের চার মতে সর্বাপেক্ষা কট্টরপন্থী ও অজনপ্রিয় ধারা এই সভ্যতা আল্লাহ্ বিরোধিতার এক অভিশপ্ত ধারা হিসেবে চিহ্নিত হয়। নবী (সা.) ও তাঁর প্রথম খলিফাগণের তৎপরতায় ইসলামের প্রথম নাটকীয় সম্প্রসারণে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে, এই চার তাত্ত্বিক ধারা বিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দানের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি লাভ করে যা ছিল স্বর্গীয়ভাবে প্রাপ্ত ইসলামি অনুশাসনের ব্যাখ্যা সম্বলিত মানব জীবনের আচার-অনুষ্ঠান ও প্রশ্নাবলি। প্রায় ৯০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ঐক্যমত গড়ে উঠেছিল। সেই মতে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সঠিক ধর্মীয় বিচার্য বিষয়ের সমাধান করা হত উক্ত চার তাত্ত্বিক ধারার এক বা দুই ধারার অনুসরণে বিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। এটি তকলিদ (সাম্প্রদায়িক জন ঐক্য) নামে পরিচিত। এটা অনুসরণ করত যে ইজতিহাদের (স্বতন্ত্র যুক্তি) আর কোন ক্ষেত্র থাকত না, আর ইসলামের বিধানকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগল। তিনি প্রথমে কোরানের আক্ষরিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং নতুন কিছু প্রবর্তনের (বিদাত) বিরুদ্ধে নিন্দা করে প্রসিদ্ধি লাভ করতে এলেন। তিনি তাঁর যুগের মহান মরমী সুফি সাধক ইবনে আল-আরাবিকে আক্রমণ করলেন, আর বহু দেবতায় বিশ্বাসী হিসেবে এবং প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী বিষয় যা সুন্নি মূলধারার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় লোকজন অনুশীলন করছিল তার নিন্দা করেন। যেহেতু রীতিনীতিকে দোষারোপ করা যথেষ্ট হলো না, তাই ইবনে তায়মিয়া খিলাফতের প্রধান কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করতে গেলেন। এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে শেষ চার খলিফা মহানবী (সা.) কে তাঁদের প্রথম ইসলামি বিশ্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মেনে চলতেন তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকৃত খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্রের আমির (পার্থিব নেতা) ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞদের সাথে একযোগে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, ইমাম (ধর্মীয় নেতা) শুধু ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, তিনি ধর্মীয় মোল্লাদের একটি কমিটির দ্বারা রাষ্ট্র শাসন ও বিচারালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিভাবকেরও দায়িত্ব পালন করবেন। এই সূত্র ধরে ইবনে তায়মিয়া ঘোষণা দিলেন ইমাম শুধু আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র পরিচালনাতেই নিয়োজিত থাকবেন না। তিনি প্রয়োজনে যুদ্ধ পরিচালনাতেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেবেন এবং তাঁর কর্তৃত্বে জিহাদ ঘোষিত হবে।

শেষ বিষয় জিহাদ প্রসঙ্গে এটি রয়েছে যে ইবনে তায়মিয়াকে উত্তমরূপে স্মরণ করা হয়—আর প্রশংসা এবং ঘৃণা উভয়ই করা হয়। আর কোন কারণ

ব্যতিরেকেই, যেহেতু তাঁর জিহাদের ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে আধুনিক ইসলামি পুনর্জাগরণের গভীরে।

ইসলামি ভাবধারা সম্প্রসারণের প্রথম শতাব্দীগুলোতে, জিহাদ মুসলমানদের নিকটে একটি আবশ্যিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যতক্ষণ না সমগ্র বিশ্ব ইসলামি শাসন ব্যবস্থার অধীন হয় ততক্ষণ ইসলাম ধর্ম কায়েম করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ঐ নিরাপদ দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম বাইজানটাইন খ্রিস্টানরাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করে তোলে। কিন্তু ইসলাম যেহেতু আরব ধর্ম থেকে বিশ্বজনীন ধর্মে উন্নীত—বহু মাত্রিক বৈশ্বিক জাতি, গোষ্ঠী ও ধর্মে শিক্ষা এবং ব্যতিক্রমী ব্যাখ্যাকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। সুতরাং জিহাদের তাত্ত্বিক ও কিতাবি ব্যাখ্যায় বাস্তব ভিত্তিক সমাধান দেয়া হয়। হাদিসে বর্ণিত আছে যে হজরত মুহাম্মদ (সা.) বদরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করে বহু ঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে এক বিখ্যাত রায় দান করেনঃ 'আমরা ছোট জিহাদ (জিহাদ কবীর) করেছি, এখন আমরা বড় জিহাদ (জিহাদ আকবর) আরম্ভ করছি।' জিহাদের এই বিভাজনকে এই অর্থে ব্যাখ্যা করা হয় ইসলামে বাইরের এবং স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক সংগ্রামের দিন শেষ হয়েছে এবং আরও বেশি জোর দিতে হবে অন্তরের এবং নৈতিক সংগ্রামের দিকে। নবম শতকের ইসলামি শাস্ত্রবিদ আহমদ বিন হানবল এই সুন্নি চরম মতবাদের অগ্রগণ্য ব্যক্তি এই ব্যাখ্যাকে সমর্থন জানান। সুফি মরমীবাদের নাটকীয় সম্প্রসারণ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলামি বিশ্বে সুফি ভ্রাতৃত্ব পুনরায় জিহাদের আধ্যাত্মিক, অন্তরের সংগ্রামকে সহযোগিতা করেছিল।

যাহোক, ইবনে তায়মিয়া নবী (সা.)-এর জিহাদের বিভাজনকে কোরানে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বাণীর বিরুদ্ধাচরণ মর্মে অবিশুদ্ধ বলে ঘোষণা দেন। কোরানের দুই অধ্যায়ের (সুরা ২, আয়াত ১৯৩; সুরা ৮, আয়াত ৩৯) ব্যাখ্যা প্রণয়ন করে ইবনে তায়মিয়া জিহাদের আক্ষরিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে ইসলামের ভাগ্য নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে তার বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে জিহাদ বলে। এই অনমনীয় মতবাদকে মোঙ্গল বিরোধী আগ্রাসন ও মূলধারা ইসলাম পরিপন্থী শিয়া মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত অবস্থা থেকে সৃষ্ট হিসেবে দেখা যেতে পারে। ইবনে তায়মিয়া মোঙ্গল খানদের অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন, আর প্রকৃত মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান জানান। ১৩০০ সালে দামেস্কের মোঙ্গল বিরোধী সফল অভিযানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সকলকে যুদ্ধ জয়ে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি সৈন্য প্রশিক্ষণ প্রদানসহ জিহাদের প্রচারণা চালিয়ে যান। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে জিহাদ ছিল সৈন্যদের প্রতিরোধের চেয়ে আরও বেশি কিছু। 'এটি ছিল যারা ইসলামের আহ্বানে

সাড়া দিতে অস্বীকার করত বা যারা ইসলামের বন্ধনকে অমান্য করত তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধ। তাঁর নিজের ভাষায় এটি ছিল ধর্ম যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিতদের মাঝ থেকে অবাধ্যদের অনুসন্ধান করে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। এই জন্যে যে-ই আল্লাহ্‌র দূতের আহ্বান শুনেছে, শান্তি তাঁর ওপর বর্ষিত হোক, আর যে তাতে সাড়ে না দিয়েছে, তার বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে।'

ইবনে তায়মিয়া পুনরায় জিহাদকে সুন্দরতম কাজ হিসেবে ঘোষণা দেন যা মানুষ করতে পারে। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ মহোত্তম কাজ এবং তারপরেও মানবজাতির জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জিহাদ সব ধরনের শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করে, উভয়ই বহিরাঙ্গের এবং অন্তরাঙ্গের। অন্যান্য কর্মের তুলনায় জিহাদ ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্যে প্রার্থনাকে প্রকাশ করে। যেহেতু এর লক্ষ্য এই যে ধর্ম সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্‌র বাণীই মনে প্রথমে উদিত হয়, অতএব সকল মুসলমানের মতানুসারে, এই লক্ষ্যে এই পথে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সবাইকে সকল বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতেই হবে।

ইবনে তায়মিয়া ইসলামের শত্রুদেরকে স্বতন্ত্র চারদলে শ্রেণীভুক্ত করেন। নাস্তিক, যেমন খ্রিস্টানরা, তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি অনুমোদনীয় ছিল, খাবার ভাগ করে খেতে পারত, তাদের মেয়েদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারত, তারা বন্দি হবার পর জীবন ভিক্ষা পেত, যে সকল মুসলমান নাস্তিকতায় ফিরে যেত, তাদের সঙ্গে কোন রকম শান্তিতে বসবাসের সম্ভাবনা থাকত না এবং যদি তারা মূল ধর্মে না ফিরত তবে তাদের সঙ্গে লড়াই করা হতো। যারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে দাবি করত অথচ মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান যথাযথভাবে প্রতিপালন করত না, এবং সে জন্যে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। পরিশেষে, যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে দাবি করেও ইসলামকে বর্জন করে চলত, তাদেরকে কোন অবস্থাতেই ক্ষমার কোন সুযোগ না দিয়ে সরাসরি হত্যা করা হতো।

এটা স্মরণে রাখতে হবে যে ইবনে তায়মিয়ার আক্ষরিক, অযৌক্তিক মতবাদ, পরমত অসহিষ্ণু চিন্তাধারা তাঁর নিজের জীবদ্দশাতেই ব্যাপকভাবে বর্জিত হয়ে যায়। তিনি বারে বারে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের নিকটে নিগৃহীত হন, কতিপয় ঘটনায় কারান্তরীণ হন এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন। তাঁর ঈশ্বরতত্ত্ব সুন্নি মূলধারায় কখনোই ঠাঁই পেতে দেখা যায় নি। যা কখনো বিস্মৃত হয় নাই এবং যা এখন পর্যন্ত আকৃষ্ট করে আছে, এদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভের পরপরই নেজদে জন্মগ্রহণকারী আরব মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়াহ্হাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ সময়ে নেজদ আরবের ধূসর মরুভূমি ঘেরা পরিত্যক্ত ঊষর এক খন্ড অনাবাসিক ভূমি ছিল, ঐ বিরান ভূমিতে যে কজন বেদুঈন উট পালক ও বিক্রেতা বাস করত, তারা সর্বাক্ষণিকভাবে নিজেদের মধ্যে চারণ ভূমি ও মরূদ্যানের দখল নিয়ে সংঘাতে লিপ্ত থাকত। প্রকৃতপক্ষে নেজদের অনেক আরবের বদ সঙ্গী-সাথী ছিল। একটি জনপ্রিয় কথা চালু ছিল যে ‘নেজদ থেকে কখনও ভাল কিছু উদ্ভূত হয়নি; আর হাদিসে বর্ণিত আছে যে, মহাবনী (সা.) আল্লাহ্‌কে নেজদকে মহিমান্বিত করার জন্যে তিনবার বলেছিলেন আর তিনবারই তিনি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন। তৃতীয়বারে এই উত্তর দিয়ে আল্লাহ্ অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, ‘যেখানে ভূমিকম্প ও মতবিরোধ রয়েছে সেখানে শয়তানের শিং গজায়।’ পরবর্তী বছরগুলোতে আল-ওয়াহ্‌হাবের কার্যধারা অনুসরণ করে অনেকেই যুক্তি দেখিয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয়।

ওয়াহ্‌হাবিরা বেনি তেমিন নামে অতি দরিদ্র সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যাদেরকে ঘোড়া দেখেই চেনা যেত। তাঁর অনেক সমালোচকের মতানুসারে তিনি ছিলেন প্রাদেশিক স্বল্প ইসলামি জ্ঞানসম্পন্ন অসভ্য পাড়াগেঁয়ো লোক। এই পর্যাবেক্ষণ ওয়াহ্‌হাবি জীবনী রচয়িতাকে একটা বিষয়বস্তু দান করেছিল, যে তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পৈতৃক জ্ঞানকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। একজন বিচারক যিনি এক বিশেষ বনেদি বংশোদ্ভূত ছিলেন তিনি হানবালি ঘরানার ইসলামি চিন্তা-চেতনার অনুসরণ করেন। তিনি ইসলামি আইন-ব্যবস্থা কোরান ও হাদিস ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। তবে আল-ওয়াহ্‌হাব প্রথম থেকে ধর্মের নিবেদিত ছাত্র ছিলেন এবং দশ বছর বয়স থেকে কোরান মুখস্থ বলতে পারতেন। জ্ঞানান্বেষণকারী যুবক হিসেবে তিনি মদিনা ও বসরা ভ্রমণ করেন, আর কুম নামক এক জায়গায় সুফিবাদের সাথে সামান্য ছল করেন। এক দশক পর তিনি মদিনায় ফিরে যান এবং মুসলিম বিশ্ব থেকে প্রতিনিধিত্বকারী ইসলামি পণ্ডিতদের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনীকারেরা পরবর্তীতে যে রং-ই চড়ান না কেন, তাঁর নামের সঙ্গে চূড়ান্ত অভিমতই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানেই তিনি তাঁর উগ্রপন্থী মতবাদের দর্শন গড়ে তোলেন।

মদিনায় প্রথম দিকে আল-ওয়াহ্‌হাব নেজদের সদস্য ইবনে তায়মিয়া ধর্মমতের একজন প্রখ্যাত প্রশংসাকারী আব্দ আল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে সাইফের নিকটে শিক্ষার্জন করেন। তিনি হাদিসের বিখ্যাত শিক্ষক সিন্ধুর মুহাম্মদ হায়াতের নিকটে ভারতীয় অভিবাসী হিসেবে পরিচিত হন। যদিও সুফি মতের আইন বিজ্ঞানের একজন অনুসারী, হানবালি নয়, ষোড়শ শতাব্দীর চরমপন্থী ধর্ম-পুনর্জাগরণকারী শেখ আহ্‌মদ সরহিন্দ এবং তিনিও প্রচলিত

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

ধর্মমত বিরোধী ইবনে তায়মিয়ার প্রশংসাকারীর মুহাম্মদ হায়াত নাকশবন্দি ছিলেন। মুহাম্মদ হায়াত এবং তাঁর পিতা মদিনায় অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দেন মর্মে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া নেজদের আল-ওয়াহ্হাব এই জ্ঞানান্বেষণকারীদের মধ্যে দিল্লির তরুণ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্কে অন্তর্ভুক্ত করেন।

কতিপয় ইতিহাসবেত্তা মনে হয় বুঝেছিলেন যে দিল্লির শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ১৭০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন, আর নেজদের আল-ওয়াহ্হাব শুধু সমসাময়িকই নয় মদিনায় তাঁরা একই সময়ে লেখাপড়া করেন আর কমপক্ষে একই সাধারণ শিক্ষকের নিকটে। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ১৭৩০ সালে সাতাশ বা আঠাশ বছর বয়সে মক্কায় হজব্রত পালন করতে যান এবং পরবর্তীতে মদিনায় চৌদ্দ মাস শিক্ষার্জনে অতিবাহিত করেন। আল-ওয়াহ্হাব (জন্ম ১৭০২/১৭০৩) জানা যায় তাঁর বয়সের বিশ দশকের শেষের দিকে মদিনায় ফিরে এসে শিক্ষার্জনে কালাতিপাত করতে থাকেন। তিনি কতদিন সেখানে অতিবাহিত করেন তা জানা যায় না। তবে তাঁর জীবনকাল শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র আবির্ভাব পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মদিনায় হাদিসের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ কুর্দ শেখ আবু তাহির মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-কুরানি আল-মাদানি যিনি প্রথম দিকে সিন্ধুর মুহাম্মদ হায়াতকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আল-ওয়াহ্হাবের প্রধান শিক্ষক। ঘটনার সম্ভাব্য চক্রে ধারণা করা হয় যে এই দুই বিপ্লবী সম্ভবত একদল ও মতের অধিকারী হয়ে থাকতে পারেন এবং তাঁদের মধ্যে চিন্তা-চেতনার বিনিময় হয়ে থাকতে পারে। মুহাম্মদ হায়াত ও তাঁর পিতা, দুজনই ইবনে তায়মিয়ার অনুসারী, তাঁদের শিষ্যদেরকে তাঁদের নিজেদের ধর্মীয় আইন-কানুনের ব্যাখ্যা অনুসরণ ও তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে সংগ্রামশীল জিহাদকে অবলম্বন করানোর জন্যে পূর্ববর্তী কঠোর ধর্মীয় বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করতে উৎসাহিত করেন। মদিনায় তাঁদের অধ্যয়নের ফলাফল দাঁড়িয়েছিল যে দুজনই আল-ওয়াহ্হাব ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ্র গৃহে গিয়েছিলেন তাঁদের কালের দুজন সুন্নি মতধারার মহান পুনর্জাগরণকারী হতে, প্রত্যেকেই তাঁরা মদিনায় অর্জিত শিক্ষাকে নিজস্ব ধারায় মৌলবাদী শিক্ষাকে কার্যে পরিণত করতে।

এটা একই ঘটনার সংঘটন নয় যে বর্তমানে সৌদি আরবে সম্মানের দিক থেকে ইবনে তায়মিয়া কেবল আল-ওয়াহ্হাবের চেয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন। ইবনে তায়মিয়ার কাছে পরবর্তীর ঋণ প্রচুর। ইবনে তায়মিয়ার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং পুনরায় মুহাম্মদ হায়াতের দ্বারা উৎসাহিত আল-ওয়াহ্হাব নেজদে নতুন ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীতে যুক্তি দ্বারা সমর্থনকারী শেখ হাফিজ ওয়াহ্হাবা কর্তৃক সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপিত হয়, 'মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও মহান খলিফাদের আমলে যে ধর্ম প্রচলিত

ছিল তা পুনরুদ্ধার।' এটিই সংক্ষিপ্তাকারে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দিল্লিতে শুরু করতে চেয়েছিলেন—যদিও একজন ধর্মীয় পুনর্জাগরণকারী হিসেবে সম্মানিত হন আর অপরজন সাম্প্রদায়িকতা প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে হন ঘৃণিত।

দিল্লিতে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর বক্তব্য প্রদান করতেন যেখানে তাঁর দর্শন প্রতিনিয়তই প্রতিবাদের সম্মুখীন ও সমালোচিত হতো। যাহোক নেজদ প্রদেশে কিছু ন্যায়নীতি জ্ঞানসম্পন্ন বিতর্কে দক্ষ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ আল-ওয়াহ্হাবের সম্মুখীন হন। এরই পরিণতিতে তিনি একটি এমনই শুদ্ধবাদী ইসলামের ধারা রচনা করেছিলেন যার পবিত্রতার প্রশ্নে কোনরূপ বিতর্কের অবকাশ ছিল না এবং এ ধরনের অবিসংবাদিত ব্যাখ্যা কেবলমাত্র একাদশ শতাব্দীর দারুণ আগ্রাসনে আগত গজনির সুলতান মাহমুদ, যিনি কসাইয়ের মত ইসলামের নামে উত্তর ভারতে বারটি লুট-তরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন আর সেটা ইসলামের নামে বৈধ করেছিলেন। তার পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের একচ্ছত্র যৌক্তিকতা প্রদর্শনে এটিই প্রথম। আল-ওয়াহ্হাবের ইসলামি মৌলবাদ ইসলামের প্রথম নীতিসমূহকে এভাবেই অতিক্রম করেছিল যেটি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ লুফে নিয়েছিলেন। এটি কঠোরভাবে পুস্তক ভিত্তিক ও অনমনীয় ছিল, এটি নির্দয়ভাবে বাস্তবায়িত করা হতো যা তার অনুসারী প্রাক্তন ছাত্ররা সুদৃষ্টিতে দেখত না।

আল-ওয়াহ্হাব এই নতুন ধর্মমতের নাম দিয়েছিলেন 'আদ দওয়া লিল তাওহিদ' সাধারণতঃ 'ঐক্যের ডাক' নামে অনুবাদ করা হয়। যাঁরা এটিকে সমর্থন করতেন তাঁরা নিজেদেরকে 'আল-মুয়াহিদুন' বা একেশ্বরবাদী নামে অভিহিত করতেন। যাহোক, অতি দ্রুত উভয়ই এই শিক্ষা ও এর অনুসারীবৃন্দ এর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে ওয়াহ্হাবি বলে পরিচিত হয়ে গেল—এমন একটি নাম যা শীঘ্রই ইসলামি বিশ্বে একটি অপমান, একটি সাম্প্রদায়িকতা প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে আর ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরিচয়ে প্রবাদ পুরুষে পরিগণিত হন।

ওয়াহ্হাবিবাদের মতবাদসমূহে প্রথমে কিতাব আল-তৌহিদ (ঐক্যের গ্রন্থ) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। মূলত কতিপয় ধারাবাহিক নোটগুচ্ছের থেকে অধিক কিছু ছিল না সেগুলি তবে পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরিরা ক্রমে ক্রমে চারটি ঢাউশ খণ্ডে ওগুলোকে রূপান্তরিত করে নেয়। এই চেতনা ইসলামকে নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদে (তৌহিদ) পরিণত করেছিল, যে কোন উদ্ভাবনী ধারাকে বাতিল করেছিল। কেবলমাত্র আল-ওয়াহ্হাব নিজের ধারণা প্রসূত কোরান-হাদিসের ব্যাখ্যা ব্যতীত যে কোন কিছুকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামের অভ্যুদয় সংসাধিত হয়েছিল পৌত্তলিকদের এবং বহুঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে। তাঁর মতে প্রকৃত মুসলমানের

জন্য এটি একমাত্র সত্যের পথ যা খোলা রয়েছে। তাঁরা প্রথমত তাদের ধর্মীয় নেতার আনুগত্য স্বীকারের শপথ গ্রহণ করত; দ্বিতীয়ত তাঁর শিক্ষাকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করত; তৃতীয়ত তাঁরা নিজেদেরকে স্বধর্মত্যাগী, ঈশ্বরের নিন্দাকারী ও অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে যোগদান করত আর চতুর্থত, একইভাবে স্বধর্মত্যাগী, ঈশ্বরের নিন্দাকারী এবং অবিশ্বাসীদের ঘৃণা করত। প্রতিদানে তারা পেত আল্লাহ্‌র প্রতিরক্ষা আর পেত সঙ্গী বিশ্বাসীদের ভালবাসা ও সান্নিধ্য এবং অবিলম্বে স্বর্গারোহণের নিশ্চয়তা পেত যদি তারা ইসলামের জন্যে সংগ্রামরত অবস্থায় শহীদ হিসেবে মৃত্যুমুখে পতিত হত। পরিত্রাণের আর কোন পথই ছিল না। আল-ওয়াহ্‌হাব লিখেছেন, 'যাঁরা আল্লাহ্‌র তৌহিদকে অনুশীলন করেন, তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদের প্রতি নিবেদিত থাকা, তাঁদেরকে সব ধরনের সাহায্য করা এবং নাস্তিক ও বহুঈশ্বরবাদীকে ঘৃণা করাই একমাত্র পথ।'

এই নতুন মতধারা নেজদে ভালভাবে গৃহীত হলো না। এটি আল-ওয়াহ্‌হাবকে তাঁর পিতা ও চাচাসহ সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষকদের সঙ্গে পরস্পর বিরোধিতায় ফেলে দিল। পরবর্তীতে সুলায়মান ঘোষণা করেন, 'তিনি দাবি করেন পবিত্র কোরান ও সুন্নাকে {নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিবৃন্দের দৃষ্টান্ত যা সুন্নিরা গ্রহণ করেছে} অনুসরণ করতে এবং তাঁদের শিক্ষা হতে সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করেন, কোন বিরোধীর মতবাদে বা শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে নিষেধ করেন। যে তাঁর বিরোধিতা করে তাকে বিরোধী বলেন, যদিও সে মুজতাহিদীনের (যারা নিজেদের বিচারবুদ্ধিতে চালিত হয়) কোন শিক্ষারই অধিকারী নয়।' তাঁদের নিজ গ্রাম উয়াইনাহতে তাঁকে প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে নিন্দা করা হয় এবং গ্রাম ছাড়তে আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁর পিতা হুরায়মিলাতে বসবাসের জন্যে যাচ্ছিলেন তবে সেখানেও তাঁর শিক্ষা প্রতিবেশীদেরকে এত ক্ষিপ্ত করে তোলে যে তারা তাঁকে তাঁর ধ্যান-জ্ঞানকে নিজের ভেতরে সংরক্ষিত রাখতে আদেশ করে, প্রায় ১৭৪০ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যা তিনি পালন করেন। অতঃপর তিনি বিচারক হিসেবে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে কার্য আরম্ভ করেন আর তাঁর নতুন শিক্ষানুসারে সকল বিচার কার্যের সমাধান করেন। ক্রমবর্ধন হারে বল প্রয়োগের ফলে অবশেষে জনগণ তাঁর শত্রু হয়ে উঠল, আর রাতের অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করল। তিনি হুরায়মিলা থেকে পলায়ন করে উয়াইনাহতে পুনরায় আশ্রয় খোঁজেন।

এখানে তিনি স্বয়ং নতুন লাটসাহেবকে তাঁর প্রকৃত শ্রোতা হিসেবে পেয়েছিলেন যাঁর খালাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নতুন পৃষ্ঠপোষকের সমর্থন পেয়ে তিনি আর একবার ঐক্যের ডাকের মতবাদসমূহ প্রয়োগ করতে

লাগলেন। বেশ কিছু হিংস্র কার্যের মাধ্যমে বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করে যা তাঁর শিক্ষার উৎকর্ষতার প্রতীকে পরিণত হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি উস্কানীর মাধ্যমে এক গণবিক্ষোভ ঘটিয়ে ইসলামের নবীর এক অনুসারীর সমাধিসৌধকে বিনষ্ট করেছিলেন। এবং একজন কথিত ব্যভিচারিণী মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন—আল-ওয়াহ্হাব নিজে এতে অংশ নিয়ে মহিলাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলেন। এই মর্মান্তিক দৃশ্য সকলকে মর্মাহত করেছিল। এই শেষ কর্মটিই মনে হয় স্থানীয় উলেমাদের ধৈর্যের শেষ সীমা ছিল। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে ইসলামি ব্যাখ্যার নতুন মতধারা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের জন্যে এবং যারা তাঁর মতবাদকে সমর্থন করে নি তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বল প্রয়োগের জন্যে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। উপজাতি সর্দারের মধ্যস্থতায় আল-ওয়াহ্হাব তাঁর মতবাদ সচল করার আদেশ পান এখন। তিনি ছোট্ট দরিয়া গ্রামে যেখানে তাঁর শিক্ষায় বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন।

দরিয়ায় এই পলায়ন পরবর্তীকালে ওয়াহ্হাবিদের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর মক্কার দার উল-হার্ব থেকে মদিনার দার উল-ইসলামে প্রসিদ্ধ দেশান্তরে যাবার কথা স্মরণ করিয়া দেয়, যেখান থেকে তিনি তাঁর আরবের আধ্যাত্মিক বিজয় আরম্ভ করেন। এখানে দরিয়ায় আল-ওয়াহ্হাব স্থানীয় সর্দার মুহাম্মদ ইবনে সৌদ, প্রবল আনিজা উপজাতির উপ-শাখার একজন নেতা আর তিনি ইতিমধ্যে যোদ্ধা হিসেবে তাঁর শারীরিক শক্তিমত্তার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। মুহাম্মদ ইবনে সৌদ কেবল মাত্র ওয়াহ্হাবি মতাদর্শেই দীক্ষিত হন নি বরং নিজের সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দ আল আজিজকে আল ওয়াহ্হাবের কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি সৌদ ওয়াহ্হাবি বংশের গোড়া পত্তন করেননি—যা পরবর্তীতে সৌদি আরবের শাসনভার বংশানুক্রমিকভাবে গ্রহণ করেন। (পরিশিষ্ট ১-এ বংশ কোষ্ঠী দেখুন আল-সৌদ-আল-ওয়াহ্হাব বিবাহসূত্রে পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি)।

প্রায় ১৭৪৪ সালের দিকে মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ও আল-ওয়াহ্হাবের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশীদারীত্ব দৃঢ়ভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হলো। এটি তাঁদের দুজনের মধ্যে একটি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়। যার দ্বারা পূর্ববর্তীজন নিজে আমির উপাধি ধারণ করে সেই মত কার্য সম্পাদন করবে, অথবা ধর্মনিরপেক্ষ নেতা, আর পরবর্তীজন শীঘ্রই শেখ উল-ইসলামের জাঁকজমকপূর্ণ উপাধি নিয়ে ইমাম হবেন। এই আঁতাত একজনকে নেজদের আঞ্চলিকভাবে এক ক্ষমতাবান প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অঞ্চলেও ধীরে ধীরে ক্ষমতা দার উল-ইসলাম বিস্তারে সহায়তা করেছিল এরই মাধ্যমে বহু প্রত্যাশিত শরিয়া ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছিল।

> একজন দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষার কারণ দেড় শতাব্দী পরে হ্যারি সেন্ট জন ফিলবি লিখে গেছেন, ধর্মকে সুস্থ ধারায় ফেরাতে খ্রিস্টীয় গীর্জার অনুকরণে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে খাদ হিসেবে পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে শুদ্ধি অভিযান চালানো হয়েছিল, অবক্ষয়িত ধর্মে বিশিষ্ট ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করে যে সমস্ত বিভ্রান্ত অনুসারীরা নিজ সন্দেহের গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তাদের দিক নির্দেশনা প্রদর্শন করা হয়েছিল। ঈশ্বরের একত্বে অন্ধ বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসহীনতার বিষয়ে সহ্য না করা, এই মতবাদের মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হত যা পরবর্তীতে বেদূঈন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে আরবীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সিংহ দ্বার গড়ে তুলেছিল।

আরবের বেদূঈন উপজাতিরা প্রধানত মেষপালক, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় একই রীতিনীতি পালন করে বসবাস করে তবে বদ্ধমূলভাবে তারা পাঠানদের মত একে অন্যের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন, যাদের সঙ্গে তাদের বহু গুণাবলির মিল পাওয়া যায়। ১৮১৬ সালে একজন সুইস পণ্ডিত ও পরিব্রাজক জে.এইচ. বার্কহার্ডট ছদ্মবেশে মক্কা ও মদিনা ভ্রমণ করে বলেছিলেন, ‘আরবীয়রা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেও তাদের অতিথিদেরকে রক্ষা করে, এবং ভাগ্যের বিরূপতার কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয়. বেদূঈনরা জীবনের প্রথমাবস্থায় আনন্দ উপভোগ থেকে বিরত থাকে ও কষ্ট সহিষ্ণুতার শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভালবাসা ও সান্তনার উপশমকারীর ক্ষমতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে।’ পাঠানদের মতই বেদূঈনরা সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাদের স্বাধীনতাকে মূল্য দিত। ‘তারা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে যা তাদেরকে পরিচালনা করে এবং এখনো মরুভূমিতে তাদেরকে রক্ষা করে এবং একইভাবে তারা তাদের নিজেদের দাস-দাসীদের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে দেখে। বেদূঈনরা এত আত্মবিশ্বাসী যে তারা নিজেদের যে কোন অবস্থা থেকে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে এটা বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে একজন দরিদ্র বেদূঈন ও তুরস্কের পাশা (তুরস্কের শাসক)র দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসে।

আন্ত-উপজাতি বিবাহ নিষিদ্ধকরণ এই স্বাধীনতাবোধকে পুনরায় বলবৎ করতে সহায়তা করছিল। বার্কহার্ডটের কয়েক বছর পূর্বে সিরিয়ার আলেপ্পোতে অবস্থানরত এক ফরাসি দূত লুইস আলেকজান্দ্রে অলিভিয়ের দ্য কোরানসেজ ওয়াহ্হাবি বিষয়ে লিখতে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেন যে, ‘এই বেদূঈন সম্প্রদায়রা অতি সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে সব কিছু দেখত এবং নিজেদের রক্ত সম্পর্কিতদের মধ্যে তাদের বংশীয় ধারাকে বজায় রাখতে চাইত। প্রতিটি সম্প্রদায়কে এ কারণে একটা বৃহত্তর পরিবার হিসেবে দেখা হত যেখানে একজন আরবীয় শেখকে অভিভাবক হিসেবে গণ্য করা হতো।’

মুহাম্মদ ইবনে সৌদ তাঁর পুত্রের বিবাহ আল-ওয়াহ্হাবের উপজাতিতে দিয়ে তাদের প্রথার অবসান ঘটান তবে এর মাধ্যমে একটি পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটান যে, বিশৃঙ্খল উপজাতিদের একই নেতার কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আনেন। কোরানসেজ তাঁর 'হিস্ট্রি দ্য ওয়াহ্হাবিস' গ্রন্থে আরও উল্লেখ করেন, 'এভাবেই আরবভূমিতে জন্ম নিয়েছিল এক নব্য জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের চরম দুর্দশাগ্রস্ততার মাঝে গড়ে তুলেছিল তাদের বিরাটত্ব।

বেদূঈন সমাজের একই সবুজ পতাকাতলে সমবেত করার প্রচেষ্টা পূর্বে একবার ঘটেছিল, যা কেবলমাত্র সামরিক ভয়-ভীতি দেখিয়ে সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে যা ঈশ্বরের ভাবনা সম্পর্কে কেবলমাত্র একজনের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে সম্মত নয় পুনরায় তারা নিজেদের মধ্যে আঁতাত গড়ার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। নিজস্ব ধর্মীয় চিন্তাধারায় আল-ওয়াহ্হাব নিজের নামে তাঁর এক আমিরের অধীনে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ সমর্পণ করে একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলেন। প্রতিটি মানুষ যারা ইবনে সৌদের আন্ত-উপজাতীয় রাষ্ট্র সংগঠনে যোগ দিত তাদেরকে আনুগত্যের শপথ নিতে হত। যা স্বর্গে তার অবস্থান নিশ্চিত করার নিমিত্তে তাকে ধর্মীয় কর বা যাকাত দিতে হত যার মূল্য প্রতি পাঁচটি উটের জন্য এক স্প্যানিশ ডলার, প্রতি চল্লিশটি ভেড়ার মূল্য এক ডলার, যাদের জমি-জিরেত থাকত তাদেরকে এক নির্ধারিত অংশের সশস্ত্র উষ্ট্রারোহী প্রদান করা হতো। এই অনুশাসন বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করার আল-ওয়াহ্হাব তার ধর্মীয় পুলিশ বাহিনী গঠন করেন যারা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত থাকত তাদেরকে বলা হতো মুতাউইহিন। তারা ছিল জনগণের নৈতিকতার অভিভাবক। বার্কহার্ডট তাদেরকে ধর্মীয় প্রার্থনার সময় ও নিয়মানুবর্তিতা পালনের পুলিশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন... এ কাজে অসংখ্য জনবল নিয়োজিত থাকত যাদের ওপর নির্দেশনা থাকত যে কোন প্রকার ধমক, গালাগালি এবং টেনে হিঁচড়ে জনগণকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে বাধ্যতামূলক শামিল করার দায়িত্ব। মুতাউইহিনরা ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া আরো বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এছাড়া জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান এবং নামাযের সময় দোকান বন্ধ করা তাদের কাজের আওতাভুক্ত ছিল। তারা ভ্রাম্যমান ধর্মীয় পর্যবেক্ষণেরও কাজ করত, এ ছাড়াও তারা নামাযের খোতবায় একতার ডাক দিত ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষাদান করত। প্রতিদানে মুহাম্মদ ইবনে সৌদ তাঁর অনুসারীদের আনুগত্যের জন্যে বিজয়ের প্রত্যাশা দান করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগের পূর্ব থেকে বেদুঈন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল কোন পার্শ্ববর্তী এলাকায় হানা দেওয়া। তবে ১৭৪৬ সালে ইমাম আল-ওয়াহ্হাব যারা তার ঐক্যের ডাকে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানাত তাদের বিরুদ্ধে

জিহাদের একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতেন। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে নবীর প্রাথমিক সংগ্রামের চিত্রকে একটি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, আমিরের বাহিনী নাস্তিকদের আস্তানার গভীর অভ্যন্তরে হানা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের রণকৌশল হিসেবে তারা প্রথমে সর্বাধিক দুর্বলদের উপরে হামলা চালায় যখন তাদের ইমাম অন্যান্য প্রতাপশালী পার্শ্ববর্তী শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বিরতির সন্ধি স্থাপন করেন। দুর্বলদের আক্রমণ করে তাদেরকে নিজ প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আক্রমণে বাধ্য করা হয়েছিল, লেফটেন্যান্ট ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন তাঁর প্রণীত ওয়াহ্হাবিদের অভ্যুদয়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন। ওয়াহ্হাবি (অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে সৌদ) ক্রমশঃ তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে এক সাম্রাজ্য প্রতিস্থাপনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আল-ওয়াহ্হাব তাঁর লেখনীতে ধার্মিক চেতনার যে বক্তব্যই পেশ করুন না কেন, তাঁর অনুসারী নেজদের বেদূঈন বাহিনীতে তেমন কোন ধর্মযোদ্ধা ছিল না যেমন তারা ছিল অবিবেচক ধর্মান্ধ গোষ্ঠী। জিহাদির নীতি-আদর্শে সমর্থিত এই বিশ্বাসে তারা তাদের পড়শীদের মালামাল লুট করত, হানাদার বাহিনীর প্রত্যেকে লুটতরাজ করত, ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে ও হত্যাকাণ্ড ঘটাতে বেরোত। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির এক-পঞ্চমাংশ চলে যেত আমিরের নিকটে, বাকি অংশগুলো অংশগ্রহণকারী উপজাতিদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে নেয়া হতো। এতদ বিষয়ে কোরানে বর্ণিত বিধান মোতাবেক ইমাম এবং তাঁর ওয়াহ্হাবি উলেমা যাকাত বা ধর্মীয় কর সকল ঈমানদারদের নিকট হতে গ্রহণ করতেন। এই গ্রন্থের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষত ওয়াহ্হাবিদের পর্যাপ্ত খোরাক রয়েছে।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে যখন হাফিজ ওয়াহ্হাবা সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটির তাঁর ব্রিটিশ দর্শকদের সম্মুখে ব্যাখ্যা করতে উপনীত হন তখন ইউরোপের প্রোটেস্ট্যান্টদের সাথে তুলনা করতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। যেমন সমসাময়িক সংস্কারপন্থী মার্টিন লুথারের ইবনে তায়মিয়ার সমীকরণ স্থাপনে যা দেখা যায়। ইউরোপীয় প্রথম পর্যবেক্ষকগণও ওয়াহ্হাবিদেরকে তাঁদের গির্জার সঙ্গে সমান্তরালভাবে দেখেছিলেন। জে.এইচ. বার্ক হার্ডট চিহ্নিত করেন,

> ওয়াহ্হাবিবাদের ধর্মকে প্রোটেস্ট্যান্টদের মতবাদ বা মুহাম্মদী বিশুদ্ধবাদীদেরও মতবাদ বলা যায়। ওয়াহ্হাবি কোরানকে ঐশীবাণী বলে স্বীকৃতি দেন, তাঁর মতে, কোরান অন্য কিছু নয় শুধুই কোরান। এই যুগের মুসলমানদেরকে তিনি তাদের অধর্মীয় অসার দম্ভ দেখানো পোশাক, ভোজন, বিলাসিতা ও ধূমপানের জন্যে তিরস্কার করেন। তিনি তাদেরকে

> জিজ্ঞেস করেন মুহাম্মদ (সা.) রেশমী পোশাক পরিধান করতেন কিনা, কখনও তিনি কি তামাক সেবন করেছেন বা পাইপে ধূমপান করেছেন কিনা? তাঁর সমস্ত অনুসারীরা অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করেন, শুধু তাঁরা নিজেরাই নন, তাঁদের অশ্বরাও কোনো সোনা বা রূপা ব্যবহার করে না; তাঁরা ধূমপান থেকে বিরত থেকেছেন, তাঁরা বলেন, ওটা মানুষকে হতবুদ্ধি করে ও উন্মত্ত করে তোলে। তারা গীত-বাদ্য, নৃত্য এবং সব ধরনের খেলা-ধূলাকে বর্জন করে, আর সর্বাধিক পরিপূর্ণতার ভিত্তিতে মিলেমিশে বসবাস করে (নিদেন পক্ষে তাদের দলীয় সর্দারের উপস্থিতিতে)।

যদিও আল্-ওয়াহ্হাবের মূখ্য নিশানা ছিল শিয়া ও সুফি সম্প্রদায়, তথাপি তাঁর মতে সুন্নি ইসলামের প্রচলিত অনেক রীতিনীতি ও প্রথাগুলিকে উদ্ভাবনী বিষয় হিসেবে ধিক্কার দেয়া হয়েছিল যা পৌত্তলিকতায় ফিরে যাওয়ারই নামান্তর হিসেবে ধরা হয়েছিল। সেগুলো ধর্মীয় একাত্মতার বহুবিধ ধারা সম্বলিত ছিল যা শতাব্দী-কাল ব্যাপী গড়ে উঠেছিল এবং নবীর বিভিন্ন অনুশাসনকে সংযুক্ত করেছিল, যার মধ্যে ছিল পবিত্র সমাধিস্থল জিয়ারত বা সেখানে নামায পড়া, অথবা তাদের সমাধিতে স্তম্ভ রচনা করা, নবীর জন্মদিন উদযাপন অথবা ধর্মীয় ব্যক্তিদের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে উৎসব উদযাপন এবং শিন্নী বিতরণকরণ। একইসঙ্গে প্রাত্যহিক বহু ক্রিয়া-কর্ম পাপ কর্ম হিসেবে ঘোষিত হয়, সেগুলোর মধ্যে ধূমপান বা সিদ্ধি সেবন, গীত-বাদ্য, নৃত্য, ভাগ্য-গণনা, রেশমি পোশাক পরিধান, তসবিহ্ জপ করা বা তাবিজ ব্যবহার করা। দাড়ি কামানো, পায়ের গোড়ালি ঢেকে যায় এমন পোশাক, তসবিহ্ গণনার মাধ্যমে আল্লাহ্র নিরানব্বই নাম জপ করা এবং অন্যান্য অনুরূপ অনুশীলন অনৈসলামিক হিসেবে ঘোষিত হয়।

তবে রক্ষণশীলতা তুলনা করতে এটি এতদূর গিয়েছিল। ওয়াহ্হাবি বিধান অনুসারে যে মুহূর্তে একজন মুসলিম ওয়াহ্হাবি একেশ্বরবাদের ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হতো তখন থেকে সে অবিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হতো–আর যে মুহূর্তে সে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ত তখন থেকে তার জান-মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। একতার পুস্তক, কিতাব আল তৌহিদে বর্ণিত আছে, ‘কোন সন্দেহ বা দ্বিধা একজন মানুষকে তার জীবন ও সহায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও বেদখল করে।’

যখন তাদেরকে তাদের ধর্মের নাম জিজ্ঞেস করা হতো, মুসলমানরা প্রায়ই নিয়ত একইরূপে ‘দয়াশীল’ ও ‘সহানুভূতি সম্পন্ন’ বিশেষণে আল্লাহ্কে ভূষিত করে তাদের ধর্মকে শান্তির ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করত। যেমন প্রার্থনা কালে পবিত্র কোরানের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে। কোরানের আরবি উত্তমরূপে

একটি প্রতীকী ভাষা, অতি সূক্ষ্ম তারতম্যপূর্ণ, দ্ব্যর্থবাহী, আর শব্দসমূহ আনতি সহকারে উচ্চারণের কারণে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। আপাত পরস্পর বিরোধী শব্দ সম্বলিত বিধায় কিতাবটি বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কোরান ও হাদিসের নিরঙ্কুশ ব্যাখ্যায় আল-ওয়াহ্হাবের ধর্মীয় শাস্ত্রে বিবৃত সংজ্ঞা ইসলামী আইন বিধানের সাথে সঙ্গতি ও সমতা রেখে রক্ষা করে কয়েক শতাব্দী ধরে আহরিত জ্ঞান ও দৈব বাণীসমূহের বিভ্রান্তিকর ও স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্যসমূহ যা এক ঊষর ভূমিতে সপ্তম শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল সেটিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সভ্যতার প্রতিরূপ (মডেল) হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে ধর্মীয় জীবনের পথ নির্দেশনা করান। এবং এই পুস্তকের বিভিন্ন নির্ধারিত অধ্যায়ের পঠন এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধর্মীয় নির্যাতন ও নির্দয়ভাবে হত্যা করার ইঙ্গিত রয়েছে সেগুলিকে মূখ্য বিষয় হিসেবে আলোকপাত করে, আল-ওয়াহ্হাবের কোরানের মূল বাণীসমূহ যেমন ক্ষমা, সহনশীলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যকে উপেক্ষা করে।

বাছাইয়ের কেন্দ্রস্থলে ছিল আল-ওয়াহ্হাবের জিহাদের ব্যাখ্যা, ইবনে তায়মিয়ার নেতৃত্ব অনুসরণ করে, একটি ক্ষুদ্রতর যুদ্ধের শেষে তিনি মহানবী (সা.)র ঘোষণাকে অসত্য বলে বাতিল করেন আর বৃহত্তর জিহাদের শুরু করেন। এই ঘোষণা আল-ওয়াহ্হাবের 'ঐক্যের কিতাব' বা 'কিতাব আল-জিহাদ' সংগ্রামের কিতাবকে প্রণিধানযোগ্য স্থান পেতে দেখা যায় নি। এর লেখকের মতে জিহাদ হলো ইসলাম ও মুসলমান জাতিকে রক্ষা করা কিন্তু ইবনে তায়মিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যায় যে জিহাদের মর্মার্থ হলো-ইসলামের পথে যে-ই দাঁড়াত তাকে সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করে ধ্বংস করাই হলো একমাত্র লক্ষ্য। এর লেখক জিহাদের উদ্দেশ্য ইসলাম ও ইসলামি সমাজকে প্রতিরোধ—এই বিষয়টি মেনে নেন। বহু ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকদেরকে শুধরানোর একটা সুযোগ দেয়া হতো এবং পরবর্তীতে ন্যায্যভাবে সব কিছু পরিচালনা করত। যদি তারা বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানাত বা প্রতিহত করত তবে তাদেরকে হত্যা করা হতো। আর তাদেরকে কারাবন্দি করার পরেও বশ্যতা স্বীকার না করলে তাদেরকে হত্যা করা হতো। যদিও তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণী ছিল যেমন—নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং চাকররা (ও মোল্লা) এ ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় পেত। এ বিষয়ে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলত অথচ যারা পথভ্রষ্ট ও স্বধর্মত্যাগী যারা তাদের মিথ্যাচার স্বীকারে ব্যর্থ হতো, তাদেরকে কোন দয়া দেখানো হতো না। অপরপক্ষে, যারা ইমাম আল্-ওয়াহ্হাবের শিক্ষা শুনত ও অনুসরণ করত তারা ধর্ম যোদ্ধা হত বা, তাঁর নিজের ভাষায় 'আল্লাহ্র সৈনিক।' তাদের ইমামের আদেশ অনুসারে বছরে কম করে একবার জিহাদ করাটা একটি কর্মে পরিণত

হয়েছিল। এই জিহাদ শুধুমাত্র তাঁর সুনির্দিষ্ট আদেশ ও তাঁর শর্ত সাপেক্ষে সংঘটিত হতো।

রিয়াদ থেকে প্রাপ্ত আল-ওয়াহ্হাবের কিছু সংগৃহীত তথ্যকে কেন্দ্র করে অতি সম্প্রতি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে যে যে সহিংসতা আল-ওয়াহ্হাবকে উদ্ধৃত করে সৃষ্ট হয় তা তার উত্তরসূরিদের সৃষ্ট ছিল আল্-ওহ্হাবের নয়। তাঁর লেখায় দেখা যায় তিনি সর্বদাই তার প্রতিবেশীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এবং এই সুযোগগুলো ওয়াহ্হাবি গাজুদের অবাধ্যদের উপর নিপতিত হওয়ার পূর্বে তারা গ্রহণ করতে পারত, এবং যখন বিষয়গুলো তার মন মত ঘটত অথবা প্রতিবেশীরা তার চেয়ে ক্ষমতাশালী হিসেবে প্রমাণিত হতো তখন তিনি অতি সহজেই তাদের সাথে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। হিটলার একই পদ্ধতি বহুবার প্রয়োগ করেছেন। এই লেখাগুলো যা প্রদর্শন করে তা হলো ওয়াহ্হাবির মতে জিহাদের ব্যাখ্যা ইবনে তায়মিয়ার প্রথম বিশেষ ব্যাখ্যা অনুসরণের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। তাঁর দুই পুস্তকের ঐক্য ও সংগ্রাম কোনটিতেই ইসলামের শান্তি ও সাম্যের মাধ্যমে প্রচারে যে চরিত্র রয়েছে তার সন্ধান মেলে না (উদাহরণ স্বরূপ সুরা ও আয়াত সমূহ ২, ১০৯; ২, ১৯০; ২, ১৯৪; ৫, ১৩; ৬, ১০৬; ১৫, ৯৪; ১৬, ১২৫; ২২, ৩৯-৪০; ২৯, ৪৬; ৪২, ১৫; ৫০, ৩৯; ইত্যাদি)। অতীতে ইবনে তায়মিয়ার মত জিহাদিরা ও বর্তমানে কট্টরপন্থীরা যখনই জিহাদে যায় তখনই সংগ্রামের কিতাব আল-ওয়াহ্হাবের কর্তৃত্বে বর্ণিত কোরানের চারটি আয়াত সংক্ষেপে জোরেসোরে আওড়ায়। এতে বহুল উদ্ধৃত ও অপব্যবহৃত 'তরবারি আয়াত' অন্তর্ভূক্ত করে, সাধারণত আংশিক উদ্ধৃত হতো। 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ বিগত হলে, যখনই যুদ্ধে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে, তখনই বধ করবে; তাদের বন্দি করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ মুক্ত করে দবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' এই চার আয়াতের কোনটিতেই উল্লেখ নাই যে ইসলামের নবী (সা.) এই বাণীটি আক্ষরিক বক্তব্যে প্রদান করেছেন। তরবারি সম্পর্কিত আয়াতের বক্তব্যে, কোরানের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ ব্যাখ্যা করবেন যে পূর্ণাঙ্গ সুরাটি মূলত বিধর্মীদের সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধি ভঙ্গের কথা বোঝায় কেন না অন্য ভাষ্যটি এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ার কারণে হয়তো অর্থের গরমিল দেখা দিতে পারে। যেহেতু আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও বিশেষ বিশেষ সুরাতে বিবৃত বক্তব্যগুলি যা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দেয়া হয়ে থাকে, তা মূলত মৌলবাদের মর্মবাণী। এক্ষেত্রে মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি বা হিন্দু সকলের ক্ষেত্রেই বিষয়টি প্রযোজ্য।

১৭৬৬ সালে মুহাম্মদ ইবনে সৌদ নামায পড়া অবস্থায় গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হলে তার পুত্র আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ উত্তরাধিকারী হিসেবে আমির হন। নতুন আমির তার পিতার সংগ্রামের সফলতার উপর ভিত্তি করে নিজেকে দাঁড় করান এবং তাঁর শ্বশুরকে গড ফাদার হিসেবে গণ্য করা হয়। এমন কি যে সমস্ত জীবনীগ্রন্থসমূহ ইবনে তায়মিয়ার পুত্র পবিত্র গুণাবলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাদের মাধ্যমেও দেখা যায় ইমাম ওয়াহ্হাব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রসার করায় মূখ্য নীতি মনে করতেন। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন করেন যেখানে বেদূঈনরা বল্লম আর ভোজালি ব্যবহার করত এবং তিনি নিজে এই নতুন অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেয়ার ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রত্যেক জিহাদির জন্য একটি ফরমান বা আদেশও জারি করেন যে, যে জিহাদি যুদ্ধে মারা যাবে সে হবে স্বর্গের (বেহেশত) দ্বার-রক্ষী। ইসলামে শহীদের ধর্মমত ঐতিহ্যগতভাবে শিয়া সম্প্রয়দাভুক্ত, যা শুরু হয়েছিল কারবালায় ইমাম হুসেনের শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে ওয়াহ্হাবি ব্যাখ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হলে বিষয়টি যোদ্ধাদের সার্বিক প্রণোদনা দেয় আর তারা সেটাই ভক্তিভরে কামনা করে। এভাবে আমির আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদের জিহাদিরা নিজেদেরকে জয় জয়কার অবস্থায় দেখতে পেল। যদি তারা যুদ্ধে বিজিত হতো তবে তারা পার্থিব লাভ পেত; যদি তারা পরাস্ত হতো তবে তারা সরাসরি স্বর্গে চলে যেত।

পার্বত্য এলাকার পাঠানদের মত বেদূঈনরা সব সময়ই তাদের সুবিধার্থে প্রতিকূল পরিবেশকে তাদের অনুকূলে আনার দক্ষতা দেখিয়ে থাকে। লুই দ্য কোর‍্যানসেজ লিপিবদ্ধ করেন–

> 'ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিষাদ ওয়াহ্হাবিদের নিত্য সঙ্গী। তাদের যুদ্ধে কোন শৃঙ্খলা নেই, তারা সর্বদা তাদের শত্রুকে এমনই এক ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধে লিপ্ত করে যাতে করে সে যুদ্ধে সকল উৎসাহ উদ্দীপনা ও মনোবল হারিয়ে ফেলে। এভাবে যুদ্ধ করার থেকে তারা লুণ্ঠন করত বেশি। তারা যুদ্ধে প্রথম বাধার মুখে সরে দাঁড়াল এবং ধাবমান শত্রু বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার লক্ষ্যে দ্রুত পলায়নে নিবৃত্ত হলো। তারা এই পন্থা সর্বাত্মকভাবে অবলম্বন করতে থাকে—শত্রু দেখলে দ্রুত পশ্চাদপসারণ এবং তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৌশলে আত্মরক্ষার প্রয়াসে নিবৃত্ত হয়। এভাবে তারা তাঁর উপর গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়েছিল, আর তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে অতর্কিতে আক্রমণ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে শত্রুপক্ষের সব কিছু ধ্বংস ও হত্যার মাধ্যমে প্রকৃত বিজয় অর্জিত হয়।

এভাবে নবীন আমির তার [illegible] নিজ যুদ্ধের আঘাত ও পলায়ন রণকৌশল উন্নত করেছিল এবং তার সৈনিকদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধের নতুন

মাত্রা সংক্রমিত করেছিল। তাদেরকে নিজেদের লব্ধ শিক্ষা ও কৌশলে আরও উত্তম প্রয়োগের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। 'ইবনে সৌদ যুদ্ধবাহন সমুন্নত করার জন্য দুজন সৈনিককে বাছাই করেছিলেন। তিনি কেবল সেনাদের জন্যই খাবার দেন নাই, উটদের জন্যও খাবার দিয়েছেন যাতে তারা প্রত্যেকে বিশ দিনের ভ্রমণে খাবার রসদ বহন করতে সক্ষম থাকে...। দুই আরোহী দুটি ছাগলের চামড়া ব্যতীত আর কিছু বহন করে নি, একটি পানিতে পূর্ণ ছিল, অন্যটি ছিল যবের ময়দায় পূর্ণ। এই-ই হচ্ছে তাদের কয়েক সপ্তাহের খাদ্য সামগ্রী। এরপর থেকে তারা মরুভূমি পরিবেষ্টিত অপ্রস্তুত শত্রুপক্ষের উপরে অতর্কিত হামলা চালায়।' সকল যোদ্ধারা ছিল ভাড়াটে উপজাতীয়। এই যোদ্ধারা ছিল উপজাতীয় সৈন্য সংগ্রহকারী, তবে আমিরের ব্যক্তিগত আদেশে সর্বোত্তম তিন শ' সেনা বাছাই করা হয় একটি স্থায়ী সেনাদল গঠনের লক্ষ্যে। তাদেরকে দ্রুতগামী অশ্ব, অস্ত্র-শস্ত্র, বিজ্ঞ ও পরামর্শদাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়, আর তারা ওয়াহ্হাবি গাজু বা যুদ্ধদলের অগ্রগামী সেনানী হয়ে যায়।

তাঁর আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা বৃদ্ধ হয়ে পড়লে আমির আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ আরো বেশী কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করে তার শ্বশুরের চিরবর্ধিষ্ণু নিষ্ঠুরতা দিয়ে কট্টরপন্থী শিক্ষা চালু করেন। বার্ক হার্ডটের মতে, প্রত্যেক অ-ওয়াহ্হাবিদেরকে দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হতো; আর তারা যদি সেটা করতে অস্বীকার করত তবে তাদেরকে মেশরেকিন বা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলে দোষারোপ করা হতো। 'ওয়াহ্হাবি (যেমন ইবনে সৌদ নিজেকে প্রধান হিসেবে জোরে সোরে জাহির করে।) তাঁর ধর্ম প্রচার করেন তরবারি দেখিয়ে। যখনই তিনি কোন বিধর্মীদের এলাকায় আক্রমণ করতেন তখনই তাদেরকে তিনবার সাবধান করতেন, আর তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করতে আহ্বান জানাতেন, তৃতীয় সমনের পর তিনি ঘোষণা করতেন যে ক্ষমার সময় শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি তাঁর সেনাদলকে লুণ্ঠন করতে ও তাদের খেয়াল-খুশি মত গণহত্যার আদেশ দিতেন। যারা তাঁর সেনাদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হতো। এই নিষ্ঠুর প্রথা ওয়াহ্হাবিদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর নৃশংস ধর্মান্ধতাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল যা তাদের প্রতিপক্ষকে ভীত করে তুলত।' ডি কোর‍্যানসেজ ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুর প্রথার ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত করেন :

> যখন তাদেরকে মোটেও আশা করা যায় নাই, ঠিক এই মুহূর্তে ওয়াহ্হাবিরা আরব গোত্রদের সম্মুখীন হয় তাদের মাঝ থেকে আব্দ আল-আজিজ সৌদের একজন প্রতিনিধি একহাতে কোরান ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁর বাণী ছিল বলিষ্ঠ ও সরল। 'আব্দ আল-আজিজ

> আরবীয় গোত্রের জনগণের প্রতি আহবান জানান! তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে কিতাবটি দেয়া হয়েছে সেটিকে বিশ্বাস করা। তোমরা পৌত্তলিক তুর্কিদের মত আচরণ করো না যারা আল্লাহকে মানবীয় রূপের মাধ্যমে প্রদর্শন করে [এক আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয় অবস্থার প্রতি ওয়াহ্‌হাবিদের বিশ্বাসের সূত্র] তোমরা যদি সত্যিই বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা নিরাপদ থাকবে, তা না হলে আমি তোমাদের উপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালাব।'

এই চরম অবস্থার মুখে অতি অল্প গোত্রই প্রতিরোধ করেছিল। ১৭৭৩ সালে আমিরের নেজদে প্রবলতম বিরোধীপক্ষ পরাস্ত হয় আর ওয়াহ্‌হাবিরা রিয়াদ শহরকে জয় করে নেয় যা নেজদ অতিক্রম করে পরবর্তী বিজয় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সামরিক কর্ম তৎপরতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঐ একই বছরে সত্তর বছর বয়সে আল-ওয়াহ্‌হাব ইমামের দপ্তর থেকে অব্যাহতি নেন। এটি স্বেচ্ছায় না অনিচ্ছায় সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। কিন্তু উক্ত পদটি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা অন্য কোন শীর্ষ স্থানীয় ওয়াহ্‌হাবি উলেমা থেকে কেউ গ্রহণ করে নি, যা প্রত্যাশিত ছিল, তবে আমির আব্দ আল আজিজ সৌদ উক্ত পদে আসীন হন। ইমাম শব্দটির অর্থ 'যিনি নেতৃত্ব দেন' আর সুন্নি ইসলামে পড়া হয় 'যিনি নামায পড়ান' হিসেবে। তবে এটা পরিষ্কার যে আব্দ আল আজিজ ইবনে সৌদ ওয়াহ্‌হাবি উলেমাদের আধ্যাত্মিক প্রধান হিসেবে উক্ত পদে উপস্থাপন করেন। তেমনিভাবে ধর্মীয় বিষয়ের কোন ব্যাখ্যা উপেক্ষা এবং শীর্ষ ইমামের অভ্রান্ততা সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। যাঁরা ইসলামের নবী (সা.)র পরবর্তী প্রথম দশকে ইসলামি সম্প্রদায়কে পরিচালনা করেছিলেন এবং তাঁদেরকে আল-সালাফ আল-সালিহ্ বা সর্বজন শ্রদ্ধেয় পূর্বপুরুষ হিসেবে মানা হয়। ইমাম ও আমির আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ ইসলাম রক্ষার লক্ষ্যে নিজ রাজত্ব কায়েমে নিয়োজিত হন যেমন রাজা ৮ম হেনরি খ্রিস্টান সাম্রাজ্য রক্ষার উছিলায় রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে ধর্মের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা দেন—ঠিক এই সন্ধিক্ষণে ওয়াহ্‌হাবিদের আমির ও ইমামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি বিশেষ ব্যক্তি কেন্দ্রিকতায় পরিণত হয়।

পরবর্তী দুই দশক ধরে আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ একাই পার্থিব দ্বৈত সত্তা, পার্থিব নেতা ও ওয়াহ্‌হাবি উলেমাদের আধ্যাত্মিক প্রধান হিসেবে ওয়াহ্‌হাবি বাদ সম্প্রসারণের কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর সামরিক সেনা প্রধানের দক্ষতা ও জনপ্রিয় শাসনকর্তা হিসেবে জনপ্রিয়তা ওয়াহ্‌হাবিবাদকে এতদূর নিয়ে গিয়েছিল যা তাঁর পিতা ও শ্বশুরের স্বপ্নাতীত ছিল। তাঁর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও শ্বশুর ১৭৯২ সালে ইন্তেকাল করেন, রেখে যান বিশজন বিধবা আর আঠারজন ছেলে মেয়ে যাদের পাঁচজন বিখ্যাত ওয়াহ্‌হাবি ধর্মের তাঁদের পালাক্রমে এই বংশ আল আস শেখ হিসেবে পরিচয় লাভ করে যার প্রথা

অনুযায়ী শেখ পরিবারের সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ জন মুফতি নাম ধারণ করে বংশ প্রধানের দায়িত্ব নেন। অতএব এভাবেই ইবনে সৌদ ও আল আস শেখ ইবনে সৌদের মধ্যে বংশীয় ধারায় বর্তমান সময় পর্যন্ত সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবীয় ব দ্বীপে উপজাতিদের মাঝে এক সর্বজনীন পরিচিতি সৃষ্টি হচ্ছিল যা অন্যান্য স্থানীয় নৃ গোষ্ঠীর আঞ্চলিক পরিচিতি ও আনুগত্যকে ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এটা একটি আরবীয় পরিচিতি ছিল তবে একজন ওয়াহ্হাবিরও পরিচিতি ছিল, আমির ও ইমাম উভয় পদেই রূপায়িত হন আব্দ আল আজিজ ইবনে সৌদ। বার্ক হার্ডটের মতে—

> সকল আরব, তাদের শত্রুরাও তাঁর উপদেশ দানের জ্ঞানে ও তাঁর মকদ্দমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতায় সৌদকে প্রশংসা করে; তিনি ছিলেন মুসলিম আইন শাস্ত্রে খুবই বিজ্ঞ; এবং তাঁর বিচারে কঠোর, যদিও তাঁর প্রধানদের অনেকেই এই বিষয়ে বিরক্ত হতেন, তা সত্ত্বেও আরবদের বিরাট জনগোষ্ঠীর নিকট প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একটি দেশ ওয়াহ্হাবিরা যুদ্ধে জয় করে নিলেন তাঁর অধীনে তারা পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করত। নেজদ ও হেজাজের রাস্তাগুলো নিরাপদ, আর জনগণ সব ধরণের নিপীড়ন থেকে মুক্ত। মুসলমানদেরকে তাঁর ধর্মীয় পদ্ধতি গ্রহণে বল প্রয়োগ করা হয়; তবে ইহুদিরা এবং খ্রিস্টানরা কর্তৃপক্ষকে কর প্রদানের শর্তে তাদের পূর্বপুরুষদের নিজ নিজ ধর্ম অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত হয় না।

সকল বর্ণনা মতে আব্দ আল-আজিজ ব্যবহারে সুন্দর ছিলেন, চেহারায় বিনয়ী, তাঁর কেবল সুন্দর অশ্বের জন্যে অতি মাত্রায় ব্যয় করার প্রবণতা ছিল। আরবদের দৃষ্টিতে তাঁর শুধুমাত্র দুর্বলতা নিহত হওয়ার এক অসুস্থ ভীতি তাকে তাড়িত করেছিল যে কারণেই তিনি পশ্চাদভাগে নিরাপদ আশ্রয় থেকে তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। তথাপি এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে তাঁর নেতৃত্বে ওয়াহ্হাবি গাজুরা আরব ভূমির এক বিশাল অংশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল দক্ষিণে ওমান ও ইয়েমেন পর্যন্ত এবং উত্তরে বাগদাদ ও দামেস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৮০২ সালে ওয়াহ্হাবি হামলাকারী দলে নেতৃত্ব দিয়ে আমিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৌদ ইবনে সৌদ আধুনিক ইরাকে কারবালা আক্রমণ করেন। শিয়াদের সর্বাধিক পবিত্র স্থান। এখানে রয়েছে মহানবী (সা.)র দৌহিত্র ও ইমাম আলীর পুত্র তাদের প্রধান পবিত্র ব্যক্তি হুসাইনের সমাধি। লেফটেন্যান্ট ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন লিখেছেন, ‘এর সব কিছুই তারা লুণ্ঠন করেছিল এবং একইভাবে হোসেনি সমাধিসৌধ তাদের লোলুপ থাবা থেকে নিস্কৃতি পায়নি এবং এরই

সাথে অভিনব নৃশংসতার নজির সৃষ্টি করে পাঁচ সহস্রাধিক মানুষ হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে নি। এই বিষয়টি যা তুর্কীদের, আরবদের ও পারসিকদের মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং বিশেষ করে তুর্কীদের মাঝে এক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য পাঠিয়ে অন্তত হোসেনি সমাধিসৌধকে সামান্যতম সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্রচুর পরিমাণে লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে নেয়া হলো, আমির ও ইমাম তাঁর নিজের জন্যে এক পঞ্চমাংশ নিয়ে বাকিটা তার ওয়াহ্হাবি সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন, একক অংশ দেয়া হলো প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যকে আর দ্বিগুণ অংশ দেয়া হলো প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্যকে।

১৮০৩ সালে আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ মক্কাধিপতির নিকট থেকে অনুমতির আবেদন করেন যার মাধ্যমে তাঁকে ইসলামের পবিত্রতম সৌধ কাবায় হজ্জ পালনের বিষয়টি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চাওয়া হয়। 'এ মেমোর‍্যাণ্ডাম অন দ্য সেকট অব ওয়াহ্হাবিস' গ্রন্থের লেখক টি.ই. র‍্যাভেনশ এর মতে, 'তারা অনেক শেখ ও অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে হত্যা করে যারা ওয়াহ্হাবিবাদকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা মোহাম্মদী সাধু-সন্তদের স্মৃতিফলক লুণ্ঠন করে নেয় যারা ওখানে প্রবেশ করেছিল। আর তাদের ধর্মোন্মত্ততা প্রসিদ্ধ মসজিদকেও রেহাই দেয়নি, যেখানে তারা প্রচুর সম্পদ ও দামী আসবাবপত্র লুট করে যেগুলো ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মোহাম্মদী রাজপুত্রবৃন্দ তাদের অংশে দান করেছিলেন।

১৮০৪ সালে একজন ওয়াহ্হাবি সৈনিক মহামরুভূমি অতিক্রম করে হিজাজে গিয়েছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সমাধি অপহরণ করে মদিনায় তারা একটি অতি প্রাচীন সমাধিসৌধ ধ্বংস করে। পরবর্তী বছরে ওয়াহ্হাবিরা দ্বিতীয় বারের মত অনুপ্রবেশ করে এবং যারা তাদের ওয়াহ্হাবি মতধারা গ্রহণে আপত্তি জানায় তাদেরকে সহিংসভাবে বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালায়, নিজেদের জন্য এটা দাবি করেছিল। মক্কা থেকে উদগীরিত ওয়াহ্হাবিদের আঘাতের তরঙ্গ অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত অনুভূত হতো; ইসলামের নবীর পবিত্র সমাধি ফলক অপবিত্র করার ধৃষ্টতা যা কট্টরপন্থী ওয়াহ্হাবিরা স্পর্ধা প্রদর্শন করেছিল তা অধিকাংশ মুসলমানের কাছে একটি জঘন্যতম ঘৃণ্য অপরাধ। তীর্থযাত্রীদের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে ওয়াহ্হাবিরা মুসলমানদের পরিত্রাণের পথ বন্ধ করে দেয়। তবে তাদের ধর্মমতে জীবন যাপন করা ব্যক্তিদের জন্য তীর্থ যাত্রার পথ উন্মুক্ত ছিল। এই বিষয়ে যে সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শী ব্যাখ্যা প্রদান করত তাদের বর্ণনা মতে, তারা ভণ্ড নবী আদ-দজ্জালের দাবি যে পৃথিবী ধ্বংসের সূচনা শুরু হয়েছে এই দাবি ধূলিসাৎ করে দেয়, কেননা ইসলামের নবী এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

অন্যরাও আরো বেশি নিশ্চিত ছিল, এবং বিশ্বাস করত যে এটি ইসলামের পুনর্জাগরণে সহায়তা করবে। ডি কোর‍্যানসেজ ১৮১০ সালে লিখেন,

> ওয়াহ্হাবিরা তখন একক নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ যেখানে তারা ইতোপূর্বে সহস্র ছোট ছোট উপজাতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই সংস্থাটি ভবঘুরে দেহপসারিনীদের যারা ভ্রাতৃঘাতি সংগ্রামে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাদেরকে একটি মানবিক আবরণে পরিচিত করেছিল এবং এই সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে গণশক্তির প্রভাব মরুরাজ্য অতিক্রম করতে সক্ষম হয়.....। এই আরবরা তাদের অতীত গৌরবের জন্য বিলাপ করে, আর সেটা ফিরে পাবার অধীর প্রতীক্ষায় থাকে। সুতরাং সর্বদিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই বিপ্লব আমাদের সময়ে এই প্রাচ্যদেশে—যা আরবীয় পন্থায় এক বৈপ্লবিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোন সুদূর প্রসারী বিষয় নয়।

ভারতে ব্রিটিশ সরকার ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের তুর্কী শাসন কর্তারা এখন জড়িত হয়ে পড়েছেন, যদিও খুবই ভিন্ন প্রেক্ষিতে। বর্তমানে যে কেউ কম্পিউটারে সার্চ অপশনে গিয়ে 'ওয়াহ্হাব+ব্রিটিশ' বোতামে চাপ দিয়ে কোন ওয়েব সাইটের যে কোন সংখ্যায় বোতাম দাবিয়ে ইচ্ছেমত প্রদর্শন করে দাবি করতে পারবে যে আল-ওয়াহ্হাব ও ওয়াহ্হাবিদের আন্দোলনের উত্থানে ব্রিটিশদের গোপন হাত রয়েছে যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝে গুপ্তচর প্রবর হামফ্রের উদ্দেশ্যমূলক আত্মজীবনীর সূত্র ধরে অনেকে মনে করেন যে তিনি এক ছদ্মবেশে অটোমান খিলাফতের অন্দর মহলে অনুপ্রবেশ করে আল-ওয়াহ্হাবের কার্যকলাপ কৌশলে পরিচালনা করতে থাকেন। এমনই একটি সূত্র যার মাধ্যমে জানা যায় যে, 'ওয়াহ্হাবিদের ধর্মপরায়ণতার শঠতাপূর্ণ ভালবাসার পশ্চাৎপটে দজ্জাল (শয়তান) কে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব হিসেবে আবির্ভূত হয় যে যাকে ব্রিটিশরা সর্বৈবভাবে শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থ প্রদান করে চৌকস করায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন ওসমানী সাম্রাজ্য অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে ভিতর থেকে নস্যাৎ করার কাজে লাগিয়ে দিল এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহ্কেও একইভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য হাসিলে ষড়যন্ত্র করেছিল।' 'মিঃ হামফ্রে একটি কাল্পনিক চরিত্র যা জার্মানরা আবিস্কার করেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয়দের সমর প্রয়াসকে অস্থিতিশীল কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই লেখক ছিলেন খুব সম্ভবত ব্রিটিশ বিরোধী সাবেক জেরুজালেমের প্রধান মুফতি, মুহাম্মদ আল-হুসেনি, 'হিটলারের মুফতি' হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

বাস্তব অবস্থায় ব্রিটিশরা এই কাজে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন দুই ওয়াহ্হাবি গুপ্তচর সম্রাজ্ঞীর সিলফে ১৮১৮ সালের নভেম্বর মাসে গোপনীয়তা অবলম্বন করে সকল অমুসলিমদের গলা কেটে ফেলেছিল। এটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে পারস্য ও ইরাকের সমুদ্রপথে লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়াল। বোম্বের শাসনকর্তা প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ওমান ও মুসকাতে মুসলমান শাসকদের সাথে আঁতাত করে এক সশস্ত্র নৌবহর পাঠিয়ে জাহাজ চলাচল পথ শত্রুমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। ওয়াহ্হাবিদের কিছু জাহাজ উৎখাত হওয়ার পর ও একটি সমুদ্র বন্দর কামানের গোলায় ধ্বংস হওয়ার পর ওয়াহ্হাবিরা অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, এবং ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক প্রতিনিধি পারস্য উপসাগরে বুশায়ারে অবস্থান নিয়ে কৌতূহলী পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করেন।

যাহোক ওসমানী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তাদের জন্যে ওয়াহ্হাবিরা আরো ঘোরতর প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা দিল। আমির ও ইমাম আব্দ-আল আজিজ ইবনে সৌদের অধীন ওয়াহ্হাবিবাদ এখন প্রশ্ন করছে অতীতের সকল মুসলিমের উপর খিলাফতের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্বন্ধে।

ব্রিটিশ কূটনীতিক স্যার হারফোর্ড ব্রিজেস লিখেছেন, 'ওয়াহ্হাবিবাদে যদি কোন বিষয় থাকে যা অন্যগুলোর চেয়েও ভয়াবহতা হলো যা দর্শনীয় ইমামের পূত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলাম পন্থীদের তাত্ত্বিক প্রধান।' অধিকন্তু, হজ বন্ধ করার কারণে তুরস্ক সুলতানের আয়ের বড় অংশের উৎস বন্ধ হয়ে যায়, সাথে সাথে তাদের ইসলামের পবিত্রতম স্থান ও স্থাপনা রক্ষাকারীর যে দাবি তাও ম্লান হয়ে যায়।

বাগদাদ থেকে পরিচালিত আধা সামরিক অভিযানে পর্যায়ক্রমে ব্যর্থ হওয়ার পর, আলী পাশা তাঁর প্রতিপক্ষ শত্রুদের ক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা অবমূল্যায়ন করে হিজাজ পুনরুদ্ধার করে সকল মুসলমানদের জন্য হজ করার পথকে উন্মুক্ত করতে তাঁর আঠার বছর বয়স্ক পুত্রের উপর সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ১৮১১ সালে আটসহস্র মিশরীয় শক্তিশালী সেনা নেজদের ওয়াহ্হাবি উগ্রপন্থী ঐক্যবদ্ধ বেদূঈন উপজাতি যোদ্ধাদের নিকটে পরাভূত হয়। এক বছর পর মিসরীয়রা বৃহত্তর সেনাদল নিয়ে এসে ওয়াহ্হাবিদেরকে বল প্রযোগ করে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে মদিনা নগরী পূণর্দখল করে নেয়। তখন মিশরীয়রা জেদ্দায় লুটতরাজ চালিয়ে ভুল করার কারণে স্থানীয় আরব দলপতিদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল সে কারণে তারা ওয়াহ্হাবিদের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে।

আমার বই

১৮০৬ সালে আমির ও ইমাম আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ কারবালায় নামায পড়া অবস্থায় এক প্রতিহিংসাপরায়ণ শিয়ার হাতে খুন হন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র

সৌদ ইবনে সৌদ তাঁর পিতার দ্বৈত উপাধি গ্রহণ করে আগ্রাসী প্রশাসন চালাতে থাকেন ১৮১৪ সালে তাঁর জ্বরে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। তাঁর নিজ পুত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে সৌদ উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতার ধারায় যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন না, আর ১৮১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রিয়াদের পশ্চিম দিকে সাতদিন ধরে এগিয়ে আসা মিশরীয়দের চূড়ান্ত যুদ্ধে ওয়াহ্হাবিদের তাদের মিত্রবাহিনীসহ পরাজিত করে বিজয় লাভ করেন। তাদের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন গিওভানি ফিনাতি নামে এক ইতালীয় দুঃসাহসিক অভিযানকারী ইসলামে দীক্ষা নিয়েছেন এই মর্মে দাবি করে মুহাম্মদী নাম গ্রহণ করত। মুহাম্মদ আলী পাশার সেনাদলে সেনাকর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। ফিনাতির বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় এই সংঘর্ষের মাধ্যমে ওয়াহ্হাবিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল। অধিকাংশ আরব যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল ওয়াহ্হাবি ধর্মমতের প্রতি তাদের সমর্থন ছিল ঢিলেঢালা তথাপি মিশরীয় ও ওসমানীদের যাদের তারা তাদের ভূমির উপরে হানাদার হিসেবে চিহ্নিত করেছিল তাদের প্রতিহত করার জন্য তারা নিরুপায় ছিল। প্রাথমিকভাবে যুদ্ধ তাদের পক্ষে গিয়েছিল, কিন্তু অতি সুশৃঙ্খল মিশরীয়দের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুপরিকল্পিত প্রস্থান তাদের প্রতিপক্ষদের নিজেদের সুরক্ষিত অবস্থা থেকে নিচে নেমে আসতে প্রলুব্দ্ধ করে সরাসরি মিশরীয় অশ্ববাহিনীর মুখোমুখি আনয়ন করেছিল। ওয়াহ্হাবিদেরকে যুদ্ধ করার জন্য একা ফেলে তাদের মিত্রবাহিনীর অনেকেই পেছনে দৌড়িয়ে পলায়ন করে। ফিনাতি লিপিবদ্ধ করেন, 'ওয়াহ্হাবিদের সাহসই আমাদেরকে প্রতিহত করেছিল; তবে শেষ পর্যন্ত এই সাহস তারা হারায় নি, ঐরকম বেপরোয়া অবস্থায়ও যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল। শত্রুপক্ষের নিধনযজ্ঞ ভয়ানকরূপ ধারণ করেছিল, সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের শিরহীন ধড়।'

মিশরীয় পাশা তাঁর কাছে আনীত প্রতি মাথার জন্য ছয়টি করে রৌপ্য মুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব দেওয়ায় তাঁর হেড কোয়ার্টারের সম্মুখভাগ মানব মাথার পিরামিডে পরিণত হলো। তিন শ কয়েদীকে ধীরে ধীরে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল যাতে করে তারা দলে দলে মক্কা ও জেদ্দার দ্বারপ্রান্তের মাঝামাঝি দশটি সারিতে উপস্থিত হতে পারে।

মিশরীয়রা ১৮১৮ সালে দরিয়াহ্তে আমির ও ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে সৌদের নেতৃত্বে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট ওয়াহ্হাবিদের উপর অবরোধ আরোপ করেছিল। প্রতিরোধকারীরা কয়েক মাস যাবত নিজেদের অবস্থায় অনড় ছিল কিন্তু খাদ্য সংকটে অনাহারের কারণে অবশেষে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

ইব্রাহিম পাশা যেখানে যত জনকে পেলেন তাদের সমস্ত সন্দেহভাজন ওয়াহ্হাবি উলেমাদের ধরলেন। সব মিলিয়ে পাঁচ শ। আর তাদের প্রধান

মসজিদে জড়ো করে তিনদিন যাবত তিনি ধর্মীয় বিতর্কে সভা পরিচালনা করে তাদের ধর্মমতের ভুল শুধরানোর চেষ্টা করেন। চতুর্থ দিনের অবসানে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় তিনি তাঁর প্রহরীদেরকে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদেরকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। পর্যটক উইলিয়াম পলগ্রেভ-এর ভাষায়, 'ঐ হত্যাকাণ্ডের ফলে দরিয়াহ্‌র মসজিদ একটি ওয়াহ্‌হাবি ধর্মমতের রক্তাক্ত সমাধিসৌধে পরিণত হয়।' আব্দুল্লাহ্ ইবনে সৌদ ও পরিবারের আরও পাঁচজন পুরুষ সদস্যকে বন্দি হিসেবে প্রথমে কায়রোতে আর তারপরে কন্সটান্টিনোপলে পাঠান হয় যেখানে, 'তাঁদেরকে রাজপথে তিনদিন কুচকাওয়াজ করানোর পর তাঁদের শিরোচ্ছেদ করে তাঁদের শরীরগুলোকে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা হয়।' পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে মদিনায় পাঠিয়ে এক গৃহে বন্দি রাখা হয়। এক বছর পরে রিয়াদে ওয়াহ্‌হাবিদের দৃঢ় অবস্থান বেদখল হয়ে যায় এবং আব্দ আল আজিজ ইবনে সৌদের দূর্গ যুদ্ধ বিধ্বস্ত করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়।

ওয়াহ্‌হাবি সাম্রাজ্যের ধ্বংস তাদের মুসলিম সমসাময়িকদের দ্বারা সন্তুষ্টি ও আয়াসের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্বনামধন্য হানাফি পণ্ডিত মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবিদিন ওয়াহ্‌হাবিদের কূট বাক্য প্রয়োগ করে কঠোর সমালোচনায় মুখর ছিলেন। 'তিনি নিজেকে একজন হানবলি বলে দাবি করেন, কিন্তু তার চিন্তা ছিল যে তিনি একাই মুসলিম, আর সবাই মুশরিক (বহু ঈশ্বরবাদী)। এই বেশে তিনি বলেন সুন্না (যারা সুন্নি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে) হিসেবে আহলকে হত্যা অনুমোদনীয়, যতক্ষণ আল্লাহ্ ১২৩৩ হিজরি (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ) বর্ষে তাঁর লোকজনকে মুসলিম সেনাবাহিনীদের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন।

বুশাইয়ের লেফটেন্যান্ট বার্ডেন ও ব্রিটিশ মিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ আরো বেশি বাস্তবসম্মত পন্থা অবলম্বন করেন। ওয়াহ্‌হাবি ধ্বংসের সাথে সাথে উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থায়ীত্বের হুমকি দূরীভূত হলো। বার্ডেন তাঁর প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদের শেষাংশে উপসংহার টানেন, 'এভাবে উত্থানপতন আশা করা যায় কখনো উত্থান হবে না—ওয়াহ্‌হাবিদের অসাধারণ ধর্মমতের।'

অধ্যায় তিন

ইমাম মাহ্‌দির আবির্ভাবের মিথ্যে প্রত্যাশা

> ১৮২০ সাল থেকে ভারতের কিছু মৌলভি নিজেদেরকে বেরিলির সৈয়দ আহমদের শিষ্য বলে ঘোষণা করেন যাকে তাঁরা আমিরুল মোমিনীন ঈমান হোমান (বিশ্বাসীদের প্রধান ও নেতা) নামে অভিষিক্ত করেন। এই দেশে ওয়াহ্‌হাবি ধর্মমত প্রচার শুরু করেন। তাঁরা সাধারণের কাছে প্রচার করেন যে হিন্দুস্তান এখন দারুল হারাব (অথবা কাফিরদের দেশ) সুতরাং সকল ভাল মোহাম্মদীর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছে।
>
> মৌলভি সৈয়দ এমদাদ আলী খান,
> এ্যান এপিটোম অভ দ্য হিস্ট্রি অব দ্য ওয়াহ্‌হাবি 1871

১৮০৪ সালে মদিনায় আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদের জিহাদিদের দ্বারা মহানবী (সা.)র স্মৃতিস্তম্ভের পবিত্রতা নাশ আর পরবর্তীতে মক্কা দখল মুসলিম উম্মাহ, একই সঙ্গে সুন্নি আর শিয়া সম্প্রদায়কে আঘাত করে। কিন্তু সুন্নিদের মধ্যে কিছু গোঁড়া ব্যক্তিবর্গ ছিল যারা ওয়াহ্‌হাবিদের প্রতিমাভঙ্গ পবিত্রকরণ ও পুনরুদ্ধারকরণের কাজ হিসেবে দেখল। তাদের মধ্যে সুমাত্রার একদল তীর্থযাত্রী মক্কায় উপস্থিত ছিল ১৮০৩ সালে ওয়াহ্‌হাবিদের হানা দেয়ার সময়। দুই বছর পর তাদের জনৈক ফকির মিসকিন বিন রহমতুল্লাহ্ নামে নেতা জাভার কেন্দ্রস্থলের উপরাংশে ওয়াহ্‌হাবিবাদ প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের গোত্রীয়রা প্রাথমিকভাবে তাঁর এই ধর্মান্তরকরণ অভিযান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাধা সৃষ্টি করে তাঁদেরকে অন্তরীণ করা হয়েছিল। তৎকালীন জনৈক মুসলিম পণ্ডিতের মতে, 'তারা জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন ও দস্যুতা করে নেয় আর অপমানিত করে 'ওর‍্যাং কায়াদের'কে (গুরুত্বপূর্ণ জনগণ) তারা হত্যা করে উলেমাদের ও 'ওর‍্যাং ইয়্যাং সারডিক' (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ)কে। তারা বিবাহিত মহিলাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে

তাদের লোকজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিত এবং তাদের মেয়েদেরকে উপপত্নী হিসেবে বন্দী করে রাখত। তারপরেও তারা তাদের কার্যকলাপকে বলত, 'এই কার্যকলাপগুলো করা হচ্ছে সঠিক ধর্ম রক্ষার জন্য।' যা ১৮১১ এবং ১৮১৫ সালের দ্বিধাদ্বন্দ্বময় সময়ে পবিত্র আন্দোলন হিসেবে স্বল্পকালীন সময়ে স্ট্যামফোর্ডকে জড়িত করে দেখা দিয়েছিল। ঐ সময়ে ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলো খেলার তাস বিতরণের মত তাদের অধিকৃত দ্বীপগুলি নিজেদের মধ্যে বিলি-বন্টন করছিল। অতঃপর একে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে যে পুনর্জাগরণী উপনিবেশবাদ বিরোধী যে আন্দোলন মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে তা অবশেষে ১৮৪২ সালে দমন করা হয়।

অন্যান্য তীর্থযাত্রীরা বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয়সহ অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের স্বদেশে আল ওয়াহ্হাবের ধর্মমত ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করতে থাকে, প্রত্যেকে নিজের কায়দা-কানুনে সেটা করে। সৈয়দ আহমদ ব্যতীত তিনজন বর্ণনাতীতভাবে প্রত্যাশা করে। বেনারসের গোলাম রসুল, এবং দুজন বাঙ্গালি হাজি শরীয়তুল্লাহ্ (হাজি শব্দটি যিনি মক্কায় হজ্জ করেছেন তার নামের পূর্বে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়) এবং তিতুমীর।

তিনজনের মধ্যে গোলাম রসুল ছিলেন স্বল্প পরিচিত। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরবে হাদিসের উপর পড়ালেখায় বহু বছর অতিবাহিত করেছেন, মক্কা বা মদিনায় নয় তবে ওয়াহ্হাবিদের নেজদের অন্তর্ঘাটিতে। যখন গোলাম রসুল বেনারসে ফিরে যান তখন তিনি হাজি আব্দুল হক নাম গ্রহণ করেন আর পরিচিত হন নেজদের শেখ হিসেবে। তিনি তাঁর সঙ্গে ইসলামের মৌলিক অনুবাদও নিয়ে এসেছিলেন যা স্থানীয় ধর্মীয় পরিষদে বিরাট অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। যাহোক গোলাম রসুল হাজি আব্দুল হকের সম্বন্ধে এই বর্ণনার প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে বেনারসে তার শিষ্যদের একজন বেলায়েত আলী, এক নবীন যুবক ১৮১৮ সালে সৈয়দ আহমদের লক্ষ্ণৌ আসার পর তাঁর আগ্রহী অনুসারী হয়ে ওঠেন। এই বর্ণনা মতে, সৈয়দ আহমদের তীর্থ থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব থেকে ওয়াহ্হাবিবাদ শিক্ষা দেয়া হচ্ছিল।

বাঙ্গালি শরিয়তুল্লাহ প্রায় একই সময়ে গোলাম রসুলের মত আরবে ছিলেন। ১৮০৫ সালে তিনি হিজাজে বসবাস করছিলেন, যখন ওয়াহ্হাবিদের কাছে মক্কার পতন ঘটল তখন ১৮১৮ সালে তিনি রিয়াদে ওয়াহ্হাবিদের ঘাঁটি ধ্বংস করে সৌদি আরব ত্যাগ করে চলে যান। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি যা প্রচার করতে শুরু করলেন তা ছিল ওয়াহ্হাবিবাদেরই একটি তরলায়িত সংস্করণ, এটি ছিল অনেকটা দিল্লির ওয়ালিউল্লাহ্র পুত্র শাহ্ আব্দুল আজিজের মতই সমসাময়িক আর একটি প্রচারাভিযানেরই নামান্তর। তাদের

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও হাজি শরিয়তুল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র যে ফারায়েজির নেতৃত্বে ছিলেন তারা দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কৌশল হিসেবে ব্রিটিশ বিরোধিতার পরিবর্তে একে সমর্থন জানিয়েছিলেন, এই কৌশলটি বিশেষ সমর্থন অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে তাঁরই অনুসারী মীর নাসির আলী যিনি তিতুমীর নামে সমধিক পরিচিত, এদের প্রতি ঘোর বিরোধিতা জানান।

তিতুমীর ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন একটি চাষী পরিবারে এবং শৈশব থেকেই সহিংসতার প্রতি তাঁর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে তিনি দুর্বৃত্তায়নে জড়িত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে কলকাতায় এসে পৌছান, যেখানে তিনি একজন কুস্তিগীর হিসেবে সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি একজন প্রতাপশালী জমিদারের লাঠিয়াল হিসেবে সামন্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে তিনি ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ায় কারাবাসে দণ্ডিত হন। একজন বিচারকের মতে তিনি একজন 'দুষ্ট প্রকৃতির বেপরোয়া ব্যক্তি' ছিলেন। কারামুক্তির পর তিনি দিল্লিতে গিয়ে মুঘল রাজপরিবারের অনুল্লেখ্য সদস্যের দেহরক্ষী হিসেবে কাজ পান, আর সেই সুবাদে হজ্জব্রত পালনের জন্য তিনি তাদের সঙ্গে মক্কায় যান। সেখানে ১৮২১ বা ১৮২২ সালে তিতুমীরের সাক্ষাত হয় সৈয়দ আহমদের সঙ্গে যিনি ইতিমধ্যে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রভাব বিস্তারী চরিত্রের জন্যে রায়বেরিলিতে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

এই সময়ে সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা ১৮২১ বা ১৮২২ সালে জেদ্দায় হজ্জ করতে অবতরণ করেন—পবিত্র মক্কা ও মদিনা মিসরীয়দের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনায় হিজাজের শেরিফগণ পরিচালনা করছিলেন। যাহোক, বেঁচে যাওয়া ওয়াহ্হাবিরা আরবের মরুভূমি অঞ্চলে পুনরায় দল গঠন করেছিল। নিহত আমির আব্দাল্লাহ্ ইবনে সৌদের এক চাচা তুর্কি ইবনে সৌদ এবং মোহাম্মদ ইবনে সৌদের পৌত্র গৃহবন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে এখন তাঁর আধা-ভ্রাতার দ্বারা বিজিত দেশকে পুনরুদ্ধার করে পুনরায় ওয়াহ্হাবি শিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টায় লাগেন। রিয়াদের দূর্গকে পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ার পর তুর্কি ইবনে সৌদ মরুভূমি অঞ্চলে পলায়ন করেন আর যেখানে তিনি তাঁর পিতামহ যাদেরকে প্রতারণা করেছিলেন তাদের সাথে পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করেন।

এই সন্ধিক্ষণে যখন ওয়াহ্হাবিরা ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, অটোমান সাম্রাজ্য হুমকির মুখে পড়েছিল ঠিক এই সময় দশ নৌকা বোঝাই হজ্জ যাত্রী মক্কায় এসে উপনীত হয়। হজ্জব্রত পালন শেষে, অধিকাংশ হাজী উপকূলে ফিরে গিয়ে পুনঃনৌযোগে ভারতে ফিরে যান। যাহোক, সৈয়দ আহমদ ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহচরেরা থেকে গেলেন। তিনি মসজিদে মসজিদে

ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁর ধর্মপ্রচারের বাণী দ্রুত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে, যারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার দেশদ্রোহিতার অথবা ধর্মীয় অপব্যাখ্যার বিষয়টি গভীরভাবে অবলোকন করছিল। তারা যা শুনল তা সৈয়দ আহমদকে বিতাড়নের জন্যে যথেষ্ট ছিল, সেটি থেকে জানা যায় যে সে যা প্রচার করছিল তা ওয়ালিউল্লাহ্ ও আব্দুল আজিজকে অতিক্রম করে তার ভাবধারার অপব্যাখ্যা চাপানোর চেষ্টা করছিল। তাঁর অনুসারীদের দ্বারা রচিত কোন জীবনীগ্রন্থেই সৈয়দ আহমদের হিজাজে অবস্থাকালীন সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নেই; এবং সঙ্গত কারণেই 'ওয়াহ্হাবি' দর্শনতত্ত্ব ক্ষেত্র বিশেষে এক বদ ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছিল। এই আন্দোলনটা সর্বতোভাবে নিজেকে একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি যা আরব বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত একটি ধর্মীয় তত্ত্বের প্রসারে নিয়োজিত থাকার অতিরিক্ত কিছুর দূরভিসন্ধিপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকার বিষয়ে সন্দেহ করা হতো। এই জীবনীগ্রন্থসমূহে যা লক্ষণীয় তা হলো সৈয়দ আহমদ কতদিন ভারত থেকে দূরে ছিলেন এবং তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, এই বিষয়ে তারা কতটা মতভেদ করেছিলেন। প্রথম শিষ্য শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল ঘোষণা করেন যে, আরবে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সব মিলিয়ে ছয় বছর যাবত তারা একসঙ্গে মক্কা ও মদিনাসহ উত্তরদিকের কন্সটান্টিনোপল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। এই ভ্রমণ তাদেরকে অটোমানদের (ওসমানী) বাস্তব দারউল-ইসলামকে দেখার আর এর সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতে ভয়ানক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ করে দেয়। যে ওয়াহ্হাবিবাদ বর্তমান ইসলামি বিশ্বকে এতটা আলোড়িত করেছে সে সম্পর্কে বেশি কিছু বলা হয় নি।

যখনই শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল এই বিষয়ে বলেন তখন মনে হয় খুব সম্ভব কমপক্ষে দুই বছরের অনুপস্থিতির পরে সৈয়দ আহমদ ভারতে ১৮২৪ সালের গোড়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি অল্প সময়ের জন্যে বোম্বের তীরবর্তী এলাকায় যান এবং নগরীর সকল শ্রেণীর মুসলিম সমাজ তাঁকে একজন দরবেশ হিসেবে ভোজে আপ্যায়ন করেছিল। আবার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হওয়ার কথা উঠেছিল যেদিন ফুরিয়ে আসছে—এবং ঠিক এই পর্যায়ে মাহ্দিতত্ত্ব সৈয়দ আহ্মদের বিস্তারিত ধর্মীয় ব্যাখ্যায় প্রথম অনুপ্রবেশ করে।

সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়ই একই বিশ্বাসে আশ্বস্ত ছিল যে এক মুক্তি দাতা ব্যক্তি মাহ্দি বা 'প্রত্যাশিত জন' নামে ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে আসবেন। তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে সকল জিহাদিদের প্রধান হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে সমস্ত দূরাচার দূর করবেন ও সৈন্যদেরকে ধর্মীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন। তারপর তিনি এবং ছোট নবী যীশু সকল ধর্মবিরোধীকে হত্যা করতে জেরুজালেমে যাবেন। তারপরে বিশ্ব তাঁর প্রতি সমর্পিত হবে যতক্ষণ না শেষ বিচারের শিঙ্গায় ফুঁ না পড়ে। অবশ্য মাহ্দির উদ্ভব বিষয়ে সুন্নি ও শিয়াদের

মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ মতভেদ ছিল। সেক্ষেত্রে তাকে পরবর্তীতে প্রথম দিক্কার ইসলামের দ্বাদশ ও শেষ ইমাম মনে করা হতো। তাঁর পুর্বসূরীদের মত নয়, এই দ্বাদশ ইমাম মারা যান নি এবং স্বর্গেও যান নি তবে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে গেছেন 'গুপ্ত ইমাম হওয়ার জন্য।' জনশ্রুতি ছিল যে পর্বতের কোন এক গুহায় তিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন। কখন তিনি পাদশাহ্ বা 'মহা রাজন' হিসেবে ধার্মিকদেরকে নেতৃত্বদানে জয়ী করবেন, সেই ধার্মিকদের আহ্বানের জন্যে রয়েছেন প্রতীক্ষারত।

মুসলিম ভারতে এই সমস্ত বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো শতাব্দীকালের চর্চায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল; যেমনটি হয়েছিল সার্বিকভাবে ইসলাম ধর্মের প্রভাবে। ষোড়শ শতাব্দীর দিল্লির সুলতানদের শেষ দশকগুলোতে বেনারসের নিকটবর্তী জৌনপুর এলাকার একজন সুন্নি মোল্লা নিজেকে ইমাম মাহ্দি বলে ঘোষণা করে বিপুল সংখ্যক অনুসারীকে আকৃষ্ট করেন। তাঁর অকালমৃত্যু তাঁর অনুসারীদের এতটুকু নিরুৎসাহিত করেনি, তারা নিজেদেরকে কট্টর মাহ্দিবাদী ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন আহমদ তাঁর 'তাবাকাত-ই-আকবরি' ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'তারা সর্বদা ঢাল-তলোয়ার ও সকল ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত, এবং নগরীতে ও বাজারে গিয়ে যেখানেই তারা ধর্মীয় নেতার আইনের ব্যত্যয় দেখত, সর্বপ্রথমে ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখিয়ে তারা এ সমস্ত বে-আইনী কাজ করতে নিষেধ করত। যদি এতে তারা সফল না হতো, তারা লোকজনকে বলপ্রয়োগ করে বা ভীতি প্রদর্শন করে তাদেরকে ঐ সকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত করত। মাহ্দি ধর্ম ভারতে আফগান নেতৃত্বের মধ্যে বিপুল সংখ্যক দীক্ষিত লোক পেয়ে যায়। তাদের সংখ্যা এতই বিপুল হয়েছিল যে, তা পরবর্তীতে এর বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং এটি ধর্মের অপব্যাখ্যা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। তথাপি পশ্চিমা পর্বত থেকে এক মুক্তিদাতা বিশাল ক্ষমতাধর ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে এবং তিনি পশ্চিমা বিশ্বের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন ও ভারতীয় সমাজের সকল সম্প্রদায়কে একত্রিত করে পুনর্জাগরিত করে তুলবেন, বিষয়টি অত্যন্ত জনপ্রিয় হচ্ছিল যেহেতু মুসলিম ক্ষমতা ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছিল।

সৈয়দ আহমদের জীদ্দশায় ১৮১০ জানুয়ারি মাসে যখন একজন মুসলিম আব্দুল রহমান সুন্নিদের একটি অংশ বোহরাদের সংগ্রহ করে একদল অনুসারী সহযোগে পূর্ব সুরাটে মান্দভি দূর্গ দখল করে নিয়ে নিজেকে ইমাম মাহ্দি বলে ঘোষণা করে তখন একটি দ্বিতীয় ও তুলনামূলক কম সফল মাহ্দিবাদের উদ্ভব দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা তখন নিকটতম শহরগুলোতে গিয়ে হিন্দুদেরকে তাদের ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান করত অথবা তাদেরকে হত্যা করত। সুরাটে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে দীক্ষিত করার জন্যে একটি লিখিত পত্র

তার কাছে প্রেরণ করা হয় আর জবাবে তিনি বোম্বে থেকে যুদ্ধের আহ্বান করে সেনাবাহিনী পাঠান। চারদল পদাতিক বাহিনী ও দুইদল অশ্বারোহী বাহিনী ১৯ জানুয়ারিতে উপনীত হয় এবং এক তরফা যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে হবু ইমাম-মাহ্‌দিসহ দুইশত বিদ্রোহী নিহত হয়। অতঃপর এই বিদ্রোহ নিকৃষ্টভাবে পরিসমাপ্ত হয়।

এভাবে ভারতে সকল শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে একটি পূর্ব প্রবণতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, ধর্মীয় সংকটের সময় প্রকৃত ইমাম মাহ্‌দির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে। এটি আমির সৈয়দ আহমদের ওয়াহ্‌হাবি প্লাটফর্মের একটি প্রতিষ্ঠিত অংশ হয়ে পড়েঃ এই বিশ্বাস যে পশ্চিমাদের রাজা ইমাম মাহ্‌দির জন্যে অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চলেছে আর অনতিবিলম্বেই তাঁর আগমন ঘটবে।

সৈয়দ আহমদ ও অন্যান্য হাজিরা জাহাজে চড়ে বোম্বে থেকে কলকাতার সমুদ্র উপকূলের দিকে রওনা দেন। অবশেষে এখানে অবতরণ করেন তাঁরা।

যে হিন্দুস্তানে সৈয়দ আহমদ ফিরে আসেন সেটি দ্রুত ব্রিটিশ কায়দা-কেতায় পুনর্গঠিত হচ্ছিল। পিণ্ডারি দস্যুদের সর্বশেষ ঘাঁটি বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এভাবে মারাঠা যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের বাহুকে দুর্বল করে দেয়া হয়েছিল এবং ভারতপুরের জাট প্রশাসন তাঁর অনধিক আশি সহস্র সৈন্য-সামন্ত সহ আগ্রার অদূরে বিখ্যাত এক দূর্গে পলায়নের উদ্দেশ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাঞ্জাব ব্যতীত আর কোথাও শিখ সম্প্রদায় রাজত্ব করছিল না। হিন্দুস্তান এখন পুরোটাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না যে সৈয়দ আহমদের দ্বৈত অভিজ্ঞান যার একটি ইসলামি পুনর্জাগরণ ও অপরটি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অনুসারীদের মাঝে আবেগঘন সাড়া ফেলেছিল। এই উৎসাহ উদ্দীপনা পাটনার মত আর কোন জায়গায় এত বেশি দৃশ্যমান হয় নি। এখানে তাঁর অনুগত সমর্থকদের নেতৃত্বে ছিলেন তিন পরিবারের ফতেহ্ আলী, এলাহি বক্স ও সৈয়দ মুহাম্মদ হুসেন।

সৈয়দ আহমদের পাটনায় দ্বিতীয় অবস্থান তাঁর আন্দোলনের অগ্রগতির সন্ধিক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। এই কথাটি সকল শ্রেণীর মুসলিম সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে হাজি ভারতকে পুনরুদ্ধারের জন্যে প্রত্যাবর্তন করেছে, ইসলামি শরিয়াতে পার্থিব বিষয় যদি না থাকে তাহলে বিশ্বাস বা ঈমানের কিছু থাকে না। তাঁর প্রথম দুই শিষ্য এখন মহানবীর ঘনিষ্ঠতম সহচরের মত তার সঙ্গে আছে, আর সৈয়দ আহমদের অনুসারীরা দেখল যে , সে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে তাঁর দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তাঁকে তাঁর আন্দোলনের আমির ঘোষণা করা হয়।

প্রতিদিন শত শত লোক তার কাছে ছুটে আসে তার আশীর্বাদ ধন্য হওয়ার জন্য আর তার আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে ধর্মীয় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে। তিনি পরিবার প্রধানের একজন মুহাম্মদ হুসেনকে তার ধর্মীয় উপ-প্রধান হিসেবে প্রথম নিয়োগ দিয়ে পাটনায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ গঠন করেন। তিনি আরও প্রধান তিন পরিবারের সদস্যদেরকে তাঁর নেতৃত্ব দানকারী সমর্থক হিসেবে আঞ্চলিক খলিফা পদে ও ধর্মীয় কর আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ দেন। এক সময় যন্ত্রপাতিগুলো যথাস্থানে সংস্থাপনের পর সৈয়দ আহমদের ধর্মীয় প্রচারাভিযান পুর্ণমাত্রায় চলতে থাকে, এই অভিযানকে তিনি স্বয়ং নাম দিয়েছিলেন মুহাম্মদের পথ (তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া)।

শাহ মুহাম্মদ ইসমাইলের বিবরণ থেকে আমরা জেনেছি যে, সৈয়দ আহমদের বহু প্রচারকের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম শিষ্যকে সৈয়দ আহমদের ধর্মমত প্রচারের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল এক ভ্রমণ শেষে লিখেন, 'শহর থেকে শহরে তিনি জিহাদের উপরে ধর্মোপদেশ প্রচার করছিলেন। একইভাবে ধর্মীয়যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে মুসলমানদের মনকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। এটিই ছিল মৌলভি ইসমাইল (শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল) প্রদত্ত জিহাদ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তেজস্বী বক্তৃতা যা শ্রবণ করে মুসলমানদের অধিকাংশই দুই বছরের জন্যে তার পক্ষে চলে গিয়েছিল।'

সৈয়দ আহমদ ও তাঁর প্রচারকেরা যে ধর্ম প্রচার করেন তা ধর্মের পাঁচটি অনুচ্ছেদের উপর ছিল প্রতিষ্ঠিত। টি.ই র‍্যাভেনশ নিম্নে বর্ণিত উপায়ে সংক্ষেপিত করেন :

১. এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস (তৌহিদের মতবাদ);
২. আধুনিক ইসলাম ধর্মের সকল ধরনের পালা-পার্বন পালনকে অস্বীকার করণ, কোরানে যে সব বিশুদ্ধ মতবাদ বর্ণিত আছে সবগুলোকে মেনে চলতে হবে (বিদাত);
৩. ধর্ম রক্ষার জন্যে সাধারণ ভাবে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের ধর্মীয় যুদ্ধের প্রতি কর্তব্য;
৪. তাদের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক বা পীরের প্রতি অন্ধ ও অবিচল আনুগত্য থাকতে হবে;
৫. এমন এক ইমামের প্রত্যাশায় থাকতে হবে যিনি কাফিরদেরকে পরাজিত করে প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে বিজয় এনে দেবেন।

দর্শনের প্রথম চার অনুচ্ছেদ নেজদে আল-ওয়াহ্হাব ও দিল্লিতে শাহ আব্দুল আজিজের প্রচারিত সুন্নি ইসলামের পূনর্জাগরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

কিন্তু শেষ অনুচ্ছেদটি ভারতে সুন্নি মতবাদের সাথে শিয়া মতবাদের সাথে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে উভয়েই আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ও শাহ্ আব্দুল আজিজ এগুলোকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করতেন না। এটিকে ধর্মের মূলমন্ত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সৈয়দ আহমদের একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রয়াস ছিল ভারতের মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার প্রচারের উদ্দেশ্য হাসিল করা। পরবর্তীতে সমালোচকবৃন্দ কিছু কারণসহ যুক্তিও আরোপ করতে সক্ষম হন যে, সৈয়দ আহমদের 'মুহাম্মদের পথ' আল-ওয়াহ্‌হাবের ওয়াহ্‌হাবিবাদের সাথে মিল ছিল সামান্যই।

প্রকৃত ঘটনা হলো যে, সৈয়দ আহমদ ও তাঁর প্রথম শিষ্য শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল আল-ওয়াহ্‌হাব-প্রসূত তৌহিদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে মক্কায় উপনীত হন। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য প্রশিক্ষিত হওয়া এবং দিল্লিতে অবস্থিত মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়ার পদ্ধতি থেকে লব্ধ জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা যা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এক শ বছর পূর্বে মক্কায় শিক্ষা হিসেবে প্রচার করেছিলেন। যখন সৈয়দ আহমদ ভারতে তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে আসেন স্পষ্টতই আরো বেশি কট্টরপন্থা, কম সহনীয় ও অধিকতর আগ্রাসী ইসলাম ধর্ম যা ছিল সরাসরি ওয়াহ্‌হাবি ধর্মমতের ছাঁচে গড়া। তাঁর প্রথম ধর্মগুরু দিল্লির শাহ্ আব্দুল আজিজের পদতলে থেকে যে ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন তার থেকে এটি অধিকতর উদ্যমশীল। যেহেতু তিনি শাহ্ আজিজের পরিবারের প্রভাবশালী কিছু সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিলেন, এবং যেহেতু তিনি হানাফি রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অনুসরণ করতে থাকেন, সৈয়দ আহমদ নিজেকে প্রসিদ্ধ হানাফি চিন্তাধারার একজন স্বাভাবিক উত্তরসূরি ও সংস্কারক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভারতে নাকশবন্দি সুফি শিক্ষাগুরু ও তাদের শিষ্যবৃন্দ এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় যাতে তারা নকশাবন্দির ধর্মীয় নীতি-আদর্শ গভীরভাবে পালন করবে, যে নীতি আদর্শ গুরুর প্রতি শিষ্যের একনিষ্ঠ ভক্তি ও আনুগত্য দাবি করে। মনে রাখতে হবে যে দুই ঘনিষ্ঠতম শিষ্য তাঁর প্রথম ধর্মগুরুর যথাক্রমে ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন। ১৮২৩ সালে শাহ্ আব্দুল আজিজের মৃত্যুর সাথে সাথে নেতৃত্বের ভার চলে যায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের হাতে, আর সে সৈয়দ আহমদের আদর্শের প্রতি না হলেও ব্যক্তিগত তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। পরিণামে আমির সৈয়দ আহমদের শিক্ষা শাহ্ ওয়ালিউল্লহ্‌র অনুসারীরা অত্যন্ত উৎসাহে ও একাগ্র চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, খুব শীঘ্রই মতভেদ দেখা দিতে লাগল, সম্ভবত বিষয়টির উপর ব্যাখ্যা ও তার উপর চাপ প্রয়োগ, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা এবং একটা ভূমিকা

নিশ্চিতভাবে পালন করেছে। এই মতভেদের পরিণামে আমরা পাই সৈয়দ আহমদের 'মুহাম্মদের পথ' আন্দোলনটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে তাদের নেতার ব্যক্তিত্বের শক্তির উপরে টিকে থাকে। এই দুই দলকে 'দিল্লিবাসী' এবং 'পাটনাবাসী' হিসেবে ধরা যেতে পারে। অগ্রজ গোষ্ঠীর অনুরক্তদের মধ্যে প্রথম দুইজন শিষ্য সুন্নি কৃষ্টি ও আচার-অনুষ্ঠানের অনুরক্ত ছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও শাহ্ আব্দুল আজিজ চরম পর্যায়ে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। শেষোক্ত গোষ্ঠীর যুবসম্প্রদায় বেলায়েত আলী কর্তৃক পরিচালিত ছিল যারা নিজেদেরকে নামে মাত্র ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের জিহাদি হিসেবে মনে করত। সৈয়দ আহমদের প্রথম শিষ্য শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল একজন 'দিল্লিবাসী' হিসেবে আবির্ভূত হয়ে আন্দোলন শুরু করেন অতি উগ্রচিন্তা ধারায় শিকার হয়ে পাটনা শিবিরে উপনীত হওয়ার পূর্বে। তাঁর নিজের বর্ণনা মতে, তিনি দিল্লির বড় জাম্মা মসজিদে প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবার ধর্ম প্রচার করতেন। যার ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার পথভ্রষ্ট যারা নাস্তিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। তবে সফলতা তাঁর সমসাময়িক ধর্মীয় পণ্ডিতদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াল, আর জনবিতর্ক দেখা দিল যে তার ধর্ম প্রচার শরিয়া মোতাবেক হচ্ছে কিনা। এটা তাঁর দলকে ভেঙ্গে অচল করে দিল আর পরবর্তীতে নগর কর্তৃপক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইলকে জনসমক্ষে ধর্মোপদেশ দিতে নিষেধ করে দিল। সেই সময় থেকে আমির সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা নিজেদেরকে "ওয়াহ্হাবি" বলে ঘোষণা করল। জনৈক পর্যবেক্ষকের মতে, 'সংস্কারকের অনুসারীবৃন্দকে তাদের বিরোধীরা বলে "ওয়াহ্হাবিবৃন্দ" যেখানে পরবর্তী দলটিকে তাদের বিরোধীরা "মুশরিকগণ" বা বিপথগামী অথবা অন্যান্য উপাস্যদেরকে ঈশ্বরের সমপর্যায়ভূক্ত মনে করত।'

১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিশেষে ভারতপুরের অতি বৃহৎ প্রাচীর কামান দেগে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং দূর্গটিকে ব্যাপক নরহত্যার স্থান হিসেবে নেয়া হয়। এটা পুনরায় নাজারিনদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রমাণ সূচক। এটা ছিল নাজারিনদের উত্তরণের সামরিক শক্তি প্রদর্শন। সৈয়দ আহমদ এখন হায়দ্রাবাদের জনৈক বন্ধুর নিকটে তাঁর ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে লিখেন : 'বিগত কয়েক বছর ধরে ভাগ্য অভিশপ্ত খ্রিস্টানদের প্রতি সদয় রয়েছে তার দুষ্ট বহু-ঈশ্বরবাদীরা জনগণের উপর নির্যাতন শুরু করেছে। যখন ইসলামের রীতিনীতি, পরবাদি পালিত হচ্ছে না তখন নাস্তিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদিতার খোলাখুলিভাবে অনুশীলন করা হচ্ছে। এই কষ্টকর পরিস্থিতি আমার হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছে এবং আমি হিজরত করার ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ধর্মের এই অধঃপতন আমার অন্তরকে লজ্জিত করে তুলেছে আর আমার মাথায় জিহাদ কিভাবে সংগঠিত করব এ চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নেই।'

আমির সৈয়দ আহমদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে মহানবী (সা.)র তরিকামত কাজ করার সময় এসে গেছে তাঁর। মহানবী (সা.) ইসলামের নামে তাঁর শত্রু এলাকা মক্কা ত্যাগ করে বিজয় শুরু করলেন এবং মদিনার দার উল-ইসলামে চলে যান। এটা সৈয়দ আহমদের উপরে ধর্মীয় বিধিবিধান পালন করা ও উপযোগী করার বিষয়টি আরোপিত, আর ব্রিটিশ অধ্যুষিত অঞ্চল ত্যাগ করে নিরাপদ ইসলাম ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চলে চলে যান যেখান থেকে তিনি জিহাদ শুরু করেন। এই হিজরা বা অপসারণের বেশ ভাল রকমের সামরিক কারণও ছিল। যা আরবের মরুভূমিতে খুব ভালভাবে কাজ করেছিল। এখানে ওয়াহ্হাবি আন্দোলন একটি নিরাপদ, বিচ্ছিন্ন কেন্দ্র হিসেবে ওয়াহ্হাবি আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে, যা ভারতে প্রয়োগ করা সম্ভব হতো না। পাটনাকে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সংগ্রহস্থল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, গোপন মোর্চা করা হয়েছিল যেখানে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের মাধ্যমে লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র রণক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগে সরবরাহ করা হত। তবে জিহাদ নিরাপদ এলাকা থেকে লক্ষ্যস্থলে পরিচালিত করতে হবে। সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল রাজস্থানে টঙ্কের মুসলিম রাজত্ব কাজে আসতে পারে। কিন্তু সৈয়দ আহমদের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক নবাব আমির খানের এক সংক্ষিপ্ত উপস্থিতি সে সিদ্ধান্ত নাকোচ করে দেয়। টঙ্ক রাজ্য কেবল হিন্দু শত্রু ভাবাপন্ন রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল না যারা ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহীও ছিল, উপরন্তু নবাবকে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি অনুগত থাকার জন্য প্রচন্ড চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল। অন্যথায় তাঁর নবাবি হারানোর ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল। তিনি আন্দোলনকে অর্থ-তহবিল ও স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে আন্দোলনে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আর নয়। শুধুমাত্র নিরাপদ স্থান ছিল আফগান সীমান্ত এলাকা—সম্ভবতঃ পার্বত্য এলাকা (বুনারের পর্বত) যেখান থেকে নবাব আমির খান উদ্ভূত হয়েছিলেন। কোন সন্দেহ নেই যে সৈয়দ আহমদের মনেও পুরনো বিশ্বাস ছিল যে ইমাম মাহ্দি পশ্চিমের রাজা হিসেবে তাঁর মুখ প্রথম প্রদর্শন করবেন।

ইমাম মাহ্দির বহু বৈশিষ্ট্য দাবি করা হলো। তিনি একজন সম্ভাব্য ইমাম ও খলিফা হিসেবে আবির্ভূত হবেন, তিনি বিবাহ সূত্রে মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তরাধিকারী হবেন। তিনি যখন তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)কে বিবাহ করবেন তাঁর স্ত্রীর সাথে তাঁর বয়সের পার্থক্য হবে চল্লিশ বছর। সৈয়দ আহমদ এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পূরণ করেন। তিনি একজন সৈয়দ, 'মুহাম্মদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত (আহমদ যার একটি সংকুচিত অংশ), আর তিনি ১৮২৬ সালে চল্লিশ বছর বয়স্ক হন। ঐ বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি তাঁর সমগ্র বাহিনীর চারশত সদস্যকে জিহাদি হিসেবে শপথ গ্রহণ করিয়ে তাদেরকে

সঙ্গে নিয়ে সফর (হিজরা) করতে লাগেন। এই বাহিনীতে তাঁর নিজ পরিবারের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাঁর নেতৃস্থানীয় দুইজন সাগরেদ ও অন্যান্যদের মধ্যে দিল্লির মৃত শাহ্ আব্দুল আজিজের সদস্যরা ছিল, আর তিন পাটনা পরিবারের কয়েকজন সদস্য যাদের মধ্যে এলাহি বক্সের চার পুত্রের তিনপুত্রই ছিল। তারা পশ্চাদপসরণ করে মধ্য ভারতের গোয়ালিয়রের মারাঠা রাজ্যে যায়, যেখানে সৈয়দ আহমদ তাঁর জিহাদে বিজিত হওয়ার জন্য হিন্দু শাসনকর্তারাও সিন্দিয়ার সমর্থন লাভের আশা করেন। তিনি মহারাজার ভ্রাতার কাছে পত্র লিখেন, 'এটা আপনার কাছে যথাযথভাবে পরিষ্কার যে দূরবর্তী ভিনদেশী এলাকার বিদেশীরা এই অঞ্চলগুলোর শাসনকর্তা হয়ে গেছে আর বর্তমানে...। তারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের রাজ্য ধ্বংস করেছে এবং মহান উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের ভূসম্পত্তি, সম্মান আর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ শূন্যের কোঠায় নিয়ে গেছে।'

সম্প্রতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে সিন্দিয়াকে কষ্টার্জিত এলাকাসমূহের এক বৃহৎ অংশকে দিয়ে দেয়ার জন্যে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। এখন তিনি নিশ্চিত যে তিনি যদি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদের আসন্ন সংগ্রামে যোগ দেন তাহলে তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন, 'যত শীঘ্র সম্ভব তত শীঘ্র বিদেশী শত্রুর কবল থেকে হিন্দুস্তানকে মুক্ত করতে।' এই বিশেষ পত্রটি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সৈয়দ আহমদ আন্তরিকভাবে একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন, ব্রিটিশ শাসনকে ছুঁড়ে ফেলার লক্ষ্যে হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখের সাথে সংগ্রামী কাজ করেছেন। কিন্তু সৈয়দ আহমদের অন্য অর্ধ ডজন বিদ্যমান পত্রাবলি যেগুলো মুসলিম শাসনকর্তাদের কাছে লেখা হয়েছিল, তার মধ্যে বোখারার আমিরের পত্র থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী বিশুদ্ধ ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন। প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আহমদ ব্রিটিশ ও শিখ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াশীল কাজ করে যাচ্ছিলেন। তবে তিনি সমানভাবে ও নির্লজ্জভাবে তাঁর সঙ্গে মুক্তিবাহিনী নিয়ে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের কাছে শির অবনত করেছিলেন। সৈয়দ আহমদের সাহসের কোন খামতি ছিল না, তবে যে স্বাধীনতা তিনি চেয়েছিলেন তা হলো ভারতে ক্ষুদ্র মৌলবাদী মুসলমানদের নিকট থেকে যেন তারা তাদের ধর্মীয় ভাবধারা চাপিয়ে দেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ের উপর।

এ ক্ষেত্রে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা সৈয়দ আহমদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার পত্রকে রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানায় চাপা দিয়ে দেন। তখন মুসলিম রাষ্ট্র টঙ্কের দিকে রওনা দেয়। সেখানে তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন নবাব ও তাঁর উত্তরসূরি ওয়াজির খান। পরবর্তী জন সৈয়দ আহমদের আদর্শের একজন সোৎসাহী অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁর সাথে আমৃত্যু পত্রালাপ রাখেন, 'আমার

নেতৃত্ব গ্রহণ করার একটি উদ্দেশ্য কিছু না শুধুমাত্র জিহাদি সেনাদের শ্রেণীবদ্ধ করে রাখা এবং মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখা। আর অন্য গোপন স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা নেই। আমার মনে ফরিদুনের (পারস্যের একজন ধর্মীয় নেতা) মুকুট এবং আলেকজান্ডার (দ্য গ্রেট)-এর সিংহাসন বার্লির (যব) দানার মতই তুল্যমূল্য। কাসরা (পারস্য মহাকাব্য শাহ্নামার একজন শাসনকর্তা)র রাজ্য এবং সিজার যে কোন দৃষ্টিতেই অনাবশ্যক ও তাৎপর্যহীন। যাহোক, আমি এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার আদেশ প্রচার করে আশা করছি যে তাঁর এই ধর্ম অপরাজেয়ভাবে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে প্রবহমান থাকবে।' এই পৃথিবীতে বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি একটি ধর্মীয় দেশ সিন্ধুর পশ্চিমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এক সময় এটিকে বহু ঈশ্বরবাদিতার ও মতভেদের পঙ্কিলতা' থেকে মুক্ত করে তিনি তারপর মূল জিহাদের কর্মযাত্রা শুরু করেন 'তারপর আমি আমার অনুসারীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করব যাতে ঐ দেশটি থেকে বহুঈশ্বরবাদিতা ও ইসলাম ধর্মে অবিশ্বস্ততা দুর করা যায়। কেননা আমার মূল উদ্দেশ্যই হচেছ ভারত আক্রমণ করা।'

মহারাজা রণজিত সিং-এর পাঞ্জাবের অঞ্চলসমূহ এড়ানোর জন্য আমির ও তাঁর হিন্দুস্তানি সহযোগীরা টঙ্ক থেকে যার মরুভূমি পার হয়ে সিন্ধু এলাকা হয়ে বেলুচিস্তান পেরিয়ে যান—পৃথিবীর কঠোরতম প্রায় ছয়শ মাইলের পথ ধরে প্রখর গ্রীষ্মের খরায় যাত্রা শুরু করেছিল। যদিও এই শেষ দুই অঞ্চলই মুসলমান প্রধানরা শাসন করেছেন, তবুও তারা কেউ তাদেরকে এক্ষেত্রে কোন সহায়তা দান করে নি। জিহাদীরা তারপর বোলান গিরিপথ অতিক্রম করে আফগানিস্তানে যায়। মুসলিম মনীষীদের জীবনীগ্রন্থানুসারে তাঁরা কাবুলে মুক্তহস্তে উষ্ণভাবে সম্বর্ধিত হন। যাহোক, বিভিন্ন প্রামাণিক তথ্যদৃষ্টে জানা যায় তাঁদেরকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যখন তাঁরা পেশোয়ার উপত্যকার খাইবার গিরিপথে আবির্ভূত হলেন তখন দেখা গেল তাঁদের সংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। একটি তথ্যে তাঁদের সংখ্যা বলা হয়েছে অনধিক চল্লিশ জন।

তবে এই পর্যায়ে সৈয়দ আহমদের ভাগ্যের মোড় ঘুরে গেল। পেশোয়ারের অন্তর্গত ও আশপাশের ইউসুফজাই ও অন্যান্য উপজাতিরা সম্প্রতি শিখ সৈন্যদের কাছে পরাজয়ের গ্লানিতে ভোগান্তির শিকার হয়। ফলত আমির এবং হিন্দুস্তানি সহচরবৃন্দ শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নিমিত্তে তারা তাঁদেরকে মিত্র বাহিনী হিসেবে সাদরে গ্রহণ করে। সর্বোপরি সৈয়দ আহমদ মহানবী (সা.)র বংশধর ও হাজি, এবং তিনি তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হন যে আল্লাহ্ সিন্ধু অববাহিকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণকে বিধর্মী

অত্যাচারীদের অত্যাচারের জোয়াল থেকে উদ্ধার করতে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। ইউসুফজাই উপজাতি ও গোষ্ঠীর বেশ কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একটি সমাবেশ আহ্বান করে আন্ত-উপজাতি সংগঠন করে হিন্দুস্তানিদেরকে আতিথেয়তা দান ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হিন্দুস্তানিরা প্রাথমিকভাবে পেশোয়ার থেকে বিশ মাইল পূর্বে নওশেরা নামক স্থানে আস্তানা গাড়ে। তবে শিগগিরি পরবর্তীতে তাদের নেতাকে স্থায়ীভাবে আস্তানা গড়ার জন্যে মহাবন পর্বতে বেশ কিছুটা জায়গা দেয়। পর্বত সম্মুখে যে সমতল ভূমিটা দেখা যায় তা বুনার পর্বতমালার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে উৎক্ষেপিত হয়েছে। এটি এমনই এক সুরক্ষিত স্থান যেখানে শিখ সৈন্য বাহিনী কখনও প্রবেশ করতে পারে নি। এখানে সৈয়দ আহমদ নিজেকে বন্ধু ও প্রশংসাকারীদের মাঝে দেখতে পান। শুধুমাত্র যে তাঁর পূর্বের পৃষ্ঠপোষক পিণ্ডারি দস্যু আমির খানের উপজাতীয় মাতৃভূমি যে বর্তমানে টঙ্কের নবাব হয়েছে সেজন্য নয়, তবে এ আবাসস্থলটি যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীরের তার থেকে তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন বেশি কিছু নয়। ১৮২৩ সালে পীরের বংশধর সাঈদ আকবর শাহ্ ইউসুফ জাইদের বিপুল লশকর বাহিনী বা উপজাতীয় সেনাবাহিনী শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়। যুদ্ধটি নওশেরার সমতলভূমির নিকটে সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে এ যুদ্ধে পেশোয়ারের পাঠানদের কয়েক শ সেনা প্রাণ হারায় তবে এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সাঈদ আকবর শাহ্ প্রধান হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি এখন তাঁর দেশের মহাবন পর্বতে আমির সৈয়দ আহমদকে শিবির গড়ার নিমিত্তে ডাকলেন। যদিও এ জায়গাটি কিছুদিন পূর্বে ব্রিটিশদের আমলে কুখ্যাত ধর্মান্ধ শিবির নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, মহাবন পর্বত তখনও ছিল (স্যার জন হেনরি বিলিউয়ের ভাষ্য মতে) 'দরবেশদের বিখ্যাত সূতিকাগার ও ধর্মান্ধদের প্রসারের উপযোগী স্থান।' এখন এটি আন্দোলনের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এটি ছিল ওয়াহ্হাবিদের দার উল-ইসলাম যেখান থেকে তারা ভারতে জিহাদ পরিচালনা করত আর এখান থেকে পশ্চিমের রাজা ইমাম-মাহ্দি তাঁর বহু প্রত্যাশিত পুনার্বিভাবের ঘোষণা দেবেন। সৈয়দ আকবর শাহ্ সৈয়দ আহমদের স্থানীয় পৃষ্ঠপোষক হন, আর তাঁর গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে খাজাঞ্চী নিযুক্ত করা হয়।

একবার পর্বতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমির এবং তাঁর দুজন ঘনিষ্ঠ মুরিদ মুসলমানদের প্রতি ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠনিকভাবে আহ্বান জানান। ১৮২৬ সালের শরৎকালের শেষার্ধে এই প্রচারপত্র হাতে হাতে বিলি করা হয় এবং এই প্রচারপত্রের অনুলিপি সীমান্তবর্তী সকল উপজাতিদের মধ্যে অসংখ্যবার

হাতে হাতে বিলি করা হয় আর পাঞ্জাবের সর্বত্র মুসলমানদের মাঝেও বিলি করা হয়। এই অস্ত্রধারণের আহ্বান নিশ্চয়ই এক চমৎকৃত আকর্ষণ সৃষ্টি করে :

> শিখ জাতি দীর্ঘকাল যাবত লাহোরে এবং অন্যান্য স্থানে প্রভুত্ব করে আসছে। সহস্র সহস্র মুসলমানকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং আরো সহস্র সহস্র মুসলমানদের উপর নিক্ষেপ করেছে স্তূপীকৃত লাঞ্ছনা। মসজিদ থেকে তারা আযান দিতে দেয় না এবং গরু জবেহ্ করা তারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়। তাদের এই অবমাননাকর স্বৈরাচার অবশেষে যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন হযরত সৈয়দ আহমদ (রঃ) ঈমান রক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ার অভিমুখে রওনা হন। সেখানে গিয়ে তিনি নিস্পৃহতার নিদ্রায় মগ্ন মুসলমানদেরকে জাগ্রত করেন এবং সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য তাদের সাহসকে উজ্জীবিত করেন। আলহামদুল্লিহ্! তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সহস্র সহস্র মুসলমান আল্লাহ্র রাহে জীবন কোরবান করতে প্রস্তুত হয়েছে। ২০শে জামাদি-উল-সানি, ১২৪২ হিজরি (২১ ডিসেম্বর ১৮২৬) বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ শুরু করে।

পুনরায় পাঠান উপজাতিদের মুরুব্বীরা যারা প্রথম তাঁর পতাকা তলে মহা সম্মেলনে একত্রে মিলিত হয়েছিল, এখন যারা তাঁর দলে পূর্বে যোগদান করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল তাদেরকেসহ তারা যোগ দিল। আমির সৈয়দ আহমদকে বর্তমানে আনুষ্ঠানিকভাবে এই আন্দোলনের ইমাম হিসেবে মেনে নেয়া হলো। আরবে, এই খেতাবকে কিছু কম করে হলেও ধর্মীয় নেতৃত্বকেই বোঝায়, কিন্তু হিন্দুস্তানে এটা তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরো বেশি গুরুত্ব বহন করে। শিয়া মতবাদের প্রভাবের কারণে ইমামকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে যার বিচারিক ক্রিয়াকর্মকে বা রায়কে ধরা হতো অভ্রান্ত। তবে এই পদের অর্থগত আরও অন্যান্য দর্পপূর্ণ কারণও রয়েছে : হানাফি আইন শাস্ত্রের বিধানে একজন ইমামই কেবল জিহাদের আদেশ দিতে পারতেন; আর এটা ইমাম-মাহ্দির চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যও। এই সময়ে সৈয়দ আহমদ যেমনটি তাঁর বন্ধুর কাছে লেখা একটি পত্রে স্বীকার করে নেন :

> 'বর্তমান বিশ্বস্ত অনুসারীবৃন্দ, সাঙ্গীদরা, বিজ্ঞ আইন পণ্ডিতগণ, মহান ব্যক্তিবর্গ ও মুসলিম জনসাধারণ—এদের সকলের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সকল জিহাদ প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে অনাস্থা আর ধর্মীয় নিষ্ক্রিয়তা দূর করণের কাজগুলো একজন ইমাম নির্বাচন ব্যতিরেকে সম্পাদিত হতো না।'

সৈয়দ আহমদ নিজেকে আমির উল-মোমিনীন বা বিশ্বাসীদের সেনাপতি বলেও ঘোষণা করেন। এটি প্রথম ভাগের খলিফাদের উপাধি প্রতিধ্বনিত করে এবং

যার মাধ্যমে ধর্মীয় যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয় যে পেশোয়ারের শেষ উপত্যকা পর্যন্ত এই যুদ্ধকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমির উল-মোমিনীন ইমাম সৈয়দ আহমদ এখন ভারতের সীমান্তের মুসলিম সমাজে নিজেকে বহু প্রতীক্ষিত মসিহ্ বা ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থাপিত করেন।

১৮২৭ সালের বসন্তকালে পেশোয়ার থেকে প্রেরিত দলবদ্ধ সৈন্যরা শিখ সৈন্যব্যূহে আক্রমণের ভেতর দিয়ে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এটা জিহাদিদের জন্য ছিল বড় রকমের বিপর্যয়। ডা. হেনরি বিলিউয়ের সংবাদদাতাদের মতে শিখরা তাদের ভূমিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ও পাল্টা আক্রমণ করেছিল। 'প্রথম আক্রমণে সৈয়দের বিশৃঙ্খল লোকজন আতঙ্কিত হয়ে বিরাট পরাজয় বরণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৈয়দ আহমদ অল্প কিছু সংখ্যক সহচরসহ রক্ষা পান। তবে তাঁদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুসারীরা তাদেরকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় এবং হিন্দুস্তানিরা মহাবন পর্বতে আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নেয়। এই বিপর্যয় সত্ত্বেও সৈয়দ আহমদ ইসলামের কঠোর অবস্থায় অনড় ছিলেন। তাঁর এই কঠোর মনোভাবের কারণে হুন্দের খাদি খান যিনি ভীষণভাবে উপজাতিদের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। আমির উল-মোমিনীন আমিরের নিকটে এটি ছিল স্বধর্ম ত্যাগের মত কাজ। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অবশিষ্ট বন্ধুদেরকে সমবেত করে একযোগে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকেন। একটা বিশৃঙ্খলা দাঙ্গার পর যাকে বিজয় বলে দাবি করা চলে না, একজন গণ্যমান্য সুফি দরবেশ, যিনি সব দিক থেকেই একজন সন্ত, তিনি এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করার উদ্যোগ নেন। তিনি ছিলেন তরুণ আব্দুল গোফুর। তৎকালীন সময়ে তাঁকে 'সাইদু বাবা' নামে সকলে জানত। তবে পরবর্তীতে তিনি পাঠানদের মধ্যে সোয়াতের সুপ্রসিদ্ধ পদ আখুন্দ উচ্চপদ অর্জন করেন। আব্দুল গোফুর হিন্দুস্তানি শিবিরে যুদ্ধবিরতির পতাকা তলে এসে যথাযথভাবে মধ্যস্থতা করে হুন্দের খাদি খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। যার ফলে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন আর তার গলা কাটা পড়েছিল—যা সৈয়দ আহমদের বিচারে ও শরিয়া মতে স্বধর্ম ত্যাগীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান ছাড়া আর কোনরূপ শাস্তির বিধান না থাকায় ঐটিই উপযুক্ত শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়।

এই কাজে তাঁর ভূমিকা রাখার কারণে আব্দুল গোফুরকে তাঁর স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করে নির্বাসনে পাঠানো হয়। আমিরের প্রচেষ্টায় ওয়াহ্হাবি মতের আইন আরোপের কারণে ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়া সমতলের কিছু গ্রামের জনগণ এখন প্রকাশ্যে অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তারা জানান দিল যে, তারা ওয়াহ্হাবি মতবাদ মানে না। এটিতেও স্বধর্মত্যাগ হিসেবে বোঝানো হয়—ওয়াহ্হাবি মতানুসারে সকল পাপের থেকে জঘণ্যতম—আর আদেশ জারি করা হয় হোটি এবং মর্দান নামক দুটি গ্রামকে পরাজয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে

লুট করা ও অগ্নি সংযোগের জন্য। এক যুগ পরে যখন হোটি মর্দানকে নতুন সীমান্ত রক্ষা স্থলের মূল হিসেবে পছন্দ করে গাইডস হিসেবে পরিচিতি দান করা হয়, এই চূড়ান্ত অবমাননার বিষয়টি এখনও স্মরণ করা হয়। এটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন পরবর্তী বছরগুলোতে অনিয়মিত সৈন্যরা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীতে যোগদান করেছিল। উত্তরের পার্বত্য এলাকাগুলোতে হিন্দুস্তানিদেরকে তাদের ঘোরতর শত্রু হিসেবে মনে করা হয়েছিল।

১৮২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউসুফজাই উপজাতিদের আশ্রয়ে অবস্থানরত আমির উল-মোমিনীনকে পেশোয়ারের গভর্নরের বিষ প্রয়োগের হীন অপপ্রচেষ্টা হিন্দুস্তানিদের সৌভাগ্য এনে দেয় যার ফলে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়। তাদের মেহমানের জীবনের উপরে এই হীন অপচেষ্টা তাদের সম্মান হানি করে, এবং পার্বত্য ইউসুফজাই উপজাতিরা তাদের ভিন্নমত থেকে দূরে এসে প্রতিক্রিয়া জানায় আর পুনরায় একত্রিত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য সৈয়দ আহমদের কাছে যায়। তারা পাহাড় থেকে শিখ সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যারা তাদের চেয়ে সংখ্যা ও গোলাবারুদের প্রাচুর্যে অনেকগুণ বেশি ছিল। পেশোয়ারের গভর্নর নিহত হন ও তাঁর সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

এই অপ্রত্যাশিত বিজয় ১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত একটি তৃতীয় আন্ত-উপজাতি সমাবেশ কর্তৃক অনুসৃত হয়, সেখানে খানদের অনেকেই ধর্মযুদ্ধে এক দশমাংশ বিশেষ কর তাদের জনগণের উপরে চাপিয়ে দিতে কেবল সম্মতই হয়নি তার সাথে তাদের জনগণের মধ্যে শরিয়ার ওয়াহ্হাবি মতবাদও প্রয়োগ করা হয়। এই একই সময়ে সমস্ত সীমান্ত এলাকা থেকে বহু অনুসারীরা এই উদ্দেশ্যে এসে যোগ দিতে লাগল, পার্বত্য অঞ্চলগুলোর শিবিরসমূহে ছয় সহস্রাধিক যোদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—যারা এই অবস্থা থেকে নিজেদেরকে বার বার পাঞ্জাব সীমান্তের জন্য অনভ্যস্ত বলে ঘোষণা ছিল মুজাহিদীন, যারা এই জিহাদে সামিল হয়েছিল তাদেরকে ধর্মযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

এই সকল মুজাহিদীনরা তাদের সত্যবাদীদের নেতা এবং ইমামের নির্দেশনায় সামরিক প্রশিক্ষণ ও ধর্মীয় শিক্ষা দুটিই গ্রহণ করে। সৈয়দ আহমদ সর্বদাই ছিলেন বিচক্ষণ খেলোয়াড়, আর যোগ্য করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে সংগৃহীত প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে। তিনি আয়োজন করলেন কুস্তি, ধর্নুবিদ্যা এবং গুলি ছোঁড়া প্রতিযোগিতার, এবং আয়োজন করেন 'কুচকাওয়াজ দিবস'-এর। এখানে তাঁর সৈন্যরা পাহাড়ি এলাকায় একে অন্যের সাথে তামাশা যুদ্ধ করত। মুজাহিদীনরা তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও ধর্মীয় শিক্ষার মাঝখানে কুচকাওয়াজের গান

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

শিখত। যে গানে তাদের নেতার গুণকীর্তন ও বিশেষত্বের প্রশংসা নিহিত থাকত। পরবর্তী বছরগুলোতে তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তারা আদালতের মামলার সাক্ষ্যে সেটা বয়ান করে। সৈয়দ আহমদের প্রথম শিষ্য শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল রচিত রিসালা জিহাদ, ধর্মযুদ্ধের সেনাবাহিনী সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। নিম্নে গানটির কিয়দংশ প্রদত্ত হল :

> কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সকল মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক।
> সকল জিনিসের জন্য উপায় নির্ধারণ কর।
> যে তার অন্তর থেকে এ যুদ্ধে চার আনা দান করবে
> পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে তার বিনিময়ে সে পাবে সাত শ গুণ।
> যে এই আল্লাহ্‌র কাজে একজন যোদ্ধাকে সজ্জিত করে দেবে
> সে পাবে একজন শহীদের পুরস্কার;
> তার সন্তানদের কবরে আযাবের কোন ভয় নাই,
> কিয়ামতের দিন সে ভাল লোক হিসেবে বিবেচিত হবে।
> কাপুরুষতা ত্যাগ করে ধর্মীয় নেতার কর্মে যোগদান কর,
> আর কাফিরদেরকে হত্যা কর।

আমি আল্লাহ্‌কে শুভেচ্ছা জানাই এই জন্যে যে হিজরি এয়োদশ শতাব্দীতে (১৭৮৬-১৮৮৬) একজন মহান নেতা জন্মেছেন (মহান নেতা হয়ে সৈয়দ আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৬ সালে)। এই নতুন বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সাড়া দিতে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা রণজিৎ সিং তাঁর সেনাপতিদের এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে আদেশ জারি করেন। এখন এক পৈশাচিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যাতে কোন পক্ষই কাউকে ছাড় দেয় নি। এ যুদ্ধে শিখদের এবং মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণার বীজ বপন করা হয় যা এখনও তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যে বিষয়ে পরবর্তীকালে ভিক্টোরীয় ইতিহাসবেত্তা স্যার উইলিয়াম হান্টার লেখেন। 'মুসলমানরা সমতল এলাকায় একাদিক্রমে হামলা চালাতে থাকে এবং যেখানেই তারা হামলা করে সেখানেই হত্যা ও অগ্নিসংযোগের ধ্বংসে লীলা সাধন করে। পক্ষান্তরে গ্রামবাসী বীর শিখরা সামগ্রিকভাবে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পার্বত্য ধর্মান্ধদের পরাভূত করে এবং পশুর মত তাড়া করে তাদের পার্বত্য নিবাসে ফেরত পাঠায়।'

উন্নতির পথে অন্তরায় হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ আহমদের মুজাহিদীন সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি পেতে থাকল। যেখানেই সম্ভব হয়েছে শিখদের সঙ্গে মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ সংঘর্ষকে গেরিলার কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ওত পেতে রাত্রে আক্রমণ করেছে। বছর দেড়েকের বিদ্রোহীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণে

নিয়ে নেয় যা পূর্ব দিকে সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। শিখদেরকে পেশোয়ার নগরীর কিছু কম করে হলেও প্রভুত্বের আসনে সংস্থাপন করে তারা চলে গেল। অবশেষে, ১৮৩০ সালের অক্টোবর মাসে পেশোয়ারের নতুন গভর্নর বিদ্রোহীদের সাথে গোপন সন্ধি করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন। যে কারণে তিনি অক্ষতভাবেই পেশোয়ার ত্যাগ করতে সক্ষম হন এবং উপত্যকার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ওয়াহ্হাবি ও তাদের সঙ্গীদের হাতে হস্তান্তর করেন।

এই বিশাল বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে সৈয়দ আহমদ নিজেকে পাদশাহ্ বা সম্রাট বলে ঘোষণা দেন, আর স্বনামে মুদ্রার প্রবর্তন করেন ও তাতে এই বাণী খোদিত করে—'ন্যায়পরায়ণ আহমদ, ধর্মের রক্ষক, যার শাণিত ভোজালির ঝলকানিতেই কাফিররা ধ্বংস হয়।' এটাকে পশ্চিমের রাজত্বভার গ্রহণ করার একটি পদক্ষেপ ধরা হয়, যেটি ছিল ইমাম মাহ্দির আগমনের দীর্ঘ প্রত্যাশা।

মোল্লা মুজাহির আলীকে তাঁর স্থানীয় খলিফা এবং পেশোয়ার নগরীর প্রধান বিচারক নিযুক্ত করার পর ঐ এলাকা মুজাহির আলী ও তাঁর সঙ্গী হিন্দুস্তানিদের ছেড়ে আসেন যাতে তারা পেশোয়ার উপত্যকার অধিবাসীদের ওয়াহ্হাবি শরিয়া মতে ধর্ম পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর নবঘোষিত পাদশাহ্ তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহচরদেরকে নিয়ে পর্বতের দূর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বিষয়টি দু'মাসের বেশি গড়ায় নি। কারণ এ ব্যাপারে পাঠানরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। উপজাতীয়রা এক দশমাংশ (টিথ) সমর কর প্রদান করে খুশি ছিল, তবে হিন্দুস্তানি বিচারক কর্তৃক কঠোর শরিয়া তাদের উপরে আরোপের ফলে শীঘ্রই তাদের পাখতুনওয়ালি উপজাতীয় আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ল। এর কারণ ছিল দুটি ফতোয়া যার একটি হলো পাঠান অভিভাবকরা তাদের কন্যাদের বিবাহে কোনরূপ পণ গ্রহণ করতে পারবে না। অপরটি হলো যাদের ঘরে বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে তাদেরকে বারো দিনের মধ্যে কন্যা সম্প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ দিতে হবে। অন্যথায় অবশ্যই সেই কন্যাকে আগত ভারতীয় মুজাহিদীনের হাতে সোপর্দ করে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দুই ফতোয়া উটের পিঠে শেষ খড়ের মত অসহনীয় পাঠানদের কাছে দেখা দিয়েছিল।

এই শেষ ফরমানটি ছিল পাঠানদের সম্মানবোধের পরিপন্থী, নঙ-ই-পুখাতনা একটি আইনি ধারা যা ওয়াহ্হাবি আইনজ্ঞ দ্বারাই উদ্ভাবিত ও সংযোজিত হয়েছিল, এতে বলা হয়েছিল যে কোন ব্যক্তিগত আঘাত বা আক্রমণ যতই ক্ষুদ্র হোক রক্ত দিয়েই তার প্রতিকার ও প্রতিবিধান করতে হবে। পুনরায় আন্ত-উপজাতিদের সভা অনুষ্ঠিত হলো, তবে এবার পাদশাহ্সহ

তাঁর সাথে সকল হিন্দুস্তানিদেরকে হত্যা করার গোপন পরিকল্পনা করা হলো। সেন্ট বারথোলো মিউয়ের 'ইউ ম্যাসাকার'-এর পাঠান সংস্করণে কোন মহিলা হত্যার ক্ষেত্রে বিষয়টি সান্ধ্য প্রার্থনা লগ্নে সম্পন্ন করতে হবে, পেশোয়ার উপত্যকা লক্ষ্য করে গড়ে কারমার পাহাড়ের মালাকন্দ শৃঙ্গ থেকে নির্দেশনার মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করা হতো। নিয়ম মাফিক পাহাড়ের উপরের আলোক সংকেত দেখানো হলে, আর এক ঘন্টার মধ্যে মোল্লা মুজহির আলী, তার সঙ্গী বিচারকবৃন্দ এবং উপত্যকার সকল হিন্দুস্তানিদেরকে তাদের জায়নামাজ থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

বুনার পর্বতের হয় অপ্রত্যাশিতভাবে না হয় অতিথি সেবকের মতিভ্রমের কারণে সৈয়দ আহমদ এবং তার ঘনিষ্ঠতম সহচররা এই সহিংস হত্যার হাত থেকে রেহাই পেয়ে সিন্ধু অববাহিকার পূর্বদিকে হাজারায় পলায়ন করল্। তখন তারা তাদের পথ উত্তর দিক থেকে কাগান উপত্যকার দিকে করে নিয়ে কাগান সাঈদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজল, যারা এখন নিজেদেরকে দেখল নানাবতীর পাঠান আইন মেনে হিন্দুস্তানিদেরকে আশ্রয় দিতে এবং তাদের প্রাণ দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট। পাঠান ইতিহাসে যা দেখা যায়, এই আশ্রয় দানের কারণে হাজারাবাসীদের বিশেষ মূল্য দিতে হয়েছিল, কারণ এই হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া পলাতক বাহিনীদের শোচনীয় অবস্থা শিখ সম্প্রদায়কে প্রত্যাঘাত করার জন্য জাগিয়ে তুলেছিল। পেশোয়ার দ্রুততার সাথে শিখ শাসনে ফিরে এলো, এবং কাগান উপত্যকায় শিখদের উপস্থিতির কারণে সমস্ত বিরোধী শক্তি নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

১৮৩১ সালের ৮ মে অবশিষ্ট হিন্দুস্তানিরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সিত্তানা ও কাগানে শেষ অবস্থান সাঈদদের বালাকোট গ্রামে সিন্ধু নদের অববাহিকায় কাগান উপত্যকাতে প্রবেশ পথকে পাহারা দেবার জন্য। দক্ষিণ দিক থেকে আগমনকারী শিখদের অপেক্ষায় তারা ওঁত পেতেছিল, তারা পরিখা খনন করেছিল এবং গ্রামের উন্মুক্ত প্রান্তর পানি দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল, যাতে উচ্চ পাহাড় থেকে নিম্নগামী অগ্রসরমান শত্রুদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া যায়। প্রায় সব দিক থেকে ঘন্টা ধ্বনিত হলে, আত্মসমর্পণের থেকে মৃত্যু বরণকে বরং তারা বেছে নিল। আমির আল-মুমিনীন, ইমাম এবং পাদশাহ্র নেতৃত্বে হিন্দুস্তানিরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শিখ বাহিনীর অগ্রগামী দলের উপর তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই যুদ্ধটি ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে কয়েক শত মাইল দূরে সংঘটিত হয়েছিল, বালাকোট যুদ্ধের অন্তিম লগ্নটি একজন আমেরিকার নাগরিক লক্ষ্য করছিল। ১৭৮৫ সালে কর্ণেল আলেকজান্ডার গার্ডনার একজন ভাগ্যান্বেষণকারী ভবঘুরে সৈনিক ও লেক সুপেরিয়রের

তীরবর্তী এলাকায় জন্মগ্রহণ করে। আলেকজান্ডার গার্ডনারের আসল উত্থান ও চলাফেরার বিষয়টি রহস্যাবৃত রয়েছে, সে আমেরিকায় বোধ করি জন্ম নেয় নি, ১৮২০ ও ১৮৩০ দশক জুড়ে তুর্কিস্তান, বড়ক শান কাফিরস্তান এবং আফগানিস্তান পরিব্রাজনের বিষয়টি সত্য নাও হতে পারে, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সে শিখ সেনাপতি রণজিত সিং-এর সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করত। শিখদের কাজে যোগদানের পূর্বে গার্ডনার কাবুলের সিংহাসন নিয়ে বিবাদী পক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়। সে নিজেকে পরাজিত পক্ষে দেখে উত্তরদিকে পামির এলাকায় পলায়ন করে। তারপরে যতক্ষণ না সে সর্দার মীর আলম খান শাসিত সীমান্তবর্তী অঞ্চল বাজোর দক্ষিণ দিক থেকে কাশ্মির, গিলগিট, চিত্রল ও কাফিরস্তানের মধ্য দিয়ে এসে পৌঁছায় ততক্ষণ ভ্রমণ করতে থাকে।

১৮৩১ সালে মে মাসের গোড়ার দিকে গার্ডনার ও একদল পাঠান উপজাতি যাদেরকে সে 'খাইবারিস (খাইবারের জনগণ) ঈমানদারদের দল' বলে আখ্যা দিয়েছিল। তারা তাদের সামরিক কাজ মীর আলম খানের অধীনে করার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল যখন 'সৈয়দ আহমদ প্রেরিত বার্তাবাহক জনৈক মুহাম্মদ ইসমাইল এসে হাজির হন ও মীরের কাছ থেকে অন্যান্য মুসলমান সর্দারদের পারিতোষিক হিসেবে কিছু অর্থ দাবি করেন।' গার্ডনার উল্লেখিত উক্ত মুহাম্মদ ইসমাইল আর কেউ নন তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদের প্রথম শিষ্য, শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল অতঃপর তিনি বেপরোয়াভাবে তার প্রথম নেতার দলছুট সদস্যদের নিজের দলে ভিড়ানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকেন। গার্ডনারের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যায় সে এবং তার সহযোগী ভাড়াটে বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সৈয়দ আহমদের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিল। তিনি বলেন, 'একটি প্রাণবন্ত আবেগ তাড়িত ভাষণের মাধ্যমে আমি মুহাম্মদ ইসমাইলকে অসভ্য ইউসুফজাই গোষ্ঠীদের আপ্লুত করেছিল। তিনি যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন তাতে তিনি কোনক্রমেই আর তার অভিভাবক সৈয়দ আহমদের দলে ফিরছেন না, যেহেতু আমি এমনই একাগ্র অনুসারীদের সংগঠিত করতে সুযোগ পেয়েছি। আমি এই ভাবেই কর্ম তৎপরতা চালাতে থাকলে যে কোন ছত্রপতি (নেতা) আমার উপস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করবে তখন সুযোগ ও পছন্দ অনুযায়ী যে কোন দলে যোগ দিতে পারা যাবে।' গার্ডনারকেও কিছু অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কেননা সে মুসলমানের ছদ্মবেশে গলায় কোরান শরীফ ঝুলিয়ে তাদের দলের সাথে মিশে গিয়ে হিন্দুস্তানিদের পক্ষে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিল।

শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল তখন তাড়াতাড়ি কাগান উপত্যকায় সৈয়দ আহমদের দলে পুনরায় যোগ দিতে গেলেন যখন গার্ডনার ও আড়াই শ পাঠান,

'সেবাই ধর্মীয় উদ্দীপনায় প্রদীপ্ত' দৃঢ়তর পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে এলো। গার্ডনারের বর্ণনানুসারে তারা তাদের পথ হারিয়ে ফেলে, যার ফলে তারা বালাকোটে এসে পৌঁছায় 'আরও ঘন্টা খানিক দেরী করে।' যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছিল এবং এটা স্পষ্ট যে যুদ্ধটি ধ্বংসযজ্ঞের দিকে মোড় নিচ্ছিল

> গার্ডনার পরবর্তীতে লেখে, 'আমি এই দৃশ্যটি ভালভাবেই স্মরণ করতে পারি যখন আমি এবং আমার ইউসুফজাই গোষ্ঠীর লোকজন ও খাইবারের অনুসারীরা এই ঘটমান লড়াই অবলোকন করলাম। সৈয়দ আহমদ এবং মৌলভি (শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল), বেঁচে যাওয়া ভারতীয় অনুসারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বেপরোয়াভাবে সমধর্মান্ধ শিখ বাহিনীর অ্যাকালিস (শিখ যোদ্ধা)দের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধরত ছিল। যখন আমার দৃষ্টি গোচরীভূত হলো মৌলভি ও সৈয়দ বাহিনীর লোকেরা শত শত অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ল। যখন সৈয়দ নিহত হয়ে পড়ে গেলেন তখন আমি কয়েক শ গজের মধ্যে ছিলাম কিন্তু আমি কোন দেবদূত (ফেরেশতা) কে অবতরণ করে তাঁর মৃতদেহটি স্বর্গে নিয়ে যেতে দেখি নি। যদিও তার অনেক অনুসারী দাবি করেছিল যে তারা স্পষ্টভাবে এই দৃশ্যটি অবলোকন করেছে।

যে পথে যুদ্ধ হচ্ছিল তা দেখে গার্ডনার তার লোকজনসহ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে গেল আর তারপরে ফিরে এসে লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিস্যা দাবি করে। সৈয়দের অনুসারীরা যারা ঐক্যবদ্ধ ছিল তাঁর মৃত্যু তাদের সেই ঐক্য ভেঙ্গে দেয় এবং অপসারণকালে বিভিন্ন অঞ্চলের দলগুলো পরস্পরের উপর লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খাইবার ও ইউসুফজাই গোত্রীয়রা কূট চক্রান্তকারীরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। যখন হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের মরিয়া হয়ে তাদের নিকটে আশ্রয় চেয়েছিল তৎপরিবর্তে তারা অনেক হিন্দুস্তানিদের নির্দ্বিধায় বধ করেছিল। কথিত আছে যে তের শ হিন্দুস্তানি ও তাদের সহযোগী বালাকোটে নিহত হয়, তবে প্রকৃত সংখ্যাটি ছিল সম্ভবত উল্লেখিত সংখ্যার অর্ধেকের কাছাকাছি।

সৈয়দ আহমদের মৃত্যু সংবাদ শিখ অধিপতি রণজিত সিং তার সৈন্য-সামন্তদের প্রতিটি কেল্লাতে বন্দুক ফায়ার করে সালাম জানিয়েছিল, এবং একই সাথে শিখদের পবিত্র নগরী অমৃতসরে আলোক সজ্জা করে উৎসব করেছিল। কি হয়েছিল থেকে যাওয়া আমির, ইমাম এবং পাদশাহ্র এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য রয়েছে যা একটির থেকে অন্যটি পৃথক। যুদ্ধের অন্তিমলগ্নে ওয়াহ্হাবি সৈন্যরা তাঁর মরদেহ নিয়ে অন্তর্ধানের চেষ্টা করলে গুলি করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। পরিশেষে একজন ওয়াহ্হাবি সৈন্য তাঁর ধারাল তরবারির আঘাতে মৃতদেহটির শিরোচ্ছেদ করে সেটি নিয়ে পলায়ন করার চেষ্টা চালিয়েছিল। তাকে আঘাত করে নিচে ফেলে দেয়া হয়েছিল, আর তার

মুণ্ডু ধড় থেকে শিখরা আলাদা করে ফেলেছিল। এক প্রতিবেদনের ভাষ্য মতে শরীরের দুই অংশকে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে নিকটবর্তী নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল যাতে তাঁর কবর কোন তীর্থস্থানে পরিণত না হয়। অপর একটি ভাষ্যে আছে শিখরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর দেহ পুড়িয়ে ফেলে আর তার কর্তিত শির পেশোয়ারে বহন করে নিয়ে গিয়ে নগরীর দূর্গ-প্রাচীরের গোলাগুলি নিক্ষেপের ছিদ্রের সম্মুখে ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

অধ্যায় চার

ইমাম-মাহ্‌দির আহ্বান

> যারা অন্যদের হিজরা এবং জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত তারা অন্তরে ভণ্ড। চলুন আমরা এটি জানি; যে দেশের প্রধান ধর্ম ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কিছু, সেখানে মোহাম্মদী ধর্ম দর্শন চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়, (সেহেতু) মুসলমানদের এই বিষয়ে একতার শক্তি গড়ে তুলে কাফিরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত আর কোন পথ নেই।
>
> ১৮৫২-৫৩ সালের সিত্তানার হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের নেতা,
> মৌলভি ইনায়েত আলীর একটি পত্রের অংশ বিশেষ।

ভারতের দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহের দার উল-ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টার করুণ পরিণতি ভারতের অন্যান্যদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে নি। তাঁর শিক্ষা সুন্নি ও শিয়া উভয় সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করে তুলল, সৈয়দ আহমদ ধর্ম সংস্কারের প্রচারকের থেকে অধিক কিছু হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সংগ্রামকে শত্রুদের মাঝে টেনে এনেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদি যুদ্ধের প্রতিটি খবরাখবর পাঞ্জাব থেকে পাওয়া যাচ্ছিল তা সকলের কৌতূহলকে উজ্জীবিত করেছিল। ১৮৩১ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর শহীদ হওয়ার সংবাদ দেশের সকল স্থানের মুসলমানরা ভীতির সাথে গ্রহণ করল। বাংলায় এটি একটি উত্তেজক প্রণোদনা যা ওয়াহ্‌হাবি বিদ্রোহ সংঘঠিত করেছিল।

স্মরণে রাখতে হবে, তিতুমীর একজন বাঙ্গালি বল প্রয়োগকারী ছিলেন, যখন সৈয়দ আহমদ ও তাঁর দল মক্কায় হজ্বে যান তখন তিনিও সেখানে হজ্ব করতে যান। দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাঁর রাজ পরিবারের চাকুরী ত্যাগ করে বাংলায় ফিরে গিয়ে কলকাতার উত্তর এবং পূর্বদিকের গ্রামগুলোতে ওয়াহ্‌হাবিদের মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই আন্দোলনের নাম তিনি

দেন, দীন মুহাম্মদ বা মুহাম্মদ (সা.)-এর পথ, যা সৈয়দ আহমদের মুহাম্মদের পথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাংলার গ্রামগুলো বিপুল সম্পদশালী জমিদারদের মালিকানাধীন ছিল। তারা তাদের ক্ষেতে কর্মরত কৃষকদের উপরে নির্যাতনের জন্য কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিল। তিতুমীর এই কৃষক অসন্তোষ তাঁর নিজের আন্দোলনের কাজে লাগিয়েছিলেন। যখন ১৮৩১ সালের গ্রীষ্মকালে বাংলায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছায় তার মধ্যে তিনি অসংখ্য ভক্তবাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাদের লম্বা দাড়ি ও অবয়ব দেখে অন্যান্য মুসলমান ও পারিপার্শ্বিক হিন্দুদের স্পষ্টতই প্রভেদযোগ্য করা যেত যেমনভাবে তাদের মহিলা সদস্যরা পর্দার অন্তরালে গিয়ে নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান ও অপরের ধর্মের প্রতি ঘৃণাবোধ এবং রক্ষণশীল কার্যের মাধ্যমে সকলের থেকে বিশিষ্টভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে তাদের নেতা নারকলবাড়িয়া গ্রামের ওয়াহ্হাবি সম্প্রদায়ের সকল সদস্যকে আহ্বান করলেন আর আদেশ দিলেন উক্ত গ্রামটিকে দীর্ঘকালব্যাপী সৈন্যদেরকে দিয়ে অবরোধের প্রস্তুতি নিতে। তারা বাঁশ দিয়ে বাঁশের সুরক্ষিত কেল্লা নির্মাণ করল, এখন যেটি তাদের স্থাপিত দার উল-ইসলাম হয়েছে।

দুই সপ্তাহ পরে তিতুমীর পাঁচ শ মুগুরধারীর প্রধান হয়ে জয়ের দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হন এবং জিহাদের নামে নিকটবর্তী একটি গ্রামে আক্রমণ করেন। তারা একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে হত্যা করে, দুটি গরুর গলা কেটে সেগুলোকে রক্তাক্ত অবস্থায় হিন্দু মন্দিরের মধ্য দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়—এই কার্যকলাপগুলো সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভের উদ্রেক করার জন্যেই করা হতো। একই সঙ্গে তাদের নেতা বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান প্রকাশ্যে ঘোষণা করল, প্রত্যক্ষরূপে এই প্রত্যাশায় যে গ্রামগুলোর সকল মুসলমানরা জেগে উঠে তাঁর আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবত নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে ঘন ঘন আক্রমণ পরিচালনা করা হচ্ছিল, এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে আতঙ্কের সৃষ্টি করা। পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেটগণ যেমনটি লিপিবদ্ধ করেন, সব কিছুই পরিকল্পিত উপায়ে করা হয়েছিল; প্রতিদিন সকালে বিদ্রোহীরা সামরিক সেনাপতির অধীনে সারিবদ্ধ হয়ে আক্রমণের জন্যে বেরিয়ে যেত, এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত লুণ্ঠন করে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে ফিরে আসত।

স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট জনৈক মিঃ আলেকজান্ডার প্রথমে অপকর্মগুলোর ধরন বুঝতে পারেন নি। বাইশজন সেপাই ও তার দ্বিগুণ সংখ্যক স্থানীয় পুলিশ সহযোগে তিনি বিদ্রোহীদের গ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন এই বিশ্বাসে

যে সন্ত্রাসীরা তার চেহারা দেখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। এতে মি. আলেকজান্ডার এতই দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে পড়েন যে তিনি তাঁর লোকজনকে বন্দুকে কার্তুজ পুরে ফাঁকা গুলি করে আনন্দ উৎসব করার আদেশ দেন। তিনি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তিনি হঠাৎ করে চার শ' থেকে ছয় শ' শত্রুসেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। যার নেতৃত্বে ছিল গোলাম মাসুম নামক এক অশ্বারোহী।

হতভাগ্য মি. আলেকজান্ডার এখন কিছু বলার চেষ্টা করল কিন্তু তাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গোলাম মাসুম তার সাঙ্গ-পাঙ্গকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দেয় আর নিজেও একটি তরবারি উঁচু করে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মিঃ আলেকজান্ডার তিতুমীরের কৃষক সৈন্যদের দ্বারা পরাভূত হওয়ার পূর্বে তাঁর ফাঁকা গুলি বর্ষণকারী সিপাইদেরকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করেন। কেবল গ্রামের দিক দিয়ে দীর্ঘ ধাওয়া খাওয়ার পর মি. আলেকজান্ডার ধূলা কাদার উপর দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে আসেন আর ভয় পেয়ে নিরাপদ স্থানে পৌছান। পনেরজন লোক নিহত হয় এবং অন্যান্যরা হয় আহত হয় অথবা জেলে বন্দি হয়, তবে এখনও কলকাতা কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছে স্থানীয় লুঘতর বিবাদ করছে। তিনদিন পরে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনৈক মি. স্মিথের হত্যাকান্ডে মি. আলেকজান্ডারের পুনরায় ভ্রম হলো, এই সময় ব্রিটিশ অশ্বারোহী নীল চাষীদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহীদের গ্রামে উপনীত হন—সে সময় সমরযানগুলো বর্তমানে ব্যবহৃত বা রুশ ট্যাঙ্ক বা ইরাকে মার্কিন হামভি সমতুল্য ধরা যেতে পারে। তারা তাদের সঙ্গে বহু সশস্ত্র প্রহরী এনেছিল, তবে এরা যতই নারকলবাড়িয়া গ্রামটির নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই তারা অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল। সংগৃহীত তথ্য মাফিক জানা যায় যে, বাঙ্গালিরা একে একে পশ্চাৎ ভাগে এসে সমবেত হচ্ছিল, যখন তারা গ্রাম সংলগ্ন বিশাল স্থলভূমিতে পৌছায়, তারা দেখল বিশ/ত্রিশজন উত্তর ভারতীয় বরকন্দাজ ব্যতীত সব স্থানীয়রা অন্তর্হিত হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হস্তিবাহিনী ঘুরিয়ে নিয়ে দুলতে দুলতে যাওয়ার সময় উন্মত্ত সহিংস জনতার দ্বারা ধাবিত হয়েছিলেন যারা অতি সত্ত্বর তাদের ধাওয়া দিয়ে তাদেরকে প্রায় ধরে ফেলার সময় পশ্চাৎ পদ বাহিনীকে সম্মুখ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বারের মত এই অবমাননাকর ধাওয়া গ্রামের উপকণ্ঠে সংঘটিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে তার বিদ্রোহীরা তাদের দাবি অনুসারে তারা নিশ্চিত হয়েছিল যে তারা স্বয়ং ঈশ্বরের ছত্রচ্ছায়ায় সংরক্ষিত। সেই কারণেই বোধ হয় তারা কাফিরদের বুলেট থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

এখন অবশেষে বাংলার গভর্নর-জেনারেল জড়িত হয়ে গেলে, এবং গভর্নর জেনারেলের নিজের আশ্বারোহী দেহ রক্ষীর সঙ্গে বারটি পদাতিক সেনাদল এবং কিছু অশ্বারোহী গোলান্দাজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। ১৭ নভেম্বরের সন্ধ্যা বেলায় এই বিশাল বাহিনী ঢাক-ঢোল-বাদ্য বাজাতে বাজাতে ও বিভিন্ন রংয়ের পতাকা উড়িয়ে কলকাতা থেকে পদযাত্রা শুরু করেছিল, এবং পরবর্তী দিন সকালে নারকলবাড়িয়া গ্রামে সুরক্ষা প্রাচীরের পশ্চাতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে জড় হয়েছিল। দশ সহস্রাধিক পেশাদারী সৈন্য নিয়ে তারা নিজেদেরকে দেখতে পেল তাদের সংখ্যার এক দশমাংশ কৃষক লাঠিসোটায় সজ্জিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত, তবে পূর্বের ন্যায় সুবিন্যস্তভাবে কুচকাওয়াজ করছে তারা। একটি খুঁটির ডগায় একজন মৃত ইংরেজকে ঝুলিয়ে পতাকার মত উড়াচ্ছে।

কেতাবি কায়দায় একটা সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয় যেখানে পদাতিকরা অগ্রাভিযান চালিয়ে বিদ্রোহীদের উপর গোলার উপর গোলা বর্ষণ করে চলেছে। এতদ সত্ত্বেও তিতুমীরের বাহিনী প্রায় এক ঘন্টা যাবত তাদের অবস্থানে অনড় ছিল। অবশেষে প্রাণে বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা তাদের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের অন্তরালে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামটিকে বেয়নেটের ডগায় ঝড়ো আক্রমণের পূর্বে অশ্বারোহী গোলান্দাজ বাহিনীর দুটি কামান অবিরাম গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছিল। তিতুমীর পঞ্চাশজনের মধ্যে নিহত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর দুই শ অনুসারীর আদালতে বিচার হয়েছিল বিদ্রোহের জন্য এগারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ও ১৩৬ জনের দুই বছর থেকে সাত বছর মেয়াদের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। তিতুমীরের দলের দ্বিতীয় সারির নেতৃত্বে থাকা গোলাম মাসুমের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। পৌরহিত্যকারী ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করেন, ‘এই লোকগুলো কোম্পানির সরকারের দিন ফুরিয়ে গেছে বলে ঘোষণা দিয়ে ‘দীন মোহাম্মদ’ নামে একটি মিথ্যে ধর্ম প্রচার করতে প্রয়াস চালায়। তাদের নেতৃত্ব দেয় দুই/তিনজন ফকির, আর শক্ত-সমর্থ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী ধর্মান্ধ যুবক যারা আমাদেরকে আক্রমণের সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হয়ে আমাদের উপরে হামলা চালায়। একটি তদন্ত হয় এবং গভর্নরজেনারেলের নিকটে প্রতিবেদন দেয়া হয় যে, ‘বিদ্রোহটা অত্যন্ত এলাকাভিত্তিক ছিল, যা আঞ্চলিক বিভিন্ন অসন্তোষ ও দাবির ভিত্তিতে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল ও সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।’

সৈয়দ আহমদের গতিশীল নেতৃত্বের অভাবে ভারতে ওয়াহ্হাবি আন্দোলন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছিল যেহেতু তাদের গোত্রীয় ব্যবধান প্রকটভাবে ভেসে উঠছিল। যেহেতু তাদের নেতা ঘোষণা দিয়েছিল যে জিহাদি কার্যক্রম একজন

ইমামের কর্তৃত্বেই পরিচালিত হতে পারে এবং যেহেতু বর্তমানে জিহাদ মৃত প্রায় সেহেতু এই ধর্মযুদ্ধ পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

যাইহোক, বালাকোটে হিন্দুস্তানি মুসলমানদের ঘুরে দাঁড়ানোর শেষ চেষ্টার প্রয়াসকালে তাদের প্রয়াত নেতা কর্তৃক মনোনীত তিন খলিফা কাশ্মিরের কূটনৈতিক কর্তব্য-কর্মে গমন করেন। তাঁরা ও আরও কিছু অন্য লোক পুনরায় সিন্ধু নদ পার হয়ে মহাবন পর্বতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়, যেখানে তাঁরা সিত্তানার সাঈদদের কাছে পুনরায় তাদেরকে আশ্রয় দেবার জন্যে আবেদন করলেন। একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো এবং তাদেরকে গ্রামের বাইরে দেবার জন্য কিছু জমি দেখানো হলো। কিন্তু পার্শ্ববর্তী পাঠান উপজাতিরা তাদের উপস্থিতিতে এতই শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে গেল যে কমপক্ষে খলিফাদের একজন মৌলভি নাসির উদ্দিন সরে যাওয়ার জন্যে এটাই যথার্থ সময় বলে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সমতলে চলে যাবার জন্যে হিন্দুস্তানিদেরকে সিত্তানার শুধুমাত্র সামান্য পরিমাণ জমিন আমৃত্যু বসবাসের নিমিত্তে কাসিম পানিপথির অধীনে ছেড়ে চলে যান। সেখানে তারা অনন্যোপায় হয়ে বসবাস করতে থাকল, আর মাসের পর মাস ক্রমশঃ এই ভাবেই চলার পর তারা নিজেদেরকে ঐ পবিত্রস্থানে তাদের হারিয়ে যাওয়া ইমাম ও আমিরের অভিভাবকত্বের মাঝে দেখতে পেল। আগত দর্শনার্থীরা উদ্বেগ নিয়ে শহীদ সৈয়দ আহমদের নিয়তি ও ঠিক কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল জানতে চায়। তারপর এটা আবিষ্কৃত হয়ে গেল যে কেহই প্রকৃতপক্ষে ইমাম ও আমিরের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে নাই, যদিও কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর মতে দেখা যায় তিনি তাঁর দুইজন ঘনিষ্ঠতম অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্রের মাঝে যুদ্ধ করে চলেছে। অতঃপর এই ত্রয়ী নেতৃবৃন্দের উপর এক ধূলার ধূম্রজাল নেমে এসে তাদের সকলকে ছেয়ে ফেলল, আর তারা মানব চক্ষুর অন্তরালে চলে গেল। পানিপথি এই ঐশ্বরিক দৃশ্য দেখে এতই অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন যে তিনি বালাকোটের আলাদা বর্ণনা সম্বলিত পত্র লেখেন পাটনায়। তিনি সহধর্মীদের অর্থ, সামগ্রী ও রসদ সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানান।

পানিপথির প্রকাশিত তথ্য পাটনায় ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের নতুন নেতৃত্ব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। সৈয়দ আহমদ কর্তৃক নিয়োজিত মূল ছয় সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের চারজন সদস্য সীমান্তে তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। বাকি দুজন, ফতেহ আলী সাদিকপুরের শাহ্ মুহাম্মদ হুসেনকে পাটনায় খলিফা হিসেবে রেখে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত পরিষদের পাঁচটি শূন্যস্থান পূরণ হয় এক দল তরুণদের দিয়ে, সবাইকে মৌলভি (প্রচারক) খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ফতেহ আলীর দুই জ্যেষ্ঠপুত্র, বেলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী; এলাহি বক্সের দুই জ্যেষ্ঠপুত্র,

আহমদুল্লাহ্ এবং ইয়াহিয়া আলী; আর একজন বহিরাগত, ফরহাত হুসেন, যে শাহ্ মুহাম্মদের আর একজন কন্যাকে বিবাহ সূত্রে গ্রহণ করার কারণে পাটনার অধিবাসী তিন কন্যা পরিবারের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই পাঁচজন তরুণ ১৮৩০ দশকের শেষ দিকে ও ১৮৪০-এর সম্পূর্ণ দশক ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের পুনর্গঠনের পেছনে একত্রে পথ নির্দেশক শক্তি হিসেবে কাজ করেন আর ১৮৫০-এর দশক জুড়ে এর সমর শক্তি হিসেবে পুনঃঅভ্যুদয় হয়।

শাহ্ মুহাম্মদ হুসেনকে আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ইমামে উন্নীত করার পূর্বে বেলায়েত আলী কয়েক বছর তাঁর ওয়াজির (প্রধান উপদেষ্টা) হিসেবে কাজ করেন। তাঁর ভ্রাতা ইনায়েত আলী তখন যুদ্ধের জন্য আন্দোলনের আধিকারিক হন, নতুন পরিষদ আহমদুল্লাহ্ বেলায়েত আলীর উত্তরাধিকার সূত্রে, ইয়াহিয়া আলী খাজাঞ্চী ও কোষাধ্যক্ষ, ও ফরহাত হুসেন আন্দোলনের সৈন্য সরবরাহকারী এবং প্রধান ধর্মীয় মৌলবাদী, আন্দোলনের সময় বেলায়েত আলীর পাটনায় ঘন ঘন অনুপস্থিতির সময় খলিফা হিসেবে মাদ্রাসা চালাচ্ছিলেন।

মনে রাখতে হবে এমন কি সৈয়দ আহমদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের পূর্বে বেলায়েত আলী ওয়াহ্হাবিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠতম ভ্রাতা সৈয়দ আহমদের সঙ্গে দীর্ঘ পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিল আর শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করে, সুতরাং বেলায়েত আলীকে সন্দেহাতীতভাবে ওয়াহ্হাবি ধারার একজন অতীব দৃঢ় উদীয়মান নেতা হিসেবে ধারণা না করার কোন অবকাশ নেই। বেলায়েত আলী প্রথম তাদের নেতার মৃত্যু সম্পর্কে সৃষ্ট সন্দেহের গুরুত্ব প্রথমেই অনুধাবন করেছিলেন এবং এ কারণেই তিনি নেতার বেঁচে যাওয়া সম্পর্কে জন সমক্ষে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তখন সে এটা জানায় যে, কয়েক বছর পূর্বে এক ধর্মোপদেশ দেয়া সভায় সৈয়দ আহমদের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী সে নিজে শুনেছে। এখন সে আনন্দের সংবাদ দিতে সক্ষম হলো যে তাদের প্রিয় নেতা জীবিত ও সুস্থ রয়েছেন, কিন্তু স্রষ্টা দুর্বল চিত্ত মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অস্ত্র ধারণে অনীহা প্রকাশের কারণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। এই কারণে সকলে চক্ষুর সম্মুখ থেকে তাঁকে তুলে নেন। তাদের ইমাম আমিরুল-মোমেনীন বুনার পর্বতে তার দু'জন অতি ভক্ত শিষ্যদের অপেক্ষায় আত্মগোপন করে আছেন। শিষ্যরা জিহাদের জন্য নিজেদেরকে একত্রিত করতে সক্ষম হবে ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর অন্তরাল থেকে পুনঃআবির্ভূত হবেন। তখন তিনি নিজেকে পাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং তাদেরকে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

এটা বস্তুত পক্ষে শিয়াবাদ উপস্থাপিত ইমাম মাহ্দি বিষয়ক উপকথার অনেকটা স্খলন, যাতে করে দেখানো হয়েছে যে লোক চক্ষুর আড়ালে থাকার প্রয়াসে অদৃশ্য ইমাম পর্বতের গুহায় অবস্থান করতেন, ঈমানদারদের ডাকে সাড়া দেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন নিজেকে পশ্চিমের রাজা হিসেবে পরিচিতি দানের জন্য।

বিষয়টি হাস্যকর হলেও এটা তার সমতলবাসী বিক্ষুব্ধ অনুসারীদের মাঝে ভীষণভাবে সাহস যুগিয়েছিল, বিশেষভাবে এটি বিভিন্ন বিরোধিতা উপেক্ষা করে তাদের জিহাদে প্রণোদিত হতে ইমামের আজ্ঞা স্বরূপ উৎসাহিত করেছিল। যদি সৈয়দ আহমদ এখনও বেঁচে থাকতেন তাহলে যে জিহাদের ঘোষণা তিনি দিয়েছিলেন সেটি এখনও চলতে পারত। তাৎক্ষণিক পরিণতি হলো খলিফা নাসিরুদ্দিন যে প্রথম দিকে ধর্মান্ধ শিবির ত্যাগ করেছিলেন তাঁর অধীনে দ্বিতীয় বার (হিজরা পশ্চাদপসরণ) হলো। তাঁকে একটি নতুন স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ার জন্য কর্তৃত্ব দেয়া হয় এবং ১৮৩৫ সালে তাদেরকে নিয়ে তিনি আফগানিস্তান অভিমুখে শিখদের বিরুদ্ধে ঘোষিত ধর্মযুদ্ধের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হতে থাকেন। তাদের সিন্ধু এলাকায় তাদের আগমন কুচের নিকটবর্তী ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মনে সন্দেহের সঞ্চার করে। রাজনৈতিক চাপে নাসিরুদ্দিনের জিহাদিরা সিন্ধু নদের চড়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, যেখানে মাসের পর মাস গড়িয়ে বছর পর্যন্ত তারা নতুন সেনা সরবরাহের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে মাটিতে লাথি মারত।

সৈয়দ আহমদ তাঁর জীবদ্দশায় কল্পিত ইমাম-মাহ্দিকে তাঁর আন্দোলনের সুবিধার্থে ব্যবহার করেন, তবে নিজেকে কখনোই 'প্রত্যাশিত একজন' বলে ঘোষণা দেন নি। তাঁর উত্তরসূরিরা তাঁর সম্পর্কে এভাবে কথা বলত না। তথাপি তাঁকে ঘিরে একটা ব্যক্তিপূজার অবতারণা হয়েছিল। যারা তাঁর ঘনিষ্ঠতম ছিল তারা তাঁকে 'ইমাম সাহেব' বলে ডাকত, তারা তাঁর স্মৃতিসমূহ লিখে নিল এবং তাঁর বাণীগুলো সংগ্রহ করল এমনভাবে যেমন করে মহানবী (সা.) ধর্মীয় উপাদানসমূহ তাঁর সাহাবীরা হাদিসের সংগ্রহ করেছিল। এখন সৈয়দ আহমদকে সর্বপ্রকার দেবগুণে গুণান্বিত দৃষ্টিতে দেখা হত এবং আরও অতিরঞ্জিত ভাবে তাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হিসেবে তাঁর সম্পর্কে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছিল—এমনকি বলা হতো তিনি তাঁর মৃত অবস্থা থেকে পুনর্জীবন লাভের ক্ষমতা রাখতেন।

একই সঙ্গে পুরাতন সুফি ও সুন্নি ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পরিহার করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে পুনঃনিরীক্ষণ করে সংশোধন করা হয়েছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো একটি অংশে বিবৃত হয়েছিল যা কয়েক শ বছর জৈনপুরের সৈয়দ আহমদ নামক এক ব্যক্তি মাধই অনুসারীরা উদ্ভাবন করেছিল, 'যাতে

তারা ১২ শ বছরের (৭৫০ বছর মূল পাঠে) পর আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে থাকবে। আরও দেখছি পৃথিবীর সব রাজন্যবর্গ একে অপরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত; আরও দেখছি হিন্দুরা জঘন্যতম মন্দ অবস্থায়; আরও দেখছি তুর্কীরা নির্যাতিত অবস্থায়; এমতাবস্থায় ইমামের আবির্ভাব ঘটবে এবং পৃথিবী শাসন করবে; আরও দেখছি যে ইসলামের নবী (সা.) তাঁর আসলরূপে আবির্ভূত হয়ে আহমদের স্থলাভিষিক্ত হবেন। যেমন করে শানস কর্তার নামের পূর্বের অক্ষরগুলো নির্দেশ করে।' শিয়া পাঠে একইভাবে করা হয়েছে, বিশেষত একটি ভবিষ্যদ্বাণী যা ইমাম মাহ্‌দির আসন্ন আবির্ভাবের ১২৬০ হিজরি খ্রিস্টান পঞ্জিকা অনুসারে ১৮৪৩-৪ সালের নির্দিষ্ট তারিখ দেয়। যখন ১৮৪৩-৪ সাল এলো অথচ ঐ দৈববাণীগুলো বাস্তবায়িত হলো না তখন আসর মহশর বা শেষ দিবসের সংকেত প্রচার করা হলো। পূর্বে বলা হয়েছে যে পাঞ্জাব সীমান্তে বৃটিশদের পরাজয়ের পর ঈমানদাররা ইমাম-মাহ্‌দিকে খুঁজতে থাকবে, চার দিনের চরম যুদ্ধে নাজারিনদের বিপর্যয়ের পর বিজয়ী বেশে ইমাম মাহ্‌দির আবির্ভাব ঘটবে এবং ভারতে ইসলামের বিজয়ে পৌরহিত্য করবেন। কোন সঠিক দিন দেয়া হয়নি; তবে এই ঘটনাপঞ্জি চন্দ্র ও সুর্য গ্রহণের মধ্য দিয়েই পরিসমাপ্তি হলো।

ধর্মীয় পদ্ধতি হলো একটি বিশেষ প্রথার অর্চনা পালনের ব্যবস্থা যা এককভাবে এক ব্যক্তিকে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে তার উপর সর্বৈব বিশ্বাস স্থাপন ও অতিভাব এবং ভক্তির মাধ্যমে উপাসনার বিশিষ্ট ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দলীয়ভাবে একটি আবহ সৃষ্টি করা হয় যেখানে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যায় অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়সমূহকে একান্ত উত্তম ও উক্ত দল বহির্ভূত সকল কিছু অগ্রহণযোগ্য এবং পরিত্যাজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় ওয়াহ্‌হাবিবাদের ক্ষেত্রে, বেলায়েত আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় যেমনটি হয়েছে, সেই ধর্মীয় পদ্ধতি সুলভ বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলো :

১. একজন মানুষের কোরান ও হাদিসের পঠনে বিশ্বাস, এবং সমস্ত বর্জনকর বিশ্বাসসমূহের ব্যাখ্যাকে পরিহার করে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকতে হবে একেশ্বরতন্ত্রে;
২. পরিপূর্ণ আরাধনা, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে একটি শপথ গ্রহণ, একক কর্তৃত্বকারী ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় নেতা এবং সেনাপতি, ইমাম এবং আমির, প্রায়শঃই প্রচলিত একটি বিশ্বাস যে এই নেতার আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে;
৩. তাঁর সম্পর্কে ধারণা ছিল যে তিনি চরিত্রগতভাবে ইসলামের প্রথম দিককার খলিফাদের বর্তমান উত্তরসূরি, যদিও তিনি ইমাম-মাহ্‌দি গোছের কেউ নন তিনি মুসলমানদের শত্রুর পক্ষে সর্বশেষ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন;

৪. সহস্রবর্ষব্যাপীবাদের একটি বিশ্বাস—এই ধারণা যে পৃথিবীর দিন ফুরিয়ে আসছে এবং এটি দিয়েই ইসলামের বিজয়;

৫. এভাবে এই প্রথায় 'আমরা' এবং 'তারা' মনোভাবের উদ্ভাবন হতে দেখা যায় যেখানে সকল প্রথা ও ধর্ম ব্যবস্থা নাস্তিক আকারে চিহ্নিত করা হয় এবং এভাবে সেগুলোকে সহিংসভাবে প্রদর্শিত করার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করা হয়।

৬. জিহাদের স্বীকৃতি দেয়া একজন মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব কিন্তু জিহাদ আকবর (বিশাল যুদ্ধ) কে উপক্ষো করে জিহাদ কবীর (মামুলি বা ক্ষুদ্র যুদ্ধ) কে ধর্মযুদ্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে :

৭. জিহাদ আরম্ভের পূর্বে প্রতীকী পশ্চাদপসরণ প্রস্তুতকরণ, সুতরাং এটি মহানবী (সা.)র মক্কা থেকে মদিনায় হিজরা বা গমনের পুনরাবৃত্তি করে;

৮. ইসলামের সোনালি যুগে প্রত্যাবর্তন, একত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রযুক্তির (যেখানে এটি পুনরায় জিহাদ হিসেবে ব্যবহার করা যায় সেটি ব্যতীত) বর্জন;

৯. এদের লোক সংগ্রহের কৌশলও ছিল প্রণিধানযোগ্য। হত দরিদ্র ও অজ্ঞ (অধিকতর অভিভাবকহীন এতিমদের) তরুণ অনুসারীদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে তাদের সম্পূর্ণ এক ঘরে করে রেখে বিশেষ শিক্ষায় মনোনিবিষ্ট করা হতো আর তাদের অন্যান্য সকল বহিঃসংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দীর্ঘসময় ধরে গড়ে তোলা হতো।

১০. মরণেচ্ছা প্রকাশের বাসনা যেখানে শহীদের অবস্থা একজন জিহাদির সর্বশেষ লক্ষ্যে উন্নীত করা;

মৌলভি বেলায়েত আলী সৈয়দ আহমদী ধর্মীয় পদ্ধতির প্রবক্তা। যদিও তিনি খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁর পূর্বসূরীদের ন্যায় সুদর্শন ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী সম্পন্ন ছিলেন না, তথাপি বেলায়েত আলী ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের তাত্ত্বিক গুরু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সুদর্শনের অভাব সৈয়দ আহমদ ও তাঁর ধর্মোপদেশ প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তা পূরণ করেন। তিনি ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় রণকৌশলী এবং পরবর্তীকালে এর সর্বাধিক সফল প্রচারবিদ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সৈয়দ আহমদের ওয়াহ্হাবিবাদের প্রচারের প্রয়াসে চতুর্দিকে পরিব্রাজন করেন।

কিন্তু যেহেতু তাঁর ধর্মীয় মতবাদসমূহ ও সভায় আলোচ্যসূচির পুনঃপ্রবর্তন অধিকতর ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে উঠল, সুতরাং বিরোধী শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিতুমীরের নিষ্ফল উত্থানের কয়েক মাস পরে বেলায়েত আলীকে বোম্বের মসজিদগুলোতে ধর্ম প্রচার করতে দেখা গেল। তাঁর সমালোচকবৃন্দের

একজনের মতে, 'তিনি জনগণকে মলুদ শরীফ' (হাদিসে যে সম্বন্ধে নির্দেশ নেই) পাঠ থেকে বিরত থাকতে বলেন, এবং আমাদের নবী (সা.)র প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাতে বলেছেন। এই ব্যাপারে বোম্বের মৌলভিরা তাঁকে কাফির বলে আখ্যা দিয়ে তাঁকে বিতাড়িত করে।' এক বছর পরে দিল্লির চৌদ্দজন শীর্ষ স্থানীয় মোল্লা এক ফতোয়ায় ভারতীয় ওয়াহ্হাবিদেরকে অভিযুক্ত করে 'বেঈমান, শয়তান, প্রতারক, ধর্মবিদ্রোহাত্মক জনগণ', হিসেবে ঘোষণা দেয় যে তারা মক্কা থেকে মদিনায় নির্বাসিত হয়; আর এই যে, 'পার্থিব সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে অজ্ঞ মুসলমানদেরকে প্রতারণা করার জন্য তাঁরা একটি নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করেছে।' তৎকালীন সময় থেকে আগামী দিনগুলোতে পুনরাবৃত্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ভারতীয় ওয়াহ্হাবিরা যারা ভারতের সুন্নি সম্প্রদায়ের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত তারা তাদের ফতোয়ার প্রচারণায় তাদেরকে চরমভাবে কাফির ও বেঈমান বলে রায় দান করতে থাকল।

'দিল্লিবাসীরা' সৈয়দ আহমদের প্রকৃত অনুসারীরা শাহ্ ওলিউল্লাহ্র মতধারার শিক্ষাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে নিজেদেরকে একত্রিত করে 'পাটনা-বাসীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগল। ১৮২৩ সালে সৈয়দ আহমদের শিক্ষক শাহ্ আব্দুল আজিজের মৃত্যুর পর মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়ার নেতৃত্ব শাহ্ আব্দুল আজিজের পুত্র শাহ্ মুহাম্মদের ইসহাকের উপর ন্যস্ত হয়। ১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর চাচাত ভ্রাতা, শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইলের শহীদ হওয়ার পর, শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক ও তাঁর কিছু সংখ্যক শিষ্য আরবে বসবাস করতে চলে যান। তাদের স্বেচ্ছা নির্বাসনের অবস্থা সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায়, দিল্লির মাদ্রাসাগুলোয় ওয়াহ্হাবি প্রথার শিক্ষা অনুসরণের প্রভাব শাহ্ ইসহাকের প্রস্থানের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। যাহোক, ১৮৩০ দশকের শেষার্ধে বা ১৮৪০ দশকের প্রথমার্ধে শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির দিল্লি কলেজ থেকে কিছু বিশেষ মেধাবী তরুণ শিক্ষক ও গবেষকদের সংগ্রহ করতে লাগল। পরবর্তীতে তারাই প্রভাবশালী কট্টরপন্থী ধর্মীয় নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মুঘল বংশীয় আলীপুরের সৈয়দ আহমদ খান এবং অপর প্রান্তে দিল্লির মোহাদ্দিস নাজির হোসেন।

সুন্নি উলেমাদের শত্রুতা সত্ত্বেও এখন বেলায়েত আলী সোৎসাহে সংগ্রামশীল জিহাদের উন্নয়ন ঘটান আর পাটনা-বাসীরা এখনও দেখল সপ্রশংস শোতৃমন্ডলী, বিশেষত মুসলিম নবাবদের মধ্যে যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে তাঁদের রাষ্ট্রে শাসন করছিলেন তাঁদেরকে। এদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের নিজাম ছিলেন অগ্রগণ্য যার অফুরন্ত ধনদৌলত এবং বিশাল পদবীসমূহ ও তাঁর স্বাধীন ক্ষমতাকে আর ঢেকে রাখতে পারেন নি। ১৮৩৯ সালে বেলায়েত আলী তাঁর স্ত্রী হায়দ্রাবাদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে

হায়দ্রাবাদে ধর্ম প্রচার করতে পৌছান। তাঁর ধর্ম প্রচারের সংবাদ শীঘ্রই নিজামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুবারিজ-উদ-দৌলার দরবারে পৌঁছে যায়। তিনি তাঁর ধর্ম প্রচারণা শুনতে গেলেন এবং তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হলেন। তাঁর ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কথিত আছে যে দরবারের মহিলারা, যখন তারা জাফরিকাটা মার্বেলের পর্দার পশ্চাত থেকে তাঁদের ধর্মের বাণী প্রচার শুনছিল, তখন তারা এত অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে তারা তাদের মণি-রত্নের গহনা ও সোনার বালাগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিল এই ধর্মের উন্নয়নের জন্যে চাঁদা প্রদানার্থে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখন আফগানিস্তানে তাদের অন্তিম সর্বনাশা হস্তক্ষেপ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল কাবুলের বর্তমান শাসনকর্তাকে উচ্ছেদ করে তাদের সমর্থিত ব্যক্তি আমির শাহ্ সুজাকে তদস্থলে আসীন করার জন্য যিনি বহু বছর পূর্বে তাঁর সিংহাসন হারিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বোম্বে থেকে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে আনা হয় এবং বাংলার সৈন্যদের একত্র করে 'সিন্ধুনদের সেনাবাহিনী' নামে জাঁকজমকপূর্ণ খেতাব দেয়া হয়। কোম্পানির বহু সৈন্যবাহিনীসমূহকে আফগানিস্তানে সমবেত হতে দেখে হায়দ্রাবাদের বেলায়েত আলী ও তাঁর সাথীরা এটিকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে মনে করে সেটাকে উপেক্ষা করা সমীচীন মনে করেন নি। সমগ্র হিন্দুস্তান জুড়ে এক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এ বিষয়ে বেশ কিছু সংখ্যক শাসকবর্গ যাদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার আশায় তাদের নিকটে সযত্নে লিখিত পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। যা-ই ঘটুক না কেন, নবাবদের খোয়ানোর বেশি কিছু ছিল না, আর তাদের ব্যাপারে সহযোগিতা নেতিবাচক ছিল। কিন্তু শাহ্জাদা মুবারিজ উদ-দৌলার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কানা ঘুষা হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে উপস্থিত ব্রিটিশ প্রতিনিধির গোচরে সেটা পৌঁছে যায়, আর এ বিষয়ে সে সরাসরি নিজামের নিকটে তাঁর ভ্রাতার রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের স্বচ্ছ প্রমাণাদিসহ উপস্থাপিত করেন। একটি গোপন বিচারকার্য সম্পন্ন হয় এবং শাহ্জাদাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। তিনি তাঁর বাকি জীবনটা বিশাল বিষণ্ন গোলকোণ্ডা দূর্গে বন্দি হিসেবে যাপন করবেন।

বিপদের কথা হলো নাসিরুদ্দিন ও তাঁর সহযোদ্ধা হিন্দুস্তানি মুজাহিদীন প্রায় ছয় মাস যাবত সিন্ধুর পরিত্যক্ত কারাগারে বন্দি থেকে এখন ব্রিটিশদের আফগান যুদ্ধের ক্রস ফায়ারে ধরা পড়ে যায়। গজনির প্রসিদ্ধ দূর্গের সিংহদ্বার রক্ষার ডাকে সাড়া দিয়ে আফগান প্রতিরোধকারীদের প্রতি সাড়া দিয়ে তারা বীরত্বপূর্ণ কিন্তু এক ব্যর্থ ভূমিকা রেখেছিল। তাদের জনা পঞ্চাশেক বেঁচে যাওয়া সৈন্যদের শাহ্ সুজার সম্মুখে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আনা হয়েছিল, জনৈক ইতিহাসবেত্তার ভাষায় সেখানে তাদেরকে জল্লাদের ছুরি দিয়ে বর্বরোচিত ও

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেসামালভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।' দ্বিতীয় দফায় ভারতে ওয়াহ্হাবিবাদ তার প্রভাবের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল।

গজনির ঝটিকা অভিযানের সমর্থনে সিন্ধু থেকে আরও সৈন্য প্রেরণ করে কাবুল অধিকৃত করা হয় ও শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানে আমির হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু তারপর অধিকাংশ সৈন্যকে হঠাৎ প্রত্যাহার করে এক মারাত্মক সিদ্ধান্ত হয়, যার ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ অভিবাসী প্রতিনিধি এবং তাঁর বেশ কিছু সংখ্যক সহকর্মীকে হত্যা করা হয় এবং অবশিষ্টাংশ ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীসমূহকে ধ্বংস করা হয়। ছ'মাস পরে স্বঘোষিত এক প্রতিশোধস্পৃহ সৈন্যদল খাইবার গিরিপথ পর্যবেক্ষণ করে আফগানদের উপরে শাস্তির নিদর্শন রেখে আরও একবার ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

এ বিষয়ে যে রকমই মোড়ক দেয়া হোক না কেন ব্রিটিশরা আফগানিস্তানে যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছিল এবং তাদের সৈন্য প্রত্যাহার ওয়াহ্হাবিদের মাঝে প্রত্যাশার নতুন চমক সৃষ্টি করেছিল। প্রতিশোধের বাহিনীদের বাতির ঘোষণা করা হতে না হতেই ওয়াহ্হাবি ভক্তরা জানতে পেরেছিল পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপনকারী তাদের ইমাম তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসন পরিত্যাগ করে সিত্তানা থেকে জিহাদ পরিচালনার ভার নিজ দায়িত্বে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রচার করা হলো যে পাটনায় পত্র গৃহীত হয়েছে, পত্রটি সৈয়দ আহমদের প্রথম শিষ্য শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল তাঁর গুরুর বর্ণনানুযায়ী লেখেন। তাঁরা ঈমানদারদেরকে বুনার পর্বতের এলাকায় তাদেরকে তাঁদের সঙ্গে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান যাতে ধর্ম যুদ্ধ পুনরায় করা যায়। যারা জিহাদে নিজেরা এসে অংশ নিতে সমর্থ হয়নি তারা অর্থ ও খাদ্য দিয়ে সহায়তা করেছিল।

তাদের উৎস যা-ই হোক—এবং যতই এগুলোকে বেলায়েত আলীর কীর্তি হিসেবে সন্দেহ করা হোক না কেন—এই পত্রগুলো দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ হয়েছিল। একজন শহীদ ও হারিয়ে যাওয়া নেতা সৈয়দ আহমদের স্বরূপ দীর্ঘদিন বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল এবং অসংখ্য ধার্মিক যুব সম্প্রদায়ের মাঝে তিনি একজন ইসলামি প্রতিরোধ ও পুনর্জাগরণের এক মূর্তিমান স্বরূপ হিসেবে পূজনীয় হলেন যাঁর উত্তরসূরী হিসেবে ওসামা বিন লাদেনকে ধরা হয়। সেই আহ্বানে বিপুল সংখ্যক মুজাহিদীন স্বেচ্ছাসেবক সাড়া দেয়, তাদের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠ কিন্তু হায়দ্রাবাদ থেকে অস্বাভাবিকভাবে স্বাধীনচেতা আগত মোল্লা মৌলভি জয়েন উল-আবদিন, যিনি বেলায়েত আলীর সময়ে নগরে ভ্রমণে এসে ওয়াহ্হাবিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। গোয়েন্দার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সাথে ভ্রমণের সময় জয়েন উল-আবদিন ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় এক সহস্র সংগৃহীত লোকজন তাদের পথ সিত্তানার দিকে করে নিয়ে তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ আরম্ভ করে। যাহোক, জয়েন উল-আবদিন গুপ্ত ইমামের

সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যাঁর ডাকে তিনি ও তাঁর হায়দ্রাবাদি সাথীরা সাড়া দিয়েছেন। তিনি আমিরুল-মোমিনীনের সাথে সাক্ষাতের দাবি জানান কিন্তু বিভিন্ন ওজুহাতে তাকে উপর্যুপরি ধোকা দেয়া হয়। পরিশেষে তাঁকে পাহাড়ের চূড়ায় হিন্দুস্তানি ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয় যেখান থেকে সে এবং অন্যান্য কৌতূহলী মুজাহিদীনরা দূরবর্তী স্থানে একটি গুহা দেখতে পেলেন, যার মুখে সাদা পোশাকধারী তিনজন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তিনজনের মধ্যে বলা হলো যে একজন আমিরুল-মোমিনীন ও অপর দুইজন শিষ্য তাঁর দৈনন্দিন পরিচর্যা কর্মে নিয়োজিত সেবক। দর্শকদেরকে শপথ করানো হয়েছিল তারা যেন কাছে না যায়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল এর ব্যত্যয় ঘটলে দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থানরত ইমাম পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যাবেন এবং এভাবে তিনি আরো চৌদ্দ বছর দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে থাকবেন।

যখন তিনি ও অন্যান্যরা তাদের নেতাকে দূরবর্তী স্থানে ঈষৎ দেখে রোমাঞ্চিত হলেন, তখন জয়েন উল-আবদিন নিজেকে দেখলেন যে তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সাথী যারা ফিরে গিয়েছিল তাদের থেকে অধিকতর সাহস নিয়ে পর্বতের গুহা মুখে আরও নিকট দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেন। তারা ডানদিকের গুহামুখে হাত ও পায়ের সাহায্যে কষ্টে আরোহণ করে আতঙ্কের সঙ্গে দেখেন যে তিন ব্যক্তি বলে কিছু নেই ওগুলো প্রতিমূর্তির অধিক কিছু নয়। জয়েন উল-আবদিনের তথ্যমতে যা পাওয়া যায় তা হলো সে পরীক্ষা করে দেখেছিল যাকে তারা ইমাম বলে আখ্যায়িত করছে আসলে সেটি ছিল ঘাস দ্বারা পরিপূর্ণ মানুষের অবয়বে ছাগলের চামড়া দ্বারা নির্মিত একটি মূর্তি স্বরূপ। প্রার্থনাকারী এই বিষয়ে কাসিন কাজজাব (সিত্তানার খলিফা মৌলভি কাসিম পানিপথি)কে তদন্ত করেন। তিনি উত্তর দেন যে এটা সত্য, তবে ইমাম অত্যাশ্চর্য ঘটনার মাধ্যমে নিজেকে এভাবে রূপান্তরিত করেন।

এই বঞ্চনায় সম্পূর্ণরূপে অপমানিত হয়ে জয়েন উল-আবদিন হায়দ্রাবাদের সহস্র স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকাংশদের সঙ্গে নিয়ে একত্রে তৎপরতার সাথে গোপনে সিত্তানা থেকে সরে যান। তিনি লেখেন, ‘এই বঞ্চনা পৌত্তলিক ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী এইসব জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ.....। এখন এই জনগণের ভ্রান্তিসমূহ ও মিথ্যা উক্তি দিনের আলোর মতই পরিষ্কার এবং (সেগুলোকে পরিত্যাগ করে) আমি পাপ থেকে আমার আত্মাকে বাঁচিয়েছি।’ অন্যান্য মোহমুক্ত স্বেচ্ছাসেবকরাও প্রতারিত হয়েছে বলে তারাও দাবি করে গোপনে সিত্তানা থেকে সরে যায়। তারা বাংলার তাঁতীদেরকে তাদের দলভুক্ত করে নেয়, তাদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ল্যাঙ্কশায়ারে প্রস্তুত সুতার পণ্য সামগ্রী বাজারে দর না পেয়ে সস্তায় বিক্রয় হয় সেই পণ্যের মত। তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছে

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেবে এই প্রত্যাশায়, তবে সিত্তানায় পৌঁছালে তাদেরকে খলিফা, পানি-বহনকারী, কাঠুরিয়া, এবং সুতা-কাটা যন্ত্রের চালকের কাজে নিয়োজিত করা হয়। ছাউনির অধিকর্তারা আইন পাস করেছিলেন যে কেবলমাত্র নিবন্ধিত কৃষক, যারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী তারাই কেবল এ কাজে নিয়োজিত থাকবে। অপরদিকে তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরেরা সহায়ক বা নিম্নতর কাজে নিয়োজিত থাকবে।

পরবর্তী বছরগুলোতে এগুলো ও অন্যান্য বিবরণ থেকে বিচার বিভাগীয় সাক্ষ্য হিসেবে সংগৃহীত হয়, এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে নিয়োজিতদের মধ্যে অধিকাংশই যারা যুদ্ধ করার নিমিত্তে সিত্তানায় গিয়েছিল তারা ছিল হত দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ যুবক দল, সেখানে যারা তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও তাদের ধর্মমতে দীক্ষা দিত তারা প্রায় সবাই মোল্লা বা মৌলভি, তাদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সুশিক্ষিত।

১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে শিখদের বিরুদ্ধে দুটি প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটনের পরে পাঞ্জাব ব্রিটিশ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এই প্রদেশটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে গভর্নর-জেনারেলের আদেশক্রমে কলকাতায় প্রশাসনিক কাজ-কর্ম নির্বাহ করত। এই সময়টায় নতুন প্রথা প্রবর্তন ও ব্রিটিশ ভারতে বেশ কিছু সংস্কার সাধন করা হয়েছিল যার মধ্যে নিহিত ছিল ইংরেজি ভাবধারায় শিক্ষার উন্নয়ন। ব্রিটেনে যিশুর বাণী সম্বলিত খ্রিস্টীয় ধর্মের উত্থান হচ্ছিল এবং যে সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের জনহিতকর কার্যের প্রসারকে নিজেদের খ্রিস্টীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করছিল। এটা এই ধর্মীয় চেতনার বশবর্তী হয়ে তাদের উন্নত জাতীয়তা বোধের বিকাশ ঘটাতে থাকে। এই বিষয়টি হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের বদ্ধমূল ধারণা থেকেই প্রতিভাত হয়। তিনি ফ্রেডারিক ম্যাকসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৫৩ সালে পেশোয়ারে কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল ঈশ্বর ব্রিটেনকে ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছেন যাতে করে তারা সেখানে নিখাদ খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।'

এই পুনঃসংস্কারসমূহ ও পরিবর্তমান মনোভাব ভারতীয় সমাজের বহু শ্রেণীর মানুষের মনে অধিক থেকে অধিকতর অসন্তোষের সৃষ্টি করতে থাকল। মুসলিম ও হিন্দুরা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি ও প্রথা এতে করে হুমকির সম্মুখীন হবে। এ বিষয়টি বঙ্গীয় সিপাহীদের মত কেউ বুঝতে পারে নি। পূর্বতনদের মধ্যে যেখানে অধিকাংশই ছিল গোঁড়া উচ্চ বর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ, সেখানে পরবর্তীদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক পাঠান আফগান বংশোদ্ভূত মুসলিম অশ্বারোহী সৈনিক ছিল, যাদের পূর্বপুরুষরা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

যমুনা নদীর পূর্বদিকের উর্বর ভূমি দিল্লি ও রোহিলকুণ্ডে বসতি স্থাপন করেছিল। এই রকম একজন মুসলিম সৈনিক ছিলেন হেদায়েত আলী, যাঁর পিতামহ ১৭৬৩ সালে বঙ্গীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন আর তাঁর এই পেশাকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁর পুত্র ও পৌত্র। হেদায়েত আলী তাঁর নুন খাওয়ার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ১৮৪২ সালে একজন সাবালক হিসেবে ব্যারাকে আফগানিস্তান যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ফিরোজাপুরের সেনানিবাসে সেনা এবং ঐ সমস্ত সেনারা কেমনভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিল সেটা তিনি লক্ষ্য করেন–

> যে সমস্ত হিন্দুস্তানি সিপাইরা কাবুল থেকে ফিরে আসত তাদেরকে জাতিচ্যুত বলে ঘৃণা করে রন্ধনের বাসন-কোসনকে স্পর্শ করতে দেয়া হতো না....। সিপাইরা বলত যে তারা কাবুলে গিয়ে জাত-ধর্ম খুইয়েছে, কারণ তারা বলত, তারা পশুর চামড়া পরিধান করত, আর তাদের ধর্মীয় বিধান মতে তারা শীতল আবহাওয়ায় তাদের কার্যকলাপ অনুসরণ করতে পারে নি। মুসলমান সিপাইরাও তাদের কাজ ধর্মীয় বাণীর প্রতি ভক্তি সহকারে করতে পারত না, কারণ তারা বলত, ব্রিটিশ সরকার ইসলাম ধর্মে যুদ্ধ করতে বলেছে মর্মে জনগণের সঙ্গে লড়াই করতে বলপ্রয়োগ করত, যা কোরানে নিষিদ্ধ। তারা গর্ব করে বলত, তারা সর্বদা উর্ধ্ব দিকে গুলি ছুঁড়ত এবং কখনো কোন লক্ষ্য থাকত না।

এবং সাধারণ অসন্তোষকে প্রয়োজনের অধিক মূল্য দেয়া হত, বাসস্থান ও পদোন্নতির ক্ষেত্রেও সিপাইরা নিজেদেরকে অনুভব করল যে তারা ক্রমশঃ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হেদায়েত আলীর ধারণা মতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাদের মাধ্যমে সে সখ্যতা গড়ে ওঠে তা চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

ওয়াহ্হাবিরা এই ধরনের অসন্তোষকে তাদের সুবিধামত অবস্থানে নিয়ে যেতে পেরেছিল। ১৮৪০-এর সম্পূর্ণ দশক ও ১৮৫০ দশকের প্রথমাংশ জুড়ে শহরগুলোতে, গ্রামগুলোতে তারা প্রচারক পাঠিয়ে জিহাদের ও আসন্ন গুপ্ত ইমামের প্রত্যাবর্তনের প্রচারণা অব্যাহত রাখে। জিহাদিদেরকে পার্বত্য গুপ্ত আশ্রয়ে অগ্রসর করার নিমেত্তে উৎসাহদানের জন্য তারা মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করে এই ঘোষণা দিয়ে যে এটি প্রতিপালন করা সকল প্রকৃত মুসলমানের উপর অবশ্য করণীয় কাজ যেমনটি মহানবী (সা.) করে গেছেন। 'এই দেশে বর্তমান সময়ে, হিজরত একটি কঠোর কর্তব্য' এই সময় থেকে ওয়াহ্হাবি আবাঁধা বিলিপত্র (পুস্তিকা) থেকে পাঠ করে তারা। 'বাস্তবিকই বিজ্ঞজনেরা এটি রচনা করেছেন। এখন এটিকে যে নিষেধ করে, ঈমানদাররা শোনো, তাকে নিজেকে

রিপুর দাস হিসেবে ঘোষণা করতে দাও। ইসলামী ধর্মমোধকে ছেড়ে এই ইসলাম ধর্মের দেশ থেকে একবার চলে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে ফিরে আসার পর আর কোনও দিন ফিরে যায় নি, যে কারণে তার পূর্বের সমস্ত আনুগত্য বৃথা হয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে বিদায় না নিয়েই সে কি মারা যাবে, তাহলে সে তার মুক্তির পথ হারিয়ে ফেলবে। অন্যান্য বিলিপত্র (পুস্তিকা)গুলোতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধের কর্তব্যসমূহ বর্ণিত ছিল এবং জিহাদ বিষয়ে নবী (সা.)র বিভিন্ন কলাকৌশল বর্ণিত ছিল। ওয়াহ্হাবিবাদের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি এই আন্দোলনের ঋণের কথা প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ করা হয় যা দুটি প্রকাশনা 'তওরিক কাইসার রুম' এবং 'মিসবাহ-উস-সারি'র মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেগুলোতে আব্দুল ওয়াহ্হাবের ইতিহাস এবং তাঁর নির্যাতন ও তুর্কী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে।'

বেলায়েত আলী ও ইনায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয় ইসলাম ধর্মে মানুষকে দীক্ষিত করার জন্যে দেশজুড়ে ব্যাপক ভ্রমণ করেন। ১৮৪৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলার মুর্শিদাবাদের পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট অভিযোগ করেন যে ইনায়েত আলী সরকারের বিরুদ্ধে 'বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত থাকা' বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে 'যুদ্ধের কারণ ও সৈয়দ আহমদের পুনর্জাগরণের বিষয়টি সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহের অজুহাত' হিসেবে ব্যবহার করেছিল। যে কারণে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন হয়েছিল। বাংলার সরকারের সচিব একটি মন্তব্য দিয়ে জানান সরকার এই প্রচারের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতে অনিচ্ছুক।' ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে যখন নথিভুক্ত হয়, তখন আলী ভ্রাতৃদ্বয় হাজারায় হ্যারি লামসডেন কর্তৃক গ্রেপ্তার হন, প্রহরাধীনে পাটনায় প্রেরণ করে সেই নগরীতে পাঁচ বছর রাখা হয় তাঁদেরকে। এই সকল বাধা-বিপত্তিকে তোয়াক্কা না করে তাঁরা সমগ্র উত্তর ভারত মুক্ত ভাবে ভ্রমণ করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে, পাটনায় ওয়াহ্হাবি পরিষদে অপর একজন আলী, এলাহি বক্সের পুত্র ইয়াহিয়া আলী, সংগঠনটির পুনর্গঠনের তাঁর প্রয়াসের আলোকপাত করেন। তাঁর এই দুর্ভেদ্য রক্ষাব্যূহের অধীনে, যেটি টিকেছিল ঠিক ১৮৬০ দশকের মাঝামাঝি মুহাম্মদ আন্দোলনের পথ, ক্রমান্বয়ে বাস্তবসম্মত ও গুপ্ত পথ হয়ে গেল। দুবছর পরে বিচারের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছিল, এটা এর সাংগঠনিক কার্যকলাপ প্রাদেশিক, আঞ্চলিক ও জেলাওয়ারী দলগুলিতে বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে এবং পাঞ্জাবকে একত্রে সংযুক্ত করে মূলকাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রসারের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। আর এ সবই কর্তৃপক্ষের নিকটে অজানা ছিল।

ওয়াহ্হাবি ধর্ম প্রচারকরা জেলাওয়ারী তাদের যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য অবস্থান গড়ে তুলত যেখানে মুসলিম সমাজে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে

নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালীভাবে বিস্তার করে। অতঃপর তিনি নিজেকে একজন বিদ্যালয় শিক্ষক বা ধর্ম শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সংশ্লিষ্ট জেলায় এভাবে অনুসারী ভক্তের দল গড়ে তাদের মধ্য থেকে তিনজনকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়, তার মধ্যে একজন রাজস্ব আদায়কারী, অপরজন পোস্ট মাস্টার এবং একজন সাধারণ ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করে। একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই চার স্থানীয় প্রতিনিধি একজন অপরজনের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করে। মোল্লা শিক্ষা ও ধর্মান্তরিত করেন, কর আদায়কারী তহবিল সংগ্রহ করেন, পোস্ট মাস্টার চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন আর নিয়োগকৃত যোগদানকারীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং সাধারণ ব্যবস্থাপক সমন্বয় বিধান করেন। এভাবে কার্যাদি ভাগ ভাগ করে ওয়াহ্হাবিরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে চলত। একজন মোল্লাকে তার রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক ধর্ম প্রচারণার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে জবাবদিহিতার জন্য ডাকা যেত, তবে প্রায় সর্বদাই তাকে ছেড়ে দেয়া হতো কারণ তারা তাদের কাজ-কর্ম বিচ্ছিন্নভাবে করত বিধায় আইনে বাধা থাকত না। স্যার উইলিয়াম হান্টার যেমনটি লিখে গেছেন, ‘ভারতে অগাষ্টিয় সাম্রাজ্যবাদ প্রথায় এক জন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট শাসিত প্রজাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা কুসংস্কারের মাঝে নিজেদের জড়াতে বিশেষ অনীহা বোধ করতেন। সেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তরালে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিভিন্ন কার্যকলাপকে সহজেই চালিয়ে নিত।

যখন পাটনা নিজেই সীমান্তবর্তী আন্দোলনের সঙ্গে নিরাপদ গৃহে নিজের ডাকবিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তখন প্রত্যেক স্থানীয় দল প্রচুর সংখ্যক কেন্দ্রের মাধ্যমে পাটনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থা দূতদেরকে সমর্থ করেছিল, যা বার্তাবাহক সরবরাহ সামগ্রী এবং নতুন যোগদানকারী কর্মীদের নিরাপত্তার সাথে যথাস্থানে পৌঁছানোর ব্যাপারে সহায়তা করত। গোপনীয়তা রক্ষার্থে বেশ কিছু নিরাপদ পদক্ষেপ অবলম্বন করত। এই কর্মে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য ছদ্মনাম ব্যবহার করত, যোগাযোগের জন্য তারা অপকারহীন ব্যবসা পত্রের মত পত্র রচনা করত, আর মূল শব্দগুচ্ছের স্থলে একটি সাংকেতিক চিহ্ন তারা কল্পনা করে নিত। আল্লাহ্কে সর্বদাই বলা হতো ‘মুখতার’ বা ‘প্রতিনিধি’ জিহাদকে একটি ‘মোকদ্দমা’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো, জিহাদের জন্যে নতুন নিবন্ধীকৃতদের ছদ্মনামে ‘ব্যাপারী’ (বণিক) হিসেবে ডাকা হতো, ‘মুসাফির’ (পর্যটক) বা খিতমতগার (চাকর), নিবন্ধীকৃত সৈন্যদলকে সারিবদ্ধভাবে প্রেরণ করাকে বলা হতো ‘কাফিলা’ (ক্যারাভান), ডাকযোগে অর্থ প্রেরণকে ‘শ্বেত প্রস্তর’ হিসেবে উল্লেখ করা হতো, টাকা ‘বই’ হিসেবে পণ্যদ্রব্য, স্বর্ণমুদ্রা ‘লাল বটিকার তসবিহ’ হিসেবে আর মুদ্রাগুলোকে বলা হতো ‘বৃহদাকারের স্বর্ণ খচিত দিল্লি জুতো’ বা ‘বৃহৎ লাল পক্ষী।’

গৃহ ও তদসংশ্লিষ্ট সংবাদ আদান-প্রদানের ঘাঁটির সম্প্রসারণের সময় পাটনার সাদিকপুরে শাহ মুহাম্মদ হুসেনের পরিবারকে ব্যাপকভাবে বর্ধিত ও সংরক্ষিত করা হয়। এই গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ ও তদসংলগ্ন একটি মাদ্রাসা নির্মিত হয়। এটির একটি সাংকেতিক নাম ছোট গোডাউন বা ছোট গুদাম, যেখানে সিত্তানার পার্বত্য শিবিরকে উল্লেখ করা হয় বড় গোডাউন বা বড় গুদাম।

এক দশকের মধ্যে ভারতে ইসলামি পুনর্জাগরণ ও বিপ্লবের ক্ষেত্র ওয়াহ্হাবি আন্দোলন সংখ্যালঘু ধর্ম প্রচারকারী সম্প্রদায় থেকে উচ্চ ফলপ্রসূ সংগঠনে পরিণত হয়। এর শাখাসমূহ উত্তর ভারতব্যাপী বিপুল শ্রমিক শ্রেণীর নির্বাচক মণ্ডলীর সমর্থনে গড়ে ওঠে। এটা একটি অসাধারণ কাজ ছিল, যেটিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী সমালোচকও স্বীকার করেন। উইলিয়াম হান্টার তাঁর বিতর্কমূলক 'আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, 'মিশনারীদের মত অক্লান্ত নিজের সম্পর্কে নির্লিপ্ত, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ইংরেজ বিধর্মীদের বিতাড়নের চরম লক্ষ্যে অবিচল, অর্থ ও লোক সংগ্রহে সক্ষম একটি সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তোলার কাজে পাটনার সুদক্ষ খলিফারা সমগ্র ওয়াহ্হাবি জামাতের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থানীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁরা যে শিক্ষা পেয়েছেন তার অধিকাংশই ত্রুটিমুক্ত এবং শিক্ষার বলে বলীয়ান হয়ে স্বদেশের সহস্র সহস্র লোককে তাঁরা পূত-পবিত্র জীবন যাপনের আল্লাহ্ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে পেরেছেন।'

১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনায়েত আলী বাংলায় ধর্মের নামে বিদ্রোহ প্রচারের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তিনি আত্মগোপন করে পাটনায় পলায়ন করেন। এখানে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন, ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন যে মূল আদেশে তাঁকে শান্তি রক্ষা করে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারপরেও তিনি দ্বিতীয়বারের মত শর্ত ভঙ্গ করেন। এক সহস্র টাকার বন্ডে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে জানান যে কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন। বড় গোডাউনের আমির হিসেবে সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি সিত্তানায় গমন করেন। ঐ বছরের শেষের দিকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বেলায়েত আলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে সময় এসেছে তাঁরও ধর্মচিন্তার জন্য সাময়িকভাবে নিভৃত বাসের। ডিসেম্বর মাসে তাঁর অনুপস্থিতিতে খলিফা হিসেবে ফরহাত হুসেনকে নিয়োগ দিয়ে পাটনার ছোট গোডাউনের দায়িত্বভার দিয়ে দেন তাঁকে। অতঃপর তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে যোগদানের জন্যে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা ও অনুগামী লোকজন, যাদের মধ্যে ইয়াহিয়া আলী এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁর ভ্রাতা আহ্মুদুল্লাহ, এলাহি বক্সের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইয়াহিয়া আলীর দায়িত্বসমূহ নিজ কাঁধে তুলে নেন।

দলটি দিল্লিতে সমগ্র শীতকাল জুড়ে খাওয়ায় ও পালন করে, যেখানে সম্রাট বাহাদুর শাহ্ প্রসিদ্ধ লালদূর্গের হলে তাঁর সম্মুখে সাধারণ শ্রোতৃমন্ডলীকে কোরান বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। আদালতের আচরণ বিধি অনুসারে প্রচারকেরা বিতর্কিত বিষয়াদি মুঘলদের উপস্থিতিতে এড়িয়ে যান। তবে বেলায়েত আলী ওয়াহ্হাবি শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্রাটকে স্বধর্মত্যাগী হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণকারী বলে বিবেচনা করেন। তদানুসারে, তিনি আবেগপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন যাতে ব্যক্ত হয় যে যারা আল্লাহ্র বিধিনিষেধ পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেবে তারা অনন্ত দোযখ যন্ত্রণায় ভুগবে। তাঁর নৈতিক বক্তৃতার মাঝখানে সম্রাট বাধা দিয়ে সংক্ষিপ্ত মানব জীবনের উপরে তাঁর অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে চান। মৌলভি যিনি তাঁর ধর্মোপদেশ দানে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীর জবাবে তাঁকে সমালোচনা করে কোরানের বাণী তেলোওয়াত করে শোনান। এই তীব্র তিরস্কার ও চুক্তিভঙ্গ সত্ত্বেও সম্রাট তাঁর মেহমানকে জাঁকালো ভোজ-সভায় আপ্যায়িত করেন ও তাঁকে রেড ফোর্ট (লাল দূর্গ)-এ অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। যাহোক, দিল্লিতে ব্রিটিশ অধিবাসীরাও সম্রাটের কথা শোনার জন্য উপস্থিত ছিল, আর এখন তিনি বেলায়েত আলীকে এত কড়াকাড়িভাবে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তাঁর উদ্দিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন যে মৌলভি ভীত হয়ে পড়লেন। ওজুহাত দেখিয়ে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর্গ ত্যাগ করলেন।

অতঃপর শীঘ্রই লুধিয়ানায় ব্যবস্থাপনার কাজের সময় ভ্রাতৃদ্বয়ের সাক্ষাত হয়। তার শত্রু রাজ্য থেকে তারা অপসারিত হয়ে ১৮৫১ সালের গোড়ার দিকে সিত্তানায় পৌছান। পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণের সময়ই শুধু একবার তাদের যাত্রা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থামিয়ে দিয়েছিল, আর তারপরও অতি সত্ত্বর পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনারের ব্যক্তিগত লিখিত সমর্থন পাবার পর তাদের কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে।

যখন এটা স্পষ্ট হলো যে তারা যেভাবে চলার কথা সেভাবে চলছে না তখন ভ্রাতৃদ্বয় সিত্তানায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন নি। সরকারিভাবে প্রয়াত সৈয়দ আহমদ ছিলেন আন্দোলনের ইমাম ও আমির। তবে যত দিন তিনি গুপ্ত ছিলেন ততদিন এই ভ্রাতৃদ্বয় এই দুই ভূমিকা তাঁদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন, বেলায়েত আলী ইমাম হিসেবে এবং ইনায়েত আলী আমির হিসেবে। সমস্যাটি ছিল যে পূর্বতনরা বিশ্বাস করত আন্দোলনে আরও সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হতো, যেখানে পরবর্তীরা আর বিলম্ব না করে সৈয়দ আহমদের জিহাদকে পুনরায় গ্রহণ করাকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে দেখল। ইনায়েত আলী তাঁর ভ্রাতার থেকে অবয়ব ও ব্যক্তিত্ব উভয় দিক

থেকেই খুব আলাদা ছিলেন। তিনি দৈহিকভাবে উন্নততর ও বলবান ছিলেন, তিনি উগ্র মেজাজী ছিলেন, আর চিন্তাবিদের তুলনায় যোদ্ধা প্রকৃতির ছিলেন তিনি। তাঁর সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি ব্রিটিশদের সম্পর্কে ভীষণ ঘৃণা পোষণ করতেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আগমনের পূর্বে শিবিরের নেতৃত্ব পুনরায় গ্রহণ করে কোন কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে অনাগ্রহী ছিলেন—তবে তিনি ইমাম হিসেবে জিহাদ শুরু করার জন্যে বেলায়েত আলীর অনুমতির প্রয়োজনবোধ করেন। এই রকম আন্তরিকতাশূন্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মাঝে যে ইনায়েত আলী পরিশেষে সিত্তানা ছেড়ে মঙ্গলথানায় তাঁর শিবির গড়তে চলে যান, জায়গাটি গভীরতর ও উচ্চতর মহাবন স্তূপ পর্বত। এখানে সৈয়দদের নেতা ও প্রয়াত সৈয়দ আহমদের পুরনো পৃষ্ঠপোষক ও প্রশংসাকারী সৈয়দ আকবর শাহের দানকৃত জমিতে তিনি একটি প্রস্তর দূর্গ নির্মাণ করেন।

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর সময় থেকে এক নতুন রাজনৈতিক ভাবভঙ্গী সোয়াতের পার্বত্য এলাকায় দেখা দিল আর বুনার সোয়াতের আখুন্দ, যিনি আব্দুল গোফুর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দেবতুল্য ঋষি চরিত্রের ব্যক্তি যাকে স্থানীয় জনৈক গোষ্ঠীপতি সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণে তাঁকে পার্বত্য এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮৩৪ সালে চল্লিশ বছর বয়সে আব্দুল গোফুর আল্লাহ্‌র স্বীকৃত ভক্তের বিজয় নিয়ে সোয়াতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আর স্থানীয় আখুন্দ বা দরবেশ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সময় থেকে তিনি পর্বত ইউসুফজাইয়ে ক্রমাগত প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা, আর শান্তি সংস্থাপক বনে যান। ১৮৫০ সালে, উপজাতিদের মধ্যে বিবাদভঞ্জনের একটা প্রয়াস চালান, তিনি সৈয়দ আকবর শাহ্‌কে বাদশাহ হিসেবে এবং আইনের নেতা (আমির-এ-শরিয়া), কার্যত তাঁকে সোয়াতিদের ও বুনারওয়ালদের রাজা বানান।

যদিও নাকশবন্দি আখুন্দ হিন্দুস্তানি ওয়াহ্‌হাবিদের উগ্র ও বর্জনকর ধর্মমতের বিষয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন, হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের মাঝখান থেকে তাকে কেন পাদশাহ্ (বাদশাহ্) পছন্দ করা হয়েছিল তা বোঝা বড় দুষ্কর। আব্দুল গোফুরের পৌত্র আখুন্দ মিয়া গুল আব্দুল ওয়াদুদ বাদশাহ্ সাহিব নেতার জন্যে ও উপাজাতিদের এক আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি নেতা নিযুক্ত হন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্রিটিশদেরকে প্রতিরোধ করেন।

জনৈক পাঠানকে নির্বাচিত আন্ত পাঠান উপজাতীয়দের মধ্যে প্রতিহিংসার উস্কানি দেবার মতন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে সৈয়দ আকবর উভয়ই একজন সাঈদ ও ১৮২৩ সালে শিখ বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেবার জন্য সর্বতোভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৮৩০-১ সৈয়দ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

আহমদের অভিযানে তিনি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং সর্বত্র সম্মান পাবার প্রত্যাশায় সৈয়দ আকবর শাহ্‌কে সোয়াতের রাজা করা হয়েছিল।

যাহোক, সাঈদ উপজাতি থেকে রাজা নির্বাচনে সহায়তা করার একটা পরিণতি ছিল যে তিনি এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে ধারণাও করতে পারেন নি। এ বিষয়টি একটি ধারণাকে বশবর্তী করছিল যে সোয়াত পর্বতমালা থেকে দার উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে পরাভূত হতে হবে। তথাপি আকবর শাহ্‌র উপর আখুন্দদের নমনীয় প্রভাব আকবর শাহের বাহিনীদের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের উপর প্রভাব যা ১৮৫২-এর শেষার্ধে বেলায়েত আলীর স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। ওয়াহ্‌হাবিদের উপর লর্ড ডালহৌসির লিখিত বর্ণনা সমসাময়িক ঘটনা এটি, যাতে তিনি বলেছিলেন হিন্দুস্তানি ছাউনি একটি গুরুত্বহীন বিষয় যাতে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই। বেলায়েত আলীর মৃত্যু হলে ভ্রাতা ইনায়েত আলীকে রেখে যান স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য যেমনটি তিনি তাঁকে (ইনায়েত আলী) উপযুক্ত মনে করেছিলেন। তিনি (ইনায়েত আলী) সঙ্গে সঙ্গে সিত্তানায় অতর্কিত আক্রমণ করেন, ধর্মান্ধ শিবিরের ইমামতি বলপূর্বক গ্রহণ করে তিনি হিন্দুস্তানি সেনাদের আক্রমণে যাওয়ার নির্দেশ দেন–তাদের সর্বপ্রথম প্রয়াস ছিল অম্বের খানের নিকট থেকে কোটালের দূর্গ ছিনিয়ে নেওয়া।

ইনায়েত আলীর পত্রাবলি আবিষ্কারের পূর্বে পাটনায় উত্তেজনা তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়া সত্ত্বেও, ওয়াহ্‌হাবিদের মূলকাজ এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। তাঁর ছোট গোডাউনের সহকর্মীদের সাথে ঐকমত্যে এসে আন্দোলনের নতুন আমির ও ইমাম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিশাল জিহাদের তাঁর পরিকল্পনায় এখন অগ্রসর হলেন। বাংলার ম্যাজিস্ট্রেট জেমস ও কিনলি সাহেব পরবর্তীতে যা লিখেছেন তিনি তাঁর দল গঠনে শ্রম দিয়ে তাদের মনে কাফির হিসেবে ব্রিটিশ বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলিম জিহাদিরা প্রতিদিনই যুদ্ধবিদ্যা অনুশীলন করত, কখনও কখনও দিনে দু'বার, আর প্যারেড করানোর সময় তাদেরকে জিহাদের উচ্চ প্রশংসা সম্বলিত গৌরবের গান গাওয়া শিক্ষা দেওয়া হতো, ও শুক্রবারগুলোতে জুম্মার নামায পড়ার পর তারা স্বর্গের আনন্দময় বর্ণনামূলক ধর্মোপদেশ শুনত, এবং তাদের ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে যতক্ষণ ব্রিটিশ ভারতকে বশীভূত করণের পূর্ব নির্ধারিত সময় উপনীত না হয়।'

সিত্তানায় ওয়াহ্‌হাবিদের ক্রমশঃ ধীরে ধীরে গড়ে তোলার খবর পেশোয়ার ও লাহোরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচরীভূত হয়, যারা লর্ড ডালহৌসির নিকটে অভিযোগ করেন যে ধর্মান্ধরা 'দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণকে বিপথে চালিত করার জন্য নিরাপত্তা ও প্রাচুর্যের মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে তাদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।' গভর্নর জেনারেলের জবাবে একটি ক্ষমার ইশতেহার প্রচার করেন। সিত্তানার হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদেরকে তাদের ব্রিটিশদের অধীনে ফিরে

আসার জন্যে একমাস সময় দেওয়া হয়। যদি তারা অনুরূপ করে, তাহলে তাদের প্রত্যেককে খরচ সাশ্রয়ের জন্যে দশ টাকা করে দেয়া হবে আর তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের নিরাপদ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে। যাহোক, তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে, তবে তাদের ক্ষমা পাওয়ার কোন প্রত্যাশা থাকবে না। ‘এই বিজ্ঞপ্তির পরে কোন হিন্দুস্তানি বা ব্রিটিশ প্রজাকে অস্ত্রসহ দেখা গেলে, অথবা অপর পক্ষে মৌলভিদের সংগে সংশ্লিষ্ট, তাকে একজন মুফসিদ (শত্রু) হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং কমপক্ষে তিন বছর কারা ভোগ করবে। এই বিজ্ঞপ্তি দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে ক্ষমা হিসেবে প্রচারিত হয়, যারা প্রতারিত হয়েছে। অভিশাপ তাদেরকে যারা আদেশ লঙ্ঘন করে। তাদের রক্ত তাদের নিজের মাথায় উঠবে।’

লর্ড ডালহৌসির ক্ষমা প্রচারের ওয়াহ্হাবিরা তাদের সামরিক অভিযান আরো তীব্রভাবে শুরু করে। দিল্লি ও উত্তর ভারতের অন্যান্য শহরগুলোতে বিপুল সংখ্যক মুদ্রিত ধর্মীয় বাণী এবং গাথা সঙ্গীত এখন প্রচার হতে লাগল। এগুলোর মধ্যে একটি হলো ‘ওড অব নিয়ামত উল্লাহ’, দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত বলে মনে হয়, যা নিম্নের পংক্তিমালাকে পাকাপাকিভাবে সম্পাদন করে

অতঃপর নাজরিনরা সমগ্র হিন্দুস্তান নিয়ে নেবে।
তারা এক শ বছর রাজত্ব করবে।
তাদের রাজত্বকালে অনেক নির্যাতন হবে।
তাদের ধ্বংসের জন্য পশ্চিমে এক রাজার জন্ম হবে।
রাজা নাজারিনদের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণা করবে।
আর যুদ্ধে প্রচুর লোক নিহত হবে।
তরবারির জোরে পশ্চিমের রাজা
এক ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী হবেন।
এবং যিশুর অনুসারীরা হবে পরাভূত......।
এই সঙ্গীতটি ৫৭০ হিজরি (১১৭৪-৫ খ্রিস্টাব্দ)তে রচিত।

পশ্চিমের রাজা ১২৭০ হিজরি (১৮৫৩-৪ খ্রিস্টাব্দ)তে আবির্ভূত হবেন। এই তারিখ স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে ইনায়েত আলী ১৮৫৩-৪ সালে শীতল আবহাওয়ায় ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিশাল জিহাদ করার পরিকল্পনা করেন। ১৮৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে কর্ণেল ম্যাকসনের হামলা আর হিন্দুস্তানিদেরকে সিত্তানা থেকে অবমাননাকর বিতাড়নের প্রায় সুনিশ্চিত ফলাফলে তাঁর দলে ভাঙন দেখা দিলে তিনি সেটা করতে পারেন নি। (যা সূচনাতে বর্ণিত হয়েছে)।

ম্যাকসনের হামলার ফলে জিহাদকে পুনঃপরিকল্পিত ও পুনরাধ্যয়ন করতে হয়েছিল। কর্ণেল ম্যাকসনের নয় মাস পরে গুপ্তহত্যার বিষয়টা ইনায়েত আলীর প্রতিশোধ হিসেবে দেখা যায় এবং হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের প্রথম আদেশ হচ্ছে ঘৃণিত নাজারিনদেরকে আঘাত কর।

১৭৬৫ সালে উত্তর ভারতে সরকারিভাবে ব্রিটিশ শাসন আরম্ভ হয়েছিল, যখন মুঘল সম্রাটের এক রাজাজ্ঞায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্রহণ করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান বা আঞ্চলিক প্রশাসকের দায়িত্বভার। যাহোক, জনপ্রিয় সমঝোতা হলো যে নাজরানি রাজ পলাশী যুদ্ধের সময় থেকে, বাংলায় ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকাল এক শ বছরের বেশি টিকবে না। কারণ এটি আরম্ভ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে, সুতরাং এটি ১৮৫৭ সালে সমাপ্ত হত পলাশীর শত বার্ষিক উৎসবে।

১৮৫৫ সালে ওয়াহ্হাবিদের মুদ্রিত সমর সঙ্গীত 'রিসালাত আল-জিহাদ' (ধর্মযুদ্ধের বার্তা) দিল্লির পথে পথে বিরাট জাগরণের গুজব সহযোগে প্রচারিত হতে থাকে। এ ধরনের গুজব ও ধর্মীয় বাণীর প্রচার গিয়ে পৌঁছাল তৎপর কর্ণকুহরে। যখন ব্যাখ্যা করতে বলা হয় কেন তার মুসলিম অনুসারীরা সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেছিল, তখন সৈনিক শেখ হেদায়েত আলী এই বিষয়ে বলে ছিল কোরানে কথিত আছে যে ব্রিটিশ প্রশাসন এক সময়ে মক্কা ও মদিনা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে যার পরে ইমাম মাহ্দি জন্ম নিয়ে সেই রাজ্য তাদের নিকট থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেবেন। কিন্তু কতিপয় মৌলভি ঘোষণা দেন যে ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব এক শতাব্দীকাল চলবে এবং তখন দেশে বিক্ষোভ মাথা চাড়া দেবে। মুসলমানরা এই বিষয়টি জেনে অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে কল্পনা করল যে ব্রিটিশ প্রশাসন এখন তো চলেই যাচ্ছে সে জন্যে তারা বিদ্রোহী সিপাহী দলে যোগদান করল।

অধ্যায় পাঁচ

১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে

> ওয়াহ্হবাবিরা যে মতবাদ আসলে ঘোষণা করে সেটি বেদূঈন পদবিন্যাসে রাজনীতি ও ধর্মের অবিসম্বাদিত নেতার সঙ্গে যোগদান করে মোহাম্মদী মত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে মহান প্রধান জাতির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা উভয়ই হয়...। সুন্নিদের সঙ্গে ওয়াহ্হাবিরা কতকগুলো সহনীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, যদিও কতিপয় নির্দিষ্ট বিষয়ে মতভেদ হয়, তবে শিয়াদের থেকে তারা মৌলিক ভাবে ভিন্ন মতের আর তাদের ঘৃণা, সকল ধর্মীয় ঘৃণার মত তিক্ত ও পরমত অসহিষ্ণু। কিন্তু ওয়াহ্হাবি সম্প্রদায়ের সর্বাধিক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, আর সেটিই মূল বিষয় হিসেবে এই বর্ণনায় সংশ্লিষ্ট করা হয়, যার সার্বিক উন্নতি সাধনের সহায়তার জন্যে তারা পীর বা আধ্যাত্মিক গুরুকে প্রদান করে।
>
> উইলিয়াম টেলর, আওয়ার ক্রাইসিস : অর থ্রি মান্থস এ্যাট
> পাটনা ১৮৫৭, ১৮৫৮-এর বিদ্রোহের সময়

নগরী পাটনা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কয়েক মাইল, কলকাতা থেকে উজানে চার শ মাইল ও বেনারস থেকে দেড় শ মাইল কম বিস্তার করে। ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে একটি রেলপথ এই তিন নগরীকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়ায় পরিকল্পিত হচ্ছিল, তবে এর কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দেশের মধ্যাঞ্চলে ভ্রমণের একমাত্র পথ ছিল নদীপথ। পালকিতে মানুষের ঘাড়ে ভর দিয়ে ভ্রমণ করা একটু কম আরামদায়ক হয় অবশ্য, কোচ ব্যবস্থায় পর্যটকরা রাতের মত ডাক বাংলোতে অবস্থান করতে পারত।

উত্তর ভারতের অন্যান্য অধিকাংশ শহরের মত জনৈক ব্রিটিশের উপস্থিতিতে ১৮৫৭ সালে পাটনা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, যেগুলোকে ব্রিটিশরা জানত দেশীয় শহর হিসেবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ তিন লক্ষ

জন অধ্যুষিত, বেসামরিক আবাসস্থল শহরের উপান্তে পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল, সরকারি অফিসসমূহ আর শহরের স্বল্প সংখ্যক ইউরোপীয় 'সরকারি কর্মচারীদের বাসভবন; এবং পুনরায় পশ্চিমে, দীনাপুরের সেনানিবাস, এখানে তিন দল বাংলার দেশীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনী একদল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকত। পাটনা ছিল বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল, মাদক দ্রব্য সংগ্রহের কেন্দ্র, আর সদর দফতর এলাকা, যেটি পশ্চিম বিহার বিভাগ নামে পরিচিত স্থানীয় সরকারের এমন এলাকা যাকে আয়তনে ও আকৃতিতে আয়ারল্যান্ডের কোন এক এলাকার সঙ্গে তুলনা করা চলে, এটি ছয়টি মহকুমা বা জেলা নিয়ে গঠিত। এই সব জেলার প্রত্যেকটিই শাসন করত বাংলার বেসামরিক কর্মের ব্রিটিশ সদস্য যিনি কালেক্টর হিসেবে পরিচিত, যার কাজগুলোর মধ্যে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাজও করতে হতো, তাকে সহযোগিতা করতেন সাধারণত একজন বিজ্ঞ মুসলিম। কালেক্টরগণ পাটনায় কর্মরত কমিশনারকে প্রতিবেদন দিতেন, যিনি নিজে একজন কনিষ্ঠ সাহায্যকারী ও একজন নগর ম্যাজিস্ট্রেটের সহযোগিতায় তাঁর কার্য নির্বাহ করতেন। বিভাগটির নিজস্ব দায়রা বিচারক ছিলেন, তিনিও পাটনায় বসবাস করতেন, যাকে সকল ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাদের বিচারিক রায় দায়রা জজকে অর্পণ করতেন। সর্বসমেত, বিভাগের প্রশাসনিক ও বিচারিক কার্যাদি ইউরোপীয় বারো জনের হাতে ন্যস্ত ছিল। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তারা নজীব নামক স্থানীয় রক্ষিবাহিনীকে তলব করেছিল তবে কোন বড় ধরনের বেসামরিক সংঘর্ষ অবস্থা দেখা দিলে দীনাপুরে মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করত।

এই সেই অঞ্চল যেটি উইলিয়াম টেলরের তত্ত্বাবধানে চলে যায় যখন তিনি ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে পাটনার কমিশনার নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে জনৈক সমর্থকের ভাষ্যমতে, বিল টেলরের বয়স তখন সাতচল্লিশ বছর, 'জীবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন সুমার্জিত একজন ভদ্রলোক ও পণ্ডিত, তাঁর স্বভাব সুলভ কিছু অসাধারণ গুণাবলি ছিল যা তিনি কখনও পরিমার্জনে অবহেলা করেন নি। তাঁর ছিল সুশীল মনন ও বোধ-বুদ্ধির বৃত্তির বিশাল ভান্ডার।' কমিশনার পদে নিযুক্ত হবার পূর্বে টেলর বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরীতে সিকি শতাব্দী অতিবাহিত করেন। তিনি সরকারি চাকুরীতে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে উন্নতি লাভের উপায় হিসেবে কাজ করে নিজেকে একজন চৌকস কর্মী প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু মানব চরিত্র সম্বন্ধে তিনি সর্বাধিক কৌশলী ছিলেন না, আর চাকুরীর মেয়াদকালে বাংলায় সরকারি চাকুরীর কর্মক্ষেত্রে তিনি তাঁর দুই বছরের জ্যেষ্ঠ এক সহকর্মীকে শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত করেন। তিনিই ছিলেন ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে, যাঁর সচিবের কাজের প্রতিভা লক্ষণীয়

আমারবই দুনিয়ার পাঠক এক হও

গতিতে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল উন্নতি লাভের চরম শিখরে। হ্যালিডে ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর সচিব পদে প্রথম অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং এক দশকের মধ্যে বঙ্গীয় সরকারের বিশেষ খেতাবধারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হয়ে যান। এতই উচ্চ পর্যায়ে যান যাতে করে তাঁর সম্বন্ধে বলা হতো যে তিনি 'সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, যদিও সরকারের কোন দায়িত্ব ভার বহন করেন না। কোন কিছুর জন্যই তিনি বড় বেহালা ও বাংলার ডাক সাঁইটে বলে উপনাম অর্জন করেন নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে ফ্রেডারিক হ্যালিডে বড় লাট ডালহৌসির আট বছরের শাসনামলের প্রথম ছয় বছর তিনি হস্ত ও কলমের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। অতঃপর ১৮৫৪ সালের মে মাসে বাংলাকে দখল করে নেয়া গভর্নর জেনারেলের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রেসিডেন্সি করার জন্য এবং লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে প্রদেশ হয়। হ্যালিডে এই প্রদেশের হন প্রথম লেফটেন্যান্ট-গভর্নর।

টেলর ও হ্যালিডের মধ্যে এর চেয়ে বড় তুলনামূলক বৈষম্য আর হয় না। একজন ছিলেন খর্বাকৃতির মানুষ, যিনি কবিতা ও চিত্রকলার স্কেচ, খেলাধূলার প্রতি ও প্রাচীন মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর সংগ্রহে বিপুল উৎসাহী ছিলেন, অপর দিকে অন্যজন বিশাল বপুর অধিকারী ছিলেন যে সম্পর্কে বাকল্যাণ্ড তাঁর ভারতীয় ব্যক্তিবর্গের জীবনীর অভিধানে বর্ণনা করেছেন—'তিনি বিশেষ ক্ষমতাধর ছিলেন যা তাঁর কথায় ও লেখায় একইভাবে প্রতিফলিত হতো।' হ্যালিডে একমনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, যে প্রসঙ্গে তাঁর মহা স্তাবক লর্ড ডালহৌসি ব্যক্তিগতভাবে বলতেন, 'তিনি এমনইভাবে সব কিছু ব্যবস্থা করতেন যে বাংলায় আমি ছাড়া তার প্রভাবশালী বন্ধু নাই।' তিনি নিজের কর্তৃত্বও জাহির করতেন, তিনি যা পেতে চাইতেন তা পাওয়ার জন্য কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না তাঁর প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করতে। পরবর্তীতে যখন টেলরের বরাদ্দকৃত পদে হ্যালিডে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাঁর নিজের পছন্দসই মি. এডওয়ার্ড স্যামুয়েলকে প্রদান করেন, তখন প্রথম টেলর ও হ্যালিডে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় খণ্ড যুদ্ধটি ছিল যখন হ্যালিডে টেলরের অভিযোগগুলোকে খারিজ করে দেন, তাঁর জেলার পুলিশরা স্থানীয় দস্যুদের না দেখার ভান করে তাদের অপরাধকে গোপন করে। তৃতীয় ও আরও সঙ্কটজনক পার্থক্য এই দুই ব্যক্তির মধ্যে দেখা দিল ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে, বিল টেলরের পাটনায় কমিশনার পদে বহালের সাথে সাথে। যখন তিনি বাংলার সরকারকে সাবধান করে দিয়ে লেখেন যে হ্যালিডে সাহেব সংস্কার সাধনের চেষ্টা করছেন আসলে সেটার সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীদের মাঝে বিক্ষোভ বৃদ্ধি করছেন। আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ..যে

বিহারের বিশেষ করে সন্দেহভাজন মুসলমানদের মধ্যে থেকে যারা শিক্ষার সাথে জড়িত তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের নজরদারিতে পড়েন।

সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভীতি ছিল যে সরকার বর্ণ প্রথায় ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন, তবে টেলরের মনে বিশেষ করে পাটনায় সংঘটিত ওয়াহ্হাবি ষড়যন্ত্রের বিষয়টা ঘুরপাক খাচ্ছিল যা তাঁর পূর্বসূরীরা ১৮৫২ সালে উন্মোচিত করেন, পরিণামে ডালহৌসির কাছে যা নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত দুটি সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি লেখার সময়, ফ্রেডারিক হ্যালিডে ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। যাহোক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে নিঃসন্দেহে প্রথমটির খসড়া করে একটি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখন তিন বছর হলো যে সব ওয়াহ্হাবিরা মূল প্রতিবেদনে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল ডালহৌসি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা এখনও সাদিকপুরে সংবাদ আদান প্রদানের ঘাঁটিতে, আর চিরকর্মঠ হিসেবেই তারা রয়েছে।

এক বছর পরে ভারত সরকার ১৮৫৬ সালে যখন ডালহৌসির ভারত ত্যাগের পূর্বে তাঁর শেষ কাজ হিসেবে সাধারণ জন-অসন্তোষের ইন্ধন যোগান। তিনি অযোধ্যা রাজ্যকে ‘বর্বর রাজ্য’-এর কারণে সংযুক্ত করার অভিপ্রায়ে সেনাদল প্রেরণ করেন। অযোধ্যা উত্তর ভারতের টিকে থাকা শেষ মুসলিম রাজ্য, আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলাকে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই ক্ষেপিয়ে তোলে। এই সংযোজন সিপাইদেরকে দলছুট হয়ে অযোধ্যাতে নতুন চাকুরীর অন্বেষণেও লিপ্ত করে, এক নগরীতে উত্তেজনাকে উত্যক্ত করে তোলে যা ইতিপূর্বে ছিল, টেলরের দৃষ্টিতে, ‘খুবই অসন্তোষ ও ষড়যন্ত্রে নিমজ্জিত।’

পুনরায় টেলরের উদ্বেগের বিষয়ে আরও বলতে গেলে, তাঁর সন্নিকটেই ছিলেন জগদীশপুরের অভিজাত কুমার সিংহ। প্রৌঢ় রাজা কুমার সিংহ পাটনার পশ্চিমে শাহাবাদ জেলায় বিশাল জমিদারির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে বাংলার সরকারের রাজস্ব বোর্ড তাঁর পাওনাদারদের থেকে তাঁর সকল কার্যাদি অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করতে লাগেন। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে হ্যালিডে রাজস্ব বোর্ড কুমার সিংহকে ছাড় দিতে নিষেধ করেন, কার্যত তাঁকে ধ্বংস করার জন্য। এই পর্যন্ত কুমার সিংহ বিল টেলরের ভাল বন্ধু ছিলেন। যদিও কুমার সিংহের বিরুদ্ধে আদেশ পালনের দাবি ছিল, তবুও টেলর হ্যালিডের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে লেখেন, আর তাঁকে সাবধান করে দেন যে এই পদক্ষেপ এতদ অঞ্চলে কুমার সিংহ ও তাঁর অনেক অনুসারী রাজপুতকে বিরোধী করে তুলবে। হ্যালিডে এর জবাবে এই ঝঞ্ঝাটে কমিশনারকে দেশের কেন্দ্র স্থল বর্ধমানে বদলি করে দেন।

১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার বাইরে ব্যারাকপুরের সৈন্যদলের দফতরে ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, পদাতিক সৈন্যদের কার্তুজে গরুর ও শূকরের চর্বি মাখানো রয়েছে মর্মে গুজবের কারণে। হ্যালিডে এবং ডালহৌসির উত্তরসূরি হিসেবে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর নিশ্চয়তা সত্ত্বেও, সরকার আচরণ অব্যাহত রাখে, 'বাংলার সকল কর্মচারীর সকল ধর্মীয় অনুভূতি অনুসারে তারা ধর্ম পালন করবে' এই গুজবসমূহে দেশের মধ্যাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এক বছর পূর্বে সিপাই হেদায়েত আলী ও তাঁর কয়েক ভাই যে সেনাদলে কর্মরত ছিলেন সেখান থেকে দীনাপুরের ৮ম বঙ্গ দেশীয় পদাতিক বাহিনীতে বদলি হয়ে যান। অতঃপর তিনি যোগদান করেন শিখ বঙ্গীয় পুলিশ বাহিনীতে। সেখান থেকে লাহোরে বঙ্গীয় পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে যার নেতৃত্বে ছিলেন তিনি যুদ্ধ-দৃঢ় ক্যাপ্টেন টমাস র‍্যাটরে। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলায় তাদের নতুন নতুন দায়িত্বভার নেয়ার উদ্দেশ্যে শিখ বাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে কলকাতা অভিমুখে দীর্ঘ পদযাত্রা করে। র‍্যাটরে সাহেবের পাশাপাশি তাদের সম্মুখ নেতৃত্বে অবস্থান করছিল সুবেদারের পদোন্নতি প্রাপ্ত হেদায়েত আলী। পরবর্তী মাসগুলোতে দৃঢ় মনা এই ব্যক্তিদ্বয় শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর দ্বৈত প্রজ্ঞাপনের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের প্রশংসাকারীদের মধ্যে থেকে সুবেদার হেদায়েত আলীকে যেভাবে বর্ণনা করতে চাইলেন 'প্রাচ্যদেশীয় সৈনিকদের মধ্যে একটি বিরল দৃষ্টান্ত।' 'তাঁর দেহ সৌষ্ঠব ছিল আকর্ষণীয়, এবং শিখদের সাথে কৃপাণ হাতে পরিচালিত তাঁর ভঙ্গিমা বিশেষত কর্ণেল র‍্যাটরের পাশে দেখে কোন শত্রু বেশিক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করার চিন্তাও করত না।

কলকাতার পথে শিখদের সেনাদল বঙ্গীয় বাহিনীর যারা উল্টো পথে যাচ্ছিল হেদায়েত আলী তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানতে পারলেন যে ব্যারাকপুরে অবস্থানকারী সৈন্যরা বিদ্রোহে ফুঁসে উঠছে। 'তারা আমাদের সৈন্যদেরকে অবহিত করল যে ব্রিটিশদের বন্দুকের কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বির প্রলেপ রয়েছে, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যারাকপুরে অবস্থানকারী সৈন্যরা গোলযোগের প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে, আর এই প্রেক্ষিতে কলকাতার ও ব্যারাকপুরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের আর্থিক সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন।' কোথায় তাঁর আনুগত্য রয়েছে সে ব্যাপারে হেদায়েত আলীর কোন সন্দেহ ছিল না 'আমার বাড়িঘর সবই সর্বদাই আমার সেনাদল, আমাকে ছাড়া কাউকে আমি পৃষ্ঠপোষক বলে জানি না। এটা এই কারণে যে যখন সরকারের বিরুদ্ধে দেশ জেগে উঠতে লাগল, তখন আমি আমার কম্যাণ্ডিং অফিসারকে এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত সব অবস্থা জানাই।' সরাসরি র‍্যাটরে

সাহেবের নিকটে গিয়ে তিনি যা শুনেছেন সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলেন—আর বলা হয় তিনি অবশ্যই ভুল করবেন। মধ্য ফেব্রুয়ারিতে শিখ বৃহৎ স্থলবাহিনী কলকাতা থেকে ১২০ মাইলের থেকে বেশি দূরে নয় রাণীগঞ্জে সাময়িকভাবে থামে, যেখানে সুবেদার সিপাইদের কাছ থেকে জানে পদাতিক সৈন্যদল ঘাঁটি গেড়েছে আর তাদের ব্যারাকপুরের দিকে বিদ্রোহের জন্যে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, তারা নিজের সমর্থন দেবার জন্যে ঐ সেনাদলে যোগদান করে। এই সময়ে র‍্যাটরে সাহেব হেদায়েত আলীকে বিশ্বাস করেন, আর অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কম্যান্ডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন। র‍্যাটরে সাহেব যা করেছিলেন পরবর্তীতে র‍্যাটরে সাহেবের অনুসরণে কর্ণেল সাহেব তাঁর ব্যবস্থাপনায় সে পথই অনুসরণ করতেন তবে এটি কলকাতায় পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ চাপের মুখে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই সন্ধিক্ষণে র‍্যাটরে সাহেবের শিখ বাহিনী নতুন আদেশ পায়। পাটনার পশ্চিমে শাহাবাদ জেলার সদর দফতরে আড়াতে সংবাদাদি পাঠাতে বলা হয়। র‍্যাটরে সাহেব এবং হেদায়েত আলী যথা সময়ে তাদের লোকজনকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান আর তাঁরা যে পথে এসেছিল সে পথে ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ আড়ার গ্রামের ছোট স্টেশনে পৌছান। এখানে প্রত্যেকে যে সব অপমানের কথা বলছিল তা পুঞ্জীভূত হচ্ছিল স্থানীয় জমিদার রাজা প্রৌঢ় কুমার সিংহের বিরুদ্ধে। তাঁকে বলা হলো তিনি সরকারের উপরে এতই রাগান্বিত তিনি বিদ্রোহ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন। এটাও যথা সময়ে ক্যাপটেন র‍্যাটরের উপরে বর্তায়। তিনি শাহাবাদের পঁচিশ বছর বয়স্ক কালেকটর ও ম্যাজিস্ট্রেট হেয়ারওয়াল্ড ক্রেফোর্ড ওয়েককে বিষয়টির তথ্য জ্ঞাপন করেন। পর্যবেক্ষক মি. ওয়েক কুমার সিংহের বর্তমানের ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন, আর র‍্যাটরের তথ্য পাটনার উইলিয়াম টেলরের কাছে পাঠানোর সময় সংযুক্ত করেন যে, তাহলে তিনি (কুমার সিংহ) নিজের স্বার্থে তা দমনের ক্ষেত্রে আঘাত হানার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করবে, এবং তার সামন্ত প্রভাব এতই বিপজ্জনক ছিল যা এ ধরনের ক্ষেত্রে বিস্তার হওয়া সমধিক ঝুঁকিপূর্ণ।

এক মাস পরে ২৯ মার্চ, একজন সিপাই বধ করার জন্য ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যারাকপুরের প্যারেড মাঠে ছুটে আসে, আর এরকম করে জুন মাসে সেনাদল বাতিলের পর বিষয়টিকে সমাপ্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং নিজেকে প্রকাশ করেন 'বরং বিষয়টি যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে তাতে প্রীত হয়ে' এবং তাঁর স্বরাষ্ট্র সচিব টেলরকে নিশ্চয়তা দিয়ে পত্র দিয়েছিলেন যে এটা 'একটা অমূলক আতঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়।'

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে চিঠিপত্র-দলিল জব্দ করা হয় তার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার কোনরূপ ষড়যন্ত্রের

নজির দেখা যায় নি। বিদ্রোহ হয় সিপাইদের নেতৃত্বে আর সেনাদলের মধ্যে ক্রোধ ও নালিশ একত্রিত করে সিপাইরা বিদ্রোহ পরিচালনা করে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে এই অসন্তুষ্টির কারণ ছিল ধর্মীয় ভীতি, যা ব্রিটিশদের অনুভূতিহীনতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল। তবে আগুনে তেল ঢালার মত উস্কানি হিসেবে এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে ধর্মান্ধদের অপপ্রচার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে ওয়াহ্হাবিরা নিজেরাই নিজেদের উপমা হিসেবে দেখা দেয়, তাদের প্রচারণার শক্তি ও সাংগঠনিক কর্মজালের ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ার কারণে। তাদের প্রচারণার জন্যে এটি সম্ভব হয়েছিল। যাহোক, তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর প্রয়াসে একাই ছিল না। সংযুক্ত অযোধ্যা রাজ্যের পূর্বের রাজধানী লক্ষ্ণৌতে পদচ্যুত নবাবকে পুনর্বহালের ব্যাপক সমর্থন ছিল—সমর্থন দিয়েছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সিপাই ও ঘোড়সওয়ার যাদের অধিকাংশই এসেছিল মূলত অযোধ্যা থেকে। দিল্লির ভেতরে ও এর আশ-পাশেরও অনেকেই সম্রাটকে তাঁর পূর্বের গৌরবে পুনঃঅধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, আর তাঁর উপরে ব্রিটিশদের অপমানের বোঝার পরিসমাপ্তি দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু দিল্লিতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ কম ছিল, এবং সম্রাট বাহাদুর শাহ্ রক্তের দিক থেকে আধা রাজপুত বিরাশি বছর বয়স্ক বাহাদুর শাহ্, নিস্তেজ ও অস্থির সংকল্প, ধর্মে একজন সুফি আর আফিম-আসক্ত—ষড়যন্ত্র স্বেচ্ছা প্রণোদিত পরিকল্পনার বাইরে বিস্তার না হতে পারে তা প্রতিহত করা হয়েছিল। তথাপিও পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি এবং এরকম আরও অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিবাদীদের দল কোম্পানি রাজকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার লক্ষ্যে পথ খোঁজার উদ্দেশ্যে এবং সন্তর্পণে লিখিত পত্র বিনিময় করতে লাগল।

যদি এই বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী একত্রে কাজ করত, তবে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরিণতি ভিন্ন রকমের হতো। তারা অনুরূপ করতে পারে নি ওয়াহ্হাবিদের কিছু ভ্রান্ত পদক্ষেপের কারণে, যারা একাই ব্রিটিশদেরকে পরাজিত করে এদের সমন্বয় সাধনের সংযোগ নিষ্পন্ন করাকে বিপর্যস্ত করার সুচিন্তিত পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু তাদের একটি পরিকল্পনা ছিল যাকে স্বতন্ত্রভাবে বলা হতো সুন্নি মুসলিম জিহাদ, আর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আঘাত হানাটা হিন্দুস্তানের কোন নগরী থেকে না করে আফগান সীমান্তের উপজাতিদের সহযোগিতায় সিত্তানা থেকে করা হয়। বিদ্যমান লক্ষণ বাতলায় যে পাটনায় মুহাম্মদ হুসেন আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ ইমাম হিসেবে নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে এলাহি বক্সের জ্যেষ্ঠতম পুত্র আহমদুল্লাহ্ পারিষদ হিসেবে কার্য সম্পাদন করছিলেন লক্ষ্ণৌ থেকে আগত ওয়াহ্হাবি মতবাদ বহির্ভূত ষড়যন্ত্রকারীদেরকে তাদের মতবাদে দীক্ষিতদের কাছে ভিড়তে দেন নি।

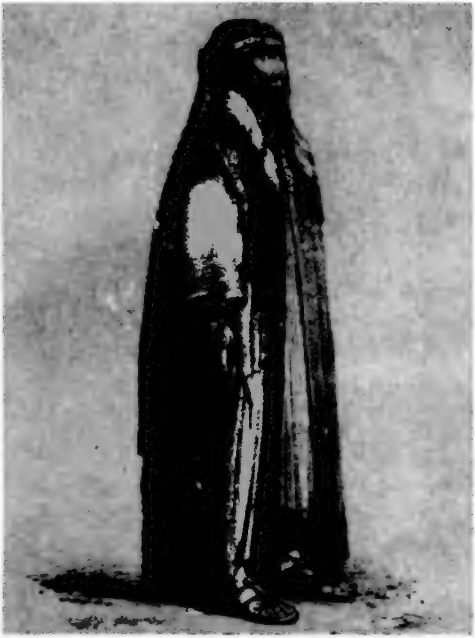

ওয়াহ্হাবি প্রধান আব্দুল্লাহ্ ইবনে-সৌদ, ১৮১৯ সালে কন্সটান্টিনোপলে শিরোচ্ছেদ করা হয় ঃ ধৃত ওয়াহ্হাবি আমির আব্দুল্লাহ্ ইবনে-সৌদ এর খোদিত চিত্র, স্যার হারফোর্ড জোন্স ব্রিজেসের 'পারস্য আদালতে'তার রাজকীয় আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান থেকে। (ব্রিটিশ লাইব্রেরি)

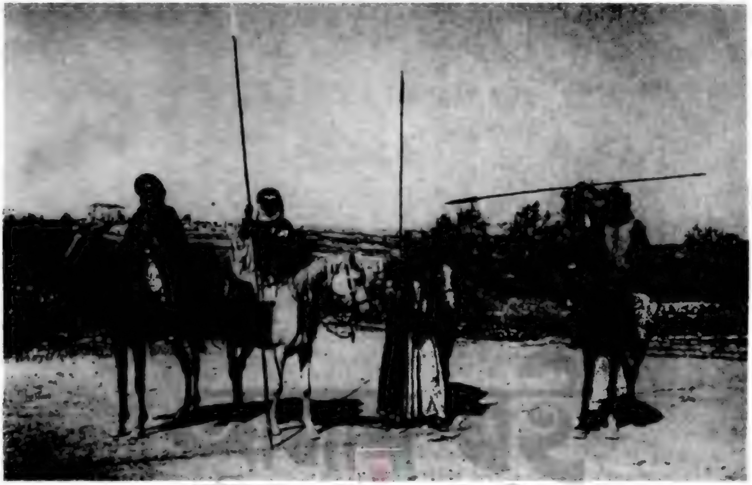

অশ্বপৃষ্ঠে চারজন বেদূঈন শ. ১৯০০ (জর্জ ইস্টম্যান হাউস)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ভারতে একটি প্রাচীন ধাঁচের মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে মৌলভিবৃন্দ বা ধর্মের বিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ।

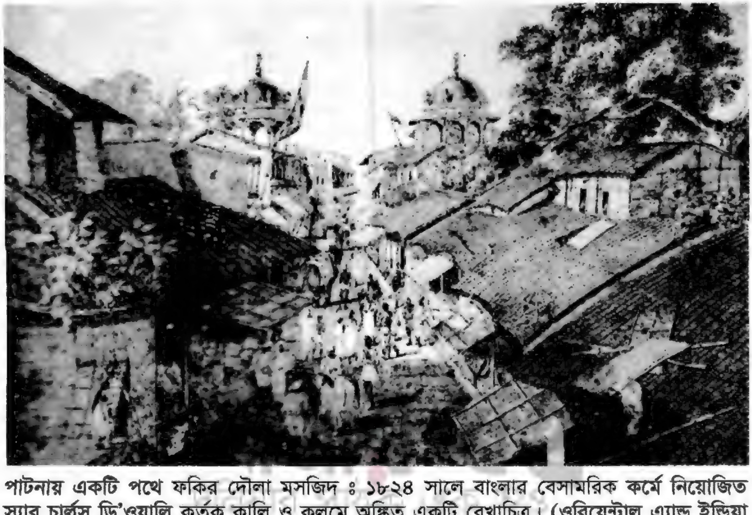

পাটনায় একটি পথে ফকির দৌলা মসজিদ ঃ ১৮২৪ সালে বাংলার বেসামরিক কর্মে নিয়োজিত স্যার চার্লস ডি'ওয়ালি কর্তৃক কালি ও কলমে অঙ্কিত একটি রেখাচিত্র। (ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড ইন্ডিয়া অফিস কালেকশন, ব্রিটিশ লাইব্রেরি)

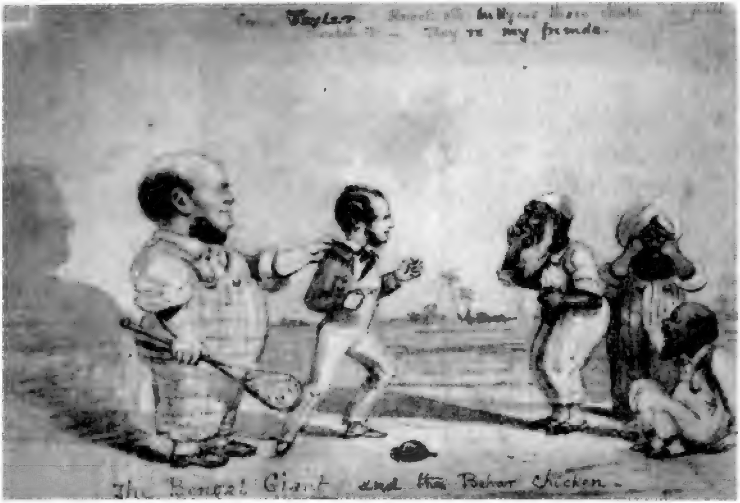
Taylor
They re my friends.
The Bengal Giant and the Behar Chicken.

'সতর্কীকরণ বা "নিরীহ ওয়াহ্হাবি ভদ্রলোকগণ" উইলিয়াম টেলরের ব্যঙ্গচিত্রের শিরোনাম যা ফ্রেডারিক হ্যালিডে (বাংলার দৈত্য)র হাতে র‍্যাকেট, তিনি ওয়াহ্হাবি মোল্লার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টায় রড উইলিয়াম টেলর (বিহার চিকেন) তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় অন্তরিত, মধ্যখানে মৌলভি আহমদুল্লাহ্। (ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড ইন্ডিয়া অফিস কালেকশন, ব্রিটিশ লাইব্রেরি)।

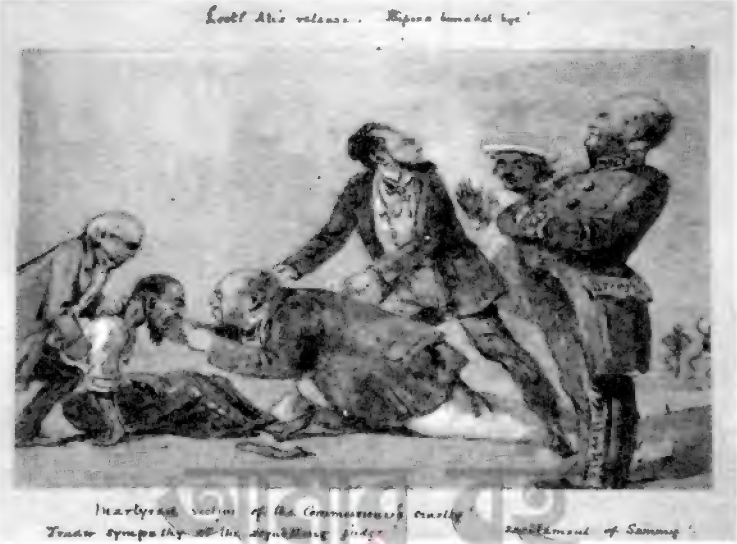
Lootf Ali's release.
Martyred victim of the Commissioner's cruelty.
Tender sympathy of the judge
of Sammy.

টেলরের আর একটি ব্যাঙ্গচিত্র, ১৮৫৭ সালে তাঁর চাকরির বরখাস্তের পরে অঙ্কিত, শিরোনাম 'লুতফ আলীর মুক্তি' এবং কমিশনারের নিষ্টুরতার শিকার শহীদ। স্বর্ণ-বেণী বিশিষ্ট লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে দেখছেন যখন টেলরের তিন সমালোচক পাটনায় (বাঁ থেকে ডানে, মেসার্স এলিওট, ফারকুহারসন এবং স্যামুয়েলস) টেলরের আটকৃত সন্দেহভাজন বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য করতে আসেন। (ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড অফিস কালেকশন, ব্রিটিশ লাইব্রেরি)

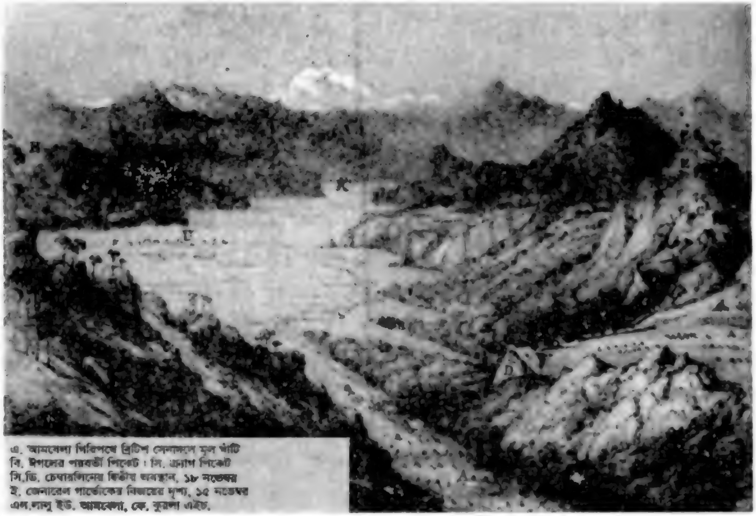
এ. আমবেলা গিরিপথে ব্রিটিশ সেনাদলের মূল ঘাঁটি
বি. ঈগলের পরবর্তী পিকেট। সি. ক্র্যাগ পিকেট
সি.ডি. চেম্বারলিনের দ্বিতীয় অবস্থান, ১৮ নভেম্বর
ই. জেনারেল গার্ভোকের বিজয়ের দৃশ্য, ১৫ নভেম্বর
এল.লালু ইউ. আমবেলা, কে. কুয়ালা এইচ.

আমবেলা গিরিপথ ও চামলা উপত্যকা ঃ ১৮৬৩ সালে আমবেলা অভিযান বিপর্যয়ের দৃশ্য। মালকার ওয়াহ্‌হাবি দুর্গ উপত্যকার পার্বত্য চূড়ায় অবস্থিত।

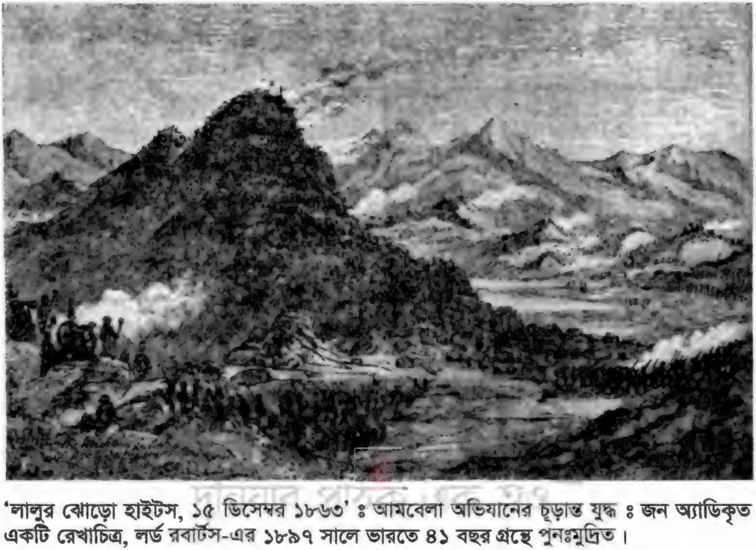

'লালুর ঝোড়ো হাইটস, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৩' ঃ আমবেলা অভিযানের চূড়ান্ত যুদ্ধ ঃ জন অ্যাডিকৃত একটি রেখাচিত্র, লর্ড রবার্টস-এর ১৮৯৭ সালে ভারতে ৪১ বছর গ্রন্থে পুনঃমুদ্রিত।

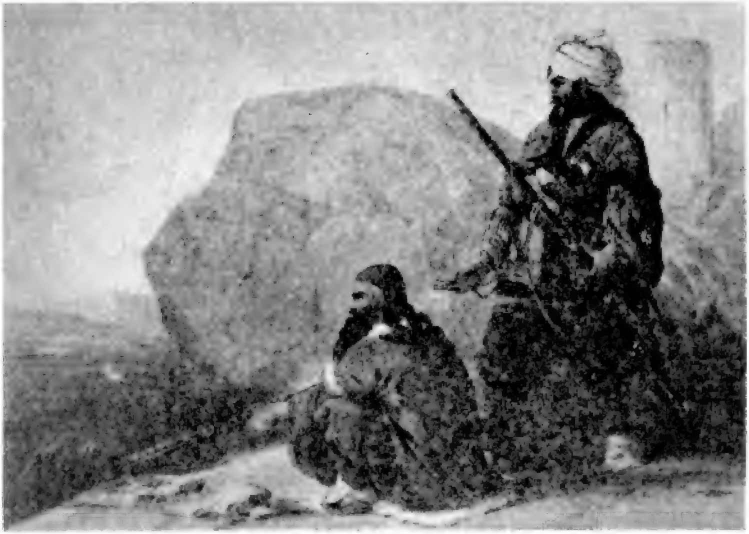

ওত পেতে থাকা পাঠানরা ঃ ১৮৪০ সালে লেফটেন্যান্ট জেমস র‍্যাটরে রচিত কসটিউমস অভ দ্য) ভেরিয়াস ট্রাইবস অভ আফগানিস্তান (আফগানিস্তানের বিভিন্ন উপজাতির পোশাক-আশাক) গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। (ব্রিটিশ লাইব্রেরি)

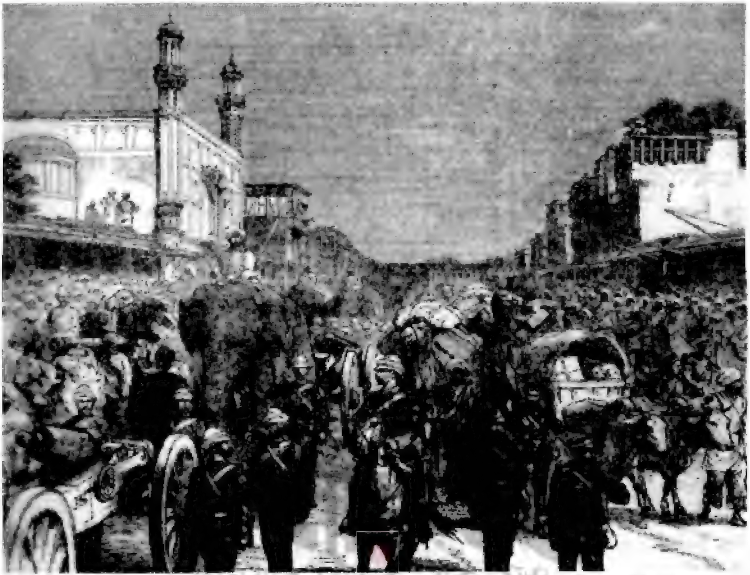

পেশোয়ার নগরীতে হস্তিবাহিত গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী একটি মসজিদ অতিক্রম করে ঃ ১৮৭৮ সালের ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ থেকে একটি খোদিত চিত্র। (ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ)

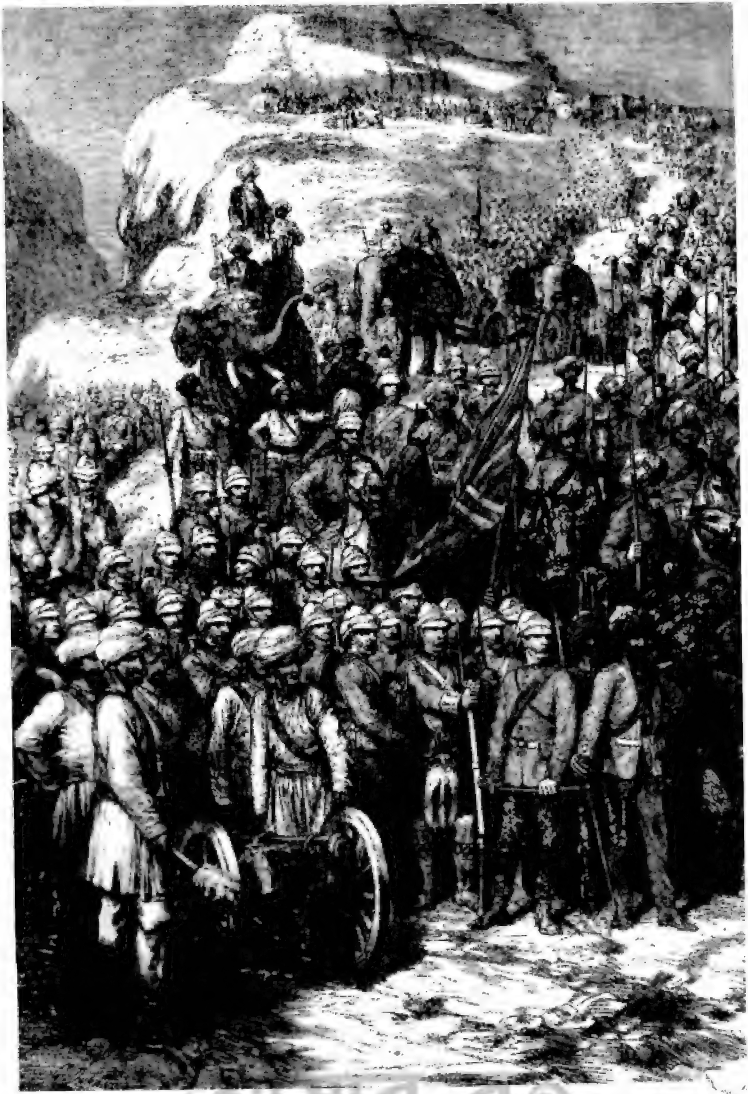

তৃতীয়বারের মত ব্রিটিশরা আফগানিস্তানকে হামলার প্রস্তুতি নেয় : একটি মনোমুগ্ধকর খোদিত চিত্র ১৮৭৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ থেকে নেওয়া হয়েছে। যখন ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাদল সমবেত হয় তখন তিন সেনাদলে বিভক্ত হয়ে আফগানিস্তান পাঠান এবং আফগানে যাত্রা করেন এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল তাদের চিত্র দখলকারী আক্রমণের কারণে–স্থানীয় পাঠন সংস্কৃতিতে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল।

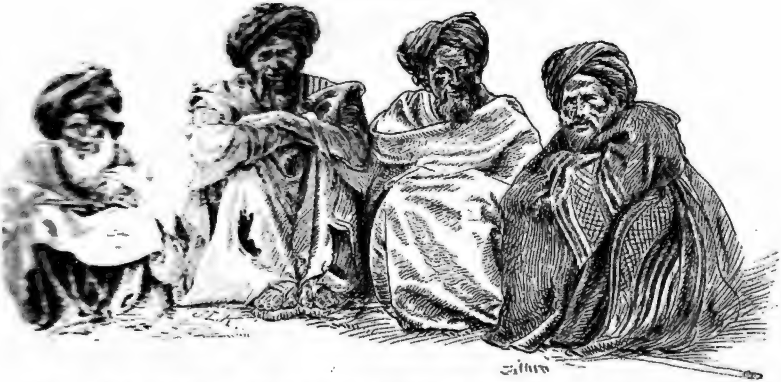

কবি ও লেখক কিপলিং-এর পিতা লাহোরে লকউড কিপলিং কর্তৃক অঙ্কিত কৃষ্ণ পর্বতের সাইদগণ। সাইদরা হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের জন্য আশ্রয়স্থল দান করে এবং তাদেরকে কৃষ্ণ পর্বত থেকে বিতাড়নের জন্য ১৮৮০ দশকে তিনটি অভিযান পরিচালনা করে। (স্যু ফ্যারিংটন)

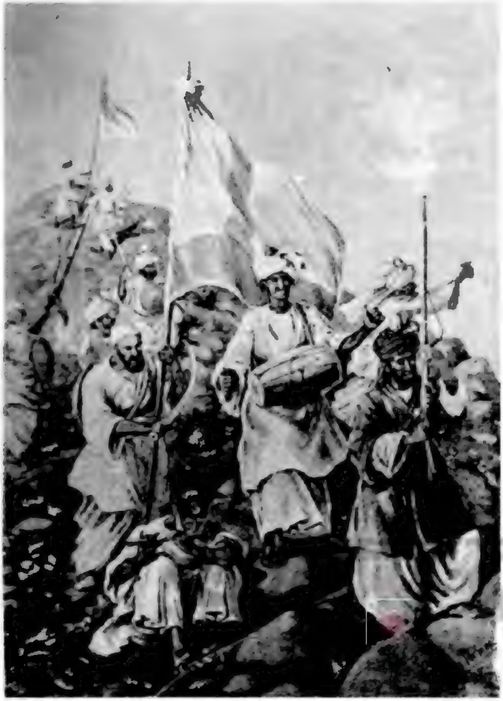

জিহাদের ঝান্ডা ঃ গাজিদের বা 'ধর্মীয় ধর্মান্ধদের' একটি দল তাদের শত্রুদের দিকে পতাকা উড়িয়ে, ঢোল বাজিয়ে ও শূন্যে তাদের লম্বা নলবিশিষ্ট চকমকি পাথর যুক্ত বন্দুকের গোড়া থেকে গুলি ছুঁড়ে এগোয়। ১৮৯৮ সালের ষোড়শতম ল্যান্সার, লেফটেন্যান্ট ডিক্সনকৃত জলরঙ। (স্যু ফ্যারিংটন)

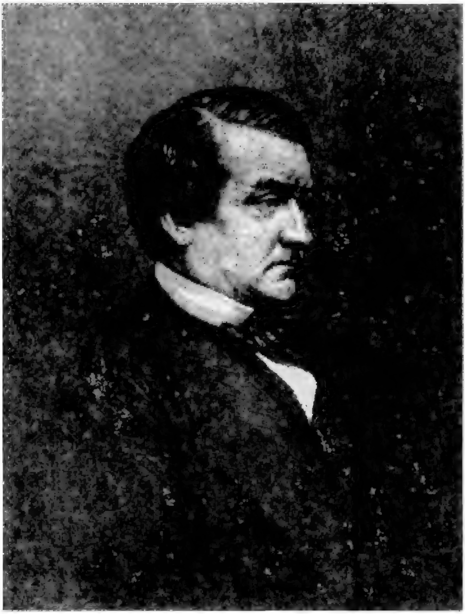

১৮৭২ সালে শহীদ বড়লাট, লর্ড মায়ো। তাঁর জনসমক্ষে ঘোষণা যে তিনি ওয়াহ্হাবিদের ধ্বংস করবেন। তাঁকে গুপ্তহত্যার লক্ষ্যে পরিণত করে।

বড় লাট লর্ড মায়োর গুপ্তঘাতক, শেরে আলী খান, ফাঁসিতে লটকানোর পূর্বে তাঁর শৃঙ্খলিত ফটক। যদিও এটি প্রমাণিত হয়নি। শেরে আলীকে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল ওয়াহ্হাবিদের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে লর্ড মায়োর ওয়াহ্হাবি ধর্মমতাবলম্বিদের ওপর নির্যাতনের বা নিপীড়নের প্রতিশোধ নিতে।

১৮৫৭ সালের ১০ মে রবিবার অবশেষে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত মহাবিপ্লব মীরাটে সহসা শুরু হয়ে যায়, দাঙ্গাকারী সৈন্য ও বেসামরিক জনগণের সেনানিবাসের মধ্য দিয়ে উত্তেজিতভাবে ছোটাছুটির মাঝ দিয়ে, ডাকবাংলায় গুলিবর্ষণ করে এবং ইউরোপীয়দেরকে দেখামাত্র হত্যা করার মধ্য দিয়ে। বেঁচে যাওয়া লোকজনের মতানুসারে, অধিকাংশ চিৎকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, 'দীন! দীন! ('এই পথ! এই পথ!') এবং 'আল্লাহ্-ই-আল্লাহ্! মারে ফিরিঙ্গী!' ('ব্রিটিশদেরকে হত্যা কর')। কোন ব্রিটিশ কর্মকর্তা দায়িত্বভার না নেয়ায় পঞ্চাশ জন মৃত ব্যক্তিকে পেছনে ফেলে বিদ্রোহীরা নির্বিঘ্নে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। মীরাটে ব্রিটিশ সেনাদলের উপস্থিতি সত্ত্বেও, সেনাপতি পশ্চাদ্ধানের আদেশ দিতে পারেন নি ও প্রাথমিকভাবে একজন সংবাদদাতাকে অশ্বারোহণ করে বিপদ সংকেতসহ দিল্লিতে পাঠাতেও অস্বীকার করেন। ফল হল যে পরের দিন সকালে বিদ্রোহীদের অশ্বারোহী সৈন্যরা বাধা-বন্ধনহীনভাবে পুনরায় ইউরোপীয়দেরকে দেখা মাত্র হত্যা করল, আর সম্রাট বাহাদুর শাহ্কে তাদেরকে গ্রহণ করার জন্যে বল প্রয়োগ করে দাবি করল যে 'রাজন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগদান না করেন, আমরা সবাই মারা যাব।' যদিও সম্রাটের পুত্রদের বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে নামমাত্র আদেশ দেয়া হয় তবে এটা ছিল ভারতীয় কর্মকর্তাদের বিদ্রোহী সেনাদল—সুবেদারগণ, অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধানগণ, ও জমাদারগণ আদেশ দিতেন, যে আদেশে থাকত ইউরোপীয় ও খ্রিস্টান কয়েদীদেরকে হত্যা করার ভয়াবহ নির্দেশ।

বিকৃত তারবার্তা সহসা ছেদ পড়ার আগে লাইনে লাইনে ছড়িয়ে পড়ে যার মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে অভ্যুত্থানের ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যে বিদ্রোহীদের নিকটে দিল্লির পতন ঘটে। বিস্ময়করভাবে বিদ্রোহ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যা থেকে বোঝা যায় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তেমন কোন সুশৃঙ্খল সমন্বয় না থাকলেও তাদের মাঝে যোগাযোগ বেশ ভালই ছিল।

যুদ্ধ আরম্ভের খবর নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই উত্তর হিন্দুস্তান ও পাঞ্জাবের সমস্ত বিভাগের সদর দফতরে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাটনায় এই সভা স্থানীয় বৃহৎ পুলিশ নজীব বাহিনীর সেনাপতির সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ইউরোপীয়দের মাঝে পাটনায় প্রথমে মারাত্মক ভাঙনের লক্ষণ দেখা দেয়, যখন দায়রা জজ মি. ফারকুহারসন প্রস্তাব দেন যে তাদের সবাইকে এক্ষুণি দীনাপুর সেনানিবাসের নিরাপত্তার জন্যে তাদের সঙ্গে ঘাঁটির রাজকোষ নিয়ে স্থানত্যাগ করে যাওয়া উচিত। এই প্রস্তাবকে অসহিষ্ণুভাবে কমিশনার টেলর 'সর্বনাশা আতঙ্ক'-এর কারণ হবে বলে খারিজ করে দেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকল ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যে তাদের সকলকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে বলে এক তেজস্বী বক্তৃতা দেন, উপদেশ যা ছিল 'তালি

দিয়ে সকল রব সমর্থন করে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।' মি. ফারকুরহারসনের প্রস্তাবের জবাবে তাঁকে তাঁর বাংলো ত্যাগ করে তিনি নিজে ও পরিবারসহ নগরের মাদক ভাণ্ডারে যেতে হয়, সেখানে তিনি বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেডারিক হ্যালিডের জামাতা সরকারের মাদক প্রতিনিধি গ্যারেটের সাথে মিলিত হন। পরবর্তী দুই সপ্তাহ এই দুইজন ও মি. গ্যারেটের সহকারী ড. লিল ছিলেন টেলরের ভাষ্যমতে, 'প্রত্যাশিত বিপদের আশঙ্কা করে অনবরত আবেদন জানান।' তাঁদের ভীতি অন্যদেরকে ও নতুন রেলওয়ে নির্মাণকারী শ্রমিকদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে ধর্মঘট করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের সঙ্গে তাঁদের আশ্রয়স্থলে যোগদান করে। অতঃপর গ্যারেট সাহেব টেলর সাহেবকে দুটি নিকটতম জেলা সদর দফতর আড়া ও ছাপড়া থেকে আনীত অর্থ তাঁর গোডাউনে গচ্ছিত রাখতে অনুমতি দেন নি এই কারণে যে যারা ঐ গোডাউনে বাস করছে তাদের বিপদ বৃদ্ধি হতে পারে। পরে তিনি তাঁর ভগ্নিপতি ফ্রেডারিক হ্যালিডেকে জানান যে তিনি রাজকোষকে গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু মি. টেলর তাঁর সাহায্য নিতে অস্বীকৃতি জানান।

কমিশনার এই বিশৃঙ্খল বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে তিনি বিভাগে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে যা প্রয়োজন তাই-ই করেন। যখন একই সঙ্গে যতটা সম্ভব পাটনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ান মওলা বকশ বুদ্ধি-পরামর্শের প্রক্রিয়া সহযোগিতা করে। মওলা বকশ ও প্রেরিত বেনামী একগুচ্ছ পত্র থেকে টেলর সাহেব জানতে পারেন যে 'সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয় রাত্রে, মসজিদগুলোতে ও গৃহগুলোতে উভয় স্থলেই, যদিও এই ধরনের গোপনীয়তা ও ধূর্ততায় প্রমাণ বা গ্রেপ্তার করা ছিল অসম্ভব। নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম বিভিন্ন পুনঃ পুনঃ বলে, যারা তাদের নাম গোপন করে, তবে জোর দিয়ে বিপদের পূর্বাভাস দেয়। তাঁর কাছে এটি মনে হয় স্পষ্ট যে 'কিছু অমঙ্গল ঘনিয়ে আসছে।' আর সেটি তিনটি এলাকা থেকে আসে। প্রথমত—নগরীর ওয়াহ্হাবিদের ও পড়শীদের কাছ থেকে। দ্বিতীয়ত—লক্ষ্ণৌর অভিবাসী ও গোঁড়া অনুগামী ব্যক্তিদের কাছ থেকে...। তৃতীয়ত—নগরীর চোর ও ইতর দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে।' এই তিনটির মধ্যে ওয়াহ্হাবিদেরকে টেলর সাহেব বিচার করেছিলেন তাদের নেতাদের মধ্যে যে সব ব্যক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়—'এই সম্প্রদায়ের কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত মৌলভি, খর্বকায় জরাজীর্ণ স্বল্প কুঞ্চিত চামড়ার বিদঘুটে চেহারার ছোট ছোট মানুষগুলো সরল প্রকৃতির, তবে তারাই সমবেত দর্জিদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল, কসাই ও নিম্নশ্রেণীর সর্বপ্রকার জনতার শামিল ছিল।' কঠোর নির্দেশনা ব্যতীত টেলর সাহেব কাজ করতে অসমর্থবোধ করেন, তবে তিনি তাঁর বাসভবন ও অফিসের কর্মক্ষেত্রে আবাসস্থলকে সরিয়ে নিতে শুরু করেন।

৭ জুনের সায়াহ্নে টেলর খবর পেলেন যে, টেলর তার নজীব পুলিশ বাহিনীর একজনের কাছ থেকে পত্র পেলেন, যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ভীতির মধ্যেই মধ্যেই ছিলেন। এটি নিকটবর্তী দীনাপুর সেনানিবাস থেকে এসেছিল আর এটি সিপাইদের এবং 'এক দিল' বা 'এক অন্তর' হিসেবে নজীবদের সম্বন্ধে তথ্য জ্ঞাপন করে। এটি জানান দেয় যে দীনাপুরে অবস্থানরত তিন বঙ্গ দেশীয় পদাতিক বাহিনী তাদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সেই রাত্রে অভ্যূত্থানের ফন্দি আঁটছিল, এবং নির্দেশনা দেয় যে যখন এই অভ্যূত্থান ঘটবে তখন বৃহৎ নজীব পুলিশ বাহিনীকে পাটনা রাজকোষ দখল করে নিতে হবে।

টেলরসাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তুত জরুরি পরিকল্পনা ছয় জেলার প্রত্যেক সদর দফতরে বিপদ সংকেত বার্তা পাঠিয়ে বাস্তবায়ন করেন এবং ক্যাপটেন র‍্যাটরে সাহেবকে আড়া থেকে তাঁর শিখ বাহিনী নিয়ে আসার আহ্বান জানান। পুনরায় তক্ষুণি পাটনায় তাঁর বাসভবনে সকল ইউরোপীয়কে তারা ও তাদের চাকর বাকরেরা যতটা সম্ভব বহন করা যায় সেই পরিমাণ বিছানা পত্র ও খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসার জন্যে ডেকে পাঠান। এক বছর পরে টেলর সাহেব লিপিবদ্ধ করেন, 'এক ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে প্রায় সব নারী-পুরুষ এবং বাচ্চারা বিছানাপত্র, জামাকাপড়, বালিশ, তোষক ও অন্যান্য ঘর কন্নার লটবহরসহ আসছিল।

টেলর সাহেব ছিলেন একজন ভাল গল্প বলিয়ে এবং তাঁর বর্ণনা যা তিনি দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে 'আওয়ার ক্রাইসিস; অর থ্রি মান্থস অ্যাট পাটনা ডিউরিং দ্য ইনসারেকশন অব ১৮৫৭, প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত জমকালো বর্ণনার মতই বিদ্রোহের এই বর্ণনা জীবন্ত। তিনি তাঁদের সংকটের এই প্রথম দিনে লেখেন, 'রাতটা ছিল সুন্দর ও সকলে সমবেত হওয়ার সময়, চন্দ্র উঠেছিল, এবং ভূমি ও বাগান প্রায় দিনের মত আলোকিত হয়েছিল।' তাঁর বাসভবনের প্রতিটি কক্ষই বসবাসকারীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

> এক কক্ষে, সব আকারের, বয়সের আর চেহারার, তন্দ্রালু, আড়াআড়ি ভাবে থাকা, নীরব ও তারস্বরে চিৎকাররত ছেলে-মেয়েদের দল, যতরকম কল্পনা করা যায় তেমনভাবে মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে; অন্য কক্ষটি একদল ভীষণ বিচলিত মহিলা কি হতে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় অবস্থান নিয়েছে; অদ্ভুত আয়ারা (চাকরানিরা) নিঃশব্দ পদচারণায় ইতস্তত চুরি করছিল, আর দুর্বোধ্য বোঝা বহন করছিল; বিক্ষুব্ধ ভদ্রলোকেরা, বন্দুক ও তরবারিধারী ভদ্রলোকেরা আর বন্ধুক ও তরবারিবিহীন ভদ্রলোকেরা দলে দলে পরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছিল; ভবনের বাইরে একদল নজীব বা স্থানীয় বৃহৎ পুলিশ বাহিনী মেজর নেশনের আদেশে জড়ো হয়েছিল, যখন হোমেসের নিম্নপদস্থ অশ্বারোহী সৈন্যরা দরজার নিকটে অশ্বে আরোহণের জন্য প্রস্তুত ছিল; গাড়ির ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ, শিশুদের চেঁচামেচি, পুরুষ মানুষদের কর্কশ কণ্ঠস্বর, চাকর-বাকরের চিৎকার—সব বাসভবনের একদিকে ভুলের বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল।

ঠিক প্রত্যুষের পূর্বে দৃঢ় পদ ভরে কুচকাওয়াজের শব্দ শোনা যায় ও ভীতির শব্দ ধ্বনিত হয়, তবে র‍্যাটরে সাহেবের শিখ বাহিনীর আগমনে সেই ভীতি দূর হয়। তাদের কুচকাওয়াজ তাদেরকে দীনাপুরের সামরিক ঘাঁটি অতিক্রম করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে সিপাইরা তাদেরকে উপহাস করেছিল, তাদের দলত্যাগী বলে অভিযুক্ত করে, আর জিজ্ঞেস করে তার 'কাফিরদের' হয়ে, বা 'দীন'-এর হয়ে যুদ্ধ করতে চায় কিনা। যাহোক, শিখদের বৃহৎ বাহিনীর অপ্রত্যাশিত আগমন সিপাইদের মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীদেরকেও ঘাবড়িয়ে দিয়েছিল, তারা তাদের পরিকল্পিত বিদ্রোহ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়। শিখ বাহিনী কমিশনারের বাসভবনের বাইরে অবস্থান নিয়ে নগরীর মধ্য দিয়ে টহল দিতে লাগে। তাদের তাৎক্ষণিক সংকট সমাপ্ত হয়।

যে কাজটি টেলর সাহেব করতে পারেন নি সেটি হলো তাঁর পরিকল্পনার কথা বাংলার লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ফ্রেডারিক হ্যালিডেকে অবহিত করতে পারেন নি। যাইহোক, ৮ই জুনের প্রথম বিষয় যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখেন। যেহেতু কলকাতা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ সংযোগ শুধুমাত্র সবিরাম চলছিল, তাই তিনি অশ্ব-ডাক ব্যবস্থায় এই প্রতিবেদনটি প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি নিজে র‍্যাটরে সাহেব ও তাঁর সুবেদার হেদায়েত আলী দীনাপুরে সেনানিবাসের সেনাপতি মেজর-জেনারেল জর্জ ললয়েডের সঙ্গে স্বল্পক্ষণের সাক্ষাতের জন্যে অশ্বারোহণে দীনাপুরে পৌঁছান। ললয়েড তাঁর পুরো যৌবন কালটা সিপাই সৈন্যদলে অতিবাহিত করেন। প্রথম ভারতীয় বিদ্রোহের ইতিহাসবেত্তার ভাষ্যমতে, তিনি 'দেশীয় সৈন্যদের পরীক্ষাকারী ও কঠোর অবস্থার অধীনে এবং সৈন্যদলের কতিপয় সেনাপতির মতামতের দ্বারা সুরক্ষিত প্রত্যক্ষ করেছেন, আর তিনি এখনও তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত। প্রামাণিকভাবে চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত করা সত্ত্বেও ললয়েড হ্যালিডের নিকটে সংবাদ পাঠান যে তাঁর সেনাদল শান্ত আছে আর শান্তই থাকবে যদি না কোন বস্তু তাদেরকে প্রলুব্ধ করে বা উত্তেজনা আক্রমণ করে। তখন তিনি টেলর ও র‍্যাটরে সাহেবকে অবহিত করেন যে তাদের ভীতি ভিত্তিহীন, আর তাঁর অধীনস্থ বঙ্গীয় তিন পদাতিক সৈন্যদল সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল। এই তিন সেনাদলের মধ্যে ছিল হেদায়েত আলীর একটি পুরোনো সেনাদল, বঙ্গীয় ৮ম পদাতিক বাহিনী, এই বাহিনীতে এখনও তাঁর চার ভ্রাতা জীবিত আছে। যখন তিনি পুরোনো সম্পর্ক পুনরায় গড়ার জন্যে তাদেরকে আহ্বান জানান, তিনি দেখেন আবহাওয়া সাংঘাতিক বৈরী এবং তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে যদি তিনি দীনাপুরে রাত্রিযাপন করেন তাহলে তাঁর জীবন দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে হবে তাঁকে।

শিখ বাহিনী পাটনায় বেসামরিক এলাকায় প্রহরার কাজ করে এখন প্রবল চাপে মরুভূমিতে এসেছে। 'মোহাম্মদী যারা আমাদের সেনাদলে আসত', হেদায়েত আলী লিপিবদ্ধ করেন, 'বলতেন "আলহামদুল্লিলাহ্, যে আমাদের, সম্রাট দিল্লির মসনদে পুনর্বহাল হয়েছেন।" যখন আমি তাদের এরকম কথা বলতে শুনতাম, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার মেজর ও কমিশনার ডব্লিউ টেলরকে জানাতাম...। তখন আমি কিছু সিপাইকে আদেশ দিতাম যে যদি কোন হিন্দু বা মুসলমান তাদেরকে এই রকম বিদ্রোহাত্মক কথা বলে তারা যেন তাকে তক্ষুণি গ্রেপ্তার করে। শহরবাসীরা জেনে সেনাদল দেখা ছেড়ে দিল।' সুবেদার এখন তাঁর সংবাদদাতাদের কর্মজাল প্রতিষ্ঠিত করল আর তাদের কাজ থেকে জানতে পারল যে কতিপয় বহিরাগত 'তারা দুই আনা ভাতায় অস্ত্রঘষা-মাজা ও মেরামতের কাজে ব্যবহারের জন্য লোক ভাড়া করার নিমিত্তে পাটনায় এসেছে। ১৩ই জুন আমি আমার আদেশকারী অফিসারকে এই বিষয়ে জানায়।'

হেদায়েত আলীর কাছ থেকে যা জানা গেছিল তা পূর্ব প্রাপ্ত বার্তা মারফত কমিশনার টেলরের প্রাপ্ত সংবাদকে আরও নিশ্চিত করেছিল। যাহোক, গোয়েন্দা ও সংবাদদাতাদের উপরে নির্ভরতা টেলর সাহেবের সরকারি সহকর্মীসহ ভালভাবে চলল না। সর্বাধিক ছিদ্রান্বেষীর মধ্যে ছিলেন পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট জে.এম. লিউইস, তিনি ২১ জুলাই টেলর সাহেবের কর্মপদ্ধতির অভিযোগ করে টেলর সাহেবকে লেখেন–'আমি গোয়েন্দাদেরকে ও তাদের গোপন সংবাদকে অবিশ্বাস করছি, কেবলমাত্র আমাকেই আপনার গোয়েন্দা (সংবাদ দাতা) আমার সাথে আপনার পরওয়ানা নিয়েই সাক্ষাত করে নি। এই সমস্ত বিবেকহীন ব্যক্তিদের হাতে ক্ষমতা পড়ে সন্ত্রাসী কর্ম ঘটে থাকে।' কমিশনারের এসব বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ছিল অন্যদের উপেক্ষা করা। অবস্থার প্রেক্ষিতে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তাকে নিজ বিভাগে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করা ঠিক হতো না। এই ঔদ্ধত্যের জন্য তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়।

১৯ জুন টেলর সাহেব কলকাতায় এগার দিন আগে প্রেরিত প্রতিবেদনের উত্তর লেফটেন্যান্ট-জেনারেলের কাছ থেকে পান। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে অভিনন্দন না পেয়ে তীব্র তিরস্কর পান। পরে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে লেখেন–

> আমার পত্র ৮ই জুনে লেখা হয়েছে, আমার সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি তাঁর (হ্যালিডের) ১৩ই জুন তারিখের উত্তর হতবাক হয়ে গ্রহণ করেছি, এই বলে যে তিনি বলেছিলেন, 'তিনি ভাবতেই পারেন নি পাটনার নিরাপত্তার এতটুকু হুমকির মধ্যে ছিল' এবং 'সিপাইদের বিদ্রোহ করা মোটেও ধারণার মধ্যে ছিল না।' আমি আমার পাঠকদের কাছে ধারণা করার দায়িত্ব দিলাম যে এ ধরনের

> পত্র পেয়ে আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল। মি. হ্যালিডে ছিলেন ৪০০ মাইল দূরে, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, সব খ্রিস্টানের জীবন বিপন্ন, আর মূল্যবান মুহূর্তগুলো বিধিমত আপত্তি বা বিতর্কে নষ্ট করা যাবে না।

পূর্বের দুই সপ্তাহের উপরে প্রতিটি পদ উত্তর হিন্দুস্তানে পুনরায় বিদ্রোহ সংঘটন বয়ে নিয়ে এসেছে। বঙ্গীয় সেনাদল বেনারস, এলাহাবাদ ও আজিমগড়ে তাদের সেনা কর্মকর্তাদের বিরোধী হয়ে ওঠে, অযোধ্যায় প্রায় অর্ধ ডজন বহির্মুখী জেলায় অবস্থিত সেনা সদস্যরা, স্যার লরেন্সকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে একই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন আর একই সাথে লক্ষ্মৌতে অবস্থানরত ব্রিটিশ বেসামরিক অভিবাসীদের মাঝে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীপূর্ণ একটি দূর্গের একটা ছোট অংশ একইভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। পাঞ্জাবে শোনা যাচ্ছিল সিপাইরা দলে দলে দিল্লির বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে, পাটনাতেই টেলরকে সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে পাটনাতেই 'একটি আন্তরিকতা' উন্নত হয়েছিল 'দরবেশীয় ভদ্রলোকগণ-এর মাঝে' যারা ওয়াহ্হাবিদেরকে ও ধনী ব্যাংকার লুতফ আলী খানকে নেতৃত্ব দিত। পরের জন ছিল একজন শিয়া আর এভাবেই সে ওয়াহ্হাবিদের স্বাভাবিক শত্রু, যেটি তাকে টেলর সাহেবের দৃষ্টিতে, 'একজন এই ধরনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন অস্বাভাবিক প্রজা। সম্ভবত ভয়ের কারণে নিজেদের ধর্মীয় বিশেষত্ব পরিহার করে ওয়াহ্হাবিরা লক্ষ্মৌ-এর বিদ্রোহীদের সাথে একাত্ম হয়েছিল। এই কারণেই টেলর অতর্কিত আগাম আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। টেলর সাহেবের নিজের কথায় 'আমি আপন মনেই শহরটিকে রক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, শহরটিকে উপদ্রব সৃষ্টিকারীদের কুমতলবের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য যতটা করণীয় করেছিলাম।'

তাদের মধ্যে দুজন সহকারী এখন কমিশনারের বাংলোতে বসবাস করছে তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম হচ্ছেন বিশ বছর বয়সী এডওয়ার্ড লকউড। তিনি অতি সম্প্রতি তাঁর প্রথম নিয়োগ পেয়ে পাটনায় এসেছে এবং তিনি এখন টেলর সাহেবের সম্মুখ বারান্দায় বালিশের নিচে রিভলভার ও তাঁর বিছানার পাশে একটি বন্দুক রেখে রাত্রি যাপন করে। পরবর্তী বছরগুলোতে লকউড পাটনায় তাঁর বিদ্রোহের দিনগুলি সর্বাধিক উত্তেজনাকর ও 'আনন্দময়' বলে স্মরণ করেন। বলতে গেলে তাদের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। 'আসল কথা হলো চুলগুলো খসে পড়বে, কিন্তু বিষয়টা এমনইভাবে গা সওয়া হয়েছিল যে আমরা কিছুই মনে করতাম না। কমিশনার যে স্বস্তিবোধ করেছিলেন তা সকলকে অবহিত করা হয়েছিল, এবং টেলর সাহেব আর র‍্যাটরে সাহেবের মাথার উপরে আমি যথেষ্ট আরামবোধ করেছিলাম।' ১৯ জুন কমিশনার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

লকউডকে বলেন যে তিনি একটি আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন 'সকল সম্মানিত স্বদেশীয়দেরকে' পরের দিন তাঁর বাসভবনে সাক্ষাতের জন্য, সেই কাজে তাঁর লকউডের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন তিনজন ওয়াহ্হাবি নেতা, টেলর সাহেব বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে 'তিনজন সংরক্ষণশীল মৌলভি শাহ্ মাহোমেদ হোসেন (সৈয়দ মুহাম্মদ হুসেন), মৌলভি আহমদ উল্লাহ্ (আহামদুল্লাহ্), ও মৌলভি ওয়ায়েজু-উল-হক।'

লকউড লিখেছেন, 'পরের দিন যখন আমন্ত্রণ পেয়ে তাঁরা আসেন, আমি তাঁদেরকে আমাদের বৃহৎ ভোজনালয়ে অভ্যর্থনা জানায়, আর তাঁদেরকে সকল ভদ্রতা সহকারে প্রণতি জানাই।' যখন সকল স্থানীয় সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন, তখন টেলর ক্যাপ্টেন র‍্যাটরে ও সুবেদার হেদায়েত আলীকে পাশে নিয়ে ভোজনালয়ে প্রবেশ করেন। যেনতেন আলোচনার পরে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় তবে তারপর, সবাই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ান, তিনজন ওয়াহ্হাবিকে পেছনে বসে থাকতে বলা হয়। টেলর সাহেব অতঃপর তাদেরকে থামানোর জন্যে মনস্থির করেছেন 'যতক্ষণ ব্যাপারটার মীমাংসা না হয় ততক্ষণ নিরাপদ রাখার।' তাদেরকে তাদের পাল্কিতে চড়ে পাটনার সার্কিট হাউস পর্যন্ত দেখতে হবে যেখানে র‍্যাটরে সাহেবের শিখ প্রহরী তাদেরকে নজরদারিতে রাখবে। সামগ্রিকভাবে তারা গ্রেপ্তার হয়েছিল—তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই গঠিত হয় নি।

তিনজনই এই সংবাদ বিশেষ শান্তভাবেই গ্রহণ করেন। আহমদুল্লাহ্ বিনীতভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে যা প্রশংসার দাবি রাখে। 'কমিশনার মহোদয় যা নির্দেশ দিয়েছেন তা আপনার দাসদের জন্য শিরোধার্য।' তরুণ লকউড প্রভাবিত হন সামান্যই 'একজন বৃদ্ধ সঙ্গী (সম্ভবত মুহাম্মদ হুসেন) আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন, আমার দিকে আড় চোখে চাতুরীর সাথে তাকানোর জন্যে তাঁকে অস্থির দেখাচ্ছিল যদিও আমাদের এই ছোট্ট খেলাটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না; কিন্তু আমি তাঁর ভীতিকে শান্ত করে দেই, আর বলিঃ "আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিন, আপনার নতুন উপাসনালয়ে,... যখন এই অশান্তিগুলো বিরাজ করবে তখন সম্মানের সাথে আপনি শান্তি উপভোগ করবেন, এবং আপনি অবসর সময়ে তসবিহ্ গুণতে ও কুরআন পাঠ করতে পারবেন।"

টেলর সাহেবের পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি যা করেছেন তা ওয়াহ্হাবিদের জন্য বিশেষ গ্রহণীয়... মনের সমস্ত আনুগত্য যা তারা নিজেদের পীর বা আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি সমর্পণ করেন। তিনি ওয়াহ্হাবিদের মতবাদ সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষ কসরত করেছিলেন এবং আশ্চর্য হয়েছিলেন যে এক অনুরাগী ভক্ত সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের

দেহমন উজাড় করে দিয়ে তার দেবতুল্য ঊর্ধ্বতন নেতার প্রতি আনুগত্যের শপথ টেলর সাহেব আশা করেছিলেন তাঁর অসাড় দেহটা স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কর্ম সম্পাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ থাকবে। তিনি বিশ্বাস করলেন যে তিনজনের দুইজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গৃহবন্দি করতে সক্ষম হয়েছে! এম এইচ—'সর্বশেষ গোত্রের অনুরাগী ভক্তরা ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের অনুমতি পাবার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের সর্বস্ব উজাড় করে নিজ দীক্ষা গুরুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন—'এবং টেলর সাহেব আহমদুল্লাহ্‌কে 'প্রধান মুরীদ বা শিষ্য হিসেবে মনে করেন, ও বলেছেন যে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন নেতার চেয়েও তিনি অনেক বেশি প্রভাবশালী।' এই পূর্ব অনুমানে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সঠিক।

সিত্তানায় বেলায়েত আলীর মৃত্যুর পর সমতলের ওয়াহ্হাবিদের সম্মিলিত আধিপত্যের অপরিহার্য দাবি পূরণ করে মুহাম্মদ হুসেন ও আহমুদুল্লাহ্ তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁরা দুজনই ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তি। এবং জ্যেষ্ঠ আমির হিসেবে মুহাম্মদ হুসেন হলেন পাটনায় ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের এই তিন প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের প্রধান, যেখানে আহমদুল্লাহ্, মুহাম্মদ হুসেনের প্রতিনিধি ও প্রধান উপদেষ্টার ভূমিকা পূরণ করা ছাড়াও পাটনায় তিনি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর পিতা এলাহী বক্স একাত্তর বছর বয়স্ক হওয়ায় দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ার কারণে পরিবার ও আন্দোলনের কোন তাৎপর্যপূর্ণ কাজ-কর্মে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করতে পারায় তিনিও কার্যত তাঁর পরিবারের প্রধান হন। প্রকৃতপক্ষে টেলর সাহেব আশা করেছিলেন এলাহি বক্সকে একই কৌশলে গ্রেপ্তার করার। কিন্তু এই বৃদ্ধলোকটি কমিশনারের বাংলার সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। হতাশ টেলর সাহেব তাঁর পথে বেরিয়ে গেলেন আহমদুল্লাহ্‌কে হুমকি দেখানোর জন্যে। তাঁর পিতার স্বাধীনতা নির্ভর করছে তাঁর নিজের সদ্ব্যবহরের উপর, এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন 'তাঁর জীবন তোমার হাতে তোমার জীবনটাও তাঁর হাতে।'

টেলর সাহেবের শত্রুরা অবশেষে এই শব্দগুচ্ছকে ভুল ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এটি ঐ বৃদ্ধ মানুষটিকে হত্যা করার একটি হুমকি, যেমন করে আফগান যুদ্ধের সময় তিনজন মোল্লাকে অন্তরীণ করেছিল যা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজের জন্য ব্রিটিশ দূত ম্যাকনাটেনের হত্যার সমতুল্য পর্যায়ের ঘটনা। লকউড ও অন্যান্যরা যারা উপস্থিত থেকে বিষয়টি অবলোকন করেছিল তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছে। লকউড বোঝাতে চান, 'আমার কাছে এটির মধ্যে একটি বিশাল বৈসাদৃশ্য দেখা দিয়েছিল যেমন একজনকে বাসভবনে ডেকে এনে হত্যা করা ও অপরটি তাকে আমন্ত্রণ করে হাতে ধরে রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমাকে হত্যা না করে।' টেলর সাহেবের এই বিষয়ের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নিজের কোন সন্দেহ ছিল না। 'এ পর্যন্ত আমি এই মানুষগুলোকে অবরুদ্ধ রাখাটাকে একটা ভয়ঙ্কর রকম

চাল বা নীতি মনে করে এবং কাজে ব্যবহার করে ভালই ফল পেয়েছি।' যাহোক, এই অবরুদ্ধ করার বিষয়টা বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিনা অনুমতিতেই করা হতো। টেলর সাহেব এ বিষয়টা পরবর্তীতে ফ্রেডারিক হ্যালিডেকে জ্ঞাত করান।

তিনজন ওয়াহ্হাবি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে, পরবর্তীতে সকল নাগরিককে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য কমিশনার এক আদেশ জারি করেন। এটি সান্ধ্য আইন দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, যার ফলে সন্ধ্যায় কেউ বাড়ির বাইরে আসতে পারত না। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে একজন মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট মওলা বক্স যাকে টেলর সাহেবের দক্ষিণ হস্ত বলে সন্দেহ করা হতো তাকেও লীগে থাকাকালীন নগরীতে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়। এই পদক্ষেপসমূহের কাঙ্খিত ফল পাওয়া গিয়েছি; পাটনা ও আশ-পাশের জেলাগুলো পারস্পারিক ভাবে শান্ত ছিল, আর ফারকুরারসন এবং অন্যান্য যারা অফিস গুদামে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে তাদের পদে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে প্ররোচিত করা হয়েছিল।

টেলর সাহেবের পাটনায় অগ্র-আক্রমণ অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে তাঁর ধারণাই ছিল না। কেন্দ্র থেকে কোন নির্দেশনা না থাকার কারণে উত্তরাঞ্চলের সমভূমিতে ওয়াহ্হাবি কর্মজাল নিজে নিজে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার কারণে সামগ্রিকভাবে তাদের আন্দোলন প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আর পাটনায় ছোট গোডাউন কার্যত বন্ধ হয়ে গেল, কাফেলার আন্দোলনের মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য অস্ত্র-শস্ত্র এবং অর্থের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সিত্তানার বড় গোডাউন স্থবির হয়ে পড়ে।

মধ্য-জুনের দিকে দিল্লি নগরীতে মুসলমানদের সামরিক ও বেসামরিক সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রাথমিকভাবে ছিল দিল্লির বাদশাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক জাগরণের বিপ্লব।

এটা স্মরণে রাখতে হবে যে বালাকোট বিভাগে সৈয়দ আহমদের শহীদ হওয়ার পর বেলায়েত আলীর নেতৃত্বাধীন 'পাটনা-বাসীদের' ও 'দিল্লিবাসীদের' মধ্যে সম্পর্ক পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বহুবর্ষব্যাপী ওয়ালিউল্লাহ্‌র পৌত্র শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি সৈয়দ আহমদের প্রথম দুইজন শিষ্য ছিলেন। ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর চাচাত ভাইয়ের মৃত্যুর পর, শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক ও তাঁর একদল শিষ্য আরবে বসবাস করতে গিয়েছিলেন। বহু বর্ষের অনুপস্থিতির পর তিনি ও তাঁর অনুসারীরা দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন, যেখানে শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক নিজেকে মৌলবাদীদের প্রধান পদ মর্যাদায় আসীন করেন যা তাঁর পিতার দ্বারা

স্থাপিত সাংস্কৃতিক বলয় কট্টর রক্ষণশীল পণ্ডিতরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৮৪৬ সালে শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাকের মৃত্যুর পর মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া ভেঙ্গে বেশ কিছু আন্তঃবিদ্যালয়ে পরিণত হয়, যেগুলোর অধিকাংশই স্পষ্টরূপে ওয়াহ্হাবি মতবাদপুষ্ট আর নেতৃত্ব দিতেন দিল্লির মৌলানা সাইদ নাজির হুসেন।

১৮০৫ সালে সাইদ নাজির হুসেন জন্মগ্রহণ করে পাটনার তিন পরিবারের এক প্রধান মুহাম্মদ হুসেনের সাদিকপুরের গৃহে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেছিলেন, এবং এখানেই তিনি ১৮২০ দশকের সৈয়দ আহমদকে কথা বলতে শোনেন। পরে তিনি শাহ্ আব্দুল আজিজের পদতলে বসার জন্য দিল্লিতে যান আর তখন তাঁর পুত্র ও উত্তরসূরি শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক সময়মত হাদিসের লক্ষণীয়ভাবে সম্মানিত শিক্ষক হন। এ পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা কেবল অনুমান করা চলে। তিনি পরবর্তীতে এই মর্মে অস্বীকৃতি জানান যে সাঁইত্রিশ জন উলেমার মধ্যে তিনি একজন যিনি ১৮৫৭ সালে নাজরানিদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার জন্যে জিহাদের ঘোষণায় সীল মোহর মেরেছিলেন। তবে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে তিনি যথার্থই সেটা করেছিলেন।

দিল্লির ফতোয়ায় স্বাক্ষরের বিষয়কে কেন্দ্র করে যথেষ্ট হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এ বিষয়ে জাল স্বাক্ষরের রটনাও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। এটা বোঝা যায় যে, বিদ্রোহের প্রতি কোনরূপ সমর্থনের নজির ঐ সমস্ত ভয়াবহ দিনগুলোতে জানাজানি হয়ে যাওয়ার মানে নিজের মৃত্যু পরওয়ানায় স্বাক্ষর করার মতই বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অবিসম্বাদি ঘটনাসমূহ যেগুলো ১৮৫৭ সালের ১৯ মের, মীরাট থেকে বিদ্রোহীদের আগমনের আটদিন পরে, এক দল মোল্লাহ্ নগরীর সর্বাধিক খ্যাতনামা জামা মসজিদে একটি পতাকা ঋজুভাবে টাঙ্গিয়ে দেয় এবং জিহাদ ঘোষণা করে একটি ফতোয়া প্রকাশ করে। এটা শোনা মাত্রই তিনি, সম্রাট পতাকাকে অপসারিত করে ফেলার আদেশ দেন ও জিহাদের ফতোয়াকে মহানির্বুদ্ধিতা হিসেবে দোষারোপ করেন কারণ এটা তাঁর হিন্দু সমর্থকদেরকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তাঁর কাজগুলো 'দিল্লি-বাসী' ওয়াহ্হাবিরা সমর্থন করে তবে খুবই ভিন্ন কারণে। সাইদ নাজির হুসেনকে বলা হয় তিনি এই জিহাদের ঘোষণাকে বিশ্বাসহীনতা, চুক্তিভঙ্গ ও অমঙ্গল আর জনসাধারণ্যে প্রচার করেন যে এতে অংশগ্রহণ করা একটা পাপ কর্ম। কিন্তু তাঁর অনুরূপ কারণসমূহ ছিল মূলত তাঁর মতবাদ সংক্রান্ত। তিনি ও অন্যান্য সুন্নি মৌলবাদীরা সম্রাটকে তাঁর শিয়া এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে 'একজন ধর্ম বিরোধী থেকে স্বল্প শ্রেয়তর' হিসেবে দেখলেন এবং তিনি সেখান থেকে দিল্লিকে দার উল-ইসলাম এর ক্ষেত্র হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সকল সাক্ষ্য থেকে জানা

যায় যে 'দিল্লি-বাসীরা' এবং অন্যান্য সুন্নি কট্টরপন্থীরা নগরীতে বিপ্লবীদের থেকে দূরে অবস্থান নেয় ও তাদের নিজেদের গুপ্ত কথা গোপন রাখে।

যাহোক ২ জুলাইয়ে 'তিন-চার সহস্র গাজি' (ধর্মযোদ্ধা, ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে ধর্মান্ধ) সহ সিপাই আগমনের সাথে সব কিছু পাল্টে যায়। এই গাজিদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গাজিকে নেতৃত্ব দেন সরফরাজ আলী, তিনি ওয়াহ্হাবি। তারা রহিল খন্ডের রাজধানী বেরিলি থেকে এসেছিল (সৈয়দ আহমদের জন্মস্থান অযোধ্যার রাই বেরিলির সাথে এটাকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না), যেটি প্রথম যুগে সমতলে আফগান-পাঠানদের সুরক্ষিত রক্ষা দূর্গ ছিল। সৈয়দ আহমদের সময় থেকে বেরিলি ওয়াহ্হাবিবাদের টঙ্কের পাঠান দূর্গ প্রাচীরের অংশ থেকে দূরবর্তী অবস্থান স্থল ছিল। বেরিলির সৈন্যবাহিনীর বৃহৎ অংশের নেতৃত্ব দেন গোলন্দাজ বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সুবেদার মুহাম্মদ বখত খান। দিল্লিতে পৌঁছিয়ে তাঁর প্রথম কাজ ছিল সোজা সম্রাটের নিকটে যাওয়া এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দেন এমন একটি যা বিভ্রান্ত বৃদ্ধ কর্তৃক কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হয়। বখত খান ও তাঁর সঙ্গে থাকা দুজন জ্যেষ্ঠ অশ্বারোহী কর্মকর্তা পরবর্তীতে ওয়াহ্হাবি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিল এবং সংঘর্ষ ঘটিয়েছিল এই কথার সত্যতা থাকতে পারে। কেননা এইখান থেকেই পরবর্তী ধাপ পর্যন্ত দিল্লিতে বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী দল জোরেসোরে বাহাদুর শাহকে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার জন্য চাপ দিতে থাকল। এই বিষয়ে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের ঘোর অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও। বখত খান নগরীতে সকল মোল্লাকে জড়ো করেন আর তাঁদেরকে আহ্বান করেন জোর করে দ্বিতীয় ফতোয়ায় তাদের দিয়ে সীল মোহরের ছাপ মারান, 'ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের কর্তব্য পালনার্থে মোহাম্মদীদের সঙ্গে যোগদান কর।' প্রাথমিকভাবে অনেকেই অনুরূপ কাজ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে মধ্য জুলাইয়ে আরও ছয় শ গাজি পৌঁছায়, এই সময় তারা টঙ্ক থেকে আসে। নিঃশর্তে মান্য তাদের অনেকেই ওয়াহ্হাবি—আর তাঁরা সৈয়দ আহমদের ধর্মে সাবেক আত্মোৎসর্গকারী, মোহাম্মদ ওয়াজির খান, যিনি বর্তমানে টঙ্কের নবাব তাঁর আশীর্বাদেই এসেছেন। এটা তখন মোল্লাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল যে জিহাদিদের এখন বলা হচ্ছে তাঁদের উপস্থিতি অনুসারে তাঁদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে সাত সহস্র—তারা তাদের মুসলিম সশস্ত্র ভ্রাতাদের সঙ্গে বঙ্গীয় সেনাবাহিনীতে একত্রে ছিল দিল্লিকে ধর্মীয় দেশে পরিণত করার জন্যে। এই সময়ে সাঁইত্রিশ জন ধার্মিক ব্যক্তি জিহাদের ফতোয়ায় সীল মোহর মারে এবং যথা সময়ে প্রকাশিত হয়।

অধ্যায় ছয়

১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগ

> বিদ্রোহ বসন্ত রোগের মত। এটি দ্রুত ছড়ায় আর যত দ্রুত সম্ভব এটিকে আবশ্যিকভাবে স্তব্ধ করে দিতে হবে।
>
> ১৮৫৭ সালের জুন মাসে জন নিকলসনের লেখা একটি
> পত্রের অংশ বিশেষ।

সিপাহী বিপ্লবে নিকলসন পনিরচালিত নিকলসন বাহিনী দ্বারা পাঞ্জাব সীমান্তে সিপাহী বিপ্লবের নির্দয় দমন ও অন্যান্য ঘটনাবলী সেনা সদস্যদের বর্ণনা মতে পাওয়া যায় যে এই ঘটনাটির মূলে ছিল কতকগুলি ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকর চিঠিপত্র। যেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল নাজানিদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটানো যা কিছু মোল্লা এবং ষড়যন্ত্রকারী সিপাহীদের মাধ্যমে সাহেবদের হস্তগত হয়েছিল। এই পত্রগুলোর একটি ২২ মে, মুসলমানদের ঈদের চতুর্থ দিনে রচিত বলে বিশেষায়িত হয়, অন্যটি মহাবন পর্বতের পূর্বদিকের ঢালে মৌলভি ইনায়েত আলী খানের অধীনে সরাসরি সমবেত হওয়ার তথ্য জ্ঞাপন করে।

সফল নিরস্ত্রীকরণ এবং ২১মে পেশোয়ারের প্যারেড ময়দান থেকে সৈন্যদলকে ভেঙ্গে দেওয়া সত্ত্বেও একদল বঙ্গ দেশীয় পদাতিকবাহিনী, ৫৫তম, হোটিমর্দনে বিদ্রোহ করে আর নিকটবর্তী পর্বত অভিমুখে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায়। জন নিকলসন ও অন্যান্যদের কর্তৃক বিদ্রোহীদের তাড়া দেয়ার কালে প্রায় অর্ধেকের মত সেনাসদস্য মারা পড়ে, পাঁচ শ সৈন্য বেঁচে গিয়ে সোয়াতের নিরাপত্তার জন্যে পৌঁছায়। তাদের জন্যে দুর্ভাগ্য, সোয়াতের পাদশা ও স্থানীয় সৈয়দ আহমদের পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ আকবর শাহ্ ২১ মে স্বাভাবিক অসুখেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতা সৈয়দ উমর শাহ্। তাঁর পিতা উপজাতীয়দের যে সমর্থন ভোগ করেছেন, তিনি তা জয় করতে পারেন নি। এই সমর্থনের অভাব সত্ত্বেও সৈয়দ উমর শাহ্ বিদ্রোহীদেরকে প্রতিহত করার

প্রস্তাব দেন ও তাঁর স্থায়ী সেনাবাহিনীতে তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করতে সম্মত হন। কিন্তু অধিকাংশ সিপাই-ই উচ্চ বর্ণের হিন্দু আর খুব শিগগিরি লক্ষ্য করল যে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয় নি। সোয়াতিরা ধর্মীয় নেতা সোয়াতের আখুন্দকে শ্রদ্ধা করত। তখন তিনি হস্তক্ষেপ করে সকল সিপাইকে তাদের রক্ষাকারী সৈয়দ উমর শাহ্‌সহ বিতাড়িত করার জন্য আদেশ দেন। তারা তাদের পথ সাইদদের স্বদেশ ভূমি বুনার পর্বতের পূর্বদিক বরাবর পথ তৈরি করে নেয় এবং দুইদলে বিভক্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ হিন্দু নিয়ে গঠিত বৃহত্তর দলটি কাশ্মিরের আশ্রয় পাবার প্রত্যাশায় তারা সিন্ধু নদ পার হয়; বাকিরা দক্ষিণে মৌলভি ইনায়েত আলীর ও তাঁর হিন্দুস্তানিদের সঙ্গে যোগদান করতে যায়।

এই সময়ে ইনায়েত আলীর মহাবন স্তূপ পর্বতে কমপক্ষে চারটি শিবির সিত্তানায় নিচু স্থানে একটি শিবির, মঙ্গল থানা ও নারিনজিতে পর্বতের উচ্চস্থানে দুটি দূর্গ, পাঞ্জতরের পেশোয়ার উপত্যকা বরাবর একটি গ্রাম। এই শেষেরটি ওয়াহ্‌হাবিদের নিকটে এসেছিল ইনায়েত আলীর সঙ্গে মৈত্রীর মাধ্যমে সেটি গঠিত হয়েছিল পাঞ্জতরের সর্দার মকুরাব খানকে সঙ্গে নিয়ে। তারা ২৩মে হোটি মর্দনে বিদ্রোহ করার পূর্বে নওশেরায় আগে থেকে গড়ে ওঠা ৫৫তম বঙ্গদেশীয় পদাতিকবাহিনীর পরাভবে ইনায়েত আলীর ভূমিকা অজানায় থেকে যায়। কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ পরে সশস্ত্র ও সিপাই এর সাজে শতাধিক সিপাই প্রায় সকলেই মুসলমান, তাঁর শিবিরে পৌঁছিয়ে তাঁকে ও তাঁর হিন্দুস্তানি মুজাহিদদেরকে প্রবল প্রেরণা যুগিয়েছিল। উত্তর হিন্দুস্তানে সাংঘর্ষিক অবস্থার কারণে পাটনায় নেতৃবৃন্দের ধর-পাকড়ের সংবাদ ইনায়েত আলীর কাছে এসে পৌঁছানো সম্ভব নয়। মধ্য-জুলাইয়ে যখন তিনি ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযানে ব্যর্থ হয় তখন পাটনায় এ খবর পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। এটি একটি হানাদার দলের আকার পরিগ্রহ করে, এটি তাঁর চাচাত ভাই মীর বাজ খান পরিচালনা করে, যা ইউসুফজাই সমভূমি জুড়ে বিস্তার লাভ করে, দুটি গ্রাম দখল করে, আর সেখানে 'মহানবীর শাসন প্রতিষ্ঠা করে।' সম্ভবত প্রত্যাশা ছিল যে আশ পাশের উপজাতীয় জনগণ তাদের পতাকা নিয়ে র‍্যালী করবে। এ ক্ষেত্রে, জিহাদিরা মূল সামরিক সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে নি, এবং পরের দিন প্রত্যুষে হঠাৎ তারা নিরস্ত্র হয়ে পড়ে। পেশোয়ারের কমিশনার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস পরে ২ জুলাইয়ের ঘটনাবলির উপরে একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন। মেজর ভৌগন (তখন মর্দনের দূর্গ পরিচালনায় রত ছিলেন) চার শ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ ও দুটি পাহাড়ি বন্দুক নিয়ে মীর বাজ খানকে হত্যা করেন, জান মোহাম্মদ খান নামে রোহিলা নেতাকে বন্দি করে, বিপ্লবীদের নেতা জুরীফের সঙ্গে তাকে ফাঁসি দেন, যে দুটি গ্রাম বিপ্লবে লিপ্ত

ছিল সেই দুটি গ্রামকে পুড়িয়ে ফেলেন, অন্যান্যদেরকে গুলি করে অমঙ্গলের এই স্ফুলিঙ্গকে স্তব্ধ করে দেন। এই দ্রুততার দৃষ্টান্তের থেকে আর কিছুই ভাল হতে পারে না।'

এই বিপর্যয়ের কারণে ইনায়েত আলী বাধ্য হয়ে পাঞ্জতর থেকে প্রত্যাহার করে পাহাড়ে আরো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিল। নারিনজি দীর্ঘ উপত্যাকার যে প্রান্তে তাঁর দূর্গটি মহাবন পর্বতের পশ্চিম ঢালু অবলোকন করছিল। এডওয়ার্ডস লিপিবদ্ধ করেন, 'এই পার্বত্য গ্রামটি এত দৃঢ়ভাবে অবস্থিত যে পুলিশরা তাঁর নিকটে যাবার সাহস কমই করত, এবং এটি হয়ে উঠল সকল দুর্বৃত্তের আশ্রয়স্থল। এর প্রায় চার শ অধিবাসী সানন্দে মৌলভিকে অভিবাদন জানায়। ধর্মযুদ্ধ মনে হয় মঙ্গলজনকভাবে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ে শুরু হয়ে গেলঃ একজন ইমাম, একটি পতাকা, এক দৃঢ় মানসিকতা, একদল সোচ্চার ধর্মান্ধ ব্যক্তি, কয়েক দিনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা।' কিন্তু এখানেও হিন্দুস্তানিরা অতর্কিতে ধরা পড়ে যায়, ২১ জুলাইয়ের প্রত্যুষে গোলাগুলির শব্দে গ্রামটি ও জেগে ওঠে—যা ছিল আটশ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের ভূমিকা স্বরূপ। তারা এবং বিদ্রোহী সিপাইরা তাদের পতাকা ও মৃত সঙ্গীদের ফেলে পলায়ন করে।

সকল বর্ণনায় দেখা যায় ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকালটা ছিল প্রচন্ড উষ্ণ, আর মেজর ভৌগনের লোকজনও পার্বত্য এলাকায় উঠে তাদেরকে ধাওয়া করে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতি ইনায়েত আলীকে দল পুনর্গঠনের সুযোগ করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর সিত্তানা ও মঙ্গলথানা থেকে প্রয়োজন মত সৈন্য জড়ো করে নারিনজি দখল করেন, তিনি তাঁর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্যে এখানকার অত্যুচ্চ স্থানে আস্তানা পুনর্নির্মাণ করেন। পাটনা ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে মুজাহিদ বাহিনীর বহর ঢেউয়ের মত আসার অপেক্ষায় তিনি ওখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নির্ভরতার সাথে প্রত্যাশা করেছিলেন ওয়াহ্হাবিরা হিজরত ও জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের পতাকাতলে এসে সমবেত হবে। ফলে কমিশনার টেলর পাটনায় সার্বিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেন, সেই সৈন্য সরবরাহ তথাপি এসে পৌছায়নি, ৩ অগাস্টের প্রত্যুষে এক ব্রিটিশ বাহিনী প্রায় দ্বিগুণ আকারে নারিনজিদের উপর প্রথম আঘাত হানে :

> গাজিরা কয়েকটি ভয়ঙ্কর পরিখা খনন করেছিল, এবং একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভাকারের সেনাবাহিনীকে তাদের সম্মুখে অগ্রসর হতে দেখে তারা চিৎকার করে নেচেছিল। তাদের সোচ্চার ধ্বনির জবাবে দ্বিতীয় সারির নেতৃত্বে থাকা লেফটেন্যান্ট হোস্ট নৌরঞ্জি থেকে ব্রিটিশ হর্ষধ্বনি দিয়েছিল। একটা সাধারণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, গাজিদের মধ্যে ৩০ জন দুর্দমভাবে যুদ্ধ করতে

পর বিশ্বাসঘাতকতা করে নির্মমভাবে নস্যাৎ করা হয়। তার তিন দিন পর স্যার হেনরি লরেন্সের লক্ষ্ণৌতে অবস্থানরত আটকা পড়া বাহিনী এমনইভাবে পরাজিত হয়েছিল যে মনে হচ্ছিল তারা পুরোপুরিভাবে ধ্বংসের উপকণ্ঠে পৌঁছাচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যে এই দুই বিপর্যয়ের সংবাদ পাটনায় পৌঁছিয়ে গিয়েছিল, এবং ৩ জুলাই এক বিশাল দাঙ্গাকারী জনতা নিজ শহরের মাঝখানে রোমান ক্যাথোলিক মিশনে পতাকা উড়াতে উড়াতে ড্রাম বাজিয়ে দীন! দীন! গীত গেয়ে আক্রমণ করে। দাঙ্গার কথা দ্রুত কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং র‍্যাটরে সাহেবের শিখ বাহিনীকে পাঠানোর জন্য পুনরাদেশ দেন। দাঙ্গার দ্রুত অবসান হয়েছিল, তবে এরই মধ্যে আফিম (মাদক) ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি ড. লিলকে হত্যা করা হয়েছিল। একজন আহত দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে র‍্যাটরে সাহেবের দ্বিতীয় সারির কর্মকর্তা সুবেদার হেদায়েত আলী তাঁর বিশ্বাস অর্জন করেন ও কথা বলতে লাগেন। এই কথোপকথন একত্রিশজন অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করতে নেতৃত্ব দেয়, এদের মধ্যে এক পুস্তক বিক্রেতা পীর আলী খান ছিলেন, ‘নিজের ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং অপর ধর্মের ও ইংরেজদের প্রতি ঘৃণার জন্য তিনি বিশেষ নাম কুড়িয়েছিলেন।’ টেলর সাহেব ইতিমধ্যে এই পরামর্শ সহকারে তথ্য পেয়েছিলেন যে পীর আলী খান লক্ষ্ণৌ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে এই মোর্চার আদেশসমূহ পেতেন এবং এখন তার অধিকারে থাকা এক গুচ্ছ পত্র এটি নিশ্চিত করেছে। সেগুলো লক্ষ্ণৌর সঙ্গী বিক্রেতার নিকট থেকে এসেছিল আর এতে নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল কিভাবে পীর আলী যখন পুনরায় হাসিল করবে ফুতেহ উপের নাসারা বা নাজারিনদের উপর বিজয়। পাটনায় ওয়াহ্হাবিদের নেতৃবৃন্দকে প্ররোচিত করে বিপ্লবে এই কারণে লক্ষ্ণৌর সংবাদদাতার উৎসাহে বিদ্রোহীদের ভারতের ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এতে যদি তাদের হিন্দু বা শিয়া সম্প্রদায়ের সাথেও আপোষ করতে হয় তাতেও আপত্তির কিছু ছিল না।

এই সমস্ত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের টেলরের গঠিত জরুরি বিচার সভায় বিচার করা হয়, আর বিভিন্ন অপরাধে দোষী হয়, পীর আলী ও অন্য ষোলজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছিল। মৃত্যুদণ্ডের আদেশের অল্পক্ষণ পূর্বে পীর আলীকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য টেলরের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে টেলর সাহেব লেখেন, ‘তিনি ছিলেন শান্ত, আত্মস্থ ও প্রায় মহীয়ান।’ ‘আমি তাঁর উপর যে নির্যাতন করেছিলাম সে জন্য তিনি আমাকে উপহাস করেছিলেন এবং এই কথা দিয়ে তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানেন, “আপনি আমাকে ফাঁসি দিতেন, অথবা প্রতিদিন এ রকম আমার মত, তবে আমার স্থানে হাজার হাজার বিপ্লবীর উত্থান হবে, আর আপনার উদ্দেশ্য কখনই হাসিল হবেনা।’

শেষ পর্যায়ের গ্রেপ্তার অভিযান পরিচালনান্তে বিল টেলর দিল্লির বিদ্রোহীদের সাথে পাটনার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

আশু আশঙ্কা দূর হয়, কমিশনারের বাংলোতে আশ্রয় নিয়ে ইউরোপীয়রা কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছিল। সার্কিট হাউসের সম্মুখের মুক্ত চত্বরটা গ্রেপ্তারকৃত ওয়াহ্হাবি নেতাদের খেলাধূলা ও বিনোদনের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। যে বিষয়ে এডওয়ার্ড লক উড লেখেন, 'আমরা শিখদেরকে ক্ষিপ্রতা ও শারীরিক শক্তি পরীক্ষার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলাম। ওয়াহ্হাবিরা তাদের বাসভবনের বারান্দায় বসে তসবিহ্ জপত, আমাদের নাটকীয়তা লক্ষ্য করে তারা নিশ্চিত বলল যে এগুলো ভদ্রলোকদের উপযুক্ত নয়। তাদের ফ্যাজিনের মত চেহারা দেখে বোঝার উপায় ছিল না, যাতে অনুচ্চ প্রতারণার সাথে মিশ্রিত হয়েছে হিংস্রতা, তারা সন্তুষ্ট না তা নয়, এইজন্যে যে তারা কখনো উচ্চ হাস্যে বা মৃদু হাস্যে হাসে নি।'

সন্ধ্যার সময়গুলো লকউড ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দ অন্য উপায় প্রয়োগ করে নিজেদের শক্তি বজায় রাখে

> মাঝে মাঝে আমরা নৃত্য করতাম—বল্লম অশ্বারোহী সৈন্যরা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়ে—এতে সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে যোগদান করত। আমরা কোন কোট পরিধান করতাম না, তবে বেশ রং-চং-য়ে গ্যারিবল্ডি জ্যাকেট পরিধান করতাম, আর চামড়ার বেল্ট কোমরে লাগাতাম তাতে থাকত রিভলভার, খুব কমই সেগুলো সরিয়ে রাখা হতো, বেল্টের সঙ্গেই থাকত ঐটি এবং দেশে প্রস্তুত তামাটে নয় এমন জমকালো চামড়ার জুতো পরতাম। এগুলো আমাদের উপরে এসে অবতীর্ণ হচ্ছিল যার মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপিত গেঁয়ো লোকদের মতই আমাদেরকে দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয় সকলে নিজ উৎসাহে যার যা ইচ্ছা তাই করছিল এবং যখন বাঁশি বাজানো হয়েছিল, আমরা সকল আবাল-বৃদ্ধ এক সাথে ঘুরতে গেলাম, যারা ধূমপান করত তারা গীর্জার প্রহরীর পাইপ ব্যবহার করেছিল। যা কেউ কোনভাবে যোগাড় করেছিল, এর প্রতিক্রিয়াটি খুবই হাস্যকর হয়েছিল। আর আমাদেরকে এমনই নির্বোধ দেখাচ্ছিল যে না হেসে থাকতে পারিনি।

বিল টেলরের বাসভবনে যারা অবস্থান করছিল বিল টেলরই সেই সময় সভার মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। 'কমিশনার তাঁর সফল পন্থার জন্যে রোজ ভারতের সর্ব জায়গা থেকে অভিনন্দন বার্তা পাচ্ছিলেন।' তাঁর তরুণ সহকারী লিপিবদ্ধ করেন। 'প্রকৃত পক্ষে আমাদের কয়েকজন মিসেস টেলরকে তাঁর স্বামীর সম্ভাব্য সাহসিকতার সুবাদে উচ্চতর পদ প্রাপ্তির দিকে চেয়ে 'মাই লেডি' বলে সম্বোধন করা শুরু করেছিলাম।' যাহোক, এখন এক মারাত্মক বিবাদ শুরু হয়ে গেল একদিকে টেলর ও পাটনার কালেক্টর মি. উডকক, এবং অন্যদিকে দায়রা জজ

ফারকুহারসন, ও দুইজন ম্যাজিস্ট্রেট, মি. লিউস এবং মি. এলিওট-এর মধ্যে। প্রথম পক্ষ মনে করল দ্বিতীয় পক্ষ তাঁদের কর্তব্য কর্মে আইনকে সমুন্নত করতে পারছে না ও ভীরুতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় পক্ষ ধারণা করল যে টেলর কলকাতার বিচার বিভাগের অনেক আইন লঙ্ঘন করে লোকজনকে গ্রেপ্তার করে প্রমাণ ব্যতিরেকে সন্দেহের বশে কর্মকর্তার সঙ্গে যথাযথ পরামর্শ ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছিলেন আর কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সহকর্মীদের পরামর্শের বিরুদ্ধে গিয়েও, সুতরাং এভাবেই তিনি তাঁর সমালোচকদের রসদ যোগান দিচ্ছিলেন। কলকাতা ও পাটনায় টেলরের শত্রুরা ইতিমধ্যে তাঁর পতন করার কাজ সম্পন্ন করছিল।

মেজর-জেনারেল ললয়েডের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও দীনাপুরের সেনানিবাসে বঙ্গীয় পদাতিক বাহিনী তাদের আনুগত্যের বিষয়ে টেলরের সঙ্গে গোলযোগ অব্যাহত রাখে। তাঁর আতঙ্ক অবশেষে বোঝা গেল ২৫ জুলাইয়ের মধ্যাহ্নে সুবেদার হেদায়েত আলী যখন 'উত্তেজিত অবস্থায়' তাঁর অফিসে আবির্ভূত হয়ে বলেন যে 'সিপাইরা বিদ্রোহ প্রবণ' তার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখাচ্ছে। এর পরেও মেজর-জেনারেল ললয়েড তাঁর বঙ্গীয় পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে নিরস্ত্র করলেন না, করলেন আপোষ। ব্রিটিশ এক বিশাল পদাতিক বাহিনী, স্টীমারে চড়ে প্রমোদ তরীতে ওঠে, উজান নদীর পথ ধরে বেনারসে যাবার পথে সম্প্রতি তারা দীনাপুরে পৌছে। তাদের উপস্থিতিতে উৎসাহ পেয়ে, তিনি এক সাধারণ কুচকাওয়াজের আদেশ দেন এতে সিপাইদেরকে তাদের বন্দুক পরিচালনার পারকুসন ক্যাপ সমর্পণ করতে হয়। যাহোক, বেশ অনির্বচনীয়ভাবে কুচকাওয়াজ হতে থাকে যখন ব্রিটিশ সেনাদল, সম্রাজ্ঞীর ১০ম পদাতিক বাহিনী ভোজনালয়ে প্রীতিভোজ খাচ্ছিল আর যখন তিনি নিজে দীনাপুরে নোঙ্গর করা স্টীমারে বসে মধ্যাহ্ন ভোজ খাচ্ছিলেন। যে মুহূর্তে প্রথম কোম্পানিকে পানিকুসন ক্যাপ হস্তান্তর করতে বলা হলো। তারা নিজেদের অবস্থান পরিত্যাগ করে দৌড়ে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে তাদের কর্মকর্তাদের উপর গুলি বর্ষণ করতে থাকল।

টেলর সাহেব হঠাৎ করে একটা আতঙ্ক সংবাদ ছড়ালেন 'বন্দুকের সংকেত শোনার আগে সকলকে আমার নিজ বাসভবনে ডেকে আনার সমন দিলেন এবং তাই সকলের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, আর বুঝলাম যে খেলা শুরু হয়ে গেছে। গাদা বন্দুকের ঘর্ঘর শব্দ হতে থাকল, যাকে টেলর ও তাঁর বাংলোতে সমবেত জনমণ্ডলী মনে করল ব্রিটিশ সেনাদলের থেকে বিদ্রোহীদেরকে গোপন করছে। 'যখন আমরা গুলির শব্দ শুনলাম যা পাটনা থেকে শোনা যাচ্ছিল, তখন আমরা হিসাব করলাম না জানি কত বিদ্রোহী ধ্বংস হলো। কেউ বলল ৬০০, অন্যান্যরা বলল সম্ভবত পাঁচ শতাধিক নয়।

কিন্তু দীনাপুরে একটার পর একটা বিপর্যয় ঘটতে থাকল। গুলির শব্দ শুনে ভোজনালয়ের ব্রিটিশ সেনাদল ছুটে বেরিয়ে গেল প্যারেড ময়দানে, তবে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এসে তাদের কোন আদেশ দিল না, মেজর-জেনারেল ললয়েড বুঝেছিলেন যে 'স্টীমারের উপরে তিনি উভয়ই বন্দুক ও সৈন্যদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবেন।' তাদেরকে অস্ত্র ও গোলা বারুদসহ দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যান।

ভাগ্যক্রমে তিন সেনাদল পাটনা অভিমুখে যাবার জন্য পশ্চিম দিকে রাজপুত জমিদার রাজকুমার সিংহের সঙ্গে যোগদানের অভিপ্রায়ে বেসামরিক এলাকা ও শাহাবাদ জেলার মহকুমার দিকে রওয়ানা হলো। তিনি এখন নিজেকে রাজপুত সাত সহস্র সৈন্য বিশিষ্ট সেনাদলের প্রধান করেন এবং দুই সেনাদল তারপর শাহাবাদ জেলা সদর দফতর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। ছোট্ট শাহের আড়া। এখানে বয়েল সাহেব নামে স্থানীয় একজন প্রকৌশলী অনেক দিন ধরে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের উপহাস সহ্য করে যাচ্ছিলেন কেননা তিনি তাঁর বিলিয়ার্ড হলকে সুরক্ষিত দূর্গ ব্যবস্থার মধ্যে সুদৃঢ় অংশে রূপান্তরিত করেছিলেন। এটি এখন আড়ার কালেক্টর হেয়ারওয়াল্ড ওয়েক, মুসলিম প্রতিনিধি, আর চৌদ্দজন ব্রিটিশ এবং ইউরো-এশীয়সহ অফিস কর্মচারীদের আশ্রয়স্থলে রূপান্তরিত হয়। তাদের সঙ্গে ছিল র‍্যাটরে সাহেবের বৃহৎ পুলিশ বাহিনীর পঞ্চশজন শিখ সদস্য, যাদেরকে মাত্র কিছুদিন পূর্বে টেলর সাহেবের ব্যবস্থাপনায় পাটনা থেকে আড়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২৭ জুলাইয়ের সকালের দিকে তিন বিদ্রোহী সেনাদল সুবিন্যাস্তভাবে আড়ায় প্রবেশ করে স্থানীয় নুজীব পুলিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে স্থানীয় কারাগার থেকে বন্দিদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যায়, আর তারপর বন্দুকের গুলি বর্ষণ করতে লাগে। যে কারাগারটি পরে 'আড়ার ছোট্ট ভবন' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। সেই দিন বিকেলে তারা কুমার সিংহের বাহিনীতে যোগদান করে তারা একত্রে আরও দশ সহস্রাধিক সৈন্যের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে। শিখ বাহিনীকে বিলিয়ার্ড হলকে প্রতিরোধ করার জন্যে পক্ষ পরিবর্তন করতে, যার মধ্যে উৎকোচ ও হুমকি ছিল, সম্মত করাতে সব ধরনের প্রয়াস চালানো হয়। ঐ অবরোধকারীদের একজনের ভাষ্যমতে, ঐ শিখেরা 'লোকগুলো' (ইউরোপীয়দের)কে নাস্তা বানিয়ে খেয়ে ফেলতে পারত', তবে তারা সেখানে অবস্থান করে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে বেছে নিল।

পাটনায় পূর্ব অবসান হিসেবে ধরে নেয়া হয় যে তাদের বন্ধুরা আড়ায় নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। এডওয়ার্ড লকউড লিখেছেন, 'আমরা মনে করেছিলাম তারা সকলে মারা গেছে, তবে, যদি তারা কিছুক্ষণের জন্যে প্রতিরোধ করে থাকতে পারত, তাহলে সম্রাজ্ঞীর ১০ম সৈন্যবাহিনী তাদেরকে উদ্ধারের জন্যে পাঠানো যেত, এবং আমার সঙ্গে বসবাসরত ওয়েক সাহেবের চাচাত ভাই রস

ম্যাঙ্গলস স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাদলে যোগদান করল। আমিও স্বেচ্ছাসেবকের কর্ম করেছিলাম, তবে কমিশনার আমাকে যেতে দেন নি। টেলর সাহেব যে নাটকীয়তা ও উত্তেজনা প্রদর্শন করলেন তা এই বক্তব্যে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় না, মেজর-জেনারেল ললয়েডের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, তিনি পাটনা সুরক্ষার জন্য দীনাপুরের সৈন্য প্রত্যাহার স্থগিত করেন, এবং কিছু সাধারণ পরিবর্তন করে আড়াতে সৈন্য প্রেরণ করেন। টেলর সাহেব বলেছিলেন, 'আমি এই ব্যবস্থার প্রতি দ্বিমত পোষণ করে বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলি। অবশেষে সে কথাই সম্মত হয়ে ললয়েড সাহেব সম্রাজ্ঞীর দুই শ পদাতিক সৈন্য দিয়ে তাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। তাদেরকে স্টীমারের বার্জে ভর্তি করে উজানে পাঠানো হয়েছিল, স্টীমারটা বালির চরে আটকা পড়ে গিয়েছিল। প্রধান সেনাপতি এখন ত্রাণ অভিযান প্রত্যাহার করে নেন—যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্টীমার অপ্রত্যাশিতভাবে দৃষ্টিগোচর না হয়। আরও কিছু সময় ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে টেলর আবারও ললয়েডের সিদ্ধান্ত বদলাতে সক্ষম হন, যাতে ২৯ জুলাইয়ের অপরাহ্নে দ্বিতীয় স্টীমারে আরও দুই শ সৈন্যসহ প্রথমটিকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সম্মিলিতভাবে আড়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। টেলর সাহেব লিখেছেন, 'এই সাহসী ক্ষুদ্র দলটির মুক্তির ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ কল্পনা করা যায়, আর সেই অনুভূতি যা সবার হৃদয়কে আবেগে মত্ত করে দেয় যারা প্রত্যাশা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ত্রাণ দানকারী সেনাদলকে বিভক্ত হতে দেখে সহাস্য চেহারায়, বিজয়ের পূর্বে আনন্দ সম্ভবত কল্পনা করা যায়।'

পরের দিন অপরাহ্নে, ৩০ জুলাই বিল টেলর তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে গাড়িতে করে নদীর তীরবর্তী এলাকায় নিয়ে যান সেই স্টীমারকে স্বাগত জানাতে যাতে করে পরিত্রাণকারী সেনাদল ফিরে এসেছিল। তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন স্টীমারটি সাধারণ নোঙ্গর না করে সোজা চলে গিয়ে সেনানিবাস হাসপাতালের বিপরীতে নোঙ্গর করল। পরে টেলর সাহেব লিখেছেন :

> 'আমি জীবনে কখনও এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি, এমনই ভয়ঙ্কর যা ভোলা যায় না, বিশদভাবে বর্ণনা করা আরও ভয়ঙ্কর। সাহসী সেনাদলের ৪০০ জন সদস্যকে বিজয়ের নিশ্চয়তায় সুন্দরভাবে সবিন্যস্ত আকারে রেখে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু কয়েক ঘন্টা পূর্বে ময়দানে ১৮০ জনকে মৃত ফেলে যেতে হয়েছিল, কিছু কর্মকর্তাও প্রাণ হারান, বেঁচে যাওয়া প্রায় সকলেই আহত ছিল। যে দৃশ্যটি উদ্ধৃত করা হলো তা হৃদয় বিদারী, সৈনিকদের স্ত্রীরা চিৎকার করে সম্মুখে ছুটে পানির কিনারার দিকে যাচ্ছিল, তারা তাদের বুক থাবড়াচ্ছিল ও মাথার চুল ছিঁড়ছিল, তাদের প্রত্যেকের চেহারায় ছিল নৈরাশ্যের বেদনাতুর ছাপ।

টেলর সাহেব পাটনায় 'ভীতিপূর্ণ প্রত্যয় যা সৈন্যবাহিনী পূর্ণ দূর্গদ্বারা সংরক্ষিত আড়া হারিয়েছে, অপ্রতিকার্যভাবে হারিয়েছে... ।'সহ প্রত্যাবর্তন করেন। বিহারে যে সংকট চলছিল তা স্পষ্টভাবে এখন উপস্থিত হলো। ঐ একই অপরাহ্নে এডওয়ার্ড লকউড যখন ভবঘুরের মত একজন লোককে গাড়ি বারান্দায় ধীর পদক্ষেপে গমন করতে দেখেন তখন তিনি টেলর সাহেবের বাংলোয় ভারতীয় মুনশীর কাছে উর্দূ পাঠ শিক্ষা নিচ্ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে তাঁর সহকারী রস ম্যাঙ্গলস, 'যিনি সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, "আমরা এক ভয়ঙ্কর পরাজয় বরণ করেছিলাম ১০ম সেনাদল খুব ভালভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আমিসহ অল্প কয়েকজন ফিরে আসি এই গল্পটি বলার জন্য।" উদ্ধারকারী সেনাদল কুমার সিংহের সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গোপনে ওত পেতেছিল আর তারপর স্টীমারে যাওয়ার সারা পথ দ্রুত অনুসরণ করতে থাকে, ম্যাঙ্গলস শেষ পাঁচ মাইল পথ জনৈক আহত সৈনিককে পিঠে বহন করেন—সাহসের একটি কাজ যার জন্য তিনি পরবর্তীতে পুরস্কার হিসেবে ভিক্টোরিয়া ক্রস গ্রহণ করেন।

ম্যাঙ্গলসের পুনার্বিভাবের পরে শীঘ্রই কমিশনার তাঁর গাড়ি চালান। লকউড সাহেব বলে যান, 'আমার মুনশি একাই খবরটি বিদ্যুৎ চমকের মত ছড়িয়ে দেন; আমি কমিশনারের নিকটে গেলাম, আমি দেখলাম তিনিও এই বিপর্যয়ের কথা শুনেছেন। কিন্তু তিনি, নিয়ম মাফিক, মনে হলো ব্যাপারটিকে খুবই শীতলভাবে নিলেন, যদিও যখন আমি কথাবার্তা শুরু করলাম তিনি ভিন্নমত পোষণ করলেন না, আমি বললাম, "মনে হয় বর্তমানে এখানে আমাদের অদম্যভাবে কাজ করতে হবে....। নিশ্চয়ই আপনি দূরবর্তী ইউরোপীয়দের ডাকবেন, এবং আড়া গ্যারিসনের মত তাদেরকে বিপুলভাবে নিহত হতে দেবেন না।" লকউডের বর্ণনা মতে, টেলর সাহেব তখন উত্তর দেন যে তিনি একটি আদেশ দিচ্ছেন 'আদেশ বা আমন্ত্রণ জানিয়ে—আমি ভুলে যাই, কিন্তু বিষয়টা অবাস্তব হয়ে দেখা দেয়—বহিঃস্থ ইউরোপীয়রা এখানে আসে এবং পাটনায় সমর্থনের জন্য সমবেত হয়।'

বহু বর্ষ পরে তাঁর স্মৃতিচারণা লিখতে বসেন লকউড। কথোপকথনে আরও বলেন যে 'যদি আমি সম্মুখে উঁকি দিয়ে দেখতে পেতাম আর বিষয়গুলো দেখতাম যা পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে আমি আনন্দের সাথে একটি প্রতারণার কাজ করতাম, যা আমি মনে করতাম ওয়াহ্হাবিদের সঙ্গে একই রকমভাবে করা যেত। তাঁর আদেশসমূহে আমাকে ডেকে এনে বিশ্বাস ভরে অর্পণ করে বিলি ব্যবস্থার জন্যে। আমি কমিশনারকে যুক্তি-পরামর্শ দিতে পারতাম, এবং অতঃপর, যখন কেউ দেখত না, চতুর্থের সাথে গঙ্গা নদীতে সবেগে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম।

সেনাদলের নিকট হত্যা-যজ্ঞের পরে এটাকে মুক্ত করার নিমিত্তে পাঠান, কুমার সিংহকে তাঁর পাটনার ও আশ-পাশের জেলাগুলোর দশ-সহস্র-শক্তিশালী সেনাদলকে পুনরায় পরিচালনার দায়িত্বভার থেকে মুক্ত করে টেলর পরিসমাপ্তি টানেন যে আড়ার অবশ্যই পতন ঘটবে। তাঁর নিজের পাটনা রক্ষা করার মত যথেষ্ট সৈন্য ছিল না, সেখানে দূরবর্তী মহকুমাগুলো রক্ষা করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার কাছে মনে হলো যে, বর্হিপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত কোন ঘাঁটি কোন সামরিক মোকাবিলা করার জন্য সক্ষম ছিল না, যা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণের মুখে পড়তে পারে। এদের মধ্যে গয়া ছিল সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত ঘাঁটি, যা ষাট মাইল দক্ষিণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কুমার সিংহের দ্বারা বিপদগ্রস্ত ছিল আর একই সাথে বাংলাদেশ থেকে তিন বিদ্রোহী বৃহৎ সেনাদল দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য অবস্থায় ছিল। তাঁর ঘাঁটি ও রাজকোষকে প্রতিরোধ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালোঞ্জো মানির কেবল পঞ্চান্ন জন ব্রিটিশ সেনা ও এক শ র‍্যাটরে সাহেবের শিখ সেনা ছিল। 'এই সর্বময় ভয়াবহ অবস্থার মুখে, আমি সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছিলাম *এবং ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় (গেয়া ও তিরহুতের) ও যথা শিঘ্র সম্ভব পাটনায় এসে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জারি করেছিলাম, নিজেদের বাঁচিয়ে সরকারি কোষ যদি সম্ভব হয় যেন নিয়ে আসে।'*

ঘটনার আকস্মিকতায় এই সৈন্য প্রত্যাহারের আদেশ পরবর্তীর প্রেক্ষিতে একটা ভীষণ ভুল সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা দিয়েছিল। টেলর সাহেবকে বলা হয়েছিল যে বক্সার থেকে একটা উদ্ধারকারী বাহিনী যাত্রা শুরু করেছে, যাদের উদ্দেশ্য হলো বিলিয়ার্ড হলে অবরুদ্ধ কর্মকর্তাদের উদ্ধার করা। তবে এটি একটি নগণ্য সেনাদল ছিল যা ভিনসেন্ট আয়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত দেড় শ যুদ্ধরত সেনা সদস্য।

টেলর সাহেব লিখেছেন, 'সকলের মতে এই সুযোগ কুমার সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে এই স্বল্প সংখ্যক সেনা উদ্ধার তৎপরতায় সম্ভাবনা অতি নগণ্য ছিল।' এই প্রেক্ষিতে, তিনি মেজর আয়ার মারফত বেসামরিক অধিকর্তা বরাবর অগ্রাভিযান স্থগিতের আবেদন জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না আরও অধিক যোদ্ধা বাহিনী উজান নদীর নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছায়। এই খোলা পত্রটি তিনি দীনাপুরে মেজর জেনারেল ললয়েডের নিকটে পাঠান 'তিনি যে ধরনের নির্দেশনা উপযুক্ত মনে করবেন সেই ধরনের নির্দেশনা দিয়ে অগ্রসর হতে সাহায্য করবেন। তিনি কি ধরনের আদেশ দিয়েছিলেন আমি তা যথাযথভাবে জানি না।'

কিন্তু টেলর সাহেবের পত্র বিলি হওয়ার পূর্বে মেজর আয়ার কুমার সিংহের সেনাদলকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে বেশ চমকপ্রদ বিজয় লাভ করেন এবং সমর্থকদেরকে মুক্ত করে আড়ায় নিয়ে আসেন।

ইতিমধ্যে গয়ায় স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালোঞ্জো মানি সর্বাধিক অসঙ্গত আচরণ করছিলেন। তিনি পূর্বেই টেলর সাহেবকে অভিযোগ করেন যে গয়া ‘বিক্ষোভ’-এ চলে গেছে আর স্থানীয় নুজীব পুলিশকে বিশ্বাস করা যাবে না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে টেলর সাহেবের প্রত্যাহারের আদেশ পেয়ে তিনি (অ্যালোঞ্জো মানি) তাঁর কর্মস্থলের সকল ইউরোপীয়দের নিয়ে পাটনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন—তবে মহকুমার রাজকোষের ৮০,০০০ পাউণ্ড না নিয়েই। শুধুমাত্র কয়েক মাইল পরিব্রাজনের পর তাঁর দলের কেউ একজন তাঁকে পাটনায় গমনকারী দলের অন্যান্যদেরকে ত্যাগ করে গয়ায় গিয়ে রাজকোষ সংগ্রহের জন্যে পরামর্শ দিলেন। ২ অগাস্ট মধ্যরাতে মি. জাস্টিস ট্রটারের কাছ থেকে একটি পত্র পান, এখন পথে গয়ার দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, ‘উভয় সঙ্কট উপস্থাপন করছে যাতে মি. মানির ‘ইতস্ততঃ আন্দোলন’ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁকে ছেড়ে গেল, আর প্রশ্ন করছিল আমি কি আমার পূর্বের আদেশের প্রতি অনুগত আছি।’ টেলর সাহেব উত্তর দিলেন যে ট্রটারকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে এবং পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হতে হবে।

গয়ায় প্রত্যাবর্তন করে মানি সাহেব সৌভাগ্যক্রমে সম্রাজ্ঞীর ৬৪তম পদাতিক বাহিনী থেকে সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদলের সাথে যোগদান করেন। তাঁদের সাহায্য নিয়ে তিনি গয়ার রাজকোষ শূন্য করে দেন আর তারপর তাঁর নতুন প্রহরাধীনে শহরটি ছেড়ে জোর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকে—আদেশানুসারে পাটনা অভিমুখে নয়, তবে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলকাতা অভিমুখে। এখানে যথাযথভাবে বীরের মত তাঁকে গ্রহণ করা হয়। সেই লোক যিনি আদেশ অমান্য করে বেগে ছুটে পালিয়ে গোয়ায় ফিরে গিয়ে রাজকোষ রক্ষা করেন। কর্ণেল জি.বি. ম্যালসন লিখেছেন, ‘ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ’-এর প্রথম নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, ‘মি. অ্যালোঞ্জো মানি প্রথমে তিনি অমান্য করে পরে তাঁর কমিশনারকে অনুসরণ করে, যেটা তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব এবং পরবর্তীতে ঝোঁকাল কর্তব্যপরায়ণতার নাটক দিয়ে সমাপ্ত হয়। যে কারণে তিনি অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও এক তারকা-খচিত বীর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কলকাতায় অ্যালোঞ্জো মানির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ও তাঁর আত্ম কর্মের বর্ণনার সঙ্গে পাটনা থেকে বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর হ্যালিডের নিকটে লেখা একগুচ্ছ পত্র নিয়ে পৌঁছানোর একটি মিল পরিলক্ষিত হয়। তারা আয়ার সাহেবের আড়া উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর বিবরণ এতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এর সাথে সাথে অ্যালোঞ্জো মানিকে পাটনা থেকে প্রত্যাহার করার টেলর সাহেবের নির্দেশও ছিল। আর একটি বিষয় এতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল যেটা ভিনসেন্ট আয়ারের প্রতি টেলর সাহেবের নির্দেশ যাতে বলা হয়েছিল পরবর্তী সৈন্য

সম্ভার না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত আড়ায় অভিযান যেন স্থগিত রাখা হয়। ওখানে মেজর জেনারেল ললয়েডের আর একটি পত্র ছিল যেখানে তিনি বর্ণনা দেন যে তিনি নিজে আয়ার সাহেবকে অগ্রসর হতে আদেশ দিয়েছিলেন—যদিও কৌতূহলপূর্ণ ঐ আদেশ সম্বলিত পত্র যথাস্থানে পৌঁছায় নি।

এই সকল যুদ্ধোপকরণই হ্যালিডে সাহেবের প্রয়োজন হয়েছিল। ৫ অগাস্টে গভর্নর-জেনারেলকে অবহিত করেন যে 'এই মাত্র টেলর সাহেবের নিকট থেকে প্রাপ্ত পত্র থেকে জানা যায় যে যখন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় তিনি আতঙ্কবশতঃ তাঁর বিভাগের সকল কর্মস্থলের আমলা কর্মকর্তাদেরকে তাঁদের পদ ত্যাগ করে দীনাপুরের পশ্চাদপসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি তৎক্ষণাৎ টেলর সাহেব তাঁর পাটনার কমিশনার পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

হ্যালিডের তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, যে পত্রটিতে টেলর সাহেবের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু তাঁর নির্দেশনা সম্পর্কিত লিখিত নিজ বক্তব্য সেখানে ছিল না। (সূত্রঃ মোটা অক্ষরে লিখিত অংশ পৃষ্ঠা:১৫১) টেলর সাহেব কমিশনারদের রাজস্ব কোষাগারের সাথে করে আনতে বলেছিলেন যদি না এতে নিজস্ব নিরাপত্তার ঘাটতি হয়। লর্ড ক্যানিং উইলিয়াম টেলরকে অপসারণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় নিশ্চিত করেছিলেনঃ 'শান্তি ও বলিষ্ঠতা'র বিরাট অভাব দেখানো; তাঁর যোগ্যতার উর্ধ্বে একটি আদেশ প্রদান; এবং 'সামরিক কর্তৃপক্ষসহ পথিমধ্যে বাধা দান।'

উইলিয়াম টেলর তাঁর পদচ্যুতির খবর পান তাঁর সমালোচকদের মধ্যে একজন কট্টর সমালোচক মি. জাস্টিস ফারকুহারসনের কাছ থেকে, এখন যিনি টেলর সাহেবের পদে কেউ না আসীন হওয়া পর্যন্ত সামরিকভাবে সেই কমিশনার পদে কর্মরত আছেন। এটি মেজর আয়ারের দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি বিশাল বিজয়ের সমকালেই সংঘটিত সেটা ছিল কুমার সিংহের সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনা—যে বিজয়টা সর্বতোভাবে পাটনা বিভাগ ও বিহারের অধিকাংশ অঞ্চলকে বিপদমুক্ত করেছিল। টেলর সাহেব লিখে গেছেন, 'আমার বন্ধুবর্গ আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল যে সংকটকাল উত্তীর্ণ হয়েছে, আমার প্রয়াসসমূহ সাফল্যের উল্লাসে উল্লসিত হয়েছে। এই সমস্ত অভিনন্দনের মাঝে, এবং, আমি যে মুহূর্তে ভাবলাম যে, কোনরূপ ভনিতা না করে, আমি বিষয়টাকে দেখতে পেলাম, পুরুস্কারের জন্য যদি নাও হয়, নিদেন পক্ষে স্বীকৃতির জন্যে, আমাকে কমিশনারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে যে ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে ঐ পদে বসানো হয়েছিল সেই ব্যক্তিটি পাটনা প্রত্যাহারের পরামর্শ দিয়েছিল। টেলরের পাটনার কমিশনারের পদ থেকে অপসারণের আঘাতে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত এডওয়ার্ড স্যামুয়েলকে তাঁর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল, যে পদে বিগত দশকে হ্যালিডে সাহেব টেলর সাহেবের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন।

বিদ্রোহের আগুন যখন দিল্লি, লক্ষ্ণৌ এবং অন্যান্য অঞ্চলে জ্বলছিল তখন টেলর সাহেবের বন্ধুরা ও সমর্থকরা তাদের দাঁত কড়মড় করা ও নিজেদের কর্তব্য পালন করা ছাড়া খুব কমই তাদের করার ছিল। মি. স্যামুয়েলস তাঁর নিজের অধস্তনকে সাথে নিয়ে ঠিক সময় মত পৌছান। টেলর সাহেবের দক্ষিণ হস্ত মওলা বকশকে অপসারণের জন্য, কারণ হিসেবে তিনি এবং মুসলমান ব্যাংকার ওয়াহ্হাবিদের গৃহবন্দি করেন। কারণ হিসেবে দেখান কেবলমাত্র ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে। এই নতুন প্রশাসনের কার্যাবলির মধ্যে ছিল তিনজন আটককৃত ওয়াহ্হাবির মুক্তি প্রদানের আদেশ দেওয়া। এই আদেশ ভারত সরকারের যথেষ্ট দোষ স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ ও ঘোষণা সম্বলিত ছিল যে তারা ছিল 'নির্দোষ ও নিরীহ লোকজন' যাদের বিরুদ্ধে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না,' তবে, অপর পক্ষে যারা দেখিয়েছিল ব্যতিক্রমী ও নজিরবিহীন আনুগত্য।' বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডের প্রকাশিত নির্দেশনানুসারে এটি করা হয়েছিল।

ভীত বিহবল হয়ে কর্মকর্তা-আমলাদের মধ্য থেকে এডওয়ার্ড লকউড ওয়াহ্হাবিদের সম্মানে।

সম্মানে নতুন কমিশনার কর্তৃক আয়োজিত নদীর উপরে 'সৌহার্দ্যপূর্ণ আনন্দ ভোজে উপনীত হতে আদেশ দেন। যখন তিনি তাঁর স্টীমারের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয় এখনকার পদচ্যুত ম্যাজিস্ট্রেট মওলা বকশের সাথে, আনন্দ ভোজের আমন্ত্রণ পত্র পেয়েছে কিনা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু তিনি বিষাদগ্রস্ত স্বরে বলেন, যা আমাকে আন্তরিকভাবে হাসায়, "হায়! প্রিয় জনাব, একজন নতুন রাজনের উত্থান হয়েছে যিনি যোশেফকে চেনেন না।'"

নদীর আনন্দ ভোজ বশে আনার একটি প্রয়াস ছিল। লকউড সাহেব ওয়াহ্হাবিদের সম্বন্ধে ঘোষণা দেন,

> 'ঐ বেহুদাগুলোর যদি এতটুকু বোধ থাকত তাহলে এই হাস্যকর, শঠতাপূর্ণ আস্ফালনে তারা হেসে গড়িয়ে পড়ত না। যখন তাদেরকে স্টীমারে জড় হতে দেখলাম, যেটি আমাদেরকে গঙ্গায় প্রমোদ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তাদেরকে ইমামের বেশভূষায় যেমন পবিত্র মনে হয় সেইরকম ভাল দেখাচ্ছিল, তাদের এখানেও তামাশার অবকাশ ছিল না। যাহোক, আমি সরাসরি পৌছালাম, তারা সকলেই আমার দিকে আড় চোখে তাকাল, এবং যদিও তারা কিছু বলল না, আমি খুব ভালভাবেই জেনেছিলাম তারা বলে বোঝাতে চেয়েছিল, 'আহা! আমার সুন্দর সাথী, আপনি এবং আপনার গভর্নর আমাদের উপরে ভালই চিরুনি চালিয়েছেন, আমাদের মনে হয়।'

বিদ্রোহীদের দীনাপুর নিরস্ত্র করার ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সরকারের অপারগতা ও কমিশনার টেলরের পদক্ষেপের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ভারতের বড় লাটকে এ বিষয়ে কঠোর হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল এবং একই কারণে লেফটেন্যান্ট-জেনারেলকে ভারতীয় জনগণের সাথে সম্পর্কের অবনতি না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাশ থেকে বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছিল, অপেক্ষমান অবস্থায় থেকে তারা লক্ষ্য করছিল কোন দিকে তাদের আনুগত্যটা প্রকাশ করবে। এতে তারা প্রশংসনীয়ভাবে সফল হয়েছিল, আর বঙ্গীয় সরকার এ ব্যাপারে দ্রুততার সাথে তাদের দাপ্তরিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছিল, যিনি আর কেউ নন ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে স্বয়ং।

মুক্তি পাবার পর পাটনার ছোট গোডাউনের নেতারা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ব্যবহার করছিল যাতে করে কর্তৃপক্ষ বুঝতেই না পারে তারা কোন প্রকার ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে, এবং এভাবেই তারা হ্যালিডে সাহেব কর্তৃক বিশ্বস্ততার জবাব দিয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার স্যামুয়েলস তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ওয়াহ্হাবিদের অবিসংবাদিত নেতা মৌলভি আহমদুল্লাহ্ কোনরূপ বিদ্বেষ লালন করে না আর তিনি ও তাঁর রক্ষণশীল সহচররা অত্যন্ত দায়িত্বশীল নাগরিকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

বাংলায় অধস্তন পদে বদলি হয়ে টেলর সাহেব তিনি মনে যা ভাবতেন সেই অনুযায়ী তাঁর যথাযথ পদে পুনর্বহাল ও স্বীকৃতির জন্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চালাতেন। সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর বক্তব্য, অভিযোগ ছাপিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন যেখানে তিনি বলেছিলেন অপসারণ বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের নিছক ষড়যন্ত্রেরই ফল। কেননা তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন না এ রাজনৈতিক কারণও এর সঙ্গে জড়িত। বিদ্রোহের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য হ্যালিডে সাহেবকে সরকারের 'দক্ষিণ হস্ত বন্ধু হিসেবে' প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়া বঙ্গীয় গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। আর যে কারণে হ্যালিডে সাহেব বেলভেডিয়ার লজ থেকে বেরিয়ে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর সরকারি বাসভবন দখল করে নেন এবং মেয়াদের অবশিষ্টকাল সেখানেই অতিবাহিত করেন। ক্যানিং সাহেবের উত্তর ছিল টেলর সাহেবকে সামরিক বরখাস্ত করা, যথার্থ প্রমাণ ব্যতিরেকে লোকদেরকে মৃত্যুদণ্ড আদেশ দেওয়ার জন্য বিচারিক তদন্তের হুমকি দেন। এ ধরনের তদন্ত টেলর সাহেব ছাড়াও অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত, এটাই টেলর সাহেবের পশ্চাদপসরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে পাটনাতে তাঁর আইন ব্যবসা গড়ে তোলেন আর

একইভাবে নিজের বদনাম ঘুচানোর প্রয়াস অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি এ্যাঙ্গলো-ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক সমর্থক দেখতে পেলেন তবে স্যার এফ. হ্যালিডে, কেসিবি—১৮৫৯ সালে এতই ক্ষমতা সম্পন্ন হয়েছিলেন যে, যাকে টলানো সম্ভব ছিল না।

দ্য টাইমস পত্রিকা ও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও উইলিয়াম টেলর ভারত ও ব্রিটেন দুই দেশেই কর্ণেল জি.বি. ম্যালসনের ভাষায়, 'দাপ্তরিক অবহেলার শীতল ছায়াতলে' থেকে গেলেন।

সর্বদাই বিতর্ক হয়েছে যে ওয়াহ্হাবিরা সিপাহী বিদ্রোহে ও কয়েকটি স্থানীয় বিদ্রোহে যা অনুসৃত হয় সেটি তারা কেবলমাত্র সীমান্তবর্তী এলাকায় ভূমিকা রাখে। মহাবন পর্বতের ধর্মান্ধ শিবিরের বিদ্রোহীরা একাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। তবে দৃঢ় প্রত্যয়ী, দীর্ঘদিন যাবত দমিত প্রমাণ রয়েছে আর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যা কখনো আবিষ্কার করতে পারে নি, যে ওয়াহ্হাবিদের একটি ছোট্ট দল 'দিল্লিবাসীদের' সঙ্গে মিলিত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয় আর সৈয়দ আহমদের জিহাদের জন্যে আমন্ত্রণ করার প্রতিলিপি তৈরি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। শুধু ঐগুলো যে বিদ্যমান থাকল তা নয়, তবে তারা ভারতে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারায় ওয়াহ্হাবি আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকল।

১৮৪৬ সালে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র পৌত্র শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাকের মৃত্যুর পর 'দিল্লি বাসীদের' নেতা সাইদ নাজির হুসেনের নেতৃত্বে ওয়াহ্হাবিদের এই বিরোধী দল আসে। পূর্বে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, সাইদ ছিলেন হাদিসের একজন প্রখ্যাত শিক্ষক ও তাঁর বহু শিষ্য ছিল, তবে তাদের মধ্যে তাঁর প্রথম শিষ্য ছিলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ্, যিনি ১৮৩০-এর পুরো দশক জুড়ে আরবে শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাকের দীর্ঘ নির্বাসনকালে তাঁর সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন হাজি ইমদাদুল্লাহ্ শহীদ সৈয়দ আহমদের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করেন কিভাবে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি এই ধর্মগুরুর পাশে তাঁর হাত ধরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন 'আমি শ্রদ্ধাবশত তাঁর থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। আর হজরত সাঈদ সাহেব (সৈয়দ আহমদ) আমার হাত নিয়ে তাঁর হাতে রাখলেন।

তাঁর ধর্মীয় বিষয়সমূহ অসত্য বলে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সাইদ নাজির হুসেনকে দিল্লি মোল্লাদের একজন বলে বিশ্বাস করে মধ্য-জুলাইয়ে জিহাদের ফতোয়ায় তাদের সীল মোহর মারতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। সেই সময়ে ব্রিটিশ বাহিনী ও বিদ্রোহী মোর্চা উভয়েই নেতৃত্বের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সপ্তাহসমূহে তারা যখন দিল্লি প্রকোষ্ঠে এসে শিবির গড়ে, অতঃপর তাদের সংখ্যা দিল্লি প্রাচীরের কাছে এসে বিস্তার করল

তখন তাদের নেতৃত্বের কোন্দলের কারণেই নিজেরা নিজেরাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। যদিও সিপাহী বিদ্রোহী ও তাদের সহযোগীরা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, তাদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ তেমন কোন কার্যকর ছিল না, যেহেতু তাদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত হতে থাকে সেজন্য সিপাইদের তাদের বৈপ্লবিক উৎসাহ প্রাথমিক সপ্তাহসমূহে ভাগ্যের ব্যাপারে হয়ে দাঁড়ায়। নগরাভ্যন্তরে পরিবেশ ক্রমেই ধ্বংস-প্রবণ হয়ে উঠল। কেননা নগরবাসী ও বিদ্রোহীরা উভয়পক্ষই লক্ষ্য করছিল যে তাদের প্রাচীরের নিচে শিবিরে অবস্থানরত ক্ষুদ্র ব্রিটিশ বাহিনী ক্রমেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিও আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠছে। কাউকে বিশেষ দায়িত্বে দেখা যায় নি, ন্যূনতম ক্ষেত্রেও সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বা তাঁর পুত্ররা কেহই তেমন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। আসলে দিল্লি নগরীটাই ছিল একটি আধা ভৌতিক বিশ্বাসে আচ্ছাদিত নগরী যেখানে সকলে মনে করত যে কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটন সম্ভব কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে মুহূর্তে তা উবে যেতে দেখা গেল।

সম্ভবত অগাষ্টের গোড়ার দিকে এই নিম্ন পর্যায়ে সাইদ নাজির হুসেনের শিষ্য ইমদাদুল্লাহ্ ও তাঁর তিন জন ছাত্র—মুহাম্মদ কাসিম নানাবতী, রশিদ আহমদ গাঙ্গোহি এবং রহমতুল্লাহ্ কায়রনবি তাঁদের নিজেদের জিহাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিছু দুর্বোধ্য কারণে তাঁদের ধর্ম পালন সম্পর্কে যে জনশ্রুতি ছিল তাতে সকলের ধারণা ছিল যে দিল্লি বাস্তবিকই জিহাদের একটি পীঠস্থান। এই চারজন তাদের সহযোগী সমর্থকদের নিয়ে নগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং যমুনার পাড় ধরে দিল্লির পঞ্চাশ মাইল উত্তরে থানা ভবন অঞ্চলে এসে উপনীত হন। এখানে তাঁরা তাঁদের নিজেদের পতাকা উত্তোলন করে ধর্ম যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন। থানা ভবনের শহর ও আশপাশের অধিবাসীরা কোনরূপ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তাঁদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ব্রিটিশ বেসামরিক কর্তৃপক্ষবৃন্দ বহু পূর্বেই তাঁদের পদ পরিত্যাগ করেছেন।

হাজি ইমদাদুল্লাহ্ ও তাঁর জিহাদিরা এখন সমগ্র জেলাকে তাঁদের ধর্মমতের ছাঁচে রূপান্তরের কাজ শুরু করে দেয় যেমনটি ত্রিশ বছর পূর্বে পেশোয়ারে সৈয়দ আহমদ করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ইমদাদুল্লাহ্ দলের ইমাম হিসেবে কাজ করেন, তবে চব্বিশ বছর বয়স্ক মুহাম্মদ কাসিমই দলের প্রকৃত নেতা হিসেবে উদ্ভূত হন। তিনি নিজেকে সামরিক সেনাপতি হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর সঙ্গে আঠাশ বছর বয়স্ক রশিদ আহমদ তাঁর লেফটেন্যান্ট ও বিচারক হিসেবে এই কর্মে যোগ দেন এবং বয়সে সামান্য কিছু বড় রহমতুল্লাহ্ তাঁদের দল ও দিল্লিতে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসেবে কর্মরত হন।

এই দ্বিতীয় ওয়াহ্হাবি দার উল-ইসলাম প্রথমটির মতই ক্ষণস্থায়ী হয়। ১২ সেপ্টেম্বর দিল্লির প্রাচীর কামানের প্রচণ্ড আক্রমণে ভেঙ্গে ফেলা হয়, আর নগরীটি এক সপ্তাহ যাবত গৃহে গৃহে বিদ্বেষপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। ব্রিটিশ জেনারেল যিনি অভিযান পরিচালনা করছিলেন তিনি হুকুম দিলেন যে কোনরূপ ছাড় দেওয়া হবে না, এবং এই আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত করতে হবে। পরবর্তীকালে যেমনটি বিদ্রোহী মইনুদ্দীন খান লিপিবদ্ধ করেছেন, 'শুষ্ক বৃক্ষরাজি যেমনভাবে সবুজকে গ্রাস করে নেয়; একইভাবে নির্দোষ ব্যক্তিবর্গ দোষীদের ভাগ্যকে বরণ করে নেয়। যেহেতু ১৮৫৭ সালের ১১ মে নির্দোষ খ্রিষ্টানরা অপরাধের শিকার হয়, একই দুভার্গ্য ২০ সেপ্টেম্বর মুসলমানদেরকেও বরণ করতে হয়। যারা তরবারি থেকে রেহাই পেয়েছিল তাদেরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

দিল্লি সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার পূর্বেই, আশপাশের গ্রাম বিদ্রোহীদের অভিযোগ থেকে মুক্ত হচ্ছিল। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মধ্য সেপ্টেম্বর মুজাফফর নগরের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট মি. এডওয়ার্ডসের নেতৃত্বে আফগান ও শিখদের একটি অশ্বারোহী প্রতিরোধের সম্মুখে পড়ে, আর এক অশ্বারোহী সৈন্য ও এক উট বোঝাই সামরিক সম্ভার খুইয়ে পশ্চাদ্ধাবন করতে বাধ্য হয়। এই সেনাদল পুনর্গঠিত হয়ে পুনরায় শহরের দিকে অগ্রসর হয়, শুধু এর পোত বহরের মালপত্র ও লোকজনকে পাবার জন্যে। মুহাম্মদ কাসিম বা অন্য যে কেউ বিদ্রোহীদেরকে সাহস ও উদ্যোগ দেখিয়েছিল। থানা ভবন দখল করতে না পেরে, মি. এডওয়ার্ডস শামলী শহরের দিকে যেতে থাকেন, দক্ষিণ দিকে একটি ভিন্ন বিদ্রোহী দলের দ্বারা অধিকৃত দূর্গকে আক্রমণ করতে যাওয়ার পূর্বে যেখানে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক ভারপ্রাপ্ত অধস্তন কর্মচারীকে এগার জন অশ্বারোহী সৈন্য থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রেখে এসেছেন। তিনি শামলীতে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পান কর্মকর্তা-আমলা ও সৈন্যদেরকে থানা ভবনের বিদ্রোহীরা দলে দলে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। একটি শেষ আশ্রয়স্থল স্থানীয় মসজিদে আক্রমণ চালানো হয়েছিল, যার ভেতরের দেয়াল এডওয়ার্ডস দেখেন 'গাঢ় লাল রঙে রঞ্জিত।'

এডওয়ার্ডস ও তাঁর নীতিভ্রষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যরা থানা ভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, যেটি এখন সহস্রাধিক বিদ্রোহীরা দখল করে রেখেছে। পুনরায় একটি আক্রমণের প্রয়াস চালানো হয় আর প্রচুর ক্ষতি সহকারে পশ্চাদ্ধাবন করতে হয়, এডওয়ার্ডস সাহেবকে এই প্রয়াসের পরিসমাপ্তি টেনে তাঁর সবচাইতে নিরাপদ কাজ হিসেবে মুজাফফর নগরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর সেনাদল নিজেরাই দেখল চৌদ্দ জন মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্য নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। পরে

এডওয়ার্ডস সাহেবের সহকারি মি. ওয়ার্ড লিখেছেন, ‘তাদের দল ত্যাগ করার বিষয়ে আমি দুটো বিষয়কে দায়ি করি, আংশিকভাবে তা হলো শামলীতে সেনা সদস্যদের হত্যা, অপরদিকে থানা ভবনে সবুজ পতাকা উত্তোলন।’ তাদের আচরণ এত বেপরোয়া হয়ে যায় যে মি. এডওয়ার্ডস অবশেষে তাঁর সৈন্যদেরকে আদেশ দেন ও অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে আক্রমণে তাঁকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানান। এই সমস্ত শঙ্কাময় মুহূর্তগুলোকে সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সব কিছু রক্ষা করা সম্ভব হত। পাল্টা আক্রমণের মুখে বিদ্রোহীরা শ খানেক মৃত সহযোগীদের ফেলে পলায়ন করে।

যাহোক, মনে হয় যে থানা ভবনে মৃতদের মধ্যে বিদ্রোহের প্রকৃত নেতৃবৃন্দ ছিল না : তাঁরা ছিলেন পালায়নে তৎপর। ইমদাদুল্লাহ ও রহমতুল্লাহ উপকূলের দিকে পলায়ন করেন, যেখান থেকে তাঁরা অবশেষে মক্কায় যাবার পথ করে নেন। দুইজন তরুণ লুকোতে গিয়েছিল। দুই বছর পরে রশিদ আহমদ একজন সন্দেহভাজন বিদ্রোহী হিসেবে গ্রেপ্তার হন, তবে ছয় মাস আটক থাকার পর সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। সঠিক সময়ে তিনি ও তাঁর সহযোগি মুহাম্মদ কাসিম, যিনি থানা ভবনে বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিলেন, তিনি দিল্লিতে ফিরে গিয়ে তাদের পুরোনো শিক্ষক মৌলানা সাইদ নাজির হুসেনের ছত্রচ্ছায়ায় পুনরায় তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষায় দাখিল হন।

অধ্যায় সাত

আমবেলা বিপর্যয়

> আমাদের প্রাচীনকালের অতি পরিচিত, অতি ধনী, বিপুল বিশাল এবং সমৃদ্ধশালী রাজধানীসমূহে এখন আর কিছু দেখা বা শোনা যায় না, কেবলমাত্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের হাড়-হাড্ডি বা মানুষের কান্নার আদলে শিয়ালের ডাক।
>
> ১৮৬২ সালে মোহাম্মদী সাহিত্য সমাজে আলীগড়ের সৈয়দ
> আহমদ খানের একটি পঠিত অভিভাষণ।

১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে দিল্লি একটি ভূতুড়ে শহর হয়ে গেল, সম্পূর্ণরূপে মুসলিম মুক্ত, যাদেরকে এখন ব্রিটিশরা তাদের ক্রমে প্রকৃত শত্রু হিসেবে দেখছেন। জনৈক ব্রিটিশ তরুণ কর্মকর্তা দিল্লি থেকে তাঁর বাড়ির পত্রে লেখেন, 'শেষ দিনের মধ্যে এই দুর্বৃত্তদেরকে গুলি করা ছাড়া আর কিছুই নাই, গতকাল ৩ বা ৪ শ জনকে গুলি করা হয়েছে। সমস্ত মহিলা ও বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের এবং বৃদ্ধ লোকদেরকে অবশ্যই নগরী ত্যাগ করতে দেওয়া হয়েছে। আমি বহু মুসলমান যুবককে দেখেছি যারা নিঃসন্দেহে আমাদের অসহায় নারী ও শিশুদেরকে হত্যার ব্যাপারে জড়িত ছিল, তারা তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে গেট পেরোতে দিয়েছিল, তবে তাদের অধিকাংশকেই হত্যা করেছিল তারা। নগরীর এলাকাসমূহে সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বাস করে ও দুর্দশাদিতে কয়েকটি মসজিদসহ বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য করা হয়। নগরীর প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদ ও ধ্বংসের হুমকিতে পড়ে যায়। কিছু সময় ধরে এটি শিখ সেনাদলের ছাউনি হিসেবে কাজ দেয়, আর অবশেষে এটি মুসলিম ট্রাস্টি সদস্যদের হাতে মুক্ত হয়ে যেতে দুই বছর অতিবাহিত হয়।

পাঞ্জাব সীমান্তের উপরে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সমানভাবে নির্মম ছিল। ময়দানে নিহত ঐসব বিদ্রোহীরা বাদে, বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী বা রাজদ্রোহী দোষী সাব্যস্ত হয় ও কার্যকর করে ২০ জনের ফাঁসি দিয়ে ৪৪ জনকে কামান দেগে

উড়িয়ে দিয়ে এবং ৪৫৯ জনকে বন্দুকের গুলি করে। অতঃপর ১৮৫৭ সালের অক্টোবর মাসে, ঠিক যখন একটি পুনরুদ্ধারের আদেশ এসে পৌঁছায়, তখনই হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের সহকারি কমিশনারবৃন্দের শিবিরে এক নিশি আক্রমণ করা হয়। হামলাকারীরা হিন্দুস্তানি হিসেবে চিহ্নিত হয়। সকল বৈষম্যসমূহের বিরুদ্ধে, তারা ইনায়েত আলীর অধীনে পুনর্গঠিত হয় আর একবার স্থানীয় বন্ধু পাঞ্চতরের মীর আলম খানের সেনাদলে যোগ দেয়। এডওয়ার্ডস তাদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

১৮৫৮ সালের মধ্য এপ্রিলে পাঁচ সহস্র যোদ্ধা কালো পোশাক পরে হোটি মর্দনের নিকটে সমবেত হয়ে সমতল এলাকা পেরিয়ে মহাবন পর্বতের দিকে যাত্রা করে। এডওয়ার্ডস সাহেবের সঙ্গে থাকা তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল স্যার সিডনি কটন তাদেরকে স্থানীয় সামরিক সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দেন। তাঁর অধিক বয়স সত্ত্বেও, কটন সাহেব এলাকার সেনাপতি হিসেবে এই পাঁচ বছরে জেনেছেন যে তাঁর সমভূমিতে নিয়োজিত অশ্বারোহী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে খুবই ভিন্ন কৌশলের সীমান্ত যুদ্ধ চায়। পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সফলতার জন্য ভাগ্যের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পার্বত্য যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এই বাগ্‌ধারটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য 'ভিতরে বাইরে চালাক হতে হবে।' পাহাড়ি উপজাতিদের শাস্তি প্রদানের ধরন, আর যা সামান্যতম ঝুঁকির ব্যাপার, তাদের উপরে হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলা করা যাতে করে তারা সময়ের অভাবে সংঘবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়।

সংখ্যায় নগণ্য নয়, এমন সেনাদল নিয়ে কটন সাহেব দ্রুত যান আর মহাবন পর্বতের গভীরে তাদের উপস্থিতি কেউ টের পাওয়ার পূর্বেই প্রবেশ করতে সফল হন। প্রত্যুষের পর পরই প্রথম সৈন্য সারি পাঞ্জতর গ্রাম বিনা বাধায় অতিক্রম করে মঙ্গলথানায় হিন্দুস্তানি দূর্গের উপরে দীর্ঘ আরোহণ করতে লাগে। কটন সাহেব লিখেছেন, 'অগ্রগামীরা প্রায় বেলা ১১টা নাগাদ পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করে। যখন আমরা দুরারোহ পথে ও কাঠের রাস্তায় কষ্ট করে এগোলাম, তখন আমাদের দিকে কেউ একটি গুলিও ছোঁড়েনি, এবং মঙ্গলথানায় প্রবেশ করে আমরা দূর্গটিকে পরিত্যক্ত দেখলাম, আর সব চিহ্নই দ্রুতগতির ও পলায়নের ছিল।'

কটন সাহেব জানতেন না যে হিন্দুস্তানিদের আমির ইনায়েত আলী কয়েকদিন পূর্বে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মুজাহিদীনরা নেতৃত্বশূন্য থাকায় আপাত দৃষ্টিতে তারা প্রতিরোধ করতে পারে নি। কটন সাহেবের আগমনে তারা আশপাশের পাহাড়ি এলাকা এবং গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কটন সাহেবের যে সব কর্ম সম্পাদনের মধ্যে ছিল

তা হলো বারুদ দিয়ে মঙ্গলথানার সমস্ত ভবনগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর সমভূমির প্রান্ত ধরে তাঁর শিবিরে প্রত্যাবর্তন করা। আক্রমণের পরিসমাপ্তি দেখানো হয়েছিল, কিন্তু এটা ছিল একটা চাতুরী। দুই সপ্তাহ পরে কটন সাহেব পুনরায় আঘাত হানেন, কাজ করছিলেন তাঁর গুপ্তচরদের তথ্যের ভিত্তিতে যে হিন্দুস্তানিরা সিত্তানায় প্রয়াত সোয়াতি পাদশাহ সৈয়দ আকবর শাহের ভ্রাতা সৈয়দ উমর শাহের নেতৃত্বে তাদের সৈয়দ মিত্রদের সঙ্গে একত্রে পুনর্বার দল গঠন করেছিল। এই সময়ে কটন সাহেব তাঁর সৈন্যদলকে বিভক্ত করে হিন্দুস্তানিদের সিত্তানার নিচের শিবিরে তিন দিক থেকে অগ্রসর করান। যখন তারা একটি অবস্থানে আসে, তখন তাদের বাহিনীর তিনটি শাখা ছড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুরা বস্তুত: পক্ষে না ঘেরাও হয়। এই ষাঁড়াশি চাপে বলয় ভেদ করতে ব্যর্থ হয়ে, হিন্দুস্তানিরা পাহাড়ি ঢালের সমতল উচ্চ ভূমিতে শেষ আশ্রয় স্থল নির্মাণের জন্য সমবেত হয়। কটন সাহেবের দাপ্তরিক প্রতিবেদন কোন সংখ্যা প্রকাশ করে না, মন্তব্য করে যে, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকে 'ধর্মান্ধতা ও উগ্রবাদী ভাব নিয়ে তারা এসে উপস্থিত হয়। ভারতীয় পুরস্কার গোলকগুলো ঘুর ঘুরে দেখে, কিন্তু তাদের মুখে কোনরূপ উচ্চবাচ্য শব্দ হয় নি। এই উপলক্ষে সবাই তাদের সর্বোত্তম পোশাক অধিকাংশই সাদা পরিহিত; তবে নেতাদের কেউ কেউ ভেলভেটের আলখাল্লা পরিধান করেছিল।' সৈয়দ উমর শাহ্ সম্ভবত মৃতদের মধ্যে ছিলেন।

যদি কটন সাহেবের সেনাদল তাদের অবস্থানে থাকত, তাহলে পরের দিন শেষ মুজাহিদীনরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। রাত হওয়ার সাথে সাথে ও সমুদয় জিনিসপত্র নিয়ে হার্বার্ট এডওয়ার্ডস সিদ্ধান্ত নেন যে এটাই প্রত্যাহারের উপযুক্ত সময়। কটন সাহেব ছিলেন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও সামরিক সেনাপতি, তবে প্রথানুযায়ী উপস্থিত রাজনৈতিক কর্মকর্তার উপদেশে মনোযোগ দিতে হত, এবং তিনি অনুরূপই করলেন—একটি সিদ্ধান্ত যার জন্য তিনি ও এডওয়ার্ডস দুইজনই দু:খ প্রকাশ করতে আসেন। যখন পরবর্তীকালে তাঁর কার্যবিবরণী তাঁর সযত্নে শব্দ চয়ন করে তিনি লিপিবদ্ধ করেন: 'কমিশনার বিবেচনা করেন যে তাদেরকে যথোচিত শাস্তি প্রদানের, আর আমাকে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য বলা হয়। শত্রুদের পাহাড় অভিমুখে আরও তাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করা যুক্তিযুক্ত মনে না করে জুদুন ও অন্যান্য স্বাধীন পাহাড়ি উপজাতিরা যারা বৃটিশ বাহিনীর পাহাড়ি উপত্যকায় এত অধিক সংখ্যক উপস্থিতিতে বিশেষ উত্তেজিত হয়েছিল।'

সিডনি কটন বিষয়টি কিভাবে সম্পন্ন করা যায় তা প্রদর্শন করে নিজেকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এ যাবৎ সোয়াতের ও বুনারের দুর্ভেদ্য পর্বতে এক বিশাল সেনাদল সফলভাবে ঢুকে পড়ে, আর যা একবার করা সম্ভব হয়েছে তা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

পুনর্বার করা যায়—যদি এ ব্যাপারে সেনা সমর্থন পাওয়া যায় 'ভেতরে ও বাইরে চালাক।' এটা এমন একটা প্রবাদ যে তাঁর উত্তরসূরিরা সংকেতিকভাবে শিখতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু যখন কটন সাহেবের সেনাদল মহাবন পর্বত থেকে নিম্নে দুর্বার গতিতে ধাবিত হয় তখন তারা পেছনে রেখে যান প্রয়াত বেলায়েত আলীর জীবিত জ্যেষ্ঠতম পুত্র আব্দুল্লাহ্ আলীসহ তাঁর আরও ছোট তিন পুত্রকে। তাঁকে পরবর্তীকালে এনায়েত আলীর উত্তরসূরি হিসেবে হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের আমির মনোনীত করা হয়। এটাও দেখা যায় যে ৫৫তম রাজদ্রোহী বঙ্গীয় স্বদেশী পদাতিক বাহিনীর অতি অল্প সংখ্যক সিপাই বেঁচে গেছে। তারা ও স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদীন যারা কটন সাহেবের জাল থেকে রক্ষা পেয়ে পাবর্ত্য এলাকায় লুকিয়ে থাকে যতক্ষণ বসবাসের জন্য সিত্তানার সৈয়দদের নতুন নেতা সোয়াতের প্রয়াত পাদশাহর পুত্র সৈয়দ মুবারিক শাহ্ তাদেরকে পবিত্র স্থান না দেয়। মহাবন পর্বতের দক্ষিণে মঙ্গল থানার কয়েক মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব কোণের ঢালে মালকা নামক বসবাসের অনুপযোগী একটি জায়গা যা চামলা উপত্যকা ও বুনার পর্বতের দিকে ঝুঁকেছিল। এখানে হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের এই শেষ মূল সিপাইরা ভারতীয় সমভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর্বতে লুকিয়ে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে তাদের পড়শীদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে লর্ড ক্যানিং সরকারিভাবে একটা ঘোষণা দিয়ে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ব্রিটিশ রাজকে শাসন ভার অর্পণ করেন। কোম্পানির বঙ্গীয়, মাদ্রাজ ও বোম্বের সৈন্যদলকে ভেঙ্গে ফেলে তদস্থলে বিভিন্ন জাতির দল, বর্ণ ও ধর্মের সেনাদল মিশিয়ে গঠিত হয় একটি উচ্চ বর্ণের সেনাদল। একই সাথে তথা কথিত 'সামরিক–জাতিসমূহ' যেমন শিখ বাহিনী ও গুর্খা বাহিনী যারা সিপাহী বিদ্রোহে প্রমাণ করেছে তাদের আনুগত্য ও তাঁদের যুদ্ধের উদ্যম উভয়ই ক্রমে অধিকসংখ্যক হারে তাদের সেনাদলে নিয়োগ করা হলো। ১৮৬২ সালের মার্চ মাসে লর্ড ক্যানিং দেহ ত্যাগ করার লক্ষ্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের দ্বিতীয় বড় লাট লর্ড এলজিন ১৮৬৩ সালের নভেম্বর মাসে হিমালয়ে পর্বতারোহণের কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তিনি (লর্ড ক্যানিং) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। অত:পর অফিস দাম্ভিক প্রশাসক জন লরেন্সের নিকটে চলে যায় যিনি সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে পাঞ্জাবকে শাসন করেন এবং এর ফলে তিনি প্রথম লেফটেন্যান্ট-গভর্নর হন। তাঁর পূর্বসুরিদের মত লরেন্সের দেশ ও এর জনগণকে অজানা ছিল না, তবে যখন এলজিন সাহেব মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি ইংল্যাণ্ডে ছিলেন আর এটি ছিল তাঁর বড়লাট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার দুই সপ্তাহ পূর্বের ঘটনা, এতই বিলম্ব

হয়ে যায় যে তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক বিপর্যয়ের উপরে কোন কিছু বলতেই পারেন নি যা আমবেলা সামরিক অভিযান নামে পরিচিত।

১৮৬৩ সালের নভেম্বরে আমবেলা অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়েছিল হিন্দুস্তানি আমির আব্দুল্লাহ্ আলীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রধানদের ডেকে 'বিধর্মীদের পক্ষ ত্যাগ করে প্রয়োজনে শহীদ হওয়ার শপথ নিয়ে সমন দিয়েছিলেন।' এই পত্রগুচ্ছের একটি মূলত আম্বের খান হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের পেশোয়ারের উত্তরসূরি কমিশনার রেয়নেল টেলর সাহেবের নিকটে পাঠিয়ে দেন। মালকায় হিন্দুস্তানিরা কয়েক মাস যাবত সীমান্ত পারাপারের নামে হিন্দুদেরকে অপহরণ করে একটি ভিন্নতর কার্যক্রমের লক্ষণ দেখাচ্ছিল। টেলর সাহেব হটি মর্দনের কিংবদন্তি হ্যারি লামসডেনের কাছ থেকে কর্তৃত্বভার গ্রহণকারী কর্ণেল আলফ্রেড ওয়াইল্ডের সঙ্গে পরামর্শ করেন। 'হিন্দুস্তানিদের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মান্ধতার নিপীড়ন থেকে সার্থকভাবে সীমান্তকে মুক্ত করতে' দুজনই পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হন। সীমান্তে ভবিষ্যতে শান্তির জন্যে, 'এই সামরিক ঘাঁটির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ধর্মান্ধদেরকে ধ্বংস করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে...। তাদেরকে মৃত্যুর মাধ্যমে বা বন্দি করে পাহাড় থেকে অবশ্যই বিতাড়িত করতে হবে, আর পাহাড়ি উপজাতিদের একটি সন্ধি করা হয় যে তাদের আবাসিক এলাকায় তারা তাদেরকে (ধর্মান্ধদের) বসবাস করতে দেবে না।'

কর্ণেল ওয়াইল্ড অবলোকন করেন যে ব্রিগেডিয়ার কটন ১৮৫৮ সালে হিন্দুস্তানিদের পশ্চাদদিক থেকে ধ্বংস করতে পারেন নি কেননা জীবিত অবশিষ্টাংশ সেনাদলের একটি অংশ উত্তর দিকে পালাতে সক্ষম হয়। ওয়াইল্ড অতর্কিত হামলার একই কৌশল অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে এই সময়ে মহাবন পর্বতকে বৃত্তাকারে, 'সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সামগ্রীগুলো দিয়ে উত্তর দিক থেকে হিন্দুস্তানিদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, এর মাধ্যমে তাদেরকে সমতলভুমির দিকে পৃষ্ঠ রেখে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা। এক সময় তাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল, ওয়াহ্হাবিদের ও তাদের মিত্র বাহিনীদের সিন্ধু নদে ও সমতলে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এই বৃত্তাকারের একমাত্র অর্থ ছিল আমবেলা গিরিপথের নিরালা পথ।

আমবেলা পাস হটি মর্দনের ইউসুফজাই সমতল ভূমির [২নং মানচিত্র, পেশোয়ার উপত্যকা' দেখুন] গাইডস-এর সেনা দফতরের উত্তর-পূর্বদিকে বিশ মাইলের অধিক জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এই সংকীর্ণ পথ গিরিপথ পর্যন্ত গিয়ে বুনারের গ্রামে যাবার একটি প্রাকৃতিক তোরণ আর মহাবন পর্বত শ্রেণীর বারো মাইল দৈর্ঘ্যে ও চার মাইল প্রস্থে চামলা উপত্যকার দিকে গিরিপথ খুলে দিয়ে পেছনের দরজা করে দিয়েছে। রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কর্ণেল অ্যাডি আমবেলা সামরিক অভিযান সম্বন্ধে তাঁর প্রথম বর্ণনায়

ব্যাখ্যা করেন, 'চামলা উপত্যকায় প্রবেশ করার একমাত্র পথ ইউসুফজাই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে, কয়েক মাইল প্রলম্বিত একটি পাহাড়ি নদীর উৎস যা আমবেলা প্রণালীরূপে পরিচিত, আসলে তা হলো ছোট নদের প্রস্তরময় ধারা প্রবাহ যেটা মহাবন পর্বতের পশ্চিম তীর ঘেঁষে প্রবহমান।'

এই পরিকল্পনার একমাত্র বাধা ছিল যে এটি অর্থ করেছিল বুনার উপজাতিদের অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করে যাচ্ছিল, বুনারবাসীদের জমি উত্তর দিক হয়ে আমবেলা গিরিপথ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আর কম সংখ্যক চামলাবাসী যারা দক্ষিণের ঢালে ও চামলা উপত্যকার পশ্চিম দিকের জায়গা অধিকার করে বসবাসরত ছিল। এই দুই উপজাতি সম্বন্ধে পেশোয়ারের বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সামান্যই জানতেন, তবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন তাদের সঙ্গী মহাবনের ইউসুফজাইদের থেকে নিশ্চয়ই তারা অধিকতর শান্ত। বিশেষত বুনারীরা সোয়াতের আখুন্দ, আব্দুল গোফুরের অনুসারী, এখন তাঁর সত্তরতম বর্ষ বয়সে সোয়াতি ও বুনারীদের উপর সুনিয়ন্ত্রিত প্রভাব বিস্তার করছেন আর সর্বদাই হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের চরম দর্শনের বিরোধিতা করে এসেছেন মর্মে সর্বসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার চালিয়েছেন। জন অ্যাডি অবলোকন করেছিলেন, 'বোনায়ের (বুনার)বাসীদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে ধর্মান্ধ চেতনার প্রতি কোনরূপ বিশেষ সমর্থন ছিল না, ধর্মীয় দর্শনের পার্থক্য থাকায়, এবং সোয়াতের আখুন্দ কর্তৃক ধর্মীয় সীমারেখা গড়ে তোলার কারণে, যে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের দ্বারা ভয়ানক প্রতিকূলতার মুখে পড়েছিলেন, যাদের সদস্যদের আখুন্দ ওয়াহ্হাবি বলে ধিক্কার দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যাদেরকে তাঁর অনুসারীরা কাফির বলতে দ্বিধাবোধ করে নি।'

রেয়নেল টেলরের মতেও, মনে হলো যে 'কোন কিছুই দেখে মনে হয়নি যে, আখুন্দ এবং তার হিন্দুস্তানি অনুসারীদের মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্যের লক্ষণ দেখা যায় নি। সেই জন্য তিনি ধারণা করেছিলেন যে চলমান এই অভিযানটি বুনার ও চামলার ভেতরে অতি সহজেই অনুপ্রবেশ করতে পারবে—যে পর্যন্ত উপজাতীয়দের বোঝানো যাবে যে উপজাতীয়দের সরকারের এই অভিযান সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া যাবে, এবং এর সাথে এও বোঝানো যাবে যে এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু অর্জনের সাথে সাথে সৈন্য প্রত্যাহার করা যাবে। টেলর সাহেব ওয়াইল্ড সাহেবের পরিকল্পনাটি পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার রবার্ট মন্টগোমারির হাতে হস্তান্তর করেন। তিনি প্ররোচিত করে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেন যে সেনা সদস্যদের সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে। শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছিল ভাইসরয়ের উপর, কিন্তু হৃদরোগের কারণে লর্ড এলজিনের পক্ষে এ বিষয়ে কোনরূপ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিল না, সেহেতু বিষয়টি তার প্রধান সামরিক অধিকর্তা স্যার হিউজ রোজকে দেওয়া হয়েছিল।

তবে এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ হয়েছিল যে কোন রকম নির্ভরযোগ্য যানবাহন ও রসদ ব্যতীত এত অধিক সংখ্যক সেনা সদস্যদের অন্য একটি দেশে প্রেরণ করা বিশেষত যেখানে শীতকালের আগমন ছিল সন্নিকটে।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে হিন্দুস্তানি শিবিরের সাথে সমতলভূমির সরবরাহ ব্যবস্থার বিশদ তথ্য-উপাত্ত লাহোরে অবস্থানরত মন্টগোমারী সাহেবের গোচরীভূত হয়েছিল।

পাঁচ মাস পূর্বে গাজন খান নামে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন একজন অশ্বারোহী পাঠান দফাদার দিল্লির উত্তরে পানিপথ নামক এক স্থানে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কর্তব্যরত ছিলেন। যখন সে দেখল খর্বাকৃতি ও কৃষ্ণ বর্ণের চার জন ভ্রমণকারি তার দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল। যখন প্রশ্ন করা হয় তখন তারা প্রকাশ করে যে তারা বাঙ্গালি সীমান্ত থেকে তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছে। তাদের উত্তরে বিভ্রান্ত হয়ে সে তার প্রথাগত অবস্থান থেকে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করল। এবং পরিশেষে আবিস্কৃত হলো যে তারা ছিল চোরাকারবারি যারা সীমান্ত দিয়ে বন্দুকের কারবার করত। তিঁনি দ্রুততার সাথে তাদেরকে বন্দি করে ফেললেন কিন্তু ওয়াহ্হাবিরা তার কাছে ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম হিসেবে তাদের মুক্ত করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল। নিকটবর্তী শহর থানেশ্বরের দরখাস্ত লেখক মুহাম্মদ জাফরের জন্য যে কোন অঙ্কের টাকা সানন্দে প্রদান করতে সম্মত ছিল। দফাদার গাজন খান স্থিরসঙ্কল্প থাকেন, আর পরবর্তী দিন সকালে কর্ণালের ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে তাঁর চারজন বন্দিকে নিয়ে যান—তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে পর্যটকদের কাছ থেকে বল প্রয়োগ করে অর্থ আদায়ের অভিযোগ এনে ঐ চারজন বন্দির মামলা খারিজ করে দেন।

তাঁর চরিত্রে এই দোষারোপে দফাদার এতই অপমানিত হলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রের সমর্থন লাভ করে এই মামলাটি নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর পুত্র ঠিক কোথায় থাকত তা লিপিবদ্ধ নেই, তবে ধারণা করা হয় পাঠান অঞ্চলে গাজন খানের গৃহেই সে থাকত। এখন সে তার পিতার কাছ থেকে পত্র পায় যে তাকে মালকার হিন্দুস্তানিদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বলা হয়েছে, বিশেষত কিভাবে তারা মানুষ ও অস্ত্র-শস্ত্রের সরবরাহ গ্রহণ করে। পুত্রটি তৎক্ষণাৎ এই অদ্ভুত অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। তার পথ পার্বত্যাঞ্চলের মধ্য দিয়ে করে নেয় আর নিজেকে মালকার ওয়াহ্হাবিদের নিকটে আগ্রহী জিহাদি বলে পেশ করে। কয়েক মাস পরে পানিপথে প্রত্যাশিত তথ্য-প্রমাণাদি নিয়ে তার পিতার কাছে প্রত্যাবর্তন করে।

দফাদার গাজন খান সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুত্রকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে নিয়ে যান এবং বিজয়ের সাথে তাঁর প্রমাণ পেশ করেন বিশদভাবে জানালেন

পাটনার ছোট গোডাউনে মানুষ, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্রের সরবরাহ কিভাবে করত সেটা। এই তথ্যে বর্ণিত ছিল যে, 'থানেশ্বরের জাফর, যাকে জনগণ খলিফা বলে জানত, তিনিই ছিলেন মহান ব্যক্তি যিনি বাঙ্গালিদেরকে এবং তাদের বন্দুক ও রাইফেলসমূহ পার করে দিতেন।' ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ বিষয়ে তাঁরা আমবেলার সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনারের পরামর্শ প্রার্থনা করেছিলেন, যিনি ভাগ্যক্রমে হার্বার্ট এডওয়ার্ডস পেশোয়ারের প্রাক্তন কমিশনার ছিলেন। এডওয়ার্ডস সাহেব সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়ারে তাঁর পুরোনো বন্ধু রেয়নেল টেলরকে বিষয়টি অবহিত করেন—যিনি তারপরে স্যার রবার্ট মন্টগোমারিকে জানান। ভীত হয়ে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে এই অস্থিরতা দমনের ব্যবস্থা না নিলে তা অচিরেই ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। স্যার রবার্ট হিউজ রোজের পরামর্শ অবজ্ঞা করে আর কাল বিলম্ব না করে এখন বিরাট বিশাল অভিযান আরম্ভ করেন।

সৈন্যের আদেশ ব্রিগেডিয়ার নেভিল চেম্বারলিনকে দেওয়া হয়, অন্য একদল রাজন্যবর্তী সেনাসদস্যরা হেনরি লরেন্সের প্রথম সারির রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পান। তাঁর সেনা সদস্য যারা অভিযানে উদ্যত হচ্ছিল তাঁর নিয়োগ তাদের কাছে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল, ভারতীয় সৈন্যদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রের বিশেষ অমাত্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য ছিল অদ্বিতীয়। তাঁকে বলা হয় যে তিনি ভারতে কর্মরত যে কোন কর্মকর্তার থেকে তাঁর শরীরে বেশি জখমের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, আর ১৮৫৭ সালে দিল্লি পুনর্দখলে তাঁর সাহসিকতা যখন তিনি স্ট্রেচারে বাহিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে সেনাবাহিনীদের উৎসাহিত করেন, তা সিপাহী বিদ্রোহের একটি সন্ধিক্ষণ হিসেবে এখনও আলোচিত হয়। চেম্বারলিনের বয়স ছিল তেতাল্লিশ বছর, তবে তাঁর পুরোনো বন্ধুদের ও সশস্ত্র সঙ্গী হার্বার্ট এডওয়ার্ডস ও রেয়নেল টেলরের মত নাছোড় বান্দার মত চেষ্টা করে ক্রমে ক্রমে পরাস্ত হয়ে তিনি দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম ও পাঞ্জাব সীমান্তে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ক্ষীণ হয়ে পড়েন। যদিও তিনি আদেশ গ্রহণ করেন, তিনি সেটি অনাগ্রহের সাথেই করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতাকে লেখেন, 'যদি কর্তব্য ত্যাগ চাই আমি সেটি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, তবে সমর ক্ষেত্রে কাজ করার আমার কোন ইচ্ছা নেই।'

১৮৬৩ সালের ১৮ অক্টোবর চেম্বারলিনের সেনারা সেনা ছাউনি ত্যাগ করে নওশেরার বাইরে যাত্রা করেছিল। চমকপ্রদ উপাদান সংরক্ষণের জন্য চেম্বারলিনকে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল শেষ মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত তিনি যেন তার আদেশ গ্রহণ না করেন, তবে যখন তিনি পৌছান তখন তাঁর সেনাদলকে দেখলেন স্থান ত্যাগে উদ্যত আর হতাশা ব্যাঞ্জকভাবে অপ্রস্তুত। তিনি তাঁর ভ্রাতার নিকটে পত্র লেখেন, 'আমি কখনও এরকম সমস্যা বা জিনিস

এত অসন্তোষজনক অবস্থায় পাইনি, গাড়ি, সরবরাহসমূহ, শস্য-থলে সবই ছিল অপর্যাপ্ত। আমাদের কিছু বন্দুক আর সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির গোলা বারুদ নিক্ষেপের মর্টার অকেজো অবস্থায় ফেরত পাঠান হয়।' ভারমুক্ত নয় আর দ্রুতগামী সেনাদল যেটি ব্রিগেডিয়ার কটন পাঁচ বছর পূর্বে সংগঠিত করেছিলেন, এটি এমন একটি দল যা দ্বিগুণ বড় আর তিনগুণ ধীর গতি সম্পন্ন। সৈন্যদের যাত্রা ছিল মহাবন পর্বত অভিমুখে, এটি প্রসারিত হয়েছিল হস্তিদের লম্বা সারি, উট, ষাঁড় ও গরুর গাড়ি, যা প্রচুর তাঁবুসহ টেবিল, চেয়ার, পালঙ্ক, বাসন-কোসন, কর্মকর্তা ও সৈনিকদের অনাবশ্যকভাবে বিশাল ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে পূর্ণ ছিল; এবং এইসব লটবহরের সাথে দেশীয় অনুসারীদের ঝাঁক আবশ্যিকভাবে যুক্ত হয়েছিল, যারা যুদ্ধরত সেনা সদস্যদের সংখ্যায় বিপুলভাবে অতিক্রম করেছিল, যা ছিল এবং আছে ভারতীয় সেনাদের একটি সংযোজন হিসেবে। এই শোভাযাত্রাটির দরান গিরিপথের মুখে পৌছাতে সমস্ত দিনটিই লেগে যায়, সেই স্থান যেখানে ১৮৫৮ সালে কটন সাহেবের সেনাবাহিনী এই পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করে।

রেয়নেল টেলর তাঁর কমিশনার পদটি তাঁর সহকারি মেজর হিউজ জেমসকে হস্তান্তর করেন যাতে তিনি চেম্বারলিনকে অভিযানের কর্মকর্তা হিসেবে সঙ্গ দিতে পারেন। কিন্তু মন্টগোমারির সঙ্গে আলোচনার পরে তিনি একটি জরুরি সিদ্ধান্ত নেন যে বুনারীদের এলাকা আক্রমণের পূর্বাভাস দেবেন না, এই কারণে যে 'আমাদের অভিপ্রায় নিশ্চিতভাবে পত্র দ্বারা অবহিত করা হয়েছে।' চেম্বারলিনের সেনাবাহিনী মহাবন পর্বতের দক্ষিণের পাদদেশের শিবির স্থাপন না করা পর্যন্ত টেলর সাহেব বুনারীদের, চামলাবাসীদের, সোয়াতিদের প্রধানদের নিকটে এবং পার্বত্য ইউসুফজাই উপজাতিদের কাছে তাঁর সেনাসদস্যরা চামলা উপত্যকায় প্রায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে এই মর্মে ঘোষণা দিয়ে দূত প্রেরণ করেন নি। তাঁর ঘোষণা নিশ্চয়তা প্রদান করে যে অনধিকার প্রবেশ হতে যাচ্ছে 'তাদেরকে কোন আঘাত করার অভিপ্রায়ে বা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্য নয়, তবে কারণ ছিল এটিই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পথ যেখান দিয়ে হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের কাছে পৌঁছানো আর তাদেরকে মহাবন পর্বত থেকে তাদের বিতাড়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।'

সেই একই রাত্রে তাদের তাঁবুতে আক্রমণ চালিয়েছিল এবং ভূমির ধার দিয়েআমবেলা পিরিপথের মুখে পদযাত্রা শুরু করেছিল, পরের দিন সকালে সৈন্যদের একটি স্তম্ভাকারে গঠিত সৈন্যদল পৌঁছেছিল। পদাকিতদের আরোহণ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল, অবশিষ্ট সৈন্যরা পশ্চাতে অনুসরণ করছিল। মেজর হিউজ জেমস যা লিখেছিলেন, 'এটা কি সম্ভব ছিল যে একটি নিরক্ষর সাহসী গোষ্ঠী এক মুহূর্তের জন্য স্থিরভাবে একটি পত্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাববে যা তারা মোটেও পড়তে পারে না, যে মুহূর্তে তাদের দরজায় সম্ভাব্য হানাদাররা অস্ত্রের ঝলকানি প্রদর্শন করছে?'

চেম্বারলিনের পরিকল্পনা ছিল তাঁর অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে রাত্রির শেষের দিকে কোটালের উপর দিয়ে চামলা উপত্যকার উৎস মুখে অবস্থান করা। রেয়নেল টেলরের গোয়েন্দা তাঁকে নিশ্চিত করেছিলেন যে 'সামনের গিরিপথটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে', তবে তাঁরা ভ্রান্তিতে ছিলেন: প্রত্যাশিত গাধা চলার পথ অবশেষে দেখা গেল সেটি আর কিছুই নয় একটি ক্ষীণ ধারা স্রোতস্বিনী যা 'অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রস্তর ও বড় বড় বোল্ডার দ্বারা পরিব্যাপ্ত।' এক সারিতে পদব্রজে যাত্রা করে সৈন্যরা কোটালে পৌঁছেছিল, ঠিক এই স্থানে এসে তারা উপরিভাগের খাদ-খন্দক থেকে পরিচালিত গুলি বর্ষণে সম্মুখীন হয়। চতুর্দিকের পাহাড়গুলো ছোট ছোট ঝোপে আচ্ছাদিত ও অভিক্ষিপ্ত পাহাড় আর জলস্রোতের আঘাতে আঘাতে গোল আকার প্রাপ্ত বৃহদকায় শিলা খণ্ড—এটা উপজাতীয় দীর্ঘ নালা বিশিষ্ট বন্দুকের জন্য উপযুক্ত একটা আচ্ছাদন। ওদের এই লম্বা নালার অস্ত্রগুলি ব্যবহারের বিশেষ অসুবিধা হলেও সিকি মাইল দূরত্বের জন্য এগুলো অত্যন্ত নিশানাবাহী। যাহোক, গাইডস ও পাঞ্জাব সীমান্তের পদাতিক বাহিনী যারা অগ্রবর্তীদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারা এই পাহাড়ি যুদ্ধের কৌশলে সুদক্ষ ছিল এবং তারা ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে হাতাহাতি লড়াই করে উপজাতীয় লোকদের পার্বত্য এলাকায় বল প্রয়োগ করে পশ্চাতে সরিয়ে দিয়েছিল। অপরাহ্নের প্রথম ভাগে পশ্চিম দিকে চামলা উপত্যকা অভেদ্য হয় ও আশপাশের সর্বদিকে দৃঢ় ঘাঁটি গাড়ে আর চতুষ্পার্শ্বে পরিব্যাপ্ত কঠিন ও অভিক্ষিপ্তাংশের উপরে ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়। যখন রাত্রি নামে তখন তাদের শিবিরে তল্পিতল্পাসহ কোন জন্তুযান এসে পৌঁছায়নি এবং গিরিপথের পাদদেশে কয়েক সহস্র সৈন্য আটকে পড়ে।

পূর্ববর্তী রাত্রে চোরাগুপ্তা হামলার কারণে জেগে জেগে কাটিয়ে চেম্বারলিন তাঁর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাথে চলমান অবস্থা মূল্যায়নের জন্য এক সঙ্গে বসেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে গিরিপথের মধ্য দিয়ে গাধা চলার পথ তাঁর প্রকৌশলীর দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত সহনীয় পর্যায়ে উন্নত না হয় ততক্ষণ 'পরবর্তী অগ্রযাত্রা না করায়' শ্রেয়। দুই সপ্তাহ যাবত তাঁর সেনাদল তাদের বিদ্যমান অবস্থার শক্তি বৃদ্ধি করা ব্যতীত যৎসামান্যই করেছে।

এই বিলম্ব প্রাণনাশক প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছিল। মালকার হিন্দুস্তানি দুর্গটি চামলা উপত্যকা থেকে বিশ মাইল দূর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। সাম্প্রতিক সংবাদ জানায় যে এটি বর্তমানে হিন্দুস্তানি ও তাদের মিত্র সৈয়দদের যৌথ বাহিনীর সহস্রাধিক সেনা দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে, সৈন্যদের বোঝানো হয়েছিল সরবরাহকারি সেনাদের পুনরায় অভিযানে প্রতিহিংসার মানসিকতা নিয়েই আনা হয়েছিল। হিন্দুস্তানিদের অভিযানের দাপ্তরিক বিবরণে লিপিবদ্ধ করা হয়, 'তারা আমাদের রীতি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করে যাচ্ছিল এবং তারা পুরোনো ভারতীয় সেনাবাহিনীর মত পোশাক পরিহিত ছিল। তাদের তিনজন ৫৫তম সৈন্যদলের স্বদেশি পদাতিক বাহিনীর জমাদার (কনিষ্ঠ কর্মকর্তা) অতি নিম্নপদস্থ ছিল...।

তারা সংখ্যায় ছিল ন্যুনপক্ষে ৯০০ জনের মত, তাদের অধিকাংশই ধর্মীয় আবেগে অন্ধ হয়ে তাদের জীবনকে বাজি রেখেছিল। বুনারীরা ও চামলাবাসীরা একত্রে বারো সহস্র যোদ্ধার মনে শক্তি যোগাতে পারত, তবে তারা এখনও বিশৃঙ্খল। তাদের প্রধানরা যতক্ষণ না তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে কিভাবে বহিরাক্রমণের জবাব দেবার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনুপরূপই রইল। অনুরূপ প্রেক্ষাপটে নবীন ও অধিকতর তৎপর চেম্বারলিন যিনি তাঁর পূর্বের জীবনে হলে তাঁর এই বাহিনীকে দ্রুত ধাবমান পাঞ্জাব বাহিনীর সাথে একাত্ম করতেন ১৮৫৮ সালে কটন সাহেব মঙ্গলথানায় যেমনটি করেছিলেন। কিন্তু প্রায় নয় মাইল দূরে আমবেলা গিরিপথে বেয়ে সৈন্য রসদ সরবরাহের কষ্টসমূহ চেম্বারলিনকে পিছটান দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

২২ অক্টোবরের সকাল পর্যন্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র মিশ্র সেনাদল চামলা উপত্যকার সম্মুখে প্রেরণ করা হয়নি। প্রথমে এটিকে পরিত্যক্ত দেখায়, সামরিক অভিপ্রায়ে পর্যবেক্ষণকারী দল প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উপত্যকার এগার মাইল নিচে দ্রুত বেগে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু তখন তাদের লড়াই করে সেনাশিবিরে ফিরতে হয়েছিল, এবং একমাত্র চন্দ্রালোকের অশ্বারোহী সৈন্যদের আক্রমণ করে তাদেরকে রক্ষা পেতে হয়েছিল। সেই একই রাত্রে রেয়নেল টেলরের জনৈক গোয়েন্দা পত্র নিয়ে আসেঃ এটি বুনারীদের প্রধানদেরকে উদ্দেশ্য করে লিখিত ও হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের আমির আব্দুল্লাহ্ আলী, এবং সাঈদদের নেতা সাঈদ ওমর শাহ্ এতে যৌথভাবে স্বাক্ষর করেছেন। যদিও এতে রেয়নেল সাহেবের পূর্ব আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, এটি মূলত সমগ্র পাহাড়ি অঞ্চলকে ধ্বংস করে দেবে—

> বিশেষতঃ চামলা, বোনায়ের, সোয়াত প্রভৃতি প্রদেশসমূহকে—এবং এই দেশগুলোকে তাদের রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেবে আর তখন আমাদের ধর্ম ও আমাদের পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি সামগ্রিকভাবে পরাভূত করা হবে। কাফিররা অত্যধিক কপট ও প্রতারক, এবং যেভাবেই পারুক তারা এই পাহাড়ি অঞ্চলসমূহে এসে যাবে আর তারা ঘোষণা দেবে যে তাদের সঙ্গে তাদের (কাফিরদের) কোন সম্পর্ক নেই, তাদের বিরোধ কেবল হিন্দুস্তানিদের সঙ্গে, তারা জনগণকে কোন প্রকার উৎপীড়ন করবে না, এমন কি তাদের মাথার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না। তারা লোকজনকে সম্পদ দিয়ে প্রলুব্ধও করবে। অতএব তোমাদের জন্য যথাযথ কাজ হচ্ছে তাদেরকে প্রতারণা করতে না দেয়া, এই জন্য যে যখনই তারা সুযোগ পাবে, তখন সব কিছু ধ্বংস করে দেবে, নিপীড়ন করবে, এবং তোমাদেরকে অনেক ক্ষতির শিকার করবে, তাদের নিজেদের জন্য উপযুক্ত হলো তোমাদের সম্পদ, বিষয়-আশয়, আর তোমাদের ধর্মের ক্ষতি সাধন।

চেম্বারলিনের বিলম্ব হিন্দুস্তানি ও তাঁদের সহযোগীদের সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে সহায়তা করে, এই প্রেক্ষিতে তারা বেশ সময় পেয়ে যায় বুনারীদেরকে সাড়া দিতে কিন্তু অন্যান্য সব খান ও মালিকদেরকে অবহিত করা হয় নি। পরবর্তী

দিন সকালেই সশস্ত্র উপজাতিদের দলসমূহ পাহাড়ের শীর্ষে আসতে লাগল, তারা প্রায় সব দিক থেকেই আসছিল, প্রত্যেক দলেই পতাকাবাহী বিশিষ্ট নেতা সবুজ ও কালো পতাকাসহ ঢাকিদেরকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের মধ্যে এক বৃহৎ লশকর বা যোদ্ধা বাহিনী দেখা গেল যাদের কালো ফতুয়া আর নীল হিন্দুস্তানি বলে পরিচয় দান করে। প্রতি ঘন্টা অন্তর উপজাতীয় লোকজন তাদের সঙ্গে যোগ দিল। অতএব যখন পর্বতে অন্ধকার নেমে এলো তখন আমবেলা গিরি সঙ্কট ও তার বাইরের উপত্যকা শিবিরের রান্নার আগুনের ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। চেম্বারলিনের দফতরে এখন জানা গেল যে বুনারীদের প্রধানগণ উপজাতীয় সমাবেশে মিলিত হয়ে সোয়াতের আখুন্দের নিকটে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানান।

এই পর্যায়ে রেয়নেল টেলর এখনও প্রত্যাশা করেন আখুন্দ আব্দুল গোফুর তাঁর পক্ষে মধ্যস্থতা করবে। এ বিষয়ে জন অ্যাডি লেখেন, ‘সোয়াতের আখুন্দের প্রভাব সমস্ত পাহাড়ি এলাকার ও পেশোয়ার সীমান্তের সমভূমির উপজাতিদের উপর খুবই বিরাট এবং তাদের কাছে তাঁর অবস্থান যা আমি রোমের পোপের সমতুল্য বলে দৃষ্টান্ত দেওয়াকে সর্বোত্তম মনে করি। যদি তিনি আমাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন, নি:সন্দেহে তিন বোনায়েরের জনগণ ও অন্যান্য উপজাতিদের যারা ইতিমধ্যেই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে তাদের মনে বস্তুগত এবং নৈতিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চার করতে পারবেন। কিন্তু আখুন্দ তাঁর আভ্যন্তরীণ মোকাবিলা করছেন সাঈদ মোবারকের আবির্ভাবে যিনি হিন্দুস্তানিদের প্রধানের নিকট সোয়াত রাজের খেতাবের মিথ্যা দাবিদার। যদি তিনি ব্রিটিশদের আক্রমণকে অগ্রসর করতে দিতেন, তিনি তাহলে সোয়াত রক্ষার সকল নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলতেন এবং সুযোগ-সুবিধা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তুলে দিতেন।

তিনদিন পরে রেয়নেল টেলরের ভীষণ আতঙ্কের বিষয়টা বোঝা গেল যখন বহু ঢাকের শব্দ শোনা গেল আর একগুচ্ছ আন্দোলিত পতাকা উত্তর দিগন্তে শোভা পেতে দেখা গেল, এগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছিল চার সহস্র বলিষ্ঠ সৈন্য সম্বলিত সেনাবহিনী। তারা ছিল সোয়াতি আর তাদের মাঝখানে ছিলেন আখুন্দ স্বয়ং, যিনি বর্তমানে পাহাড়ে শিবির গেড়েছেন সেখান থেকে আমবেলা গ্রামটি দেখা যায়। আখুন্দের পৌত্র সোয়াতের প্রথম ওয়ালি, তাঁর মতানুসারে, তাঁর পিতামহ আমবেলার উদ্দেশ্যে একাই যাত্রা করেন, কিন্তু ‘সাইদুবাবা (আখুন্দ) জিহাদে যাচ্ছেন এই সংবাদ আগুনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং শত শত লোক পথে তাঁর দলে যোগ দেয়। এর ফলে ২৬ অক্টোবরে আমবেলা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছালে তাঁর সঙ্গে দেখা গেল চার সহস্র পদাতিক স্বেচ্ছাসেবক এবং সোয়া শ অশ্বরোহী সৈন্য।’

এক সময় জানা যায় যে তাদের প্রিয় সাইদু বাবা তাঁর কর্তৃত্ব বুনার ও চামলার রক্ষার্থে সাময়িকভাবে তাদেরকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন, যারা পূর্বে নিজেদের বিবেক বিসর্জন দিয়ে নিষ্ক্রিয় ছিল তারা তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সংগ্রহ করে গিরিপথের মুখে যুদ্ধে যোগ দিতে দ্রুত ধাবিত হলো। অক্টোবর মাসের শেষে গুণতিতে দেখা গেল যে আমবেলার পাহাড় শীর্ষে দশ সহস্র সোয়াতি যোদ্ধাসহ মোট পঞ্চান্ন সহস্র যোদ্ধা সমবেত হয়েছে।

চেম্বারলিনের এখন শুধুমাত্র দেখার বিষয় ছিল তাঁর অবস্থানকে বেকায়দা অবস্থায় পড়তে না দেওয়া। তাঁর আমবেলা গিরিপথের উত্তর দক্ষিণের ধাপের ফাঁড়িদ্বয় সর্বাধিক ঝুঁকিতে ছিল, একটি গুরু পর্বত থেকে দেখা যেত, অপরটি শঙ্কুবৎ চূড়া থেকে যেটি লাল্লু হিসেবে পরিচিত ছিল। এই পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গ ধরে খাড়া সিঁড়ির মত ভেঙ্গে যে ঢালু ভূমির অবতরণ ঘটেছিল তা একটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নদ্যাদির উচ্চ ও দুরারোহকুল সৃষ্টি করেছিল, এই অঞ্চলটির উত্তর দিকের অবস্থান জনশ্রুতি থেকে ঈগল পাখির বাসা নামে পরিচিত, এবং এরই দক্ষিণে অবস্থিত উন্মুক্ত তীক্ষ্ণ স্থানটি দুরারোহ পর্বত চূড়া চৌকি হিসেবে পরিচিত। ২৪ অক্টোবরের রাত্রে চেম্বারলিনের সেনারা ধারাবাহিক আক্রমণের প্রথম আক্রমণটি করে যাতে তাদের এই দুই অবস্থানকে অবৈধভাবে দখল করতে না পারে সে জন্যে। ভঙ্গুর মাটির কারণে বিরতিহীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা বা পরিখা খনন করা অসম্ভব ছিল, তবে যেখানেই সম্ভব হয়েছে পাথর ছুড়ে ফেলা হয়েছে, পলায়নের উপায় হিসেবে তাড়াহুড়ো করে প্রস্তরের প্রাচীরাদি নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে সূচাল লাঠি দিয়ে প্রতিহত করা হয়েছে।

এই দুইটি কৌশলী অবস্থানকে নিরাপদ করতে না করতেই তারা সহসা বেপরোয়া প্রবল আক্রমণের শিকার হয়, তারা একের পর এক বেপরোয়া অভিযানে নিয়োজিত হলো যেখানে হিন্দুস্তানিদেরকে যুদ্ধের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অস্ত্র পরিচালনায় দেখা গেল। প্রথম আক্রমণের পর গুণতিতে ত্রিশজন হিন্দুস্তানিকে মৃত পাওয়া গেল, তাদের অধিকাংশই চেহারায় বাঙ্গালি যুবক ছিল। সংক্ষিপ্ত সাময়িক যুদ্ধ বিরতির ও পরবর্তী আক্রমণের সময় দেখা যায় যে যখন উপজাতীয়রা তাদের নিহত ও আহতদেরকে নিতে এলো তখন তারা 'পতিত হিন্দুস্তানিদেরকে মাটির পাত্রের মত ঘৃণা করে, যা যুদ্ধের দিনে আমাদের মাথাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করার কথা, কিন্তু এটি অতি রঞ্জিত ও অলীক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেননা তা সংগ্রহের সময় যে কোন সংঘাতময় মুহূর্তে ভেঙ্গে যেতে পারত।'

তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও, প্রতিহতকারীরা উপজাতীয় লোকজনকে মুহুর্মুহু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি তাদের সর্বাধিক জয় সমতল ক্ষেত্রের পরিসীমায় সৈন্যব্যূহ বেষ্টিত স্থান থেকে। এই

অভিযানগুলি প্রায়শঃই গুপ্তস্থল থেকে অবিরাম গুলি বর্ষণের মধ্য দিয়ে শুরু হত। এগুলো সর্বদা গুপ্ত জায়গা থেকে প্রবল গুলি বর্ষণে অগ্রবর্তী ছিল,যা আক্রমণকারী দলসমূহকে পাহাড় ও ঝোপ-জঙ্গলের মাঝ দিয়ে তাদের অগ্রসর হওয়ার কাজে সহায়তা করত যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রতিরক্ষা ব্যুহের মাঝে জড় হতো। অত:পর আক্রমণকারীরা তাদের গুপ্ত স্থান থেকে উঠে 'আল্লাহ্-হো-আকবর' (আল্লাহ্ মহান) বলে চিৎকার দেয়, তাদের পতাকা উত্তোলন করে আদেশ করে 'পার্বত্যবাসীদের দৃঢ় মানসিকতা—ছোট ছোট তরবারিধারী লোকজন, আর যারা তাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে হাতাহাতি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছে—তখন তারা দ্রুত এগোচ্ছিল এবং বিশাল সাহসিকতায় ঐ কাজের জন্য পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল, পাহাড়ের আড়ালে সমবেত হচ্ছিল, তারা পুন: দম নেওয়ার নিমিত্তে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিচ্ছিল, এবং চূড়ান্তভাবে তীব্রবেগে ছুটে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।'

৩০ অক্টোবরের প্রত্যুষের ঠিক পূর্বে হিন্দুস্তানিরা পাঞ্জাব পদাতিক বাহিনীর এক কোম্পানি ক্র্যাগ পিকেটের (দুরারোহ পর্বত চূড়া মাটিতে প্রোথিত সূচাগ্র খোঁটা) উপর হামলা চালিয়ে পরাজিত করে তাদের স্থান দখল করে নেয়। প্রথম প্রত্যুষে কয়েক শ উপজাতীয় লোক নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সম্মুখে এগিয়ে হিন্দুস্তানিদের সঙ্গে যোগ দেয়, এবং এক বেপরোয়া আক্রমণ করা হয় 'একটি সর্বাধিক উত্তেজনার হাতাহাতি লড়াই উদ্ভূত হয়, যাতে মেজর কেয়েস আহত হন, শত্রুরা বেয়োনেটের মুখে বিতাড়িত হয়, স্থান পুনর্দখল করে নেওয়া হয়, তিনটি পতাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়...। হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধরা ৫৪জন যোদ্ধাকে হারায় তারা যুদ্ধ স্থলেই নিহত হয়, আর তিন জন আহত হয়।' এটি ছিল তিনটি ঘটনার মধ্যে প্রথমটি যাতে ক্র্যাগ পিকেটের হাত বদল হয়।

প্রচণ্ড যুদ্ধের এক সপ্তাহ পরে নেভিল চেম্বারলিন তাঁর অবস্থানের সঙ্কটজনকতার ইঙ্গিত দিয়ে সংক্ষিপ্ত ও খসড়া পত্র দ্রুত প্রেরণের জন্য লিখতে বসে পড়েন:

> প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু থেকে কাবুলের সীমানা পর্যন্ত প্রায় সকল উপজাতিদের মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই কারার জন্য ঐক্য বিদ্যমান। প্রাচীন বিদ্বেষসমূহ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রয়েছে: এবং ধর্মান্ধদের প্রভাবাধীনে সাধারণত উপজাতিরা একে অপরের শত্রু, শত্রু ভাবাপন্ন উপজাতিরা আখুন্দ বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। আখুন্দরা এ সময়ে সিত্তানার মৌলভি (আমির আব্দুল্লাহ্ আলী)র প্রতিবাদ করেছেন, যিনি একটি ব্যতিক্রমী মোহাম্মদী ধারা উপস্থাপন করেন; তবে বর্তমানে তাঁরা সমঝোতার বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, আর নিশ্চিত যে সমস্ত

> হিন্দুস্তানি উপনিবেশ হয় এখানে, বা তাদের আমবেলার পথে...। আমরা একটি প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত আছি যাতে শুধুমাত্র যে হিন্দুস্তানিরা ও মাহবন উপজাতিরা রয়েছে তা নয়, তবে আরও রয়েছে সোয়াতিরা, বাজোরীরা, এবং বুরেন্দোর উত্তরে সিন্ধু উপ-জাতীয় গোষ্ঠী সংক্ষুব্ধ ও অশান্ত অবস্থায় তাদের ছিটে ফোটা—দল নিয়ে আমাদের নিজস্ব সীমা রেখার মধ্যে অবস্থান করছিল।

মালকায় হিন্দুস্তানি অধ্যুষিত অঞ্চলে অগ্রসর হওয়া প্রশ্নের বাইরে ছিল, ঠিক তেমনই এখান থেকে পশ্চাদপসরণও সহজ কোন বিষয় ছিল না 'আমাদের অস্ত্রধারী সেনাদলের সম্মান বজায় রাখার শুধুমাত্র একটি পথ ছিল এবং সরকারের স্বার্থ রক্ষার পথ ছিল নিজ প্রতিরক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া, যে অবস্থায় সৈন্যরা আত্মপক্ষ সমর্থনে নিয়োজিত, আর সময়ের প্রেক্ষিতে তাদের শত্রু বাহিনীর মুহুর্মুহু আক্রমণকে নিরুৎসাহিত করা ও এই উদ্দেশ্যেই শত্রুদের উপর নিষ্ফল আক্রমণ পরিচালনা করা।'

এভাবে দাঁড়িয়ে আঘাত হানা তখনকার একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তী তিন সপ্তাহকাল জুড়ে চেম্বারলিনের বাহিনী দিন রাত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, মাঝে মধ্যে চোরা গোপ্তা হামলাও চালিয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধ রেখার অনেকাংশে দেখা গেল উভয় পক্ষের সৈন্য-সামন্তরা এত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল যে তারা একে অপরের প্রতি তিরস্কার ও অশালীন বাক্য প্রয়োগ করছিল। আমবেলায় উপস্থিত বিদ্রোহের ছয়জন সহ-সভাপতির একজন মেজর ফ্রেডারিক 'ববস' রবার্ট লিপিবদ্ধ করেন, 'শত্রুরা ব্রাউনলোয়ের ও কেয়েসের লোকজনের সঙ্গে তামাশা করত [২০তম এবং প্রথম পাঞ্জাব পদাতিক, উভয়ই মুসলিম সৈন্যদল] আর এই সব উপলক্ষে বলত, "আমরা তোমাদেরকে চাই না। লাল পাগড়িওয়ালা লোকগুলো কোথায়? [১৪তম শিখ বাহিনী, যারা লাল পাগড়ি পরিধান করত] অথবা গোরা লোগ [শ্বেত লোকেরা]? ওরা আরও ভাল শিকার [কৌতুককর]" পাঞ্জাব সীমান্তের সেনাদলের সকলে নিজেদেরকে দেখল যে তারা নিজেদের উপজাতিদের সঙ্গে লড়াই করছে, আর কতক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃবৃন্দের ও অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গেও। বুনার থেকে যুদ্ধে নিয়োজিত হওয়ার পর এক সিপাই বুঝতে পারল যে তাঁর সম্মুখে তাঁর পিতা মৃত শত্রুদের মধ্যে পড়ে রয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে অবস্থান ত্যাগ করে পলায়নের কোনই উপায় ছিল না।

১২ নভেম্বরে চেম্বারলিন ও তাঁর সেনাদের প্রথম বিরাট সংকট দেখা দিল যখন পাঠানরা ক্র্যাগ পুনর্দখলের জন্য নতুন উদ্যোগে রাত্রে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকল আর সেটি পরবর্তী দিনের সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। অবিরত আটচল্লিশ ঘন্টা গুলি-গোলার মধ্যে ক্র্যাগ পিকেটের

প্রতিরোধকারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পলায়ন করে। বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে সিপাইরা পর্বতের পাদদেশে পশ্চাদপসরণ করছিল। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার নেভিল চেম্বারলিন সরাসরি নিচের শিবিরে ছিলেন, তবে পর্বতের চারিপাশ ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল আর কালো মেঘের মত গুলি চলাচলের ধোঁয়ার কারণে কি ঘটে চলেছে তা বলা সম্ভব ছিল না। শিবিরে অবস্থানরত অনুসারীদের তার নিজের তাঁবুর পাশ দিয়ে হঠাৎ একত্রিত বিক্ষিপ্ত পদচারণায় ভীত হয়ে পালিয়ে যেতে দেখলেন, তিনি বাইরে দৌড়িয়ে গিয়ে ১০১ রাজকীয় বঙ্গীয় সেনাদলকে ডাকলেন। বেশ আকস্মিকভাবে, এই ব্রিটিশ সেনাদল তাদের নতুন অবস্থান নিতে যাচ্ছিল, এবং ইতিমধ্যে বাইরে যাবার প্রাক্কালে সারিবদ্ধ হয়েছিল। ক্র্যাগ (দুরারোহ পর্বত চূড়া) যে কোন মূল্যে পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ হয়েছিল। পাহাড়ে তুমুল সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল ও ঝটিকা হানাহানি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে বিবদমান দুই শিবিরের মধ্যে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ বিরতি দিয়ে নিজ নিজ যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের সংগ্রহ করে তাদের অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

গিরিপথের দক্ষিণ দিকের লাল্লুর পাদদেশে চেম্বারলিনের অবস্থান এখন অত্যধিক অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। রেয়নেল টেলর বুনারীদেরকে আকার ইঙ্গিতে বোঝানোর ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে ব্রিটিশ বাহিনীর তাদের অঞ্চলে যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা নেই, অতএব ১৬-১৭ নভেম্বর রাত্রে গিরিপথের উত্তরে গুরু পার্বত্য অঞ্চল থেকে নীরবে সেনাদলকে প্রত্যাহার করে নেন। এই ইঙ্গিত বুনারীদের কাছে ভালভাবেই গৃহীত হলো, এই সময় থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে আর তারা কোন সক্রিয় ভূমিকা রাখল না। কিন্তু হিন্দুস্তানিদের যুদ্ধের উৎসাহকে এটি দমন করতে পারল না। এই মাটির প্রাচীর দিয়ে প্রায়—আত্মঘাতি আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কেবল হিংস্রতম হাতা-হাতি যুদ্ধে তাদেরকে প্রতিহত করল। বিক্ষুব্ধ হয়ে, চেম্বারলিন সাহায্যের জন্য স্পষ্ট আহ্বান জানিয়ে মন্টগোমারি সাহেবের নিকটে একটি পত্র প্রেরণ করেন। 'আমি শত্রুদের আক্রমণ মোকাবিলা করাটা আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে...। যদি আপনি সর্বাধিক সংখ্যক কমে যাওয়া ও উদ্যমহীন সৈন্যদেরকে উদ্ধারের নিমিত্তে কিছু সক্ষম সৈন্য পাঠাতে পারেন, উদ্ধারকারী সৈন্যদেরকে সমতল অঞ্চলে রক্ষার জন্যে পাঠানো যেতে পারে। এটি জরুরি।'

একদিন পর পাঠানরা ও হিন্দুস্তানিরা ক্র্যাগ পিকেটের উপর তাদের তৃতীয় ও শেষ প্রচেষ্টা চালায়। পূর্বের ন্যায় তারা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালায় আর, পূর্বের মত, যে দুই শ প্রহরী পিকেট প্রহরায় ছিল অবশেষে ভীত হয়ে তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে। কিন্তু এইবার শত্রুরা ক্র্যাগ দখল করার যুদ্ধ প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হলো এবং শিবিরের সব দিক থেকেই দেখা

গেল। সব যুদ্ধক্ষেত্রেই বন্দুক ও রাইফেল আনীত হলো আক্রমণকারীদের উপর প্রয়োগার্থে, যতক্ষণ প্রস্তুত অতিরিক্ত সেনাবাহিনী এসে উপনীত না হলো ততক্ষণ এই পন্থায় নতুন দখলকারীদের আবদ্ধ করে রাখা হলো। এখন বর্তমান ব্রিটিশ সেনাদল ৭১ তম পার্বত্য ক্ষুদ্র পদাতিক বাহিনীর সাহস দেখানোর পালা।

রেয়নেল টেলরের ক্ষতিকর পথের বাইরে থাকার বিষয়ে নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও, নেভিল চেম্বারলিন সম্মুখভাগ থেকে নেতৃত্ব দেওয়াকে বেছে নিলেন ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে মনের উপর চাপ পড়ায় তিনি আর প্রতিরোধ করতে পারেন নি। তিনি ও টেলর সাহেব দু'জনই পার্বত্যবাসীদের প্রধান ছিলেন যখন তারা বেয়োনেটের ভয় দেখিয়ে ক্র্যাগ পুনর্দখল করে। এবং চেম্বারলিন তাঁর বাহুতে বুলেট বিদ্ধ হওয়ায় দৈহিক যন্ত্রণার শিকার হন যার ফলে তাঁর কনুইয়ের হাড়গুলো চূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর পুরোনো বন্ধু সার্জন হেনরি বিলিউ তাঁর বাহু থেকে বুলেট অপসারিত করেন।

লাহোরে স্যার রবার্ট মন্টগোমারি সাহাযার্থে অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরণের জন্য ভীতির সঙ্গে আবেদন পেলেন। তিনি কেবল সৈন্যবাহিনী প্রেরণই করলেন না তবে পেশোয়ারে মেজর হিউজ জেমস কর্তৃক পূর্ব সঙ্কেত পেলেন 'বিক্ষোভ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল' আফগান সীমান্ত বরাবর 'পেশোয়ার সীমান্তে মুসলমানরা শত্রুতা প্রদর্শন করতে শুরু করছিল...। কোহাট থেকে উজীরীরা ও অথম্যানখেলদের দ্বারা প্রত্যাশিত হানার গুজব আমার নিকটেও পৌঁছাচ্ছিল। কাবুল ও জালালাবাদের গুপ্তচর আখুন্দের সঙ্গে যারা ধেরের প্রধান গাজন খান ৬০০০ সেনাদের দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করে।' পাঠানরা ও হিন্দুস্তানিরা দুই সহস্রাধিক মৃত আর সম্ভবত ঐ সংখ্যার তিনগুণ সৈন্যদের নিয়ে এখন যন্ত্রণায় পড়লেন, তবে ব্রিটিশদের ক্ষতিসমূহও আনুপাতিক হারে কম ছিল না। ১৮ জন সেনা কর্মকর্তা এবং ২১৩ জন নিহত হয়, আর ৭৩১ জন হয় আহত।

মন্টগোমারি উপসংহারে বলেছেন যে একমাত্র বিষয় যা চেম্বারলিনকে যুদ্ধ প্রত্যাহার করার ক্ষমতা দেয়। তিনি আমবেলায় মেজর জেমসকে রেয়নেল টেলরকে প্রতিস্থাপনের আদেশ দেন ও চেম্বারলিনকে বিচ্ছিন্ন করতে বলেন 'যদি এটি সামরিক বিধানে অনুমোদনযোগ্য হয়।' জেমস চেম্বারলিনকে দেখলেন এই অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ক্ষেত্রে বেশ কষ্টে রয়েছেন— তবে তিনি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন যে এই প্রত্যাহার করা হবে 'সর্বাধিক অগ্রহণযোগ্য।'

প্রধান সেনাপতি স্যার হিউজ রোজ মন্টগোমারিকে বাতিল করে মধ্যস্থতা করেন, এবং আমবাল্লা ও সমতলের অন্যান্য জায়গার সেনাদলকে আদেশ দেন কষ্টকৃত কুচকাওয়াজের সাথে পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হতে। মেজর 'ববস'

রবার্টস উক্ত রোজ সাহেবের সদর দফতরের কর্মচারীদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থার প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য তাঁকে আমবেলায় পাঠানো হয়। তিনি চেম্বারলিনকে দেখলেন তাঁর তাঁবুতে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন তবে স্থির নিশ্চিত যে একটি প্রত্যাহার কেবল পাঠনদেরকে সীমান্ত বরাবর যুদ্ধ প্রসারিত করতে উৎসাহিত করবে। উপরন্তু, বুনারীরা ও সোয়াতিরা যে হতাশ হয়ে পড়ছিল তার পরিষ্কার লক্ষণ নিহিত ছিল। 'তারা এই অভিযানের আসল ধাক্কা বয়ে বেড়িয়েছিল, অনেক সৈন্য হারিয়েছিল, আর এখন তারা দেখল তাদের উপত্যকা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, এবং দূরবর্তী প্রদেশের ক্ষুধার্ত পার্বত্যবাসীরা তাদের মজুত খাদ্য খেয়ে ফেলেছে।'

১০ ডিসেম্বরে বুনার খানদের ও মালিকদের প্রতিনিধিবর্গ যুদ্ধ বিরতির পতাকা নিয়ে শিবিরে উপনীত হলেন, তারা ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক হিন্দুস্তানিদের বহিষ্কারের সমর্থন জানিয়েছিল যে একটি শর্তে মহাবন পর্বত থেকে ব্রিটিশরা তাদের সৈন্য তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার করে নেবে। মনে হলো যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে—যতক্ষণ চুক্তিটি সম্বন্ধে সোয়াতের আখুন্দরা অবগত না হলো। তিনি এখন আব্দুল্লাহ্ আলীর দৃষ্টিতে অনুকূল হলেন যে ব্রিটিশরা বিজয়ের ব্যাপারে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ, এবং সেটি যা এখানে বিপদগ্রস্ত তা তাঁর ধর্ম। ওয়াহ্হাবিদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ শত্রুতা ও তাদের শিক্ষাকে বাতিল করে। আখুন্দ যুদ্ধে যাওয়ার বয়সী সোয়াতিদেরকে তাঁর ধর্ম রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে আহ্বান জানান। দ্বিতীয় বারের মত পাহাড়ি এলাকার আশ-পাশ উপজাতি লোকজনে ভরে গেল ও তাঁদের শিবির শুরু হলো। 'ওয়াচ টাওয়ারের আলো দিয়ে নিচে অবস্থিত মানুষগুলোর সংখ্যা ১২ জন হিসেবে নির্ণয় করে বহু সহস্রের উপস্থিতির পূর্বাভাস দিত।' মধ্য ডিসেম্বরে পরিসংখ্যান পাওয়া গেল যে কেবল লাল্লু পর্বতের পাদদেশেই পনের সহস্র পাঠান একত্রিত হয়েছিল।

উদ্ধারকারী সেনাদলের অর্ধাংশ এখন নওশেরায় সমবেত হয়ে স্যার হিউজ রোজ ও বাকি সেনাদলের আগমনের অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু আমবেলার অবস্থা এতই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে যে মেজর জেমস জেনারেল গারভককে আদেশ দিয়ে তিন সেনাদলের এই প্রথম সেনাদলকে পুনরায় বিলম্ব না করে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে গমন করতে বলেন। তাঁর সেনাদল ১৫ ডিসেম্বরের সকালে আমবেলায় পৌছায় তৎক্ষণাৎ তারা নিজেদের অভিযানে লিপ্ত করল : জেনারেল গার্ভোক তার দলের মাঝখানে 'সৈন্যাভিযানের নির্দেশ পৌছে দিতে আদেশ দিলেন। এই ইশারায় ৫,০০০ সৈন্য তাদের আচ্ছাদন থেকে উঠে দাঁড়াল ও সশব্দ উল্লাসে এবং বন্দুকের গুলি বর্ষণের মধ্য দিয়ে তারা অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ল—পাঠান ও গুর্খা সৈন্যরা কে আগে শত্রুদের কাছে পৌছাবে এই নিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো।' তাদের সহসা প্রবল

আক্রমণ করা হত উপরের দিকে লাল্লু পর্বত বরাবর, শত্রুদেরকে আক্রমণ করে পর্বত থেকে নিচে ও চামলা উপত্যকায় ফেলে দিত, যেখানে তারা অশ্বারোহীদের হাতে নাকাল হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

বৈশিষ্ট্যগতভাবে, শেষ প্রতিহত করার জন্য ছিল এক বিশাল হিন্দুস্তানিদের দল। 'ববস' রবার্টস বর্ণনা করেছেন, 'একদল গাজি' হিসেবে, যারা এক বেপরোয়া আক্রমণ চালিয়েছিল ঠিক তখন যখন দেখা গিয়েছিল যুদ্ধ শেষ হয়েছে। রবার্টস লিখেছেন, 'চরম সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সেনাপতির সহকারি রাইট ও আমি এক সঙ্গে সেনানিবাসের বিশেষ সেনা সদস্যদের মাঝে ছুটে গিয়ে তাদেরকে আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলি। যেহেতু আমরা দুই সেনাসদস্যের নিকটেই পরিচিত ছিলাম তাই তারা দ্রুত নিজেদেরকে আমাদের প্রয়াসে সাড়া দিয়ে তাদেরকে জড় করে। আমরা গাজিদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে সফল হয়েছিলাম—একজনকেও রেহাই দেই নি। আমরা গুনেছিলাম ২০০ জন শত্রুকে হত্যা করেছিলাম, তুলনামূলকভাবে আমাদের ক্ষতি সামান্যই ছিল—৮ জন নিহত ও ৮০ জন আহত হয়েছিল।'

পরবর্তী দিনে এক ডজন উপজাতি ও গোষ্ঠী আমবেলা গিরিপথের আশপাশে তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে বুনারী ও আমাজাই উপজাতি যাদের আবাসস্থল চামলার দক্ষিণ প্রান্ত এবং পর্বতের উপর পর্যন্ত প্রসারিত তাদেরকে ত্যাগ করে সমবেত হয়েছিল। বুনারীরা সাম্প্রতিক অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি, আর তাদের নেতৃবৃন্দ বর্তমানে রেয়নেল টেলরের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যদি তিনি তাদের ভূমি থেকে সকল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসারণ করে নেন, তাহলে তারা নিজেরা অবশিষ্ট হিন্দুস্তানিদের মহাবন পর্বত থেকে বহিষ্কার করে দেবে আর তাঁদের মালকার দূর্গ ধ্বংস করবে।

টেলর সাহেব যে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য নিজে ভীষণ দায়ী ছিলেন তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য এখন মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি এই আপস নিষ্পত্তি এই শর্তে গ্রহণ করেন যে বিতাড়ন ও ধ্বংস সত্যিই সংঘটিত হতে হবে আর সেটা কেবল নামে মাত্র হলে চলবে না। আর এর পরিসমাপ্তিতে তারা সম্মত হয় যে তিনি ও একটি ক্ষুদ্র প্রহরী দল বুনারীদের প্রহরা কার্যে নিযুক্ত থাকবেন। পরবর্তীতে উপজাতিদের চারজন সর্দারের নেতৃত্বে দুই সহস্র উপজাতি লোকজন পাঠান হয়, আর টেলর সাহেব সাতজন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা ও চার দল গাইডস পদাতিক বাহিনীসহ তাদের সঙ্গে অবস্থান করেন। 'ববস' রবার্টস যে প্রায়শই নিজেকে সংঘাতের মধ্যমণি হিসেবে দেখতে পছন্দ করতেন তাঁকে টেলর সাহেবের সঙ্গী হিসেবে প্রেরণ করা হয়।

১৯ ডিসেম্বরের অপরাহ্নে রেয়নেল টেলর ও সেনা কর্মকর্তারা আর তাদের পদাতিক বাহিনী ও চার জন বুনার খানের প্রহরায় অশ্বারোহণে চামলা

উপত্যকায় যাত্রারম্ভ করেন। কিন্তু বুনারীদের প্রতিশ্রুতি দুই সহস্র গাদা বন্দুকধারীর পরিবর্তে শুধুমাত্র এক শ জন বন্দুকধারী ছিল। উপরন্তু, বুনারীদের ব্যক্তিগত চুক্তি মহাবন পর্বতে বসবাসকারী কয়েকটি ক্ষুদে ইউসুফজাই উপজাতিকে বিশেষত আমাজাইবাসীদের ক্রুদ্ধ করে তুলল। তারা লাল্লু পর্বতচূড়ায় তাদের আবাস স্থলকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রচণ্ড হতাহত হয়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছিল। রবার্টস পরবর্তীতে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ‘আমাজাইবাসীরা দেশে আমাদের অবস্থানের সময় তাদের বিরাগে কোন খোলস দেয় নি, ও তারা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ রেখেছিল।’ আমাজাইবাসীদের শত্রুতা সত্ত্বেও, ২১ ডিসেম্বরের শেষের দিকে মালকায় পৌছান গেছিল। অপরিহার্যভাবে এটি জনশূন্য ছিল। কিন্তু এটি যা কল্পনা করেছিল তার থেকে অনেক বেশি বৃহদায়তন ও স্থায়ী, ‘কয়েকটি বৃহৎ অট্টালিকা যাদের মধ্যে মৌলভির দর্শকবৃন্দের হলকক্ষ, সৈন্যদের জন্য ছাউনি, ঘোড়ার আস্তাবল আর দৃষ্টি নন্দন বস্তু দ্বারা নির্মিত পাউডারের কারখানা রয়েছে। কোন স্থায়ী দূর্গ নাই তবে বাইরের দেওয়ালসমূহ সংযুক্ত ও নির্মিত পেছনের দরজা দিয়ে অবিরাম চলাচলের পথ রয়েছে।’ পরবর্তী দিন সকালে ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তারা দেখল সব বড় বড় দালানে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে, আশপাশের কয়েক মাইল থেকে আগুনের ধুম্ররাশি নির্গত হতে দেখা যাচ্ছিল। দৃশ্যত দেখাও যাচ্ছিল আমাজাইয়ের এক বিশাল ও ক্রুদ্ধ জনতা, যারা মিনিটে মিনিটে আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল,যতক্ষণ ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা ও তাদের প্রহরীরা সব দিক থেকে ঘেরাও না হলো ততক্ষণ তারা চাপ প্রয়োগ করতে থাকল।

হিন্দুস্তানিদেরকে পুনঃ পশ্চাদ্ধাবনের সমস্ত পরিকল্পনা জলাঞ্জলি দেওয়া হলো। রবার্টস লিখেছেন, ‘সমবেত সহস্র হিন্দুস্তানিদের তুলনায় আমরা একেবারে নস্যিতুল্য ছিলাম। আমাদের অবস্থান ছিল নিঃসন্দেহে সংকটপূর্ণ ছিল, এটি আমাদের জন্য শুভ যে আমাদের জানা ছিল আমাদের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন অতি শীতল মস্তিষ্কের একজন দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ নেতা।’ রেয়নেল টেলর আমাজাই মোড়লের সঙ্গে যোগদান করে তাকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন যে তাদের পরিদর্শনের কাজ সম্পাদিত হওয়ায় তারা এখন পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে প্রস্তুত। কিন্তু এতে আমাজাইবাসীরা এখনও পুনরায় উত্তেজিত হলো ‘তারা উচ্চস্বরে কথা বলল, ও টেলর সাহেবের চতুর্দিকে পাঠানি কায়দায় অঙ্গভঙ্গি করে ভিড় জমাল। তিনি সম্পূর্ণ একাই ও পরিপূর্ণ মানসিক স্থৈর্যযুক্ত হয়ে ক্রুদ্ধ এবং ভয়ালদর্শন জনতার মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন।’

এই সংকট মুহূর্তে একজন একহাতওয়ালা ও এক চোখে বৃদ্ধ বুনার খান দগারের জাইদুল্লাহ্ খান ভিড় ঠেলে টেলরের পাশে তাঁর এক হাত উত্তোলন

করে সকলকে নীরব থাকতে আহ্বান জানালেন। অতঃপর তিনি (জাইদুল্লাহ্ খান) যা করেন রবার্ট সাহেব সেটাকে 'তেজস্বী বক্তৃতা' বলে আখ্যায়িত করেন, সমবেত আমাজাইবাসীদের বলেন যে তারা অবশ্যই ইংরেজদের ও তাদের প্রহরীদের হত্যা করতে পারে, তবে অনুরূপ করতে হলে, 'বুনারীদের পূর্বে আমাদেরকেই প্রথমে হত্যা করুন, কারণ আমরা জীবন দিয়ে হলেও বুনারীদের আগে রক্ষা করব।' এটি নানাবতীর পাঠানদের প্রচলিত রীতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। জাইদুল্লাহ্ খানের পরবর্তী কার্যাবলি প্রমাণ দেয়, তিনি ব্রিটিশদেরকে শত্রু হিসেবে দেখেছিলেন; যদিও মালকায় তাদেরকে সঙ্গ ও সমর্থন দেওয়ায় সম্মত ছিলেন, তবুও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তাদেরকে তাঁর জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করবেন।

যদিও ভ্রমণ বুনারী ও আমাজাইবাসীদের মধ্যে 'ঝড়ো আলোচনায় বাধাগ্রস্ত' হয়, তারপরেও টেলর সাহেব ও তাঁর প্রহরীরা আমবেলায় নিরাপদে পত্যাবর্তন করেন। গিরিপথের শীর্ষে সামরিক শিবির তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে যায় এবং ১৮৬৩ সালের খ্রিস্টান দিবসে উভয় অঞ্চল আমবেলা গিরিপথ ও মহাবন পর্বতের বিধর্মীদেরকে কলঙ্ক মুক্ত করে দেওয়া হয়। মেজর জেমস তাঁর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে লিখেছেন, 'ধর্মান্ধদের উপনিবেশ আমাদের সীমান্তগুলোয় কলঙ্ক হয়ে আমাদের প্রশাসনে এঁটে আছে... অর্ধ-ধ্বংসপ্রাপ্ত, বল প্রয়োগ করে পশ্চাদপসরণ করাচ্ছে অধিকতর আতিথেয়তাশূন্য ও বসবাসের অনুপযোগী অঞ্চলসমূহে, আর অতি অল্প সময়ে, আমি বিশ্বাস করি, চিরতরে উচ্ছেদ করে দেবে।' সামরিক নথিপত্র নির্দেশ করে লড়াইয়ে সাত শতাধিক ওয়াহ্হাবি মুজাহিদীন প্রাণ হারায়। তথাপি ঘটনা এই যে আমির আব্দুল্লাহ্ আলী এবং সম্ভবত দুই শ মত তাঁর হিন্দুস্তানি অনুসারীরা অন্য দিন লড়াইয়ের জন্য সেখানে থেকে যান।

সুতরাং ঐ আফ্রিদি গোত্রীয় শেরে আলী যে প্রথমে হিউজ জেমসের নিম্নপদস্থ অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে কাজ করেন আর তারপরে রেয়নেল টেলরের অশ্বারোহী দফাদার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তাঁকে। শেরে আলী টেলর সাহেবের পক্ষে আমবেলা অভিযানে ছিলেন ও তাঁকে পুরস্কৃত করা হয় একটি অশ্ব, একটি পিস্তল আর একটি সনদপত্র দিয়ে। পরবর্তীতে তাঁর ব্যক্তিগত নিম্নপদস্থ কর্মচারী হিসেবে শের আলী টেলর সাহেবের অধীনে কর্মরত ছিলেন 'সোৎসাহ আগ্রহ সহকারে আর যে কোন কাজেই সে ছিল আমার ছেলেমেয়ের খেলার সাথী, একটি ছোট্ট মেয়ে যে তাকে সদা-সর্বদা ডেকে হাজির করত। তাঁর মোটা পসতীন [ভেড়ার চামড়ার তৈরি জ্যাকেট] ও জুতোয়, আর সর্বদা তরবারি ও ছুরি সঙ্গে রাখায় তাকে তাঁর গোষ্ঠীর লোকেদের মত লাগত, সে তাকে (মেয়েকে) সব জায়গায় নিয়ে যেত ও সে

তাকে টাট্টুতে চড়াত।' কিন্তু শেরে আলী ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল কিন্তু মনের ভেতরে তিনি সর্বতোভাবে আফ্রিদিই ছিলেন।

এই রক্তক্ষয়ী শত্রুতা শেরে আলীর বংশ পরম্পরায় জিইয়ে রাখা হয়েছিল এবং এই ধারা টেলর সাহেবের চলে যাওয়ার পরেও অব্যাহত বা প্রচলিত ছিল যখন তাদের নিম্নপদস্থ কর্মচারী শেরে আলী পেশোয়ারের আরো দুজন কমিশনারের অধীনে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। যা হোক, ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে তাঁর এক আত্মীয় যে তাদের পারিবারিক শত্রুতায় লিপ্ত ছিল সে তৎকালীন কমিশনার ফ্রেডারিক পলোকের গৃহের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া অবস্থায় তাকে ধরে শেরে আলী তাকে হত্যা করেন। বিধিমতে তিনি পলোক সাহেবের সম্মুখে আবির্ভূত হন ও দোষী সাব্যস্ত হন, কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করার কারণে ও চাকুরি জীবনে সদাচরণের প্রেক্ষিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন। আদেশটি ভালভাবে গ্রহণ না করে আদালত থেকে যাবার পূর্বে তিনি আদালতে আবেদন জানালেন যেন তাঁকে দ্বীপান্তরের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। পলোক সাহেব সেটি অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানিয়ে শেরে আলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপে ভারত সরকারের দণ্ড উপনিবেশে প্রেরণ করে দেন। সেখানে তিনি বহির্বিশ্বে হারিয়ে গেলেন ও ভুলে গেলেন, তাঁর বিশ্বাস অটল থাকল যে পলোক সাহেব ও ব্রিটিশ রাজ যাদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাঁরা তাঁর উপরে বিরাট অবিচার করল।

অধ্যায় আট

বিচারাধীন ওয়াহ্হাবিগণ

> অসন্তুষ্ট পথভ্রান্ত রাজদ্রোহীরা দলে দলে আমাদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে; আদালতগুলো একের পর এক নতুন নতুন দলপতিদের, সাগরপারে দ্বীপান্তরে প্রেরণের আদেশ দিয়েছে; এতদসত্ত্বেও সীমান্তের ইসলামি শিবির যুদ্ধ করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী জনগণ অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্য করেছে এবং এভাবেই খ্রিস্টান শাসনের বিরুদ্ধে তাদের রক্তক্ষয়ী উদ্যম অব্যাহত রেখেছে।
>
> স্যার উইলিয়াম হান্টার, আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস : তারা কি রানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ? ১৮৭৬

১৮৮৪ সালে দিল্লিতে একটি অসাধারণ আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। এটির নাম দেওয়া হয় 'কালা পানি : তারিখ এ আজীব (কালো পানি : এক অদ্ভুত গল্প) ও একজন ভারতীয় ওয়াহ্হাবির প্রথম মুদ্রিত স্মৃতিকথা। এতে তিনি তাঁর গ্রেপ্তার, বিচার ও কালা পানিতে বা কালো পানিতে দ্বীপান্তরের কথা বয়ান করেন—এক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত পানি—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে তিনি নির্বাসনকালে ষোল বছর অতিবাহিত করেছেন। এর লেখক থানেশ্বরের মুহাম্মদ জাফর, তাঁর পুত্রের কাছ থেকে পাওয়া সাক্ষ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দরখাস্ত লেখকের নাম অশ্বারূঢ় পুলিশ দফাদার গাজন খানের মারফত জানা যায়। ১৮৬৩ সালের শরৎ কালের শেষ ভাগে থানেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সেই তথ্য-প্রমাণাদি দাখিল করা হয়। এ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় 'থানেশ্বরের সেই মুনশী জাফর, লোকে যাকে খলিফা বলে সম্বোধন করে, তিনি আসলে একজন মহামানব এবং বাঙালিদের সীমান্ত শিবিরে যাতায়াতে সাহায্য করা, তাদেরকে রাইফেল ও রসদ যোগানোই তাঁর কাজ।'

মুহাম্মদ জাফরের আত্মজীবনী শুরু হয় তাঁর শৈশব কালের বর্ষসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে শিশুকালে তাঁর পিতাকে হারানোর পর কিভাবে ভবঘুরের মত জীবন যাপন করেন আর এ ধরনের জীবন চলে যতদিন তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের দরখাস্ত লেখক না হন ততদিন পর্যন্ত। অতঃপর ওয়াহ্হাবি ধর্ম প্রচারকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবাদে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় আর তিনি ব্রিটিশ নাস্তিকতাবাদী বিচার বিভাগের সাথে নিজের সম্পৃক্ততাকে দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করতেন। মুহাম্মদ জাফর তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে অনেক কিছুই বোঝাতে চান যে তাঁকে অন্য কিছু হলেও একজন অন্যায় আচরণের ভুক্তভোগী মনে করায় না। কিন্তু তিনি ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তখন একটি বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব দিয়ে সিত্তানায় যাত্রা করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল একুশ বছর। ১৮৫৮ সালে জেনারেল কটনের হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের ধ্বংসের পর তিনি থানেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর পূর্বের পেশা পুনর্গ্রহণ করেন। এটি ছিল 'কোন এক ব্যক্তির আদেশে, গুপ্ত উদ্দেশ্যের জন্য।' কোর্টে তাঁর কাজ এখন 'গুপ্ত উদ্দেশ্য' সম্মুখে এসে গেল আর সেটি ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ও 'কোন এক ব্যক্তি' ছিলেন পাটনার ওয়াহ্হাবিদের আমির আহমদুল্লাহ্, ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে কমিশনার উইলিয়াম টেলর যে তিনজনকে আটক করেছিলন তাদের একজন। তাঁর সহ-বন্দির স্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে আহমদুল্লাহ্ ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, যখন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ ইমাম হন। বৃটিশদের অজান্তে এই দুই ভ্রাতা এখন সমতল ভারতে ওয়াহ্হাবিদের যুগ্ম-নেতা হয়ে যান।

তবে অতঃপর ১৮৬৩ সালের সেই দিনটি আসে যেদিন থানেশ্বরের বিচার বিভাগে কর্মরত তাঁর বন্ধু মুহাম্মদ জাফরের গৃহে এসে সতর্ক করে যান যে পুলিশ দফাদার গাজন খান ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর নামে 'মিথ্যা অভিযোগ' করেছে। পরে সেই রাত্রে আমবাল্লার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাপ্টেন কিউ.ডি. পারসেন্সের নেতৃত্ব তাঁর গৃহে হানা দিয়ে তৎক্ষণাৎ দেখে যাকে মুহাম্মদ জাফর নিজেই বলেছেন 'বিপজ্জনক পত্র' লিখিত হয়েছে তবে প্রেরিত হয় নি। জাফর স্বীকার করেন, 'পত্রটি মুজাহিদিন সরাইখানার প্রধানের কাছে লেখা আর সেখানে কয়েক সহস্র মুদ্রা পাঠানোর একটি সংকেতিক বার্তা ছিল।' পত্রটি ও অন্যান্য দূষণীয় কাগজপত্রকে বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। পরবর্তী দিন সকালে ঘোষণা দেন যে তিনি আমবাল্লায় যাচ্ছেন, ও পলায়ন করেন। ক্যাপ্টেন পারসন্স ছিলেন একজন বদমাশ পুলিশ কর্মকর্তা যার মানসিক সমস্যা ছিল আর সেটা তাঁকে পরবর্তীতে ভয়ঙ্কররূপে নির্দয় করে তোলে। যতক্ষণ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিল্লিতে তাঁর

(জাফরের) আশ্রয়স্থলের তথ্য না দেয় ততক্ষণ তিনি (পুলিশ কর্মকর্তা) মুহাম্মদ জাফরের বাসগৃহে অবস্থানকারী সকল পুরুষ সদস্যদের নিদারুণভাবে প্রহার করতে থাকেন।

এই পর্যায়ে আমবাল্লার কমিশনার স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস মুহাম্মদ জাফরের আমদানিকৃত সকল জিনিসপত্র ও তাঁর পত্রকে আঁকড়িয়ে ধরেন। নেভিল চেম্বারলিনের নেতৃত্ব হিন্দুস্তানি ধর্ম-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর অপেক্ষায় ছিল, এবং এখানে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে অবহিত হওয়া গেল যে কারা ও কিভাবে ধর্ম বিদ্বেষীদের ক্ষেপিয়ে তুলছিল। মুহাম্মদ জাফরের গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে দশ সহস্র টাকার একটা ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন পারসন্স এই লক্ষ্যে এক বিশাল তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। জাফর প্রাথমিকভাবে পুলিশের পাতা ফাঁদ কৌশলে এড়িয়ে তাঁর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে অনাবৃত ঘোড়ার গাড়িতে করে আলীগড়ে পলায়ন করেন। কিন্তু পারসন্স এটা শুনে সম্মুখের পুলিশ স্টেশনকে তারবার্তায় জানালে মুহাম্মদ জাফর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হন আর তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আমবাল্লায় আনয়ন করা হয়। পরবর্তী কয়েক দিন যাবত পারসন্স সাহেব ও তাঁর পুলিশবৃন্দ ওয়াহ্হাবি দলিল লেখকের ওপর নির্যাতন চালিয়ে 'জিহাদে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থকদের' তাঁর কাছ থেকে নাম প্রকাশ করানোর প্রয়াসে রত থাকেন। তাঁকে বলা হয় তিনি যদি 'রাজসাক্ষী' হিসেবে কাজ করতে সম্মত হন তবে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হবে ও উচ্চপদে চাকরিতে বহাল করা হবে, তবে যদি তিনি সেটি করতে অস্বীকার করেন তাহলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

দুর্বৃত্তদেরকে রাজসাক্ষী হিসেবে ব্যবহার, যারা রানির সাক্ষী হিসেবে কাজ করত তাদের সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারী বা অপরাধের সাথীদের বিরুদ্ধে তাদেরকে প্রতিদানে ক্ষমা করে দেওয়াটা ব্রিটিশ বিচার বিভাগীয় মান সম্পন্ন একটি কৌশল ছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে মুহাম্মদ জাফর এই সমস্ত উস্কানিদাতা ও তাদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নিজেই তিনি অসতর্কভাবে দুর্বৃত্তায়নের তথ্য প্রকাশ করে ফেলেছেন, তাঁর এই সমস্ত তথ্য উপাত্তের যোগসূত্রে ১৮৬০-এর সমগ্র দশক ও ১৮৭০ দশকের প্রথম ভাগে সংঘটিত বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও গ্রেপ্তারির মধ্য দিয়ে ভারতে ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের বিপর্যয়ের একটা ধারণা পাওয়া যায়।

মুহাম্মদ জাফরের পত্রগুচ্ছ ক্যাপ্টেন পারসন্সকে পাটনায় তদন্ত কাজে সহায়তা দেয় ও তিন পাটনা পরিবারের প্রধান এবং ওয়াহ্হাবি পরিষদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদ্বয় মৌলভি আহমদুল্লাহ্ ও ইয়াহিয়া আলী পিতা বয়স্থ এলাহি বক্সের কাছে নিয়ে যায়। পারসন্সের তার বার্তার ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন

করে, পাটনা নগরীর ম্যাজিস্ট্রেট বৃদ্ধ লোকটিকে তাঁর গৃহে গ্রেপ্তার করে দশ সহস্র টাকার জামিনে মুক্ত করে দেন। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের আমবাল্লা ও দিল্লিতে গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে পূর্ব সতর্ক হয়ে এলাহি বক্সের পুত্রদ্বয় সাদিকপুর ছোট গোডাউনে রক্ষিত দূষণীয় সমস্ত কাগজপত্র প্রায় পুড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছিল। ১৮৬৪ সালে ২১ জানুয়ারি পাটনায় স্বয়ং পারসন্স সাহেব উপস্থিত হলে এই পোড়ানো কর্মটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ও স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশের এক বিশাল দল নিয়ে তিনি ওয়াহ্‌হাবিদের মূল আস্তানায় হানা দেন। তাঁর অধিক বিলম্বের কারণে তিনি মৌলভি আহমদুল্লাহ্‌কে গ্রেপ্তার করতে পারেন নি। আহমদুল্লাহ্‌ বাংলার লেফটেন্যান্ট জেনারেলের সভায় যোগদানের জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। তবে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহিয়া ও তাঁর সংগঠনের অন্য দু'জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে আরও কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। মুহাম্মদ জাফরের বর্ণনামতে, পাটনার পদচ্যুত সাবেক কমিশনার উইলিয়াম টেলর এইসব গ্রেপ্তারের সময় উপস্থিত ছিলেন, যা তাঁকে যথেস্ট সন্তুষ্টি প্রদান করেছে।

এই কাগজপত্রগুলো থেকে অধিকংশেই অর্থ আদান-প্রদানের ব্যাপারে অবগত হওয়া গেল আর এ থেকে সাদিকপুরের বাসগৃহে অবস্থানকারী কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করার যথেষ্ট উপাদান ছিল না, তবে সেগুলো অক্লান্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে বাংলায় বেশ কিছু সংখ্যক সন্দেহভাজনদের তথ্য দিল। এদের দু'জনকে পারসন্স যুক্তি পরামর্শ দিয়ে মানিয়েছিলেন—বিষয়টি অবশ্যই অজানা তবে যা অনুমান করা যায়—সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে তারা যখন পাটনায় ছোট গোডাউনে অবস্থান করছে তখন তাদের পথে বাংলা থেকে মধ্যদেশের সীমান্তে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে। ওখানে ওয়াহ্‌হাবিদের ইমাম ইয়াহিয়া আলীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়, ও তাঁর জিহাদ প্রচারের কথা শোনা যায়। জাফরের পলায়নের পরে আমবাল্লায় এদের মধ্যে তিনজন গ্রেপ্তার হয়ে রাজসাক্ষী হয়, তাঁর বিরুদ্ধে মামলাসমূহ, ইয়াহিয়া আলী, এলাহি বক্স ও অন্য আটজনের সম্পন্ন হয়েছে বলে বিবেচিত হয়।

আমবাল্লার ডেপুটি-কমিশনারের মতানুসারে ইয়াহিয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আহমদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধেও অভিযোগ গঠনের যথেষ্ট সাক্ষ্য ছিল, তবে এটি বাংলার গভর্নর নিষ্পত্তি করেন। মৌলভি আহমদুল্লাহ্‌কে ব্রিটিশ সরকার উচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেন, এখনও ইংল্যাণ্ডে তাঁর স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডের মত বন্ধু রয়েছে ও, অধিকন্তু পাটনায় ডেপুটি কালেক্টর অব ইনকাম ট্যাক্স এবং সরকারি নির্দেশনা কমিটির সদস্যপদসহ আরও বেশ কিছু সরকারি পদাধিকার করে রাখেন। ১৮৫৭ সালে উইলিয়াম টেলরের হাতে গুরুতর অবিচার ভোগ করার পর এটা অচিন্ত্যনীয় ছিল যে তাকে প্রবল প্রমাণ

ব্যতিরেকেই দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করা হত। সুতরাং নি:সন্দেহে টেলর সাহেবকে ভয়ানক হতাশ করে আহমদুল্লাহ্‌কে ছেড়ে দেওয়া হয়, টেলর সাহেব তাঁর আইনি প্রতিষ্ঠান থেকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে এই ঘটনাগুলো অবলোকন করছিলেন।

প্রচণ্ড সাধারণ বিক্ষোভ ও সংবাদ পত্রের সমালোচনার মধ্য দিয়ে ১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে দায়রা জজ স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস, দুইজন মুসলিম ও দুইজন হিন্দু বিচারকের সহযোগিতায় আম্বাল্লা আদালতে রানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে এগারজন ওয়াহ্‌হাবির বিচার কার্য আরম্ভ করেন। ইয়াহিয়া আলী তাঁর নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোন আইনজীবী নিয়োগ করতে অস্বীকার করেন, সুতরাং তাঁর বন্ধুরা তাঁর পিতার ও তাঁর জন্য উচ্চ পারিশ্রমিক প্রদান সাপেক্ষে ইউরোপীয় ব্যারিস্টার নিয়োগ করেন। তথাপিও, ইয়াহিয়া আলী মামলার অগ্রগতি কর্ম থেকে বিরত থেকে পবিত্র কোরান থেকে অন্তহীন তেলোয়াত করতে থাকেন আর আপাত দৃষ্টিতে তাঁর ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দেন। মুহাম্মদ জাফর বিচারের বর্ণনায় কয়েক ডজন সাক্ষীর নানা ধরনের সাক্ষ্যের কথার উল্লেখ করেন যেগুলোকে বলা হতো 'আমাদের দিকে তাকাত ও করুণভাবে কাঁদত' যখন তারা তাদের সাক্ষ্য দিত। তিনি নিশ্চিত করেন যে বিচার কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সকলকে পুলিশি প্রহরায় রাখা হয় আর যদি তারা তাদেরকে সাক্ষ্যে যা বলতে শেখানো হয়েছে তা না করে সে জন্য হুমকি দেওয়া হয়। তিনি একটি উদাহরণ দেন তাঁর বাসগৃহে কাজ করা একটি বালক আর তিনি প্রথম শুনানীতে তাঁর সক্ষ্যে নি:সন্দেহ করতে ব্যর্থ হয়: 'সেই রাতে তাকে এমন বর্বরভাবে প্রহার করা হয় যে সে পরবর্তী দিনে দায়রা জজ আদালতে সাক্ষী হিসেবে হাজির হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে। দায় এড়ানোর জন্য মি. পারসন্স ঘোষণা করেন যে ছেলেটি সাধারণ অসুস্থতা জনিত কারণে মারা গেছে।' রাজসাক্ষীদের সাক্ষ্যসমূহ সর্বদাই প্রকাশ্যে অপব্যবহার করা হয়, তবে এটা কঠিন যে জাফরের ভুল বিচারের অভিযোগ গুরুত্বপূর্ণভাবে নেওয়া যখন তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একটি ষড়যন্ত্র চলছিল আর তাতে তিনিও অংশগ্রহণ করেন।

এগারজন সকলে দোষী সাব্যস্ত হলো মুহাম্মদ জাফরের মতানুসারে, যখন রায় ও শাস্তি ঘোষণা করা হয় তখন আদালতের উপস্থিত জনতাই নয় ভারতীয় চারজন বিচারকের চোখেও ছিল অশ্রু। 'তারা আন্তরিকভাবে আমাদের মুক্তি কামনা করেছিল, কিন্তু যখন তারা দেখল জজ ও কমিশনার আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দিকে ঝুঁকছে তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল আর লিখল যে অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেছে।' কয়েদিদের তিন জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় আর

অবশিষ্ট আট জনকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। রায় ঘোষণার সময় স্যার হার্বার্টের মনে আসল অপরাধী সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। তিনি ঘোষণা করেন, কারাবন্দি ইয়াহিয়া আলীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি এই রাষ্ট্রদ্রোহের মূল হোতা যা এই বিচারে নগ্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

> তিনি একজন ধর্মপ্রচারক, তিনি পাটনায় তাঁর মসজিদ থেকে মুসলমানদের ঘৃণার বাণী প্রচার করেন। তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁর অধীনে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন ও মুসলিম জিহাদ প্রচার করেন। তিনি তাঁর দেশবাসীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভ্রান্ত পথে চালিত করে বিদ্রোহের পথে নিয়ে যান। তিনি ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে তাঁর ষড়যন্ত্রের দ্বারা সীমান্ত যুদ্ধের কবলে ফেলেন, যাতে শত শত লোক প্রাণ হারায়। তিনি বংশগতভাবে রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মান্ধ পরিবারের সদস্য। তিনি ধর্মীয় সংস্কারক হওয়ার প্রত্যাশা করেন, তবে এ ব্যাপারে আবেদন ও বিবেক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও... তিনি তাঁর অন্তিম লক্ষ্য রাজনৈতিক বিপ্লবে সন্ধান করেন।

মুহাম্মদ জাফর বিচারের রায় পাবার ক্ষেত্রে পরবর্তী সেই ব্যক্তিই ছিলেন। তিনি যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সরকারি ইশতেহারের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তিনি সগর্বে দাবি করেছিলেন কেমন করে এডওয়ার্ডস সাহেব শেষ মন্তব্য করেন যে তিনি (মু. জাফর) তাঁর মহা বিচক্ষণতা খাটিয়ে সরকারের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন আর এডওয়ার্ডস তাঁর ফাঁসি দেখতে পেয়ে খুশি হবেনঃ 'আমি সমস্ত বিবরণ খুব শান্তভাবে শুনলাম তবে শেষ বাক্যের জবাবে বললাম, 'আল্লাহ্ই জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। এইসব জিনিস আপনার ক্ষমতাধীন নয়। আমার মৃত্যুর পূর্বেই আপনাকে শেষ করার ক্ষমতা আল্লাহ্র আছে।" আমার জবাব শুনে তিনি খুব ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন।'

তাঁর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডসের শেষ সরকারি কাজ হিসেবে এই ওয়াহ্হাবির বিচার কার্য ছিল, আর এটি শেষ হওয়ার নিউমোনিয়ায় মৃত্যুকে মুহাম্মদ জাফর আল্লাহ্র গজব বা শাস্তি হিসেবে দেখেন।

শাস্তি অনুমোদিত হতে না হতেই কয়েদিরা তাদের মস্তক মুণ্ডন করেছিল ও তাদের দাড়ি কেটে ফেলেছিল, তাদের শ্বেত পোশাক যেমন পাগড়ি ও আলখাল্লাকে কয়েদিদের মোটা খসখসে গেরুয়া বসনে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। মুহাম্মদ জাফরের বর্ণনা মতে, তিনি ও ইয়াহিয়া আলী তাঁদের মৃত্যুদণ্ডে উল্লসিত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি অনুভব করেন যে তিনি যেন 'বেহেশতে আছেন বেহেশতী পরীদের

দেখছেন।' তাঁদেরকে আমবাল্লা কারাগারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল, যেখানে তাঁদের অবিরাম চলমান উচ্চ জীবনী শক্তি ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনার্থীদেরকে অবাক করে দিত। 'প্রায়ই তারা জিজ্ঞেস করত, "শিগরিরি তোমাদের ফাঁসি হবে। তোমরা কেন এত খুশি?" আমরা বলতাম যে আমাদের ধর্মে আল্লাহ্র পথে এই নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়াকে শহীদানের পূণ্য অর্জন করার বর্ণনা আছে আর সেটিই আমাদের সুখের কারণ।'

যাহোক, তৃতীয় বন্দি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়ে খুব অসুখী হলো। সে দিল্লির ধনী কসাই মুহাম্মদ শফি, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বরাবর যত সেনানিবাস ছিল সেগুলোতে সে চুক্তি মাফিক মাংস সরবরাহ করত। মুহাম্মদ জাফরের মারফত প্রকাশ হয়ে পড়ে যে এই আন্দোলনের অর্থ আদান-প্রদানের মুখ্য ভূমিকায় ছিল জনৈক শফি। সে তার বিভিন্ন স্থানে ওয়াহ্হাবিদের অর্থ বহন করত আর তার মধ্যে থেকে নিজের বখরা বের করে নিত। যদিও সে এই ষড়যন্ত্রে গভীরভাবে জড়িত ছিল, তবু শফি প্রতিশ্রুত ওয়াহ্হাবি ছিল না। কয়েক মাস পরে তার নিজের জীবন রক্ষার্থে এক নিলাম ডাকে সাড়া দিয়ে একজন রাজসাক্ষী হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে আম্বাল্লায় ক্যাপ্টেন পারসন্স ও অন্যান্যরা মৌলভি আহমদুল্লাহ্র বিরুদ্ধে অনুমোদনযোগ্য একটি মামলা চালু করার প্রয়াস চালাল। শফির নতুন সাক্ষ্য ও পাটনার জনৈক জুতো-বণিক এলাহি বকশ দ্বিতীয় রাজসাক্ষী, অবশেষে তারা তাঁকে বিচারের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। এলাহি বকশ আদালতে তার সাক্ষ্যে প্রকাশ করে যে তিনজন ব্যক্তি বিভিন্ন পত্র থেকে তাদের নাম পাওয়া যায় আহমদ আলী, মোহমদ আলী ও আহম্মদ খান এই সকল নামই আহমদুল্লাহ্ ব্যবহার করতেন আর এটিই মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই সনাক্তকরণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করে যে আহমদুল্লাহ্ ছিলেন 'কাফিলাহ্র (নামটি ওয়াহ্হাবিদের গুপ্ত পথের সরবরাহের জন্য দেওয়া হয়) পার্থিব জিনিসপত্রের মহাব্যবস্থাপক' আর ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়টি ঢেকে রেখেছিলেন 'বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে রানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিমিত্তে সিত্তানায় লোকজন ও অর্থের যোগান দিচ্ছিলেন।'

১৮৬৫ সালে মধ্য দেশে 'দ্য পায়োনিয়ার' (আমার প্রপিতামহ জর্জ অ্যালেন সি.এ. কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত) প্রকাশিত হয় ও তিন মাসের অধিক কাল যাবত শুধুমাত্র পাটনায় আহমদুল্লাহ্ আলীর সচিত্র বিচারের প্রতিবেদন ছাপাল না তৎসঙ্গে এই মামলার জন-প্রতিক্রিয়াও ছাপতে লাগল, নিম্ন লিখিত বিশেষ অংশে যা দেখা যায় :

২ জানুয়ারি আজ আমরা বিশ্বাস করি, পাটনার ওয়াহ্হাবি প্রধান মৌলভি আহমদুল্লাহ্র বিচার কার্য শুরু হয়েছে। অক্লান্ত ক্যাপ্টেন পারসন্স এখন বাঙ্কিপুরে, পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট মি. র‍্যাভেনশকে সহযোগিতা করছেন।

১১ জানুয়ারি : পাটনা ও আম্বাল্লার মামলার ষড়যন্ত্রকারীদের উদাহরণ দিয়ে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত না করে, কতিপয় আন্তরিক ওয়াহ্হাবি পন্থী ভদ্রলোক পূর্ণিয়ায় নতুন করে তাদের ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে চেষ্টা করল। একজন মৌলভি ঈমানদারদের কাছ্ থেকে 'জিহাদ' সংঘটনের কথা বলে অর্থ সংগ্রহ করছে, যা দ্বাদশ ইমামের দ্বারা শুরু হবে, যে খ্যাতি ও যশের আলোকে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।

১৩ জানুয়ারি : মাহোমেদ শুফী (মুহাম্মদ শফি) রানির সাক্ষ্যকে উল্টিয়ে দিয়েছে আর 'দিল্লি মেইল' পত্রিকা বলে যে তার স্বেচ্ছায় আত্মোন্মচন ও পাটনায় আহ্মদুল্লাহ্র বিচার কার্য সকল রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে সন্ধান করে বের করতে পারে।

১৬ জানুয়ারি পাটনার জুতো-প্রস্তুতকারী লাহী বাকশ (এলাহি বকশ) রানির সাক্ষী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত তথ্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল যা তীব্রভাবে মৌলভি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

১ মার্চ পাটনার জজ মৌলভি আহ্মদ-উল্লাহ্কে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবাদীর জবাবে এক শোচনীয় প্রয়াস তৎক্ষণাৎ বিচার কার্য বন্ধ করে দেয়; কেবল একজন সাক্ষীকে জেরা করা হয়, আমাদেরকে বলা হয়, যে সে কেবল মিথ্যা হলফকারী। সহযোগি বিচারকদের রায় ছিল সর্বসম্মত। এই ভাবেই ওয়াহ্হাবি নাটকের শেষ অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটে...। আমরা মনে করি আহ্মদুল্লাহ্ স্যার ফ্রেডারিক (জেমস) হ্যালিডেকে তারবার্তা করতে কাল ক্ষেপণ করেন নি।

এই বিষয়ে, সরকার আপীলের অবস্থানে এসে সিদ্ধান্ত নেন যে তিন ওয়াহ্হাবি নেতাকে ফাঁসি দিলে তারা শহীদের মর্যাদায় উন্নীত হবে। তাদের মৃত্যুদণ্ড আদেশ রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলো এবং তৎসঙ্গে অন্য সাত সহ-প্রতিবাদীকে দুই বিচারের পর শৃঙ্খলাবদ্ধ করে জাহাজে করে ভারত সরকারের শাস্তি-উপনিবেশ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রেরণ করা হয়। ব্যাংকার মুহাম্মদ শফি ও জুতো-বণিক এলাহি বকশ দ্বীপান্তর থেকে অব্যাহতি পায় কারণ তাদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য। মুহাম্মদ জাফরের দীর্ঘ আলোচনার পূর্বতন এক বছরের কারাভোগের পর মুক্ত হয়, যদিও তাঁর কথিত পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কখনো তাঁকে ফেরত দেওয়া হয় নি। সকল দোষী ব্যক্তিবর্গের জিনিসপত্র ও সম্পদসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর সাদিক রোডে পান্থশালা যা দীর্ঘদিন ব্যাপী ওয়াহ্হাবিদের ছোট গোডাউন হিসেবে কাজ এসেছে তাকে ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং এই জায়গাটিকে একটি সরকারি উদ্যানে রূপান্তরিত করা হয়।

আদালতে প্রমাণিত হয় যে পাটনায় ছোট গোডাউন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্যধারার ঘাঁটি ছিল, আর বহু বছর যাবত জনসমর্থন

নিয়ে বিল টেলর বিগত ১৮৫৭ সালে আহমদুল্লাহ্ আলী ও অন্যান্য শীর্ষ ওয়াহ্হাবিদের আটক করে রাখার স্থলে পরিণত করেন। ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা বিশেষত পায়োনিয়ারের সমমানের প্রকাশনায় বিশেষ করে টেলর সাহেবকে কেন্দ্র করে যে শোরগোল উঠেছিল তার অবসানের জন্য উক্ত পত্রিকাগুলোতে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। টেলর সাহেব নিজে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন অভিযানের সপক্ষে কারণ দর্শিয়ে বিশদ বর্ণনা দেন ও তাঁর পদচ্যুতির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও ভারতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে তিনি সমানে আক্রমণ চালাতে থাকেন, বিভিন্ন চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যাতে তিনি উল্লেখযোগ্য নানা ব্যক্তিত্বের প্রশংসাপত্রের উদ্ধৃতি দেন। ১৮৬৮ সালে যখন আরজিলের ডিউক ভারত সরকারের নতুন সচিব নিয়োজিত হয়ে তাঁর মামলাটি পুনরায় চালু করতে সক্ষম হন, তখন মনে হলো যেন টেলর সাহেবের নামের কলঙ্ক মোচন হয়ে যাবে। যাহোক, এসময়ে বাংলার সাবেক লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে ভারতের পরিষদে নিয়োজিত হন, যে পরিষদ সচিবকে ভারতের পক্ষে কাজ করার পরামর্শ দিত, আর এটি উইলিয়াম টেলরের কাছে অভিশাপ হয়ে দেখা দিল। ডিউক উপযুক্তভাবে পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন—এবং পরস্পর বিরোধী পন্থার মধ্যে যেটি বর্তমান সেটিকে অবলম্বন করতেন।

ভারতের পরিষদে আজীবন সদস্য ছিলেন, আর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে ১৯০১ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। উইলিয়াম টেলর ১৮৯২ সালে তাঁর কলঙ্ক মোচন না করেই মারা যান। ১৮৫৭ সালে পাটনায় টেলর সাহেবের সহকারি ছিলেন এডওয়ার্ড লকউড। তিনি লিখেছেন, 'তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ভাবেন আর তাঁর উপরে অবিচার করা হয়েছে সেই অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই বলে নি, একই সময়ে যারা তাঁকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে এক নিরাশাব্যঞ্জক যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, 'তিনি তাঁর উপর কথিত অবিচার সম্পর্কে চিন্তা ও বলা থেকে ঘৃণাভরে বিরত ছিলেন। একই সাথে তিনি সেই সকল ব্যক্তিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন যারা তাকে ভারতীয় বিদ্রোহ পাটনা সংরক্ষণের মূল হোতা হিসেবে সম্মান টুকু দিতে আপত্তি করেছিল।' লকউড টেলর সাহেবকে ব্রিটিশ ভারতে মহামতি ওয়ারেন হেস্টিংস এর সাথে তুলনা করে বলেন আকারে খর্বাকৃতির হলেও তিনি ছিলেন বিশাল মনের অধিকারী যাকে তাঁর শত্রুরা আক্রোশমূলক সমালোচনা করে অবনত করতে চেয়েছিল। 'তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস-এর থেকে উচ্চাতায় দীর্ঘ নয়, দু'জনই ভার্জিলের মৌমাছিদের মত ইনজেন্টেস অ্যানিমোস অগাস্টো ইন পেক্টর ভারস্যান্ট' (ছোট্ট শরীরে বৃহৎ আত্মা বিদ্যমান)...। তাঁরা মিষ্টভাষিতার মাধ্যমে নিজেদের অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত। ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট যাদুঘরের

দক্ষিণ এশীয় শাখায় আছে ৬৬৭টি রত্ন আর দুর্লভ শিল্পসামগ্রী সমূহের সংগ্রহ যা সঞ্চিত করেছেন উইলিয়াম টেলর তাঁর ভারতের কর্মজীবনে আর তাঁর কাছ থেকে ১৮৭৪ সালে ক্রয় করা হয়েছে। ওগুলোর মধ্যে সিলভারের বহুমূল্য প্রস্তরে রয়েছে। খোদিত অষ্টকোণী গোলাকার সীল মোহর। এটি কোরানের নীতিবাক্য ধারণ করে 'নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্) নিশ্চিত সত্য' আর তারিখ লিপিবদ্ধ আছে ১২৭৮ হিজরি মোতাবেক ১৮৬১-২। কিভাবে এটি টেলরের অধিকারে আসে তা জানা যায় নি, তবে যাদুঘরের বর্ণনামূলক তালিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে সীল মোহরটি পূর্বে 'পাটনার বিদ্রোহী ওয়াহ্হাবি আহমদুল্লাহ্র' অধিকারে ছিল।

আমবাল্লা ও পাটনার বিচারের সফল পরিণতি সরকারি কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করে। কেননা তারা ওয়াহ্হাবিদেরকে অধিকার রাজনৈতিক হুমকি মনে করেছিল। তাদের সতর্কতায় বিহারে পুলিশের সহকারি মহাপরিদর্শক জে.এইচ. রেইলির নেতৃত্বাধীনে গ্রেপ্তারের অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা হাতে নিয়ে কিছুটা কুখ্যাত বিশেষ পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায় তবে এটা পরিষ্কার যে বেশ কিছু সংখ্যক ওয়াহ্হাবি আস্তানা এদের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়, যা আরও গুপ্ত দলগুলোকে উন্মুক্ত করতে সহায়তা করে। এটি শীঘ্রই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে সু-সংগঠিত ওয়াহ্হাবি কর্মজাল (নেটওয়ার্ক) বিহার ও বাংলার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান রয়েছে। একই সকল কৌশলের পুনরাবৃত্তি করে কিছু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের রাজসাক্ষী হতে প্রণোদিত করে বা বল প্রয়োগ করে অবশিষ্টদেরকে অনেককে রাজসাক্ষী হিসেবে দেখা গেল আদালতে আনতে, ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ ও ১৮৭১-এর আরও উচ্চ মার্গীয় বিচার কার্য সম্পাদিত হয়েছিল।

রেইলি সাহেব পাঞ্জাবে তাঁর দলের দ্বারা অনেক বিচারের মধ্যে একটিকে উন্মোচিত করেন। ১৮৬৮ সালের আক্টোবর মাসে তিনি হটি মর্দন পরিদর্শনে যান, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে যতটা নিকট নিরাপদে যাওয়া সম্ভব ছিল তিনি ততটাই গিয়েছিলেন, এবং সেখান থেকে তিনি হিন্দুস্তানি শিবিরে গুপ্তচর পাঠান। যেহেতু আমবেলা যুদ্ধের সূচনা পাঁচ বছর পূর্বে হয়েছিল সেহেতু বেলায়েত আলীর পুত্র আব্দুল্লাহ্ আলীকে তাদের মহাবন পর্বতের প্রাচীন আস্তানায় অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। এ কারণে তারা সিন্ধু নদের উপকণ্ঠে হাজারা এলাকায় তাদের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এটি অস্থায়ী শিবিরগুলোর মধ্যে একটিতে যা তাদেরকে রেইলি সাহেবের গুপ্তচর দেখে সে প্রতিবেদনে জানায় যে হিন্দুস্তানিরা বর্তমানে ৩৬২ জন যোদ্ধা ৮টি দলে বিভক্ত। তাদের সঙ্গে ছিল সত্তর জন মহিলা ও বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আর খুবই দু:স্থ অবস্থায় বেঁচেছিল। তখন রেইলি সাহেব তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষবর্গের কাছে সকল হিন্দুস্তানিদের

পক্ষে তাদেরকে ক্ষমা করার সুপারিশ করে লেখেন—তাঁদের নেতা আব্দুল্লাহ্ আলী, ও তাঁর সহকারী আহমদুল্লাহ্ ও ইয়াহিয়া আলীর এক ভাই ফয়েজ আলী ব্যতীত, তাঁরা দু'জনই এখন করাগারে। অল্প কিছুদিন পরে মনে হয় রেইলি সাহেবকে খোদ আব্দুল্লাহ্ আলী বা হিন্দুস্তানি শিবিরের গুপ্তচর হাজারার পাহাড়ি এলাকা পরিদর্শন করান—এক রহস্যজনক সভা অনুষ্ঠিত হয় যেটি হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের অনধিকার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের একটি অংশ হতে পারে। এটি স্পষ্টতঃই ব্যর্থ হয়, আর পরবর্তীতে এটি নীরব হয়ে যায়, তবে ঐ সভায় আব্দুল্লাহ্ আলী (বা তাঁর গুপ্তচর) বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ প্রস্তুত করে, রাওয়ালপিণ্ডির সহকারি কমিশনার এগুলো প্রত্যক্ষ করে ওয়াহ্হাবি সংগঠন সম্পর্কে সক্রিয় কর্মী ও সমর্থকদের নাম সম্বলিত প্রচুর তথ্য প্রদান করেন। এই প্রতিবেদনটি নিয়ে রেইলি সাহেব দিল্লি অভিমুখে রওনা দেন যেখানে জনৈক সংবাদদাতা সাম্প্রতিককালে সিংহাসনচ্যুত শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ শাহের সীলমোহর যুক্ত একটি পত্র দেখেছেন বলে দাবি করেন।

শাহ্জাদা ফিরোজ শাহ্ মুঘল রাজপরিবারের একমাত্র সদস্য ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন। বিদ্রোহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তিনি হিন্দুস্তান থেকে পাঠান এলাকায় পলায়ন করেছিলেন এবং, রেইলি সাহেবের তথ্যমতে, পরবর্তীতে ওয়াহ্হাবি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে দিল্লির সমর্থকদের কাছে জিহাদের জন্য তাঁর সঙ্গে পার্বত্য এলাকায় যোগদান করতে বলে পত্র লেখেন। আরও কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয় ও প্রতিবেদন নেওয়া হয় যা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র মাদ্রাসার নেতৃস্থানীয় মৌলানা (বিজ্ঞ শিক্ষক) জড়িত থাকার বিষয়টি নির্দেশ করেঃ দিল্লির মৌলানা সাইদ নাজির হুসেন, তিনিও তাঁর হাদিস প্রকাশের জন্য প্রখ্যাত।

একগুচ্ছ পত্র পরবর্তীতে সাইদ নাজির হুসেনের গৃহ থেকে সবলে হস্তগত করা হয়, পত্রগুচ্ছের মধ্যে ছিল আমবাল্লা ও পাটনার বিচারে সাজাপ্রাপ্ত ওয়াহ্হাবিদের ও ওয়াহ্হাবি আমির আব্দুল্লাহ্ আঁলীর যিনি সীমান্ত হিন্দুস্তানিদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এই পত্রগুচ্ছ খোদ আলীর রেইলি সাহেবের নিকটে সাম্প্রতিক প্রতিবেদন হিসেবে আবির্ভূত হলো–যে সম্মানিত মৌলানা দিল্লিতে ওয়াহ্হাবিদের নেতা ছিলেন ও সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন।

রেইলি সাহেব পাঞ্জাব সরকারের নিকটে তাঁর মামলা উপস্থাপন করেন, এই সময়ে দিল্লি এখনও যার বিচার ব্যবস্থাধীনে আসে; এবং সাইদ নাজির হুসেন গ্রেপ্তার হন। ছয় মাস আটক করে রাখার পর তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ব্যতিরেকেই তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। কেন কর্তৃপক্ষ তাঁর

বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গঠন করেন নি সেটি একটি রহস্য হয়ে থাকে; এটি হতে পারে যে তারা তাঁর দেওয়া প্রতিবেদন থেকে তাঁর সম্পর্ককে জানত, অথবা এটা হতে পারে যে সাইদ নাজির হুসেনের দিল্লিতে অবস্থানটা এরকম ছিল যে, কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি পুনরায় সক্রিয় না করাটা উত্তম মনে করে নেন। মৌলানা সাতানব্বই বছরের বার্ধক্যের জীবন যাপনে ছিলেন আর সর্বদাই ওয়াহ্হাবিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ব্যাপারটিকে অস্বীকার করে যান, ঠিক যেমন তিনি দিল্লিতে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে তাঁর সক্রিয় বা সহায়তা দানকারী ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। জীবনীকারদের একজন বর্ণনা দেন যে ১৯০২ সালে মৃত্যুকালে শত শত শিষ্য তাঁর পদতলে বসেছিল, অনেকেই এসেছিল আফগানিস্তান ও অন্যান্যরা কাশগার, হিজাজ এবং নেজদের মত দূরবর্তী এলাকা থেকে।

স্যার জন লরেন্সের উত্তরসূরি লর্ড মায়ো তাঁর বড়লাটের প্রশাসন তাঁর দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে শুরু করেন। তিনি 'ভারতে ওয়াহ্হাবিবাদকে দমন করবেন যেমনটি আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদেরকে দমন করেছিলেন।' বিদ্রোহী দলের হুমকির ব্যাপ্তি পরীক্ষাকল্পে একটি বিশেষ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার পরিণতিতে পাটনায় নগর ম্যাজিস্ট্রেট টি. ডব্লিউ. র‍্যাভেনশ কর্তৃক ভারতীয় ওয়াহ্হাবি আন্দোলন ও শেকড় সম্পর্কিত প্রথম পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রতিবেদন আন্দোলনের সংগঠনের অসাধারণ ব্যাপ্তি আর এর সশস্ত্র জিহাদের ইতিহাসকে তুলে ধরে। ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন সেনা অধিকর্তার হত্যাকে কেন্দ্র করে ওয়াহ্হাবি বিষয়টি নাটকীয়ভাবে একটি উত্তপ্ত আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।

প্রথমটি কলকাতায় ছুরিকাঘাতে নিহত ১৮৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জন নরম্যান, যখন তিনি ওয়াহ্হাবি বিচার কার্যের পৌরহিত্য করার জন্য আদালতে যাচ্ছিলেন। তাঁর আক্রমণকারী আব্দুল্লাহ্ নামক একজন পাঠান, তাঁর উদ্দেশ্যের সুসঙ্গত কারণ না বলেই ফাঁসি কাঠের দিকে যায়। জেমস রুটলেজ নামক এক ভারতের পর্যটক তাঁর বিচার কার্যে উপস্থিত থেকে পর্যবেক্ষণ করেন যে অভিশংসক (প্রসিকিউটর) 'অপরাধের উদ্দেশ্য আবিষ্কারের কোন আশা' দ্রুত পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি পুনরায় লিপিবদ্ধ করেন যে 'এই সময়ে ভারতব্যাপী একটি খুবই অস্বস্তি পূর্ণ বিক্ষোভ বিরাজ করছে...। জনতা এই হত্যাকাঙ্ক্ষাকে দেখল যুদ্ধব্যবস্থার আরম্ভ হিসেবে যাতে নতুন ভাবে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত দলের কেউ একজন অনেক কিছু ঘটাতে সক্ষম হতে পারে। এটা তাকে নিজের আত্মবিসর্জনে প্রণোদিত করতে পারে। প্রয়োজনে সে বিশিষ্ট কিছু ইংরেজ ব্যক্তিবর্গকে আত্মঘাতি আক্রমণে হত্যা করতে পারে। এই মামলাটির অবস্থা দেখে, আমার সম্মুখে বহু মন্তব্য

রয়েছে, আমার কোন সন্দেহই নেই যে হত্যাকাণ্ডের কারণ হলো ওয়াহ্হাবিদের বিচার।'

রুটলেজের আতঙ্ক বদ্ধমূল হয় যখন জাস্টিন নরম্যানের গুপ্ত হত্যার অনধিক পাঁচ মাস পরে একটি দ্বিতীয় ও অধিকতর চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড মায়ো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করেন। কারাগার পুনর্গঠনে ছিল জনৈক বড়লাটের বিশেষ আগ্রহ, আর তিনি স্বয়ং দেখতে চেয়েছিলেন দ্বীপান্তরে সাজা প্রাপ্তদের অবস্থা যারা তাদের সাজা পেয়ে কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জে আন্দামান দল গড়েছে। তাঁর নির্বাসিত জীবনে মুহাম্মদ জাফরের বর্ণনা থেকে এটি পরিষ্কার যে তিনি ও তাঁর সাথী ওয়াহহাবিদের প্রতি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা শাস্তি উপনিবেশে সদাচরণ করেছেন। তাঁর দক্ষতার কারণে মুহাম্মদ জাফর প্রধান কমিশনারের প্রধান করণিক হিসেবে কর্ম সম্পাদন করেন, আর যদিও তিনি ও অন্য নেতৃস্থানীয় ওয়াহ্হাবিরা বিভিন্ন দ্বীপে বাস করতে তারা নামাযের সময় এবং এক সঙ্গে খাবার নেওয়ার সময় একে অন্যের সঙ্গে দেখা করতে পারত। জাফরের দৃষ্টিতে, লর্ড মায়োর ওপর যা সংঘটিত হয়েছে সেটি ছিল স্বর্গীয় বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৮ ফেব্রুয়ারিতে মুল দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য পরিদর্শন করে বড়লাট চলে যান ছোট্ট দ্বীপ মাউন্ট হ্যারিয়েটের তীরের উপরে এর চূড়া থেকে সূর্যাস্ত দেখার জন্য। পরে অন্ধকারে তিনি অবতরণ করে তাঁর স্টীম লঞ্চে আরোহণ করেন, তাঁর সম্মুখে ছিল দু'জন মশাল বাহক ও সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত। যখন লর্ড মায়ো তাঁর নৌকোর মধ্যবর্তী পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন যখন ঠিক দলের মধ্য দিয়ে একজন লোক দৌড়িয়ে এসে পেছনে থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'বার ছুরিকাঘাত করল। আক্রমণকারীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হলো, কিন্তু মায়ো তাঁর নৌকোর পথ থেকে পানিতে পড়ে গেলেন। তিনি তাঁর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নৌকোর পথে ফিরে এলেন, আর অন্যের সহায়তায় তাঁর জলযানে প্রবেশ করলেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আক্রমণকারী ছিলেন রেয়নেল টেলর ও পেশোয়ারের অন্য কমিশনারদের আর্দালী আফ্রিদি শেরে আলী, ১৮৬৭ সালে তাঁকে শত্রুতার কারণে রক্তক্ষয়ী হত্যাকাণ্ডের জন্য দ্বীপান্তরের দণ্ড প্রদান করা হয়েছিল।

পরিশেষে শেরে আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কিন্তু দ্বীপপুঞ্জের ওয়াহ্হাবি বন্দিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা বা তাদের আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়ে কিছুই বলেন নি। সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে ছিলেন 'দ্য পায়োনিয়ার' পত্রিকার মালিক জর্জ অ্যালেন, যখন লর্ড মায়োকে

আক্রমণকারী আঘাত হানে তখন তিনি (জর্জ অ্যালেন) তাঁর নিকটেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তিনি বড়লাটকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন শেরে আলী উত্তরে সাধারণভাবে বলেছিলেন যে 'আল্লাহ্ তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর দেশের শত্রুকে হত্যা করতে, এই অপরাধে তাঁর কোন সঙ্গী ছিল না, তবে আল্লাহ্ ছিলেন শেরীক (সহচর)। অ্যালেন আফ্রিদিকে বর্ণনা করেছেন এরকমভাবে 'মাঝারী উচ্চতা, গায়ের রং বাদামী, বাদামী দাড়ি, আর মোটেও মন্দ মুখমণ্ডল নয়, যতদূর মনে হয় কেউ তাকে বিচার করলে—তাঁকে নিদেনপক্ষে দেখে অপরাধীর ধারণা করতে পারবে না, আর বলেন যে 'তিনি যেভাবে গর্বের সাথে বিজয়ের হাসি হাসেন তা যথেষ্ট ন্যাক্কারজনক, ফাঁসি তাঁর জন্য সহস্র গুণে ভাল।'

তাঁর শাস্তির পর দেশের মূল অংশের অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরাও তাঁর কাছ থেকে ঘটনার পেছনের কঠোর তথ্য বের করতে পারেন নি যে 'তিনি শুনেছেন আব্দুল্লাহ্ বিচারপতি নরম্যানকে হত্যা করেছেন—সেটি একটি মহৎ কাজ ছিল, তবে তিনি যে কাজটি করেছেন তা পূর্বের যে কোন কাজের থেকে বৃহত্তর, যেহেতু তিনি ভারতে সবচাইতে উচ্চ পদস্থ সাহিবকে হত্যা করেছেন...। তিনি আশা করেন এই কাজের জন্য তাঁর দেশে নাম গৌরববান্বিত হবে।' বোধগম্যভাবে তাঁর বিজয়ী এই কার্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে জাফর আরও সামান্য কিছু যোগ করেন, শেরে আলী তাঁর ফাঁসির সময়ে তাঁকে দেখতে আসা সমবেত কয়েদিদের উদ্দেশ্যে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন তা লিপিবদ্ধ করেন নি। 'তিনি তাঁদেরকে উচ্চ স্বরে সম্বোধন করেন "ভাইয়েরা! আমি তোমাদের শত্রুকে হত্যা করেছি। আর তোমরা সাক্ষী যে আমি একজন মুসলিম।" এবং অতঃপর তিনি কলমা (কোরানের দোয়া) পড়তে লাগেন আর সেটি পড়তে পড়তেই মৃত্যুবরণ করেন।'

মুহাম্মদ জাফরের বর্ণনামতে শেরে আলী কেবল স্বর্গীয় প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেন, কিন্তু যদি জাফরের লর্ড মায়োকে হত্যার ওয়াহ্হাবি ষড়যন্ত্রে গুপ্ত সম্পর্ক থাকত, তাঁর নিজের উপরে দোষারোপের ভয়ে অবশ্যই অনুরূপ বলতেন না। গুপ্ত হত্যার পেছনে ওয়াহ্হাবিরা জড়িত আছে এই বিশ্বাসে ভারতে ব্রিটিশ সমাজ সংঘবদ্ধ হচ্ছিল যখন, তখন এই বিশ্বাসকে সমর্থন করার মত সামান্যতম প্রমাণও দেখা যায় নি। তবুও দুটি সম্ভবত বিচ্ছিন্ন বিষয় অব্যাখ্যাত থেকে যায় একজন প্রয়াত ওয়াহ্হাবি নেতা বেলায়েত আলীর পৌত্রকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে লর্ড মায়োর আগমনের ঠিক পূর্বে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল, এবং হত্যাকাণ্ডের পূর্বের রাত্রে জনৈক ব্যক্তি বা অজানা ব্যক্তিবর্গ শেরে আলীর সম্মানার্থে এক বিশাল ভোজ দিয়েছিল।

ওয়াহ্হাবি নেতৃবৃন্দ ও ভ্রাতৃবর্গ আহমদুল্লাহ এবং ইয়াহিয়া আলী দু'জনই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে বন্দী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ জাফর ও অবশিষ্ট বন্দীরা অবশেষে ১৮৮৩ সালে সাধারণ ক্ষমার অংশ হিসেবে বড়লাট লর্ড রিপনের ঘোষণায় মুক্তি পেয়ে যায়। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাসন কালে বিবাহিত স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরে নিজ গৃহে ফিরে তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং একুশ বছর বয়সী পুত্র সন্তান যাকে তিনি কয়েক মাসের শিশু অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমবাল্লার কিছু ভাল ম্যাজিস্ট্রেট দপ্তরের মাধ্যমে তিনি একটি চাকরি পেয়ে স্থানীয় সমাজে বসবাস শুরু করেন।

তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে, মুহাম্মদ জাফর একজন পরিবর্তিত মানুষ হিসেবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি শাস্তি উপনিবেশে থাকার সময় ইংরেজি বিষয়ে লেখাপড়া করেন আর এটি তাঁর সম্মুখে একটি বিশ্বকে উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, 'ইংরেজি ভাষা একটি জ্ঞান ও শিল্পকলার ভাণ্ডার। যে ব্যক্তি ইংরেজি জানে না সে বিশ্ব কার্যধারা সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন হবে না। ইংরেজি শিক্ষা ব্যতীত কেউ সক্রিয় ও ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে না।' এবং তাঁর পঠনের মাধ্যমে আধুনিক সমাজকে আবিষ্কার করে মুহাম্মদ জাফর ও অন্যান্য সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন আর শিখেছিলেন সহিষ্ণুতা, তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়া কিছু ব্রিটিশ কর্মকর্তার প্রশংসাও করেছেন। তবুও পরিশেষে, তিনি শেষ করতে বাধ্য হন যে এই সকল নব্য শিক্ষা তাঁর আত্মাকে বিপদগ্রস্ত করেছে 'পশ্চিমা জ্ঞানের প্রভাবে আমি ভোরের প্রার্থনা (নামায) বন্ধ করে দেই...। আমি কোরান পড়তে বা হাদিস শুনতে আমার মনে আগ্রহ জাগত না। আমি সর্বদা ইংরেজি ভাষা ও গ্রন্থাবলিতে নিমগ্ন হয়ে পড়তাম...। এখনও স্মরণ করি সেই দিনগুলোতে কিভাবে শয়তান আমাকে আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল আর আমি কখনও কখনও অনুরূপ করতাম। কখনও কখনও যখন আমি নাস্তিকদের যুক্তি-তর্ক পড়তাম আমি সেগুলোকে আমার অনুভূতি দিয়ে বিশ্বাস করতাম।'

মুহাম্মদ জাফরের অসাধারণ ধর্মীয় সংরক্ষণশীলতার আবেগ সহজাত প্রচণ্ড প্রতিরোধ দিয়ে শেষ হয় এই ভাষা (ইংরেজি) পার্থিব জীবনের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত যে এটা কেবল ক্ষতিকারকই নয়, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য বিপজ্জনকও বটে। যদি একজন তরুণ কোরান ও পবিত্র নবী (সা.)র জীবন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে ইংরেজি শেখে ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ পাঠ করে এবং বিবিধ বিষয় যা আমি ততদিন জেনেছি তাতে বুঝতে পেরেছি সে ধর্ম বিমুখ হয়ে পড়বে আর একই সাথে অপসংস্কৃত ব্যক্তিতে পরিণত হবে যা অতিমাত্রায় খোলামেলা ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে পড়বে। এই

অবস্থায় তাকে সংশোধন করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এই ধরনের জ্ঞান নিশ্চিতভাবে একজন ব্যক্তিকে অধার্মিক ও নাস্তিক করে তুলবে যদি সে ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত না হয়। এটা তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করবে যা সমগ্র জীবনব্যাপী সেখানে অবস্থান করবে।

সুতরাং পবিত্র অজ্ঞ থাকাটাই শ্রেয়তর। তাঁর নিজের জীবন ইতিহাসে, মুহাম্মদ জাফর পাঠকদের উপদেশ দেন, পড়তে হবে নীতিবাক্য সম্বলিত গল্প, এই জন্য 'এরকম গল্প, আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র কোরানে বলেন, "এইসব ঘটনাবলি থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যায়।"'

ওয়াহ্হাবিদের বিচারকার্য ও দুটি গুপ্ত হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ সমাজেও ভারতের বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী উভয়ের মধ্যে বিরাট বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে দেখা দেয়। ভারতীয় বিপ্লবে সংঘাতপূর্ণ ঘটনার মাধ্যমে ধারণা জন্মেছিল যে মুসলমানদেরকে আর বিশ্বাস করা যায় না—এই ধারণা ১৮৫৭ সালের প্রাপ্ত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী আরও প্রকট হয়েছিল যে বিদ্রোহের পর ধৃত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই ওয়াহ্হাবি মোল্লা শ্রেণীর ছিল যারা বিভিন্ন মাদ্রাসা-মক্তব এবং রেঙ্গুন পর্যন্ত বিদ্রোহের বীজ বাষ্প ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

তাঁর গুপ্তহত্যার এক বছর পূর্বে লর্ডমায়ো এক জনসমাবেশে বক্তৃতার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিলেন : 'মুসলমানরা কি তাদের ধর্মীয় কারণে রানির বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে বাধ্য?' বিষয়টি পত্র-পত্রিকায় চরম বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল ও কতিপয় শীর্ষ স্থানীয় বুদ্ধিজীবী মহলের কারণে এ বিষয়ে ছাপার হরফে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, এদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান পরিসংখ্যানবিদ উইলিয়াম হান্টার মায়োর অনুসরণে তাঁর বিতর্কিত গ্রন্থ দ্য ইণ্ডিয়ান মুসলমানস যেখানে তিনি ওয়াহ্হাবিদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট লিখেছিলেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছিলেন মুসলিম আইন বাতিল করে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়াকে মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ও অবশ্যম্ভাবী করেছিল।

যেখানে কর্তৃপক্ষবৃন্দ নেতৃত্ব দেন, সেখানে জনমত অনুসৃত হয়। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম বেসরকারি রাজকবি আলফ্রেড লিয়্যাল ছিলেন ১৮৬০ দশকের শেষ ভাগে ও ১৮৭০ দশকের প্রারম্ভে বেরার কমিশনার, ও পরবর্তী পররাষ্ট্র সচিব। লিয়্যালের প্রকাশিত একগুচ্ছ কবিতার বিষয় হিসেবে দেখানো হয় যে তাদের মুসলমান প্রজারা গৌরবোজ্জ্বল মুসলিম রাজত্বের কাহিনিগুলি গভীর সংবেদনশীলতার সাথে শ্রবণ করেন ও ব্রিটিশদের প্রতি অন্তর্নিহিত ঘৃণাকে অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখেন। গোড়ার দিকের 'এ সারমন ইন লোয়ার বেঙ্গল' (উত্তরবঙ্গের ধর্মোপদেশ) প্রথম ওয়াহ্হাবি বিচার কার্যের অব্যবহিত পরেই ১৮৬৪ সালে লিখিত। এটি সোয়াতের 'হাজী মহমদ গাজী উর্ফে মুজাহিদ-উদ-

দীন ওয়াহ্হাবি' নামক জনৈক মোল্লার সম্পর্কে বয়ান করে যিনি বাংলার গ্রামাঞ্চলের দিকে এক গুপ্ত সমাবেশ ডাকেন আর স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্যে তাঁদের হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর শ্রোতৃমন্ডলী আলোড়িত হয়, তবে কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায় না এবং বিরক্তিতে তাদেরকে ত্যাগ করেন :

> বস্তুতঃ, যদিও তোমাদের আত্মা ইচ্ছা করছে, তোমাদের মাংস আছে তবে
> ধর্ম যুদ্ধের জন্য দুর্বল,
> যখন ইংরেজদের তোপের মুখে পড়ি তখন নিজেকে
> রক্ষা করাকে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি।'

দুই দশক পরে লিয়্যাল তাঁর লরেলত্ব এক তরুণ কবিকে দিতে সম্মত হন যাঁর কাব্যসংগ্রহ ডিপার্টমেন্টাল ডিটিজ ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়, এটি জানিয়ে দেয় যে ভারতীয় দৃশ্যপটে এক রাজকবির আবির্ভাব হয়েছে। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর লাহোরে সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটে তিন বছরের চাকরি জীবন তাঁকে শিখিয়েছে মুসলিমদেরকে বলশালী ও সম্মানিত হিসেবে দেখতে তবে কখনোই বিশ্বাস করতে নয়। তাঁর প্রথম দিকার ছোট গল্প দ্য সিটি ওয়াল-এ লাহোর দূর্গে আটক এক রাজ-বন্দীকে পলায়নে সাহায্য করতে গিয়ে বর্ণনাকারী প্রতারিত হয়। যখন তিনি জিজ্ঞেস করেন এই বয়স্ক বন্দী কে হতে পারে তখন তাকে বলা হয় '১৮৩৬ সালে তিনি ছিলেন যুবক যোদ্ধা, পুনরায় আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন '৫৭ সালে, আর তিনি '৭১ সালে আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তবে আপনারা মানুষকে বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার কৌশল ভালই রপ্ত করেছেন। এখন তিনি বৃদ্ধ; কিন্তু তিনি যদি পারেন তবে আপনাদের সঙ্গে লড়াই করবেন।' 'তাহলে তিনি কি একজন ওয়াহ্হাবি?' বর্ণনাকারী জানতে চান। আরও ঔৎসুক্য জাগিয়ে কিপলিং এক অদ্ভুত ভাবে উভয়বল এক গুচ্ছ ক্ষুদ্র কবিতা 'সৈয়দ আহমদের ওয়াহ্হাবি মসজিদ-আল-আকসা থেকে' নামে লেখেন তাঁর ভারত ত্যাগের বহু বছর পরে তাঁর গল্প সংগ্রহ 'ট্রাফিক্স এ্যাণ্ড ডিসকভারিজ'-এ প্রকাশিত হয়। কবিতার বর্ণনাকারী পর্যবেক্ষণ করেন একজন ওয়াহ্হাবি কয়েদিকে একত্রে শৃঙ্খলিত কয়েদি দলে আর তাঁর আচরণে তাঁর (বর্ণনাকারী) চিত্তকে প্রভাবিত করেছিল যে তিনি তাঁকে তাঁর 'স্মরণীয় বিগত দিন' সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কিন্তু যখন তিনি কয়েদির গল্প শোনেন বর্ণনাকারী নিজেকে দেখেন তাঁর 'অলৌকিক গল্প বুননে' আকস্মিক আবেগে অসাড় করে ফেলেছেন। কবিতাটি এই পংক্তিমালা দিয়ে হয়

আমি নিজেকে তাঁর আকর্ষণে সমর্পণ করলাম—
এই মানুষটির বন্ধনে পড়ে বন্দী হয়ে গেলাম
যে পর্যন্ত না সে আমাকে এ মর্ত্যে ফিরিয়ে দিল
চেয়ে দেখি সব কিছু শূন্য;
তবু সে সুখে থাকুক কামনা করি
কারণ তাঁর মনটা ছিল উদার।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুগত্যের অন্বেষণ চলছিল। মুসলিমদের প্রথম কর্তব্য কোথায় নির্দেশ করে এই প্রশ্নটি মাতৃভাষার সংবাদপত্রে ও মসজিদে উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। সুন্নি মুফতি ও অন্যান্য ধর্মীয় আইনজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কলকাতা এবং দিল্লিতে সমাবর্তনে মিলিত হয়, আর অনেক মানসিক যন্ত্রণাদায়ক আলোচনার পর ফতোয়া জারি করা হয় এই ঘোষণা দিয়ে যে ভারত ব্রিটিশদের অধীনে একটি দার-উল-হার্ব না একটি দার উল-ইসলাম দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন, যেখানে ধর্মীয় বিদ্রোহীরা অবৈধ, পক্ষান্তরে দিল্লিতে তারা দেশটিকে দেখল শত্রুর রাজ্য হিসেবে—তবে বিবৃত হতে থাকল যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা তথাপি বাঞ্ছনীয় নয়। একই সাথে অনেক সাধারণ সুন্নি ও শিয়া মুসলিমদের মধ্যে অনেকে ছিল যারা নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় থাকা সত্ত্বেও তাদের অনেকে ওয়াহ্হাবি মতবাদের গোঁড়ামির প্রতি তিক্ত মনোভাবের কারণে ওয়াহ্হাবি বিচার ব্যবস্থা স্বধর্মী মুসলমানদের উপর নির্যাতন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভেদীকরণের একটি সাধারণ শ্রেণীগত আচরণ। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে কতিপয় ইতিহাস বেত্তা অবশেষে এই যুক্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিল যে তৎকালীন প্রশাসনে মুসলমানদের সংখ্যা বা উপস্থিতি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এই বিষণ্ন বাস্তবতা হচ্ছে যে এই ক্রমাবনতি মুসলিমদের সামগ্রিক ভাবে জনজীবন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্নতার একটি ধারা পর্ব হিসেবে অনুসরণ করে চলছিল। বিশেষত সুন্নি মুসলিম সম্প্রদায় তাদের ধীর অতীত চারিতায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করার লক্ষ্যেই বাস্তবতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার পর প্রয়াসে এমন আচরণ প্রদর্শন করেছিল।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতে মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদাই মুসলিম পদ মর্যাদায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুসন্ধান করত, দিল্লির সম্রাটের নেতৃত্বে যিনি ভারতে কিছু ব্রিটিশ বড়লাটদের মাধ্যমে ভারতে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়ে তাঁর প্রশাসন পরিচালনা করতেন। যখন মুঘলদের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় তখন এইসব শাসকবর্গ নিজেদেরকে স্থানীয় শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন, হয় মুসলিম নবাব বা হিন্দু বা শিখ মহারাজা খেতাব নিয়ে, প্রত্যেকেই ভূ-সম্পত্তির

অধিকারী। একটু একটু করে ভারতে ব্রিটিশ সরকার স্তরে স্তরে অবস্থিত রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অপসারিত করে বা কোথাও কোথাও দুর্বল করে প্রশাসনের আধুনিকায়নার্থে নেতৃত্বের স্থলাভিষিক্ত করে যাদের সামন্ততন্ত্র বা ধার্মিকতার প্রতি অতি অল্পই আনুগত্য ছিল। ১৮৫৭ সালের এই ঘটনাবলি এই ক্ষমতা পরিবর্তনের গতি বাড়িয়ে দেয়। যখন অযোধ্যা ও বিহারের বহু ভূসম্পত্তিধারী অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হয় তখন দিল্লির বৃদ্ধ সম্রাটকে বার্মার নির্বাসনে পাঠান হয়, একইভাবে টঙ্কের নবাবকে বেনারসে নির্বাসনে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ব্রিটিশরা বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যেমন পেশোয়ারে এডওয়ার্ডস কলেজ ও লাহোরে এইচিসন কলেজ যেখানে পূর্বের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা ব্রিটিশ ধারায় শিক্ষিত হত, সক্রিয়ভাবে তাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষা দেওয়া হত সেখানে।

এই পুনর্গঠন ভারতে মুসলিম সমাজকে পুনরায় বিভক্ত করে। বেশ কিছু সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় অবলোকন করল যে মুসলিমদের পশ্চিমা ছাঁচের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আর তাদের ধর্মের ও সমাজের অগ্রগতির জন্য ব্রিটিশ ক্ষমতা বলয়ের মধ্যে যে সময় পর্যন্ত না এককভাবে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে তাদের বিশিষ্ট নেতা নাকশবন্দি মৌলবাদীদের একজন, যে দিল্লিতে ১৮৪০-এর দশক জুড়ে শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাকের অধীনে লেখাপড়া করেন ও ১৮৫০-এর দশক জুড়ে সাইদ নাজির হুসেনের কাছে। মুঘল অভিজাত ব্যক্তি সৈয়দ আহমদ খান, আলীগড় আন্দোলনের ও একই নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যদিও একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের অনেক বিষয়ের কট্টর সমালোচক ছিলেন, তবু তিনি আর তাঁর সমর্থকরা নিজেদেরকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন দেখল এবং অসদাচরণের শিকার হলো যখন দেখল তাদের সহ-ধর্মীদের অধিকাংশই তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে।

পশ্চাৎ মুখে এই ধাওয়া দিয়ে সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অগ্রগামী সতীর্থ মোল্লাদের দুইটি দলের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে—বিশেষত এই দলভুক্তরা সৈয়দ আহমদ খানের মতই একই অঞ্চল ও প্রেক্ষাপটভুক্ত ছিলেন। তারা দু'জন দিল্লিতে ১৮৫৭-এর বিপ্লব পূর্ববর্তী বছরগুলোতে শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক ও সাইদ নাজির হুসেনের নিকটে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র আদর্শ অনুসরণ করে নাকশবন্দি শিক্ষায় শিক্ষিত হন।

আরও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে এই দুই দলের চরমপন্থী মোল্লাদেরকে নাজির হুসেন স্বয়ং নেতৃত্ব দেন, এই ব্যক্তি যিনি ১৮৫৭ সালে 'দিল্লি-বাসীদের' নেতৃত্বে দেন ও ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যাকে ওয়াহ্‌হাবিদের প্রধান সন্দেহে দিল্লিতে গ্রেপ্তার করেন। দু'জন প্রভাবশালী ছাত্র যারা মাদ্রাসা-ই-

রহিমিয়ার প্রাক্তন ছাত্র—ভোপালের নবাব সিদ্দিক হাসান খান ও মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাতালভি—তিনি তাঁর মুক্তির দুই বা এক বছরের মধ্যে রাজনীতি-ধর্মীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন যেটি জামাত আহল-ই-হাদিস নামে পরিচিত, জনগণের হাদিসের দল। এর নেতৃবৃন্দ তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোন গোপনীয়তা রাখেন নি 'ভারতকে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের পূন্যভূমিতে রূপান্তরে।' তা সত্ত্বেও তারা তাঁদের অনুসারীদের কাছে সহজ করেও দিয়েছিল যে এখন জিহাদ করার সময় নয়। মুহাম্মদ হুসেন বাতলভি লিখেছেন, 'ভাইয়েরা, তরবারির যুগ আর নেই। এখন তরবারির পরিবর্তে কলমের দ্বারা শাসন করা প্রয়োজন। কিভাবে মুসলমানদের হাতে তরবারি আসতে পারে যখন তাদের হাতই নেই? তাদের কোন জাতীয় পরিচিতি নেই।'

যদিও ভারত সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে হাদিস অনুসারীরা তাদের সহধর্মী ও বিধর্মীদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় উষ্মা প্রকাশের কোনরূপ বিলম্ব করে নি যা ছিল আল-ওয়াহ্হাব তাঁর অনুসারীদের আইনের আওতার মধ্যে থেকেই নৈকট্য বজায় রেখে বিরোধিতা প্রকাশ করেন, যা মসজিদ ও সমাধিস্থলের ওপর সহিংসতা আকারে প্রকাশ পায়। হাদিস অনুসারীরা ভারত সরকারের সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান ছিল। এ দিকটা বজায় রেখেই তারা যাদের ইসলাম বিরোধী মনে করেছিল তাদের বিরুদ্ধে সহিংস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে আহল-ই-হাদিস প্রচারকেরা অধিকাংশ মসজিদ থেকে বহিস্কৃত হয় আর প্রকাশ্যে ওয়াহ্হাবি বলে অভিযুক্ত হয়। যারা তাদেরকে অনুসরণ করল তাদের সকলকে দোষারোপ করে ফতোয়া প্রচার করা হয় 'অবিশ্বাসী ও স্বধর্মত্যাগী' বলে। অবশেষে, ১৮৮৫ সালে আহল-ই-হাদিস নেতৃত্ব ওয়াহ্হাবিবাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন আর ভারত সরকারকে তাদের নিজেদের ওয়াহ্হাবিদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই মর্মে মেনে নিতে আহ্বান জানান। ধর্মের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করার কারণে, সরকার সম্মত হয়ে আদেশ দেন এখন থেকে সকল সরকারি কাগজপত্রে 'ওয়াহ্হাবি' ও 'ওয়াহ্হাবিবাদ' শব্দদ্বয়ের ব্যবহারকে এড়িয়ে যেতে হবে। যাহোক, ভারত ইসলামি সমাজ এই রকম সাময়িক দুর্বলতার ব্যাপারটি জানত না, আর এই দিন থেকে আহল-ই-হাসিদ বর্ণিত হতে থাকল—সুবিচারের সাথে—যখন এর উৎসসমূহ ও শিক্ষায় ওয়াহ্হাবিবাদ নিহিত। এর বিরামহীন বহুঈশ্বর-বিরোধী, পরিবর্তন-বিরোধী, শিয়া-বিরোধী এবং খ্রিস্টান-বিরোধী বার্তা কট্টর সুন্নি মৌলবাদীদেরকে অবিরাম আকর্ষণ করতে থাকে।

দিল্লির দ্বিতীয় দলের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ কম যুদ্ধংদেহী মনোভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার অবস্থা গ্রহণ করে উপকৃত হলো। তাদের নেতৃবৃন্দ ছিলেন

মুহাম্মদ কাসিম ও রশিদ আহমদ, চার সদস্য বিশিষ্ট জিহাদি দলের দু'জন যাঁরা ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে থানা ভবনে তাদের নিজেদের দার উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দিল্লি ত্যাগ করেছিলেন। মুহাম্মদ কাসিম দলের জঙ্গি সেনাপতি হিসেবে কাজ করেছিলেন আর শামলি মসজিদের হত্যাযজ্ঞে তাঁর হাত থাকতে পারে; রশিদ আহমদ শরিয়া দলের বিচারক হিসেবে তত্ত্বাবধান করেছিলেন।

পাটনা বিচারের শেষে এক বছর পরে ১৮৬৬ সালের মে নাসে, এই দু'জন মোল্লা তাঁদের নিজেদের মাদ্রাসা দিল্লির পঁচাত্তর মাইল দুরের একটি ছোট্ট শহর দেওবন্দে এই দু'জন মোল্লা তাঁদের নিজেদের মাদ্রাসা স্থাপন করেন আর একটি দিনের যাত্রায় তারা থানা ভবনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিকভাবে মাদ্রাসার একজন শিক্ষক ছিলেন, মোল্লা মাহ্মুদ দেওবন্দি, আর একজন ছাত্র, পনের বছর বয়স্ক মাহ্মুদ উল-হাসান, এবং প্রাঙ্গণ ছিল একটি প্রাচীন মসজিদের পার্শ্বের আঙ্গিনা।

পেছনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী সেনাবাহিনী যার নিয়ামক শক্তি ছিলেন দেওবন্দি আন্দোলনের মোঃ কাসিম, তিনি দেওবন্দি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনরূপ গোপনীয়তার আশ্রয় নেন নি। যা ছিল ব্রিটিশদের অত্যাচার থেকে ইসলামকে রক্ষা করা। তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজরা মুসলমানদের সামান্য দোষের কারণে তাদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালিয়েছিল, ১৮৫৭ সালে বিপ্লবে নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য নিষ্ঠুর সংগ্রাম করা যদি আদৌ কোন দোষ হয়ে থাকে। তারা লুট করতে কোন কিছুই বাদ দেয়নি ও ইসলামি শিল্পকলা ও বিজ্ঞান, মুসলিম সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে একবারে নিশ্চিহ্ন করে যায়।'

প্রাথমিকভাবে 'আরব মাদ্রাসা' হিসেবে পরিচিত, দেওবন্দ মাদ্রাসা ভারতের সাধারণ মাদ্রাসা থেকে খুবই ভিন্ন ধারায় সংগঠিত হয়েছিল যা এই সময় পর্যন্ত মাদ্রাসার জ্যেষ্ঠ মোল্লার কর্তৃত্বের ওপর নির্ভর করে সুন্দররূপে অনিয়মিতভাবে চলেছিল। মুহাম্মদ কাসিম সরাসরি জেনেছিলেন কিভাবে ব্রিটিশ সমর্থিত দিল্লি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর তিনি দেওবন্দকে ব্রিটিশ ছাঁচে একজন অধিশিক্ষক, একজন উপ-আচার্য, এক শিক্ষা অনুষদের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী, এক সেট শিক্ষাক্রম এবং একটি সময়-সূচীসহ গড়ে তোলেন। তথাপি তাদের দার্শনিক মতবাদ মাদ্রাসা-মক্তবের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে। একটি কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়েছিল, ছাত্ররা সহজ-সরলভাবে মিতব্যয়িতার সাথে জীবন যাপন করত, ইংরেজি ছিল নিষিদ্ধ, উর্দূ কথ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত, আর সকল ছাত্রবৃন্দ মূল আরবীতে কোরান মুখস্থ করত। সেই অনুসারে সকল শ্রেণীতে কোরান শিক্ষা কেন্দ্রীভূত হত। হাদিসে বিশেষজ্ঞ

মোল্লারা শিক্ষা দিতেন আর তারা আল্লাহ্‌র একত্বের ওপর প্রবল জোর দিতেন, দিল্লির শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্‌র সেই শিক্ষানুসারে যেমনটি তাঁর বংশধর শাহ্ আব্দুল আজিজ ও শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাকের মাধ্যমে চালু করে গেছেন। এতে নাকশবন্দি সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়েছিল, বিশেষত শিক্ষক ও অনুসারীদের মধ্যে এমন সম্পর্কের ভিত্তি রক্ষা করা হত যা প্রথম যুগে ইসলামের নবী ও তাঁর সাহাবিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের সম্পর্কের প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায়।

একই সাথে মাদ্রাসাটি একটি নিরাপস, আচারনিষ্ঠ ও বর্জনকর মৌলবাদে উন্নীত হয় যা ওয়াহ্‌হাবিদের সীমাবদ্ধতার থেকে কোন অংশে কম নয়। দেওবন্দি আদর্শ দরবেশদের উপাসনা করাকে বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সমাধিসমূহকে সজ্জিত করণ, আর নৃত্য-গীতের মত কার্যাবলিকে বর্জন করে। শিয়া, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে এটি ক্লান্তিহীন বাগযুদ্ধের অবতারণা করে, এটি নিজেকে ভারতীয় প্রগতিশীল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, যতদূর সম্ভব আইন লঙ্ঘন না করে ব্রিটিশ আইন-আদালতসমূহকে পরিহার করে, এটি সংগ্রামরত জিহাদকে ধর্মের ভিত্তি বলে ধরে রাখে তবে জিহাদকে ইসলামের পুনর্জাগরণের আলোকে উন্নীত করে ও শরীয়া মতবাদের অপরিবর্তনীয়তার মাধ্যমে এর পরিচিতিকে সমুন্নত করে, আল্লাহ্‌র একত্ব ও উলেমাদের সমগ্র প্রয়াসী পরিচালনার কর্তৃত্বে।

যখন সর্বসাধারণের সমক্ষে ওয়াহ্‌হাবি বলে অভিযুক্ত করা হলো, এ রকম ঘন ঘন হতে লাগল, তখন দেওবন্দিরা নিজেদেরকে হানাফি মতে দৃঢ় বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করল। ওয়াহ্‌হাবিবাদের উপরে তাদের দাপ্তরিক কাজ ছিল সম্ভবত রশিদ আহমদ কর্তৃক প্রচারিত ফতোয়ায় উপস্থাপিত একটি বিবৃতি যা ব্যক্ত করে আল-ওয়াহ্‌হাব ‘চমৎকার বিশ্বাস পোষণ করতেন তবে তাঁর ধর্মমত ছিল হানবলি। যদিও তিনি বদমেজাজী ছিলেন তবু তিনি ও তাঁর অনুসারীরা ভাল লোক ছিলেন।’ এইটি মূলধারার তিন শ উলেমাকে দেওবন্দি মাদ্রাসার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে সুন্নিদের নিষেধ করে একটি ফতোয়া প্রচার করা থেকে বিরত রাখে নি। এই ফতোয়ার একটি অংশ পড়লে দেখা যায়, ‘দেওবন্দিবৃন্দ, দরবেশগণ ও পবিত্র নবী (সা.) এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, ভক্তির ক্ষেত্রে তাদের অবজ্ঞা ও অপমানের কারণে তারা সুনিশ্চিতভাবে স্বধর্মত্যাগী ও বিধর্মী। তাদের স্বধর্মত্যাগ ও ধর্মমতের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস নিকৃষ্টতম ধরনের কাজ, যাতে যে কোন ব্যক্তি তাদের স্বধর্ম ও ধর্মমতকে সামান্য অবিশ্বাস করে সে-ই একজন স্বধর্মত্যাগী ও নাস্তিক। মুসলমানদের তাদের সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে ও তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে, তাদের পেছনে নামায পড়া তো দূরের কথা।’

সর্বান্তকরণে এর ঈশ্বর তত্ত্বে মৌলবাদী মুহাম্মদ কাসিম নানউতবির দেওবন্দও ছিলেন সাহসিকতার সঙ্গে নতুন কিছু পরিবর্তনের পক্ষে, বিশেষত জনগণের কাছে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে। মাদ্রাসাটি তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করে কৃষক সম্প্রদায়, অধিকার বঞ্চিত ও অশিক্ষিতদেরকে এর ছাত্র হিসেবে পান এবং সরকার বা সম্পদশালী দাতাগণের অনুদান নিতে অস্বীকার করে দৃঢ়তার সাথে বলতে থাকেন যে এটি কেবল ধর্মীয় দান গ্রহণ করবে। ছাত্রবৃন্দ ছিল পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চারা ও প্রায়ই সেখানে বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত অবস্থান করত, যাতে অনেকেই মাদ্রাসাকে তাদের মূল গৃহ বলে সনাক্ত করে এবং তাদের শিক্ষককে প্রতিনিধি পিতা মনে করে। এটি ছিল প্রথম দিকের ছাঁচের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের যেখানে তালিবানরা এক মাদ্রাসা থেকে আরেক মাদ্রাসায় তারা যেখানে পারত সেখানে ঘুরে ঘুরে প্রায়ই এলোমেলো অবস্থার ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণ করত। ফলে একটি ঘন সন্নিবদ্ধ অন্তর্মুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যেখানে সদ্য যুবকেরা তাদের ভেতরে কামভাব দেখা দিলে তা অত্যন্ত সহজ উপায়ে দমন করত, সুতরাং ঐ কামেচ্ছাকে নিজেদের মধ্যেই লালন করত আর রমণীরা দুর্বল জীব হিসেবে আত্ম নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ ছিল ও তাদেরকে সহজেই প্রলুব্ধ করা যেত, যার দরুণ তাদেরকে সর্বোত্তমভাবে বশীভূত করে রাখা হত। সমকামিতা যেমন-ই ব্যভিচার তেমন-ই মহাপাপ হিসেবে স্বীকৃত ছিল, যদিও একই সময়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। পুঞ্জীভূত যৌন আক্রোশকে দমনার্থে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ উপাসনায় তারা নিমগ্ন থাকত—আর তাঁর পার্থিব বিষয়টির প্রতি তারা নিয়োজিত থাকত।

যখন এ স্থানটি নিজেকে রক্ষণশীলদের একটি ঘাঁটি হিসেবে দাবি করছে, তখন দেওবন্দ আধুনিক যান্ত্রিকতার ব্যবহার করতে কোনরূপ দ্বিধা করেনি। তাদের মতবাদ ও বিভিন্ন বার্তা প্রচার ও প্রসারের কাজে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র ব্যবহারে তারা যথেষ্ট উদ্যোগী ছিল, বিশেষত মুফতিদের ফতোয়ার ক্ষেত্রে তারা সর্ব বিষয়ে এই পদ্ধতি অনুসরণ করত। সরকারিভাবে দেওবন্দ মুফতিরা ইজতিহাদকে প্রত্যাখ্যান করেন, ব্যাখ্যায় স্বাধীন বিচার শক্তির ব্যবহার শরিয়ার এক সমস্যা। কিন্তু তারা একটি পদ্ধতিও গ্রহণ করেছিল যে প্রতিটি বিষয়ে কিছু বাহ্যিক বিধিনিষেধ রয়েছে যেগুলি আক্ষরিকভাবে প্রতিপালনযোগ্য এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত বিষয়াদি নিজেদের মধ্যে পর্যালোচনাযোগ্য। এটি কার্যত পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে ইজতিহাদের থেকে কোন অংশে কম নয়। সুতরাং দেওবন্দ তাদের ধর্মীয় ক্ষেত্র বিশেষে মূল্যায়ন প্রদানে এতটাই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী হয়েছিল যে তারা এ বিষয়ে কম-বেশি পুরো বাজার দখল করে ফেলেছিল। এভাবে প্রতি বছর অসংখ্য ফতোয়া জারি করে সারা ভারত জুড়ে

একটি আবহ সৃষ্টি করেছিল যেখানে বোঝানো হতো ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় আইন সম্পর্কে দেওবন্দ ঘোষিত ব্যাখ্যায় ছিল সর্বশেষ কথা এবং একজন ঘোষিত মোমিন মুসলমান কিভাবে তার আচরণবিধি প্রতিপালন করবে। গোড়ার দিক্কার একটি ফতোয়া আধুনিকতাবাদী আলীগড়ের সৈয়দ আহমদ খানের সকল কার্যাবলিকে অনৈসলামিক বলে ঘোষণা করে, আর সকল মুসলমানকে তাঁর দেশপ্রেমিক সংস্থায় যোগ দিতে নিষেধ করে।

এই ধরনের জনপ্রিয়তা অর্থ করে দেওবন্দ মাদ্রাসা জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করে, পুনর্ভ্যুদয় হওয়া কতিপয় মাদ্রাসায় এই সময়ে ইসলামি পুনর্জাগরণের মতাদর্শ নিয়ে যে সমস্ত গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল, বিশেষত মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে একটি ইসলামি পরিচিতি বোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে ও ব্রিটিশ ধারা ও মূল্যবোধের প্রতিপক্ষে তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়ে দেওবন্দ ভারতব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠে যেখানে ছেলেরা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রাচীন ধর্মে দীক্ষিত হতে পারত। ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি দার উল-উলুম অতিরিক্ত নাম হিসেবে গ্রহণ করে, ইসলামি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, তখন থেকে এটি ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ইসলামি ধর্মীয় শিক্ষায় দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল হয়ে যায়। কেবল প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি কায়রোতে আল-আকসা মসজিদের সাথে সংযুক্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে দার উল-উলুম দেওবন্দ দক্ষিণ ভারতে দুই ডজনেরও বেশি তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একই সাথে এইমাদ্রাসা ক্রমবর্ধমান হারে প্রশিক্ষিত শ্রেণীর উলেমা দল যারা এক নতুন সংস্কার পন্থী উলেমা হিসেবে পরিচিত ছিল। যাদের সাথে খ্রিষ্টীয় ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল, যারা শিক্ষাগত যোগ্যতায় পেশাগত ডিগ্রিধারী হলেও রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত ছিল যারা এর বলে বিশেষ সুবিধা পেয়ে চাকরি-বাকরি অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ পেয়ে থাকত, সমালোচকদের প্রকাশ্য বিতর্কে ম্লান করে দিত, গণ-প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিত, সর্বোপরি দার উল-উলুম দেওবন্দপন্থী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই সকল শিক্ষা সালাফি বা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে মর্যাদাপূর্ণ হয় যা পূর্বপুরুষদের আদর্শকে ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করে ইসলামি পুনর্জাগরণের ভিত্তি যা মধ্যযুগে দামেস্কের হানবলি আইন প্রণেতা উদ্ভাবন করেছিলেন। ইবনে তায়মিয়া, ও তারা যারা সেগুলোকে অনুসরণ করত তারা সালাফিয়া—'পূর্বপুরুষদের অনুসরণকারী', হিসেবে অভিহিত হত। উভয় শব্দই মহানবী (সা.)র সাহাবা ও ইসলামের প্রথম যুগের শাস্ত্রজ্ঞদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

দারউল-উলুম ও এর ধর্মপ্রচারক কেন্দ্রীয় [illegible] দক্ষিণ এশীয় ইসলামের ওপর দার উল-উলুম-এর ধর্মপ্রচারকদের প্রভাব ছিল বিশাল। তারা

উলেমাদেরকে নতুন কর্তৃত্ব দিয়েছিল আর ধর্ম নিরপেক্ষ ঐতিহ্যমন্ডিত নেতাদের গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তারা প্রাচীন আদর্শসমূহে নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। যে একজন সত্যিকারের মুসলমানের প্রথম কর্তব্য ছিল ইসলামের বিশ্ব সমাজ; আর যে তার একটা কর্তব্য ছিল যখনই ইসলামের ওপর আঘাত আসবে তখন তাকে প্রতিহত করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার সুন্নি ইসলামে শেষের ফল ছিল ভূকম্পীয়, যা ক্রমবর্ধমানভাবে রক্ষণশীল ও অন্তর্মূখী হয়ে পড়েছিল, কম সহিষ্ণু, এবং মাদ্রাসায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সন্ধানের দিকে অনেক বেশি ঝুঁকে পড়েছিল। আর মাদ্রাসা-প্রশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা সত্য পথে উম্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। ফলাফল সমূহ সুসম্পূর্ণ।

অধ্যায় নয়

অগ্নিঝরা সীমান্ত

> যে কেউই এই প্রাদুর্ভাবের তিনিটি প্রধান উৎসের অন্বেষণে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে, সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি ধর্মান্ধতা, দ্বিতীয়টি, ধর্মান্ধতা, এবং তৃতীয়টি, ধর্মান্ধতা... । যেখানেই ইসলাম ধর্ম আসে সেখানে শিষ্যবর্গকে এর নিমিত্তে প্রচার অনুভূতির অন্তঃপ্রবাহে ইন্ধন জোগাতে দেখা যাবে যা এই অদ্ভুত বিশ্বাস বোধের অন্তর্নিহিত চেতনাকে উত্তেজিত করে। এই ধরনের সকল প্রচারকবৃন্দ আগাম বার্তা দিয়েছিলেন যে এমন একটি সংকট দেখা দিতে পারে যে যখন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলো যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং দেশীয় কৃষি জনমনে দেশাত্মবোধের এক আবেগ সৃষ্টি করতে পারে। আর ১৮৯৭ সালে এই সংকট দেখা দিল...এই বিশৃঙ্খল সময়কে বুঝে উপজাতিদের অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামির ওপর কাজ করার জন্য সমস্ত কাজ মোল্লাদের সফল কাজ বলে দাবি করা যায়।
>
> রয়টারের লায়োনেল জেমস, দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্রান্টিয়ার ওয়ার, ১৮৯৮

১৮৭১ সালে কবি এডওয়ার্ড লীয়ার তাঁর ননসেন্স সংস-এ এই সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্বন্ধে পশ্চিমা বিশ্বের অজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করে লেখেন 'সোয়াতের আকন্দরা কে বা কেন, অথবা কোনটি বা কি? থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি (ধর্মীয় সমাজ)র প্রতিষ্ঠা কর্ত্রী মাদাম ব্লাভতস্কির কাছে আখুন্দরা অনিষ্টকর প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গের গোপন সমাজের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে প্রধান এবং অবশিষ্ট সকলের মধ্যে প্রধান বলে ঘোষণা দেন। ওয়াহ্হাবিদের সঙ্গে তাঁর দৃশ্যমান বিরোধিতা একটি মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়, খুনে হাত যা লর্ড মায়োকে আঘাত করেছিল তা নিশ্চিতভাবে পুরোনো আব্দুলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।' কিন্তু মাদাম ব্লাভতস্কি ছিলেন যথারীতি সত্য থেকে বহুদূরে।

১৮৬৩ সালে আমবেলায় আখুন্দের তাদের বিরুদ্ধে চরম মধ্যস্থতা সত্ত্বেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পেশোয়ারে তাকে একটি নিরপেক্ষ প্রভাব বলে স্বীকার করে নেয়। জনৈক ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারি লিখেছেন,

> 'মনে হয় তার জীবন একাগ্রতা, অবমাননতা, বিভিন্ন নেশা ও বিলাস-বাসনা থেকে দূরত্ব এবং সাধুতাপূর্ণ, তিনি যে মতবাদ প্রচার করতেন তা যেমনই উদারপন্থী ও সহনশীল তেমনই উল্টোভাবে ওয়াহ্হাবি কট্টর পন্থীদের ছিল অসহিষ্ণুতা ও উগ্রপন্থা। অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের যে নিরীখে বিচার করা হয় তিনি তাঁর নিজের চেতনার আলোকে মঙ্গলের জন্য, শান্তি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে শত্রুতা পরিহার করা, জনগণকে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে কোন সহিংসতা থেকে সংবরণ করা।'

কিন্তু ১৮৭৭ সালে আব্দুল গোফুরের মৃত্যুর সাথে সাথে সোয়াতে, বুনারে ও এদের পেছনের এলাকাগুলোতে তাঁর আনীত অটলভাবে একত্রে থাকার প্রবণতা স্পষ্ট হতে লাগল। তাঁর এই মৃত্যু প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা কের ফ্র্যাসার-টেলরের মতে ব্রিটিশ-আফগান সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই যে ব্রিটিশ প্রভাব প্রসারিত করে ভারতকে আফগানিস্তানের গভীরে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল রুশদেরকে একই কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। 'সুনিপুণ নিষ্ক্রিয়তার দুই দশক পরে লরেন্স, মায়ো ও অন্যান্য বড়লাটদের ওপর যতদূর প্রযোজ্য হয়, অন্যদিকে ঘড়ির ঘন্টা ভারতে নতুন বড়লাটের প্রভাবশালী লর্ড লিটনের আগমন বার্তা ঘোষণা করে।

১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাবুলের আমির শের আলী কর্তৃক কাবুলে রুশ রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় খাইবারের পথ দিয়ে আমিরকে আনয়নের জন্য তাঁর নিয়োজিত এক দলকে প্রেরণ করেন। এটার নেতৃত্বে ছিলেন সেই পুরোনো সীমান্ত যুদ্ধে যুদ্ধরত প্রবীণ সৈনিক নেভিল চেম্বারলিন, এখন মেজর-জেনারেল ও একজন কেসিবি, আর তাঁর দলে একজন পুরোনো সীমান্তবাসী সার্জন মেজর হেনরি বিলিউকে ব্যাখ্যাতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। গিরিপথের অর্ধ-পথে, আলী মসজিদের দূর্গের নিচে, আফগানদের সঙ্গে দলটির সাক্ষাৎ হয় আর বলা হয় যে যদি তারা আরও এগোয় তাহলে তাদের জীবন হারাতে হবে। এই সকল তিরস্কার আফগানিস্তান আক্রমণে তাদের দেওয়ার জন্য লর্ড লিটনের প্রয়োজন হয়েছিল, একটি সামরিক উদ্যোগ যা গৃহীত হয় সেটির প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনিচ্ছা মিশ্রিত সমর্থন ছিল।

তিন সেনাদল যথা সময়ে তিন পথ দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে, একদল যুদ্ধ করে আসে একই পাবর্ত্য অঞ্চলের তোরা বোরার মধ্য দিয়ে, যেখানে ২০০১ সালে ডিসেম্বর মাসে ওসামা বিন লাদেনের অনুমোদিত

পরিকল্পনা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং তাঁর অনেক 'আরব' আমেরিকার বিশেষ সেনাদলের জালের মধ্য দিয়ে ছিটকে গিয়ে পাকিস্তানে পড়ে। আমিরকে নির্বাসনে পালিয়ে যেতে বল প্রয়োগ করা হয় আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বি ইয়াকুব খান তাঁর স্থলে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বিপর্যয়, পশ্চাদপসরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচলিত ধরণ চলতে থাকল: তাঁর প্রহরি গাইডসসহ ব্রিটিশ অধিবাসীর হত্যাকাণ্ড; মইওয়ান্দায় সামরিক বিপর্যয়, বিজয়ের কুচকাওয়াজ দ্বারা এটি অনুসৃত হতে থাকল ও কান্দাহারে বিজয়, লিটন সাহেবের অগ্র পন্থার অকৃতকার্যতা এবং কাবুলে কম নমনীয় আমিরের অভিষেক। এই সময়ের নায়ক ছিলেন কাবুল যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতি, ফ্রেড 'ববস' রবার্টস, এখন মেজর-জেনারেল, যিনি তা সত্ত্বেও আফগানিস্তান ছেড়ে যান এই ঘোষণা দিয়ে যে, 'আফগানরা যত আমাদেরকে কম দেখবে ততই আমাদের কম অপছন্দ করবে।'

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের প্রকৃত বিজেতা ছিলেন আফগানিস্তানের নতুন আমির আব্দুর রহমান, তাদের লৌহদণ্ড নিয়ে শাসন করার সঙ্কল্প কোন বাক্য দম্ভ ছিল না। বিশ বছরের ব্যবধানে অর্ধ-স্বশাসিত প্রদেশ থেকে তিনি একটি দেশকে জাল করে নেন ও জায়গিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, নির্মম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে গণহারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ও নির্বাসন দণ্ড দিয়ে স্থানীয় বিপ্লবীদেরকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেন। আফগানিস্তানব্যাপী তাঁর কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আব্দুর রহমান এখন পুনরায় নিজেকে আমির ঘোষণা করেন, ঠিক যেমনটি এক শতাব্দী পূর্বে নেজদে আমির আব্দু আল-আজিজ ইবনে সৌদ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আব্দুর রহমান তাঁর নিজের ধর্মীয় কর্তৃত্ব বিষয়ে এত আস্থাবান ছিলেন যে তিনি একজন মুজতাহিদ হিসেবে শরিয়া ব্যাখ্যা করার অধিকার দাবি করে বসেন। তাঁর অঞ্চলে কাফিরদের অবস্থানে দৃষ্টিপাত করে দেখেন যে এটি ইসলামের প্রকাশ্য অপমান, তিনি জিহাদ ঘোষণার জন্য ওয়ারদক প্রদেশের হাজারা ও বমিয়াঁ এবং আসলে ধর্মশূন্য কাফিরিস্তানের কলাশে যান। বিরক্তিকর গলজাই পাঠানদের যারা কাবুল ও কান্দাহার এলাকার যে সব পাশাপাশি জমি দখল করে ফসল কেটে নিয়েছে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করতে, তিনি বিপুল সংখ্যক লোক হাজারা গ্রামে সেখানকার শিয়া সম্প্রদায়কে হ্রাস করার অভিযানের অংশ হিসেবে একই সঙ্গে, আমির আব্দুর রহমান উলেমাদের নির্বুদ্ধিতা সহ্য করেন নি: যখন কান্দাহারের একজন মোল্লা একজন আমির সম্পর্কে নাস্তিকতায় অভিযোগ আনার সাহস দেখায়, তখন তিনি তাকে মসজিদ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দেন যেখানে সে মহানবী (সা.)র বিখ্যাত পোশাক পরিধান করে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল, এবং তাকে তাঁর নিজ হাতে হত্যা করেন।

তাঁর নিজের সীমান্তে সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্ষমতায় আস্থা সত্ত্বেও আমির নিজেকে দেখলেন তিনি বৃটিশদের দ্বারা অবিরতভাবে অপমানিত হচ্ছেন,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

বিশেষত ১৮৯৩ সালের নভেম্বর মাসে ডুর‍্যাণ্ড লাইন সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠান উপজাতিদের জমি থেকে তাদের জমির বিভাজনের ক্ষেত্রে। ঐ একই বছরে আমির বড়লাটের কাছে অভিযোগ করেন যে 'আমার কাছ থেকে সীমান্তবাসী উপজাতিদেরকে যারা আমার জাতীয়তা ও ধর্মের জনগণ, বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আমার প্রজাদের দৃষ্টিতে আমাকে অপমান করছেন, আর আমাকে দুর্বল করবেন, এবং আমার দুর্বলতা আপনার সরকারের জন্য ক্ষতিকর।' ব্রিটিশ বাহিনীর সম্ভাব্য নতুন ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় ভীত হয়ে আব্দুর রহমান উভয় সীমান্তে পাঠানদের মাঝে প্রচারণা চালিয়ে তাদের আনুগত্য পুনরুত্থানের প্রয়াস চালান।

তিনি নিজেকে জিয়া-উল-মিল্লাত ওয়া-উদ-দীন (আলোর ঐক্য ও ধর্ম) বলে ঘোষণা দেন, আর সীমান্তরক্ষী প্রত্যেক মোল্লার নিকটে তকয়িম-উদ-দীন (ধর্মের ন্যায় পরায়ণতা) নাম সম্বলিত একটি দলিল প্রেরণ করে দেন। এটি ধর্মীয় মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থ হিসেবে অর্থ বহন করে, তবে প্রায় সামগ্রিকভাবে একটি ধর্মীয় কর্তব্যবোধের কারণেই জিহাদকে সম্প্রসারিত করার কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

আব্দুর রহমানের অন্তর্নিহিত আকাঙ্খা ছিল মুসলিম বিশ্ব তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে তাঁকে অটোমান সুলতান আব্দুল হামিদের আদলে ধর্মীয় নেতা হিসেবে জানবে। আন্ত-ইসলামিয় পুনর্জাগরণের দোলা মুসলিম বিশ্বের কতিপয় অংশে অনুভূত হওয়া শুরু হয়েছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে পশ্চিমা অপসংস্কৃতির আগ্রাসন মোকাবিলায় টিকে থাকতে হলে ইসলামকে নতুন ধারায় বিন্যস্ত করতে হবে। অটোমান সুলতান হামিদের মত ছাঁচে এই নতুন ভাবনার শীর্ষ নেতাদের মধ্যে যাঁর নাম স্পষ্টভাবে ও বোধগম্যভাবে ছিল তিনি ইসলামি আধুনিকতার জাদুকর সাঈদ জামাল আল-দিন আল-আফগানি, 'আফগান' নামে জনগণের কাছে পরিচিত ছিলেন। আল-আফগানি প্রথমে ভারতীয় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঠিক সিপাহী বিপ্লবের পূর্বে, তরুণ তালিব হিসেবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করেছিলেন কি না তা এক বিতর্কের বিষয়। তবে ভারতে যা দেখেন তাতে প্রমাণ পান যে ব্রিটেন ইসলামের সর্ববৃহৎ শত্রু এবং তাকে প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। ১৮৬৬ সালে আফগানিস্তানে তাকে কান্দাহারের প্রধান সেনাপতির প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। আব্দুর রহমান কর্তৃক বহিস্কৃত হয়ে, আলীগড়ের আধুনিকতাবাদী সৈয়দ আহমদ খান তাঁর দর্শনের সহযোগিতার মাধ্যমে সোচ্চার প্রতিপক্ষ হয়ে তিনি ভারতে পুনার্বিভূত হন। যা হোক 'আফগান' দর্শনও প্রত্যাখ্যান করেন, এই যুক্তি দেখিয়ে যে প্রকৃত ইসলামি পুনর্জাগরণ কেবল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ও আধুনিকতার উপযোগী করা যেতে পারে। যদিও তাঁর জীবনের অন্তিম বছরগুলো তুরস্কের গৃহবন্দি হয়ে

অতিবাহিত করতে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিগত দশকগুলোতে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের অগ্রগতি বিশ্ব মুসলিমদের মধ্য দিয়ে মৌলবাদীদেরকে ১৯২০-এর দশক জুড়ে দুই সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে: মিসরে ইখোয়ান উল-মুসলিমীন, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব; আর ভারতে জামাত-ই-ইসলামি, ইসলামের দল।

বর্ধিষ্ণু এই ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু বিশ্বাসের সঙ্গে একত্রে চলতে লাগল যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সময় দ্রুত ধাবিত হচ্ছিল যখন খ্রিস্টীয় সহস্রাব্দ নিকটে এগিয়ে আসছিল: খ্রিষ্টানদের ঐ শতাব্দীসমূহ সমাপ্ত হয়েছিল এবং ঐ ইসলাম এখন উদীয়মান। উত্তর আফ্রিকায় এই সহস্রাব্দ দেখল সুদানীয় অতীন্দ্রিয়বাদী মুহাম্মদ আহমদের নেতৃত্বে মাহদিয়াহ আন্দোলনের প্রকাশ, যিনি ১৮৮১ সালে নিজেকে মাহ্দি বলে ঘোষণা দেন। তাঁর পূর্বের আল-ওয়াহ্হাব ও সৈয়দ আহমদের মত, মুহাম্মদ আহমদ ঈমানদারদের এক সেনাদল গড়ে কাফির সরকারের উপরে জিহাদ ঘোষণা করে ইসলামের স্বর্ণযুগের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এক্ষেত্রে, মিশরীয় সরকার। ১৮৮৫ সালে খারতুম এলাকায় মাহ্দি অনুসারীদের হাতে জেনারেল গর্ডনের মৃত্যু মাহ্দির কারণে প্রচুর প্রেরণা যোগায়, যখন মাহ্দির নিয়োজিত খলিফা আব্দুল্লাহ্র দরবেশ সেনাদলকে ব্রিটিশদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পরবর্তী ব্যর্থতা খ্রিস্টানদের ক্ষমতা শেষ হতে চলেছে তার লক্ষণ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

যখন আগ্রহী ঈমানদাররা বর্ধিষ্ণুহারে তাদের ধর্ম নিরপেক্ষ নেতাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মোল্লাদের কথা শোনে, যারা প্রচার করে যে নির্ধারিত সময় এসে গেছে তখন ভারতে ঐতিহ্যবাহী বশ্যতা পুনরায় দুর্বল হয়ে পড়ে। আর প্রত্যাশার এই আবেগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গোষ্ঠীর মত কোথাও এত প্রাণবন্ত মনে হয়নি। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্র্যাঙ্ক মার্টিন আব্দুর রহমানের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবস্থান নিতে আফগানিস্তানে আসেন। তাঁর পূর্বের হার্বার্ট এডওয়ার্ডস ও অন্যান্যদের মত, মার্টিন সাধারণ লোকদের ওপর মোল্লাদের প্রভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে যান—তবে যা আরও বেশি উত্তেজনাকর সেটা হলো অমুসলিমদের ওপর তাদের ঘৃণা:

> একজন কাফিরের দর্শন, আর সকলে যারা মুসলমান নয় তারাই কাফির, এত জঘণ্য যে তারা পথে থুতু ফেলে রাখে আর তাদের কাউকে হত্যা করাটা তাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ প্রশংসনীয় ব্যাপার....। তারা যুক্তি দেখায় যে তাদের ধর্মের শত্রু আল্লাহ্র শত্রু আর এটা একটা জঘণ্য জিনিস, ও কোরান তাদেরকে এ ধরনের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়, এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে যদি অনুরূপ কাজ করতে গিয়ে তারা নিজেরা নিহত

> হয়, তারা সরাসরি বেহেশতে যাবে, আর যে লোক একজন কাফিরকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়, অথচ ঐ প্রচেষ্টা করতে গিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করে, সে যে কাফিরকে হত্যায় সফল হয় তার থেকে নিম্নতর বেহেশত লাভ করে।

এই শত্রুতার জন্য তিনি মোল্লাদেরকে দোষারোপ করেন ও তাদের আমির ও ইমাম আব্দুর রহমান তাদেরকে যে নতুন পরওয়ানা দেন। মোল্লাদের ব্যতিক্রমসহ খুব সামান্য কোরান পড়তে পারে, এবং পরবর্তীরা স্পষ্টতই বেশ বিনা খরচায় অনুবাদ প্রদান করে যখন তারা তাদের উদ্দেশ্যে এটিকে উপযুক্ত মনে করে, যার ওপর ভিত্তি করে জিহাদের নীতি নির্ধারণ করা হয়, ধর্মযুদ্ধ, আর যেটিকে আমির মুদ্রিত আবাঁধা পুস্তিকার আদল দিয়ে সম্প্রতি দেশব্যাপী বিতরণ করেন।

১৮৯০ দশকের মাঝামাঝি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রত্যেক পাঠান উপজাতি বেশ সহসাই তাদের নিজেদের অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর ধর্মীয় নেতাকে অর্জন করে, একজন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মানুষ যার ক্ষমতা ছিল তাঁর জনগণকে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করার কাজে নিয়ন্ত্রিত করার। এই অনন্য সাধারণ প্রতিভাধরদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মোহমাদিদের হাড্ডা মোল্লা, মাহ্‌মুদদের মোল্লা পবিন্দাহ্‌, আকাখেল আফ্রিদিদের সৈয়দ আকবর, বাজারের ইন্দরেজ মানকি মোল্লা, পাঠানমোল্লা— এবং সর্বোপরি সোয়াতের সদুল্লাহ্‌ মোল্লা।

১৮৯৭ সালের বসন্তকালে আমিরকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁর বিশ্বব্যাপী ইসলামি পুনর্জাগরণে যোগদান করতে একটি সেনাদল নিয়ে সুলতান আব্দুল হামিদ কাবুলে পৌছান। এটি আমির আব্দুর রহমানকে পাঠানদের নেতৃস্থানীয় উলেমাদেরকে কাবুলে ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাতে উদ্বুদ্ধ করে। আমির যাই-ই অভিপ্রায় করে থাকুন, এই প্রতিনিধিরা কাবুল ছেড়ে গেল এই বিশ্বাসে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্নে আর ইসলামের পক্ষে শক্তিশালী আঘাত হানার সেই সময় এসে গেছে। তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন যে সুলতান এই মাত্র গ্রীসে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন, যে তুর্কীরা সুয়েজ খাল ও অ্যাডেন দখল করেছেন, এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জার্মানি ও রাশিয়া তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এই সময়ে সীমান্ত উপজাতিদের মনের অবস্থা উইন্সটন চার্চিল কর্তৃক এ রকমভাবে বর্ণিত হয়েছে 'বিশাল তবে নীরব উদ্বেগ...। উপজাতিদের মধ্যে দূতেরা এদিক-ওদিক চলাচল করল। একটি যুদ্ধ বিশেষ করে ধর্ম যুদ্ধের কানাঘুষা একটা উন্মত্ত ও জঙ্গীবাদী গোষ্ঠীর মাঝে সংক্রমিত করা হয়েছিল। উপজাতিদেরকে শেখানো হয়েছিল বিস্ময়কর ঘটনার প্রত্যাশা করতে। তাদের জাতি ও ধর্মের একটি মহান দিবস ছিল তাদের হাতে।'

পেশোয়ার ও লাহোরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষবৃন্দ এই সহসা বিক্ষোভকে কাবুলি—অনুপ্রাণিত হিসেবে দেখলেন, আর এটা কাটাতে হবে বলে মেনে নিলেন। সত্তর বছর পূর্বে সীমান্তে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জিহাদের ছত্রচ্ছায়ার শক্তিকে তারা সামগ্রিকভাবে কম গুরুত্ব দেন। এটা লক্ষণীয় আমবেলার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাক্ষ্য এই যে ওয়াহ্‌হাবিদের বিচার কার্যে সকল তথ্য প্রকাশ্যে আনা সত্ত্বেও, হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধরা সীমান্তে অবস্থান করে কষ্টভোগ করেছিল। আর এটি আরও উল্লেখযোগ্য যে যখন কেউ ভাবে যে নেতা ও আমির ছিলেন মৌলভি আব্দুল্লাহ্ আলী, পরবর্তীতে তিনি তাদেরকে আমবেলা অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

আমবেলা বিপর্যয়ের পর হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্তরা উৎখাত হয়ে আশ্রয় থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়ায় যখন সোয়াতের আখুন্দ তার দুর্ধর্ষ শত্রুর চাপে হিন্দুদের আশ্রয়দানকারীদের স্থান ত্যাগে বাধ্য করে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৬৮ সালে এই বিষয়ে ঐ ছায়াবৃত পুলিশ কর্মকর্তা জে. এইচ. রেইলি কর্তৃক তাদের ১৮৬৮ সালে এই বিষয়ে ঐ ছায়াবৃত পুলিশ কর্মকর্তা জে.এইচ. রেইলি কর্তৃক তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ঐ একই শীতকালীন আলফ্রেড ওয়াইল্ড, এখন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল, কৃষ্ণ পর্বতে হাজারার যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেখানে হিন্দুস্তানিরা আশ্রয় দেখেছিল, কিন্তু এক পর্বত থেকে আর এক পর্বতে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গুপ্ত আশ্রয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি।

১৮৭৩ সালে পাটনায় আব্দুল্লাহ্ আলীর কনিষ্ঠতম ভ্রাতা মুহাম্মদ হাসান ভারত সরকারের একটি সরকারি ক্ষমতার জন্য আবেদন করেন যাতে হিন্দুস্তানিরা তাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়, এই কারণে যে ধর্মান্ধদের সমর্থন হ্রাস পেয়েছে অবশেষে তাদেরকে বল প্রয়োগে পরিত্যাগ করা হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষবৃন্দ পূর্বের ন্যায় একই রকম ভুল করলেন। হিন্দুস্তানিরা দৃঢ়ভাবে অনুরক্ত থেকে পাহাড়ি উপজাতিদের কাছে থেকে অনিয়মিত ও ঈর্ষা করে লিখিত বিবৃতি নিয়ে প্রচার কার্য জিইয়ে রাখে, আর ১৮৮১, ১৮৮৮ ও ১৮৯১ সালের কৃষ্ণ পর্বতে পুনরায় তিনটি উপজাতি বিপ্লবে যথেষ্ট শক্তিশালী সমর্থন পুষ্ট ভূমিকা রাখে।

এই অভ্যুত্থানের সর্বশেষ ঘটনাটি দমনের পর সৈয়দ ফিরোজ শাহের নিকট সিন্ধু নদ পারাপারের অনুমতির জন্য আবেদন জানান প্রথম পৃষ্ঠপোষক সৈয়দ আকবর শাহের পৌত্র আব্দুল্লাহ্ আলী। এখন তিনি সিত্তানারও নেতা, তাঁর ভ্রাতা ও তিন পুত্রকে নিয়ে। অনেক যুক্তি তর্কের পর আমাজাইয়ের মুরুব্বীরা অবশিষ্ট হিন্দুস্তানিদের মহাবন পর্বতের ঢালে তিলওয়াই গ্রামে তাঁদের পুরোনো ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করতে অনুমতি দেন, যেটি আদি ঘাঁটি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের খুব বেশি নয়। সৈয়দ ফিরোজ শাহ্ ও সোয়াতের প্রাক্তন

আখুন্দ আব্দুল গোফুরের উত্তরসূরিদের মধ্যে চলমান সংগ্রামের নাগালের মধ্যে এখন তারা নিজেদেরকে দেখল।

এবং তথাপি এই সময়ে যখন উত্তর-পশ্চিমে সীমান্ত সম্পর্কে একজন সাংবাদিক লাহোর থেকে লিখতে আসেন, তখন তিনি লিপিবদ্ধ করেন যে হিন্দুস্তানিরা এখনও উপজাতিদের মধ্যে তাঁদের 'ভয়ঙ্কর ধর্মান্ধতা'র জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। তাদের উপনিবেশ স্থানীয়ভাবে কিলা মুজাহিদীন (ধর্মযোদ্ধাদের দূর্গ) নামে বিখ্যাত ছিল, যেখানে 'আরবিতে আদেশ দেওয়া, চামড়ার গুলি চালানো, ব্রিটিশদের নাস্তিক ক্ষমতাকে ঝড়ো আক্রমণে ধ্বংস করার অনুশীলনে তাদের সময় নিবেদিত ছিল।' এটা কথিত ছিল যে তারা তখনও তাদের গুপ্ত ইমাম সৈয়দ আহমদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রত ছিল।

এটি অসম্ভাব্য আব্দুল্লাহ আলী বা তাঁর মুজাহিদীনদের যে কেউ কাবুলে ১৮৯৭ সালে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত আব্দুর রহমানের ধর্মীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয় নি। একজন ষাট বছর বয়স্ক বুনারী মোল্লা সাদুল্লাহ্ যিনি মাস্তান মোল্লা নামেও পরিচিত (মোহাবিষ্ট মোল্লা) বা সারতর ফকির (উন্মুক্ত শির দরবেশ), তবে তিনি ব্রিটিশদের কাছে পাগল ফকির বা পাগল মোল্লা হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত হন, তাঁকে উপস্থিত সদস্যরা তাদের অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন মনে করেন নি। বুনারে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার বহু বছর পরে ১৮৯৭ সালের মধ্যে গ্রীষ্মে মোল্লা সাদুল্লাহ্ বেশ সহসাই তাঁর নিজ স্বদেশে পুনার্বিভূত হন। তিনি ঘোষণা দেন যে তিনি বহু সংখ্যক দরবেশের সঙ্গে দেখা করেছেন যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সোয়াতের প্রাক্তন আখুন্দ ও সৈয়দ আহমদ, এবং তাঁদের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছেন ব্রিটিশদেরকে সোয়াত ও পেশোয়ার উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করার। আল্লাহ্ ব্রিটিশদের পেশোয়ারের শাসনকর্তা হিসেবে ষাট বর্ষ মেয়াদী সময় বরাদ্দ করেছেন, আর সেই মেয়াদ এখন শেষ হয়েছে। যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কোন ভয় ছিল না, এই জন্য যে দরবেশরাও তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ বুলেট পানিতে পরিণত হবে আর তাদের বন্দুকের নল গলে যাবে। উপরন্তু, তিনি ঐশ্বরিক সহায়তায় অলৌকিক শক্তি অর্জন করেছিলেন যা দৃষ্টির আড়ালে প্রায় নয়-হাজার-ফুট উচ্চ পবিত্র ইলম ঘরে বিপুল সংখ্যক লোক গুপ্তভাবে সমবেত হয়েছিল যেখান থেকে সোয়াত উপত্যকা দৃষ্টি গোচর হত। খাদ্যদ্রব্য বিষয়ে, তাঁর সঙ্গে থাকা এক পাত্র ভাত বহু সংখ্যককে খাওয়ানোতে ছিল যথেষ্ট।

ঐ পাগল ফকিরের বাণী সোয়াত উপত্যকায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। চার্চিল সাহেব লিখেছেন 'যখন জুলাই মাস এসে গেল, তখন মালাকন্দের বাজার পাগল ফকিরের গল্পে ভরে গেল। ইসলামের একটি মহান

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

দিবস হাতে ছিল। তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে একটি শক্তিশালী লোক আবির্ভুত হলো। মোল্লা সাদুল্লার সাথে রাজধানী দিল্লিতে উপস্থিত হয়েছিল তের বছর বয়সী শাহ্ সিকান্দার (আলেকজাণ্ডার) নামে এক নবীন সহচর, যাকে ধরা হত যে দিল্লিতে যদি কখনো ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই হবে তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী ও শাসক। একদা এটি দার উল-ইসলামে সঞ্চিত ছিল। এই নবীন দাবিদারের পরিচিতি রহস্যই থেকে যায়, তবে স্মরণে রাখতে হবে যে ১৮৬৮ সালে শেষ সম্রাটের ভ্রাতুষপুত্র পলায়নপর মুঘল শাহজাদা ফিরোজ শাহ্ একে একে কাবুল, বোখারা, এবং কন্সটান্টিনোপল ঘোরার পূর্বে মহাবন পর্বতে হিন্দুস্তানিদের সঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে যোগদান করনে। এই মুঘল বনি প্রিন্স চার্লি মক্কায় ১৮৯৭ সালে একাকী নির্বাসনে মৃত্যুবরণ করেন, আর তাঁর বিধবা অবিলম্বে আবেদন করলে ভারত সরকার তাঁকে পেনশন বরাদ্দ করেন। প্রকাশ্যে যুবরাজ ফিরোজ শাহ্ কোন উত্তরাধিকারী ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করেন, তবে বোঝা যায় যে, ১৮৬৮ সালে একজন মুঘল যুবরাজের হিন্দুস্তানি শিবিরে অতি সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে হিন্দু রাজকুমারের সাথে সম্পর্কের ফলশ্রুতি হিসেবে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক শাহ্ সিকান্দারের পিতা বা মাতার জন্ম।

১৮৯৭ সালের মধ্য-জুলাইয়ে সাদুল্লাহ্ সোয়াতে তাঁর পতাকা উত্তোলন করে সোয়াতের সাবেক আখুন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর আশপাশের উপজাতিদের অস্ত্র ধারণ করতে আহ্বান জানান, যিনি প্রয়াস চালান আর তাঁকে বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হন। সাদুল্লাহ্র ধর্মীয় পূর্বের ঘটনা সম্বন্ধে সামান্যই জানা যায় তবে তিনি সৈয়দ গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে সৈয়দ ফিরোজ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিলেন, তিনি সোয়াতি গোষ্ঠীর শাসন ভার দখলের প্রয়াসে ফিরোজ শাহ্ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিলেন। সাদুল্লাহ্র ডাকনাম 'উন্মুক্ত-শিরওয়ালা' দেওয়াটা তাকে ওয়াহ্হাবি মতধারা থেকে বিচ্যুত করে, যেহেতু পরবর্তীর ধর্মীয় বিধান মস্তককে সর্বদা আবরণ যুক্ত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পাগল ফকিরের সম্পর্ক দিল্লির সিংহাসনের দাবিদার সঙ্গে থাকায় তাঁর হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ইঙ্গিত দেয়। সিত্তানায় প্রশ্নাতীতভাবে তাঁর ওপর বিরোধী দলের সমর্থন ছিল, এমন কি যদিও তাদের নেতা আব্দুল্লাহ্ আলী প্রাথমিকভাবে সাদুল্লাহ্ ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। অনেক হিন্দুস্তানি ঘাঁটি থেকে অনেক তরুণ মুজাহিদীন যাদেরকে তাদের বৈশিষ্ট্যমূলক কালো ফতোয়া ও কালো-নীল আলখাল্লা ফকির শ্রেণীর মধ্যে তাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করত, তাদের উপস্থিতি মোল্লা আসাদুল্লাহ্র এই অনুপ্রেরণার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে তিনি কি ভারতের সর্বপ্রথম ধর্মান্ধ জিহাদি সৈয়দ আহমদের নিকট থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নাকি অন্য কিছু।

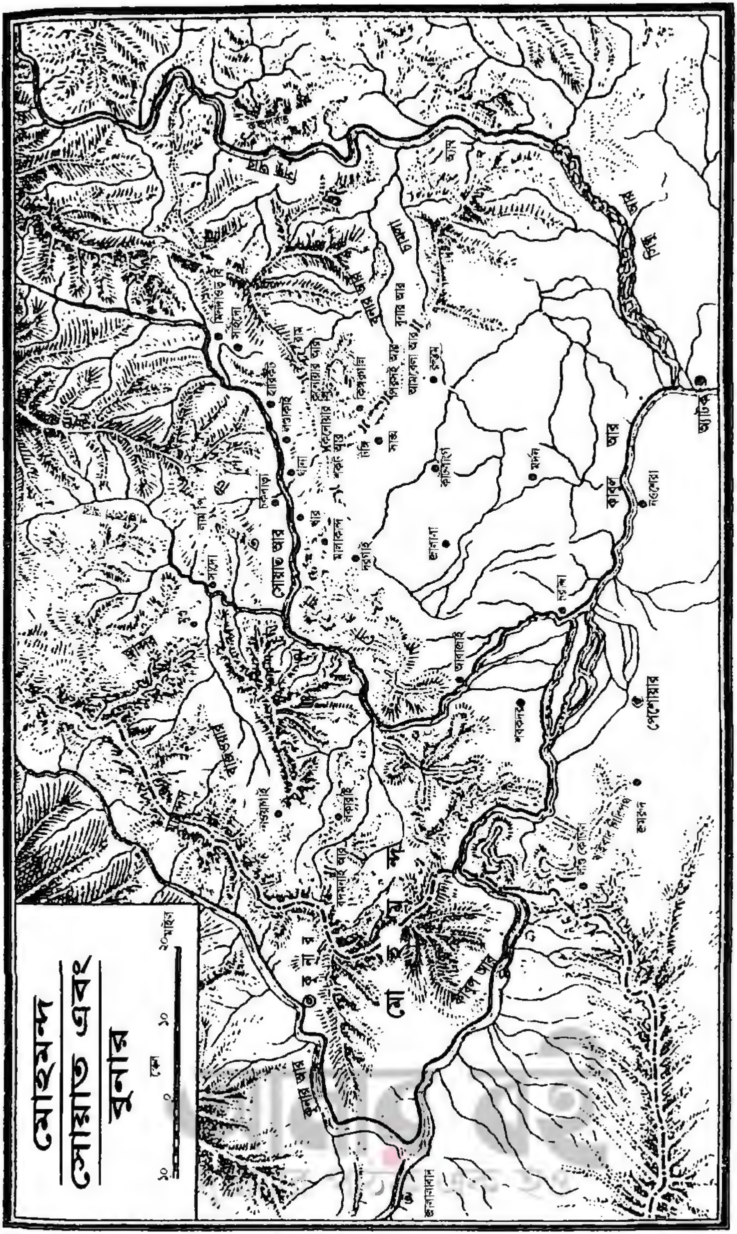

মোহমন্দ
সোয়াত এবং
বুনার
স্কেল
১০ ০ ১০ ২০মাইল
সোয়াত আর
কাবুল আর
পেশোয়ার
আটক

'মোহমন্দ, সোয়াত এবং বুনার'ঃ ১৮৯৮ সাল থেকে মানচিত্র

তাদের নবায়ন মধ্যস্থতার পন্থার অংশ হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষবৃন্দ ১৮৯৫ সালে সোয়াতের দুটি সামরিক দূর্গ গড়ার অনুমতি দিয়ে সোয়াতিদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়, লোক দেখানোর জন্য পেশোয়ারের সঙ্গে দিরের সংযুক্ত রাস্তাদির থেকে উত্তরে প্রহরা দেয়। একটি দূরবর্তী ঘাঁটি অবস্থিত চকদাড়ার সোয়াত নদীর সংযোগ স্থলে, আর দ্বিতীয়টি মালাকন্দ থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে পর্বত শ্রেণীর শীর্ষে যেখান থেকে পেশোয়ারের উপত্যকা দেখা যায়। এই দুই দূর্গের উপস্থিতি যারা ভারতীয় হলেও বৃটিশ কর্মকর্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সোয়াতিরা কখনোই ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। তারা এটিকে তাদের চির গর্বের সাথে লালিত স্বাধীনতার লঙ্ঘন হিসেবে দেখেছিলেন এবং সোয়াতকে দার উল-ইসলামের ঘাঁটি হিসেবে অপবিত্রতার শামিল মনে করেছিল। ফল স্বরূপ, যখন পাগলা ফকির তাঁর সমন প্রচার করেন তখন সহস্র সহস্র সোয়াতি তাদের খানদের উপদেশকে অবজ্ঞা করে দলবদ্ধ হয়ে তাঁর পতাকাতলে যোগদান করে। ১৮৯৭ সালের ২১ জুলাই মোল্লা সাদুল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে দশদিন সময়ের মধ্যে নতুন চাঁদ উঠলেই মালাকান্দ থেকে ব্রিটিশদেরকে বিতাড়িত করা হবে। পাঁচ দিন পরে দুই লশকর (উপজাতীয় সেনাদল) চকদাড়া ও মালাকান্দ দূর্গের দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে গেল।

মালাকান্দায় এক অপরাহ্নে যখন সহিস কর্মকর্তাদের ঘোড়ার সেবায়রত ছিল পাঠানদের তখন পোলো খেলার শেষ চাকা খেলা হচ্ছিল। পাঠানদেরকে লক্ষ্য করা হচ্ছিল যাতে গৃহে পলায়নের চেষ্টা করতে দেখে তাদেরকে (কর্মকর্তাদের) সজাগ করে দেয়া যায় যেহেতু একটা যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তারপর শীঘ্রই লেফটেন্যান্ট হ্যারি র‍্যাটরে অশ্বারোহণে চকদাড়া প্রত্যাবর্তন করে, যেখানে তাঁর পিতার নেতৃত্বে সেনারা দূর্গে কর্তব্যরত ছিল, যখন অন্য পথে দ্রুত অগ্রসরমান অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা তাঁকে বলে যে একটি উপজাতীয় সেনাদল পতাকা উড়িয়ে ও ঢোলক বাজিয়ে সোয়াত নদীর বাম তীরের মালাকন্দের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। র‍্যাটরে সাহেব তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুত চকদাড়ার ঘাঁটিতে পৌছালেন। সেখান থেকে মালাকন্দের রাজনৈতিক প্রতিনিধি মেজর হ্যারল্ড ডিনকে তারবার্তা পাঠিয়ে রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন।

ডিন সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সেনাপতিকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন আর হটিমর্দনে সাহায্যার্থে অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য অবিলম্বে তারবার্তা পাঠান। এই দ্রুত কর্মতৎপরতা দুইটি দূর্গকেই পূর্ণধ্বংস থেকে রক্ষা করে। বার্তাটি গাইডসের সদর দফতরে রাত সাড়ে আটটায় গৃহীত হয় ও পাঁচ ঘন্টা পরে ভুক্ত, বিশ্রাম নেওয়া এবং সশস্ত্র একটি সৈন্যদল ত্রিশ মাইলব্যাপী অঞ্চলকে প্রতিরোধ করতে মালাকন্দে রওনা হয়।

২৬ জুলাইয়ে যখন অন্ধকার নেমে এল তখন মালাকন্দ ও চকদাড়া ঘাঁটি গুলি গোলার শিকার হলো। রাতব্যাপী একটার পর একটা প্রচণ্ড আক্রমণ হতে থাকে যখন উপজাতীয়রা যারা ঢেউ এর মত তাদের বলপূর্বক প্রবেশের প্রচেষ্টা চালায় তখন ঠিক প্রত্যুষের পূর্বে গাইডসের অশ্বারোহী একদল সৈন্য সমতলের মালাকন্দ দূর্গ থেকে দুলকি চালে হাজির হয়, পরে সত্ত্বর একাদশতম বঙ্গীয় বল্লমধারী অশ্বারোহী সৈন্যদল আসে। তারা প্রতিরোধকারীদের কাছ থেকে চাপ গ্রহণ করে ও একটি পাল্টা আক্রমণ করে রাত্রে হারানো কিছু অবস্থান উদ্ধার করে নেয়। ঐ একই অপরাহ্নে ৫টার সময় গাইডসের পদাতিক বাহিনীর মূল উদ্ধারকারী সৈন্যদল, দুইদল শিখ ও দগরা পদাতিক সৈন্যদল দিনের উত্তাপের মধ্য দিয়ে কুচকাওয়াজ করে সর্দিগর্মি এবং সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে একুশজন সৈন্যের মৃত্যুর বিনিময়ে মালাকন্দে পৌঁছায়, এটি জারি হওয়া সত্ত্বেও ঐ সাহায্যার্থে প্রতিরোধকারী সৈন্যরা তিনদিন তিন রাত ধরে বিরোধিতা করে আসছিল যার ফলশ্রুতিতে চরম এক দাঙ্গাবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে দশ সহস্রাধিক বিদ্রোহী উপজাতিরা অংশগ্রহণ করে। গাইডসের পদাতিক বাহিনীর লেফটেন্যান্ট পি.সি। এলিওট লকহার্ট লিখেছেন, 'গাজিদের দল ধর্মীয় উদ্দীপনায় প্রবল ধর্মান্ধতার উত্তেজনার মধ্যে কাজ করে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য বুক সমান উঁচু মাটির বাঁধ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে প্রতিবার হটানোর পর বিশজন তাদের মৃত যোদ্ধাদের ত্যাগ করে যায়, যখন পতাকাধারীরা তাদের প্রয়াসকে চিৎকার করে, জোরে-সোরে ঢাক-ঢোল আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে।'

এই হামলায় পাগলা ফকির মোল্লা সাদুল্লাহ্ সামান্য আহত হয় ও তাঁর দ্বিতীয় সারির সেনাপতিসহ বেশ কিছু সংখ্যক সমর্থক নিহত হয় এবং অন্য একজন নেতা বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'ঘনিষ্ঠ সঙ্গী' হিসেবে। আজকাল মালাকন্দ পথের পাশে একটি সুরক্ষিত সমাধি স্তম্ভ দেখা যায়। স্থানীয় মৌখিক ভাষ্যের ঐতিহ্য অনুসারে, এটি সম্মানিত শহীদ রাজা হজরত সিকান্দার শাহ্র সমধিক আচ্ছাদিত করে, তাঁকে বলা হয় তিনি লালসাদা পতাকা উড়িয়েছেন। এটি তরুণ সিকান্দার শাহ্র সমাধি হতে পারে, মনে করেছেন মুঘল যুবরাজ ফিরোজ শাহ্, যাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায় নি।

অগ্রগতির অন্তরায়ের পর আক্রমণের মূল গুরুত্ব পড়ে মালাকন্দ থেকে চকদাড়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সহজে আক্রমণ করা যায় এমন দূর্গের সেতুকে প্রহরা দেওয়া, একাজে নিয়োজিত ছিল র‍্যাটরে সাহেবের দুশ শিখ সৈনা, সিপাহী বিপ্লবের সময় র‍্যাটরে সাহেবের হয়ে কাজ করেছিল তাদের অনেকেই তাদের পুত্র ও পৌত্র। প্রায় দুশ ঝাণ্ডা বাহকদের দ্বারা সমর্থিত সাত সহস্র সেনা দ্বারা তারা ছয় দিন যাবত অবরুদ্ধ হয়েছিল, একজন পদাতিক বাহিনীর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

কর্মকর্তা যিনি তাদেরকে দেখেছিলেন তাঁর মতে, 'একটি খুবই সুন্দর দৃশ্য।' তাদের সাধারণ প্রচণ্ড দ্রুত গতি ও তাদের সুপরিচিত প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত চিৎকার ধ্বনি সংযোগ অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। নেতৃস্থানীয় দলের ঝাণ্ডাবাহকরা প্রথম শেষ পর্যন্ত দেয়ালগুলোর নিচে থেকে তাদের পদ্ধতিতে কাজ করেছিল, যেখানে আমাদের শিখ বাহিনীর দৃঢ় গুলি ক্ষেপণ তাদের সকল হামলাকে প্রতিহত করেছিল।

যদিও তারবার্তার সংযোগ কেটে ফেলা হয়েছিল, মালাকন্দ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল সংকেতদাতা সিপাই প্রেম সিংহ, গোলাগুলির ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে প্রদর্শন করা যায় এমন একটি উচ্চস্থানে গিয়ে তাঁর সূর্যলোক প্রতিফলিত করে সাংকেতিক যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত তারবার্তা প্রদর্শন করত। ২ অগাস্টে দূর্গে তিন দিন যাবত পানি ছিল না, সে তার শেষ সংকেত পাঠাল, সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ 'আমাদেরকে সাহায্য করুন।' পরবর্তী দিনে অ্যাংলো আইরিশ বিচক্ষণ সেনাপতি বিণ্ডন ব্লাডের নেতৃত্বে তিন ব্রিগেডের একটি চৌকস সেনাদল মালাকন্দ থেকে চকদাড়ায় অগ্রসর হতে থাকল, আর সমস্ত প্রতিরোধ ধসে পড়ে।

পাগলা ফকিরের স্বর্গীয় অতিথি সেবক তাদের সাহায্যে আসবে—এই বিষয়টির প্রত্যাখ্যানে সোয়াতিরা তাঁর বিপক্ষে অবস্থান নিলে তিনি যেমনভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন তেমনই রহস্যজনকভাবে পলায়ন করেন। উপজাতিদের প্রধানগণ নিয়মমাফিক তাদের শ্বেত পতাকাতলে এসে মেজর ডীনের নিকটে তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। এক সময় বর্তমান এলাকা মালাকন্দ যুদ্ধক্ষেত্র বাহিনীকে নিরাপত্তা দিয়েছিল যখন তারা পাগলা ফকির ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের অনুসন্ধানে যাচ্ছিল, ব্লাড সাহেবের নেতৃত্বে প্রধান সেনাদল পূর্বদিকে বুনার গ্রামকে আঘাত করার জন্য এগোচ্ছিল। এই গ্রামকে পাগলা ফকিরের সিত্তানার সৈয়দ এবং হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের শেষ আস্তানা বলে বিশ্বাস করা হত। অধিকন্তু জেনারেল ব্লাডের সেনাদল যখন পাহাড়শীর্ষে পৌঁছাল যেখান থেকে চামলা উপত্যকা দেখা গেল আর চৌত্রিশ বছর পূর্বে আমবেলা অভিযানের সময় এই স্থানে এর সেনাপতি একটি বিরতি নিয়েছিলেন, কয়েক দিনের নিষ্ক্রিয়তার পরে তাঁরা ঘুরে দাঁড়ান।

লেফটেন্যান্ট উইন্সটন চার্চিল তাঁর সেনাদল থেকে ছুটিতে ছিলেন তবে ব্লাড সাহেবের যুদ্ধক্ষেত্র বাহিনীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে থেকে দ্য পায়োনিয়ার ও দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তিনি তাঁর (ব্লাড) এই সিদ্ধান্তে তাঁর অন্যান্য ও সহকর্মী কর্মকর্তার মত ক্রুদ্ধ হন। চার্চিল উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বলেন, 'সরকার ঝুঁকি থেকে দূরে অপসৃত রয়েছে।' মালাকন্দ যুদ্ধক্ষেত্র বাহিনী এরূপে প্রায় এক পক্ষ কাল নিষ্ক্রিয় থাকল। সরকার

(গভর্ণমেন্ট) বুনারকে হামলা করতে ভয় পেয়েছে, এই সংবাদ সীমান্ত বরাবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে উপজাতিরা তাদের শক্তিতে পুনরায় তেজীয়মান হয়ে ওঠে। তারা কল্পনা করে নেয় তারা একটি দুর্বলতা আবিস্কার করেছে। তারা একেবারে ভ্রান্তিতেই ছিল না...। গিরিপথ বেয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সুযোগ না ও আসতে পারে। নবীন বয়সের উইন্সটন আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁর ওপর অর্পিত কাজটি সম্পন্ন করার দ্বিতীয় সুযোগ না-ও আসতে পারে এবং একারণে ধর্মান্ধদের শিবির বেঁচে যেতে পারে।

কিন্তু চার্চিল সাহেব ভুল ধারণা করলেন যে কর্তৃপক্ষবৃন্দ তাঁদের সাহস হারিয়েছে। পাগলা ফকির বুনার গ্রামে পলায়ন করেছিল বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল, তবে পশ্চিম দিকে গিয়ে সোয়াত নদী পার হয়ে মহমন্দদের এলাকায় প্রবেশ করেছিল। জারোবি গ্রামে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল একজন বয়স্ক মোল্লার সাথে। তিনি মহমন্দদের নিকটে এত পবিত্র ছিলেন যে কেউ তাঁর আসল নাম নাজব-উদ-দিন উচ্চারণ করতে সাহস করত না, তবে তাকে কেবল হাড্ডার মোল্লা হিসেবে সবাই জানত। হাড্ডা মোল্লা দীর্ঘদিন যাবত আফগানিস্তানের আমিরের মাংসে কাঁটা হিসেবে ছিলেন আর এক দশক পূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে মহমন্দদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন। যাহোক, আব্দুর রহমান সেই সময় হতে হাড্ডা মোল্লার প্রভাবের বলয়কে স্বীকার করে নিয়ে বিরাট আগ্রহের সাথে তাঁর সঙ্গে সহাবস্থানের জন্য মিনতি করতে যান, তাঁকে ইসলামের আলো বলে স্বীকারও করে নেন।

৭ অগাস্টে মহমন্দরা হাড্ডা মোল্লার নেতৃত্বে বিপ্লবে জেগে উঠে পেশোয়ার উপত্যকার প্রান্তবর্তী হিন্দু গ্রাম শঙ্কর গড়ে নেমে অতঃপর তার যখন যাচ্ছিল তখন বকদর বাজারের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাদেরকে হত্যা ও লুণ্ঠন করে। জ্বলন্ত গ্রামের ধোঁয়া পেশোয়ার থেকে দেখা যাচ্ছিল, এবং প্রতিশোধ ছিল দ্রুত। চার্চিল সাহেব বিদ্রোহী মুসলিমদের দমন করতে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, যে কাজটি শত্রুরা ভীষণভাবে হতাশাব্যাঞ্জক করে তুলেছিল। শত্রুরা সর্বদা আগুয়ান হানাদার বাহিনীর মুখে প্রায়শঃই হারিয়ে যেত। পরবর্তীতে হানাদার বাহিনী যখন প্রত্যাবর্তন করত ঐ সময়ে পাহাড়ের উঁচু স্থানে উঠে অভিযানকারীর দুর্বল স্থানে আঘাত হানত। এই রকম এক প্রত্যাহারে চার্চিল তাঁর জীবন প্রায় হারাতে বসেন, এবং অতঃপর অসুবিধায় পড়েন। এক আধুনিক সেনাবাহিনী যাঁর অত্যাধুনিক সেনাসদস্যদের নিয়ে মুক্ত হওয়ার পথ সন্ধান করছিলেন তবে দৃঢ় সংকল্প শত্রু প্রতিকূল স্থানে অবস্থানরত। তিনি লিখেছেন 'ভারতে বহু বর্ষ ধরে যুদ্ধে যত সৈন্য হতাহত হয়েছে এই যুদ্ধে আনুপাতিক হারে প্রকৃতপক্ষে তার থেকে অধিকতর সৈন্য হতাহত হয়েছে।

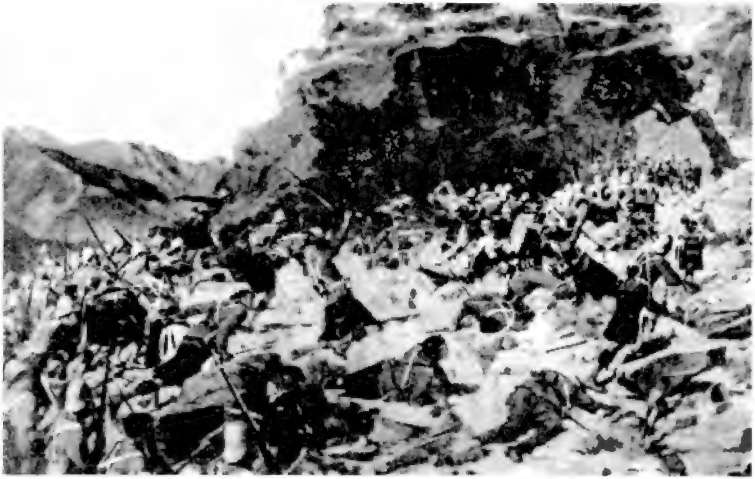

১৮৯৭ সালে ২০ অক্টোবর তিরাহ্ অভিযানের সময় গর্ডন পার্বত্যবাসীদের দরগাইহাইটস পুনরুদ্ধারের প্রসিদ্ধ আক্রমণ। (মেরি ইভান্স পিকচার লাইব্রেরি)

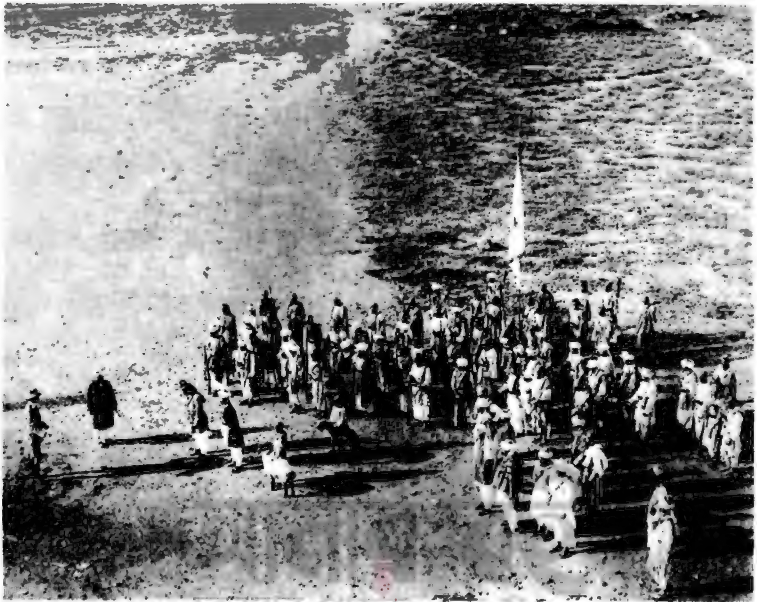

খান সেনাপতির নেতৃত্বে পাঠান উপজাতীয় লশকর বাহিনী স্বল্প মেয়াদী তৃতীয় আফগান যুদ্ধাবসানের পর জনৈক ব্রিটিশ রাজনৈতিক কর্মকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

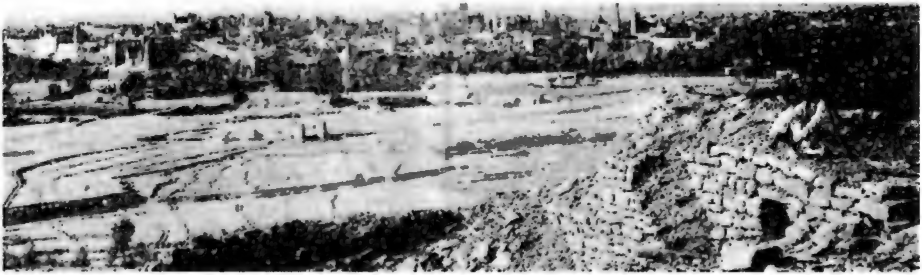

দরিয়াহ্‌র ধ্বংসাবশেষ, আল-সৌদ বংশের প্রথম রাজধানী, ১৯১৭-১৮ সালে হ্যারি জন ফিলবি কর্তৃক তোলা ফটো। (রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি)

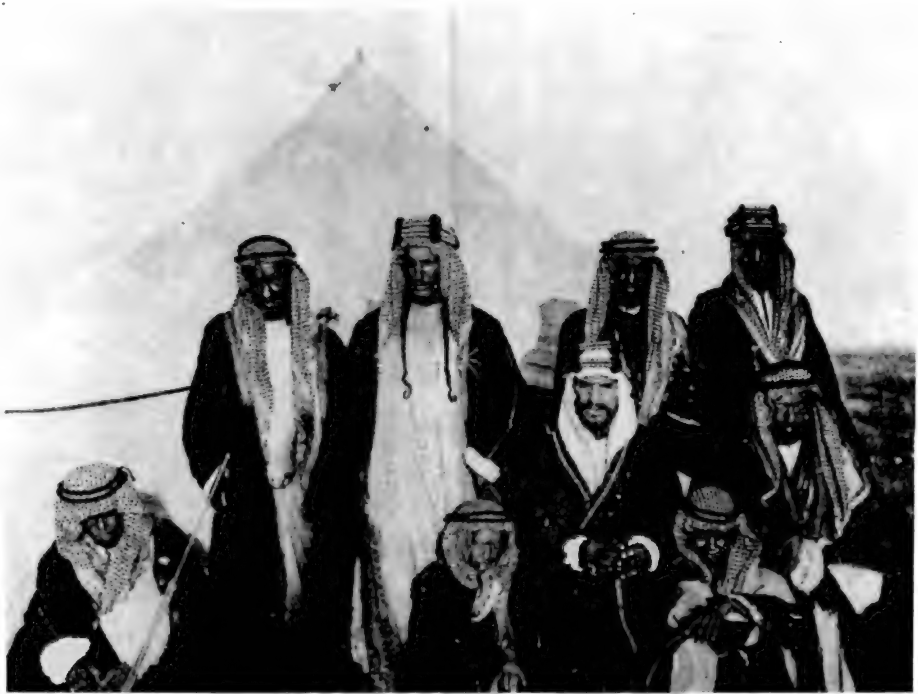

নেজদের আমির এবং ইখোয়ানের ইমাম, আব্দুল আজিজ ইবনে সৌদ, তাঁর ভ্রাতৃবর্গ ও পুত্রদের সঙ্গে, ক্যাপটেন শেক্‌সপীয়ার যখন থাজের নিকটবর্তী শিবিরে ১৯১১ সালে যোগ দেন তখন ছবিটি তোলেন। (রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি)

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাবেক ব্রিটিশ রাজনৈতিক কর্মকর্তা হ্যারি জন ফিলবি মক্কায় তাঁর ওয়াহ্হাবি ইসলামে ছদ্মবেশি ধর্মান্তরণের পর। (রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি)

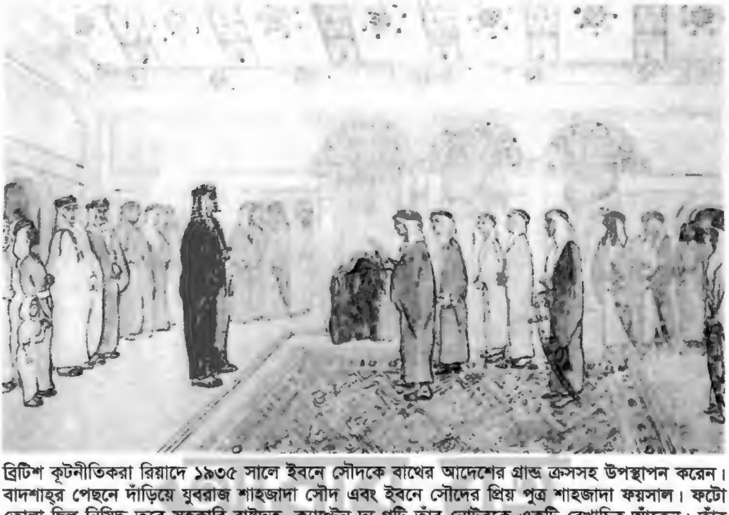

ব্রিটিশ কূটনীতিকরা রিয়াদে ১৯৩৫ সালে ইবনে সৌদকে বাথের আদেশের গ্রান্ড ক্রসসহ উপস্থাপন করেন। বাদশাহ্র পেছনে দাঁড়িয়ে যুবরাজ শাহজাদা সৌদ এবং ইবনে সৌদের প্রিয় পুত্র শাহজাদা ফয়সাল। ফটো তোলা ছিল নিষিদ্ধ তবে সহকারি রাষ্ট্রদূত, ক্যাপ্টেন দ্য গটি তাঁর নোটবুকে একটি রেখাচিত্র আঁকেন। তাঁর সঙ্গে থাকা নোট বোঝায় যে বিদেশীদের আরবের পোশাক পরিধান ছিল বাধ্যতামূলক। রয়্যাল সোসাইটি অভ এশিয়ান এ্যায়েয়ারস (এশিয় কার্যাবলীর রাজকীয় সমাজ)

এক চক্ষু বিশিষ্ট তালিবান নেতা মোল্লা মুহাম্মদ ওমর ইসলামের নবী (সাঃ)র বেশভূষা পরিধান করে ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা আমিরুল মোমিনীন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বে কান্দাহারের কোন একটি বাসভবনের ছাদে আবির্ভূত হন। প্রখ্যাত টেলিভিশন ক্যামেরান পিটার লরিমার কর্তৃক তোলা একটি বিরল ফটো। (পিটার লরিমার/ফ্রন্টলাইন/গেটি)

১৯৯৬ সালে কাবুলের সন্নিকটে সশস্ত্র তালিবানরা। (হ্যারিয়েট/এপি এমপিক্স)

ভারতে অধুনা দার উল-উলুম দেওবন্দের মাদ্রাসা। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে বেঁচে যাওয়া দু'জন ওয়াহ্হাবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, এটি এখন মৌলবাদী শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যার শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী ত্রিশ হাজার মাদ্রাসায় বিস্তারিত।

দার উল-উলুম মাদ্রাসায় একটি শ্রেণী কক্ষে তালিবান বিদ্যার্থীরা। দেওবন্দি শিক্ষার অন্তস্থলে রয়েছে হাদিস ও তৌহিদ, আল্লাহ্‌র একত্ব। (ডেভিড বাথ গেট/কারবিস)

আল কায়েদার আমির ও তাঁর ওয়াজির : ওসামা বিন লাদেন, 'আল-শেখ হিসেবেও পরিচিত', যে মানুষটি তাঁর দ্বিতীয় অধিনায়কত্বে ছিল কিন্তু যাকে আরও সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত তাঁর আদর্শের সৈনিক হিসেবে ধরা হয় সেই ড. আয়মান আল-জওয়াহরিসহ। আল-জাজিরা ভিডিও থেকে সংগৃহীত।

ওয়াহ্হাবি-আহল-ই-হাদিস-দেওবন্দি রাজনৈতিক ঐক্য : ২০০৩ সালের অগাস্ট মাসে রাওয়াল পিণ্ডির আন্দোলনের এক জনসমাবেশে পাকিস্তানের মূল ইসলামি রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ। ২০০১ সালে তারা ঐ মুত্তাহিদা মজলিস-ই-আমল (এমএমএ) বা 'ইউনাইটেড এ্যাকশন ফ্রন্ট,' যা ইদানীং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়াহ্হাবি শরিয়া পুনঃপ্রবর্তন করে নীরবে তালিবানদেরকে সমর্থন করছে। মধ্যখানে জেইউপি-এর শাহ আহমেদ, দৈহিকভাবে স্ফীত জেইউআই (এফ) এর মাওলানা ফজল-উর-রহমানকে পাশে নিয়ে এবং শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত জেআই এর কাজী হুসেইন আহমদ।

একটি সেনাদলের মধ্যে অত্যল্প সময়ে ১০০০ মানুষের বেশি, নয়জন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা, চারজন স্বদেশী কর্মকর্তা, এবং ১৩৬ জন সৈন্য হয় নিহত হয়েছিল বা আহত হয়েছিল।' তিনি তাঁর কয়েক জন ভ্রাতা সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ দ্রুত সমাহিত করার কাজে উপস্থিত থাকেন 'এই বেঢপপা ফরমগুচ্ছ যা সরকারি বিধিমালায় শব বহনকারী বাক্সে বন্দি রয়েছে তা দেখে মনে হয় জাতির উচ্চ সত্তার দাবি, সাম্রাজ্যের জাঁকজমক, বিজয়ের গর্ব, সব কিছুই ব্যর্থ স্বপ্নের মত ম্লান প্রতীয়মান হয়। আমি বার্কের অবস্থা অনুধাবন না করে পারিনি, "আমরা নিজেরা ছায়া হয়ে কি এক স্বপ্ন ছায়ার দিকে ছুটছি।"

এক পক্ষ কালের মধ্যে মহমন্দ বিদ্রোহ শেষ হয়ে গেল, আর উপজাতীয় মুরুব্বীরা তাদের আত্মসমর্পণ মেনে নিয়ে এগিয়ে এলেন ও তাঁরা ঘোষণা দিলেন যে তারা যুদ্ধ করেছিল এই জন্য যে তাদেরকে বলা হয়েছিল সংযুক্ত হয়ে মোকাবিলা করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। লাহোরের দ্য সিভিল এ্যান্ড মিলিটারি গেজেট সংবাদপত্রের প্রতিবেদক উসন্যাম মিলস লিখেছেন, 'দীপ্ত খ্রিস্ট ধর্ম'-এর শপথ তাদেরকে অস্ত্র ধারণে উজ্জীবিত করেছিল। 'বিপ্লব পুনরায় ছড়িয়ে পড়ার প্রথম লক্ষণ ছিল পেশোয়ার থেকে সংবাদ উদ্বেগজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে আমাদের চারটি সীমান্ত প্রতিবেশীদের মধ্যে ক্ষমতাবান ও যুদ্ধপ্রিয় ওরাকজাইদের ও আফ্রিদিদের মধ্যে যুগপৎ উত্থান হচ্ছিল।' পাগলা ফকির ছিল কি না, যা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল, সোয়াত উত্থান আরম্ভের তিন সপ্তাহ পর ও মহমন্দ বিপ্লব আরম্ভের দশদিন পরে, আকাখেল আফ্রিদিদের আখুন্দজাদা সৈয়দ আকবরকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় পর্যায়ে উত্থান শুরু করেছিল, পনের শ মোল্লা ও দশ সহস্র আফ্রিদির নেতৃত্ব দিয়ে খাইবারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

যখন প্রথম গ্যারিসন খাইবার পাসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল একজন ব্যতীত সকলে নিধন হয়েছিল তখন জানা গেল তাদের এই হত্যাকারীরা বিচার চলাকালীন নিজেদের সৈয়দ আকবরের বাহিনী হিসেবে স্বীকার করেছিল। আফ্রিদি লশকররা অতঃপর জমরুদ দূর্গে বিনা বাধায় অগ্রসর হয়, এই বিশাল দূর্গে হেঁটে যাওয়ার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে খাইবার গিরিপথে যেতে হয়—যার ফলে তিরাহ্ গ্রামের সকলে দক্ষিণ দিকে তাদের সঙ্গে অরাকজাই ও দক্ষিণী আফ্রিদি উপজাতিদের মধ্যে থেকে আরও পঁয়তাল্লিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে।

কর্তৃপক্ষবৃন্দ শক্তি ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে। উসন্যাম মিলস লেখেন :

> 'কখনই আমাদের সীমান্তের খ্যাতি এত ভীতির সম্মুখে পড়েনি। কখনই আমাদের কর্তৃপক্ষকে এত সাহসিকতার সাথে অগ্রাহ্য করা হয় নি। আলী মসজিদ থেকে লণ্ডি কোটাল লুণ্ঠন করে বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়। বিজয়ের

> উন্মত্ত মহা উল্লাস সীমান্তবাসীদের মাঝে বিরাজমান ছিল...। আমাদের বিস্মিত হওয়ার কি এতে কিছু আছে যদি পাঠানরা তাদের উন্নাসিকতা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জোরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে যে মুসলমান সহস্রাব্দ অতি সন্নিকটে। এর সাথে নিজেকে আশ্বস্ত করে ব্রিটিশ রাজ্যের অবসান অত্যাসন্ন আর আল্লাহর তরফ থেকে স্বর্গীয় মানুষগুলোর মর্তে অবতরণ ঘটবে এবং হিন্দুস্তানের জমির উপরে নিজেদের মালিকানা জাহির করে বিজয়ীর বেশে শাসন পরিচালনা করবে।'

তিরাহ্ অভিযানমূলক সেনাদল ছিল ভারতীয় বিপ্লবের সময়ে ভারতে জেগে ওঠে চল্লিশ সহস্র যোদ্ধা নিয়ে গঠিত বৃহত্তম সেন্যদল। জেনারেল স্যার উইলিয়াম লকহার্ট যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিশেষত স্যাম ব্রাউনি লাইনে যুদ্ধে ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে এই প্রথম বিদেশী সৈন্যের কারো দ্বারা তিরাহ্র পর্দা (বাধা) ভাঙ্গা হয়েছিল, সেটি ছিল একটি বন্য প্রকৃতির উপত্যকা যা সফেদ কহর পর্বতমালার গাত্র ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। (এটি অধুনা ওসামা বিন লাদেনের 'আরবীয় অনুসারীদের' আশ্রয় গ্রহণের তীর্থভূমি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে)। এটি ছিল একটি শক্র ভাবাপন্ন এলাকা যা ধ্বংসাত্মক গিরিপথ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যা অতিক্রম করতে দ্রুত ধসে পড়া প্রস্তর খণ্ড পাড়ি দিতে হতো, জঙ্গলাকীর্ণ সুউচ্চ উপত্যকা এবং দ্রুত ধাবমান পাহাড়ি নদী, এবং ভয়ঙ্কর পাহাড়ি খাদ—দেশটি প্রাকৃতিকভাবে অপার সুরক্ষিত ছিল, আর বহির্হাম লাকারীদের জন্য চরমভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল—এমতাবস্থায় তিনি পথিমধ্যে দীর্ঘ এক রসদ সামগ্রীবাহী ট্রেন দ্বারা বাধাগ্রস্ত হন।'

লকহার্টের কৌশল ছিল সোজা সম্মুখগামী দক্ষিণ দিক হতে ওরাকজাই গ্রামে প্রবেশ করা আর তারপর পৌঁছাতে উত্তর দিককে নির্দেশ করে 'আফ্রিদি জাতির চক্র কেন্দ্র ও মধ্যস্থল...তিন বা চার জোড়ার সহজ মিলন সাধন' খাইবার গিরিপথ পুনরুদ্ধার করতে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে। দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করে ওয়াজিরিস্তান পর্যন্ত বিদ্রোহ ছড়িয়ে না পড়ে যেখানে মাসুদদের নেতা মোল্লা পাবিন্দা জিহাদের মন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

১৮ অক্টোবরে লকহার্ট তাঁর অভিযান শুরু করেন গর্ডনের পার্বত্যবাসীদের সঙ্গে নিয়ে দরগাই নামের পাঁচ সহস্র ফুট উচ্চতার পর্বতচূড়াতে কর্তৃত্ব নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণ করার অভিযান আরম্ভ করেন। এই হামলাটি কেবল হাল্কা বাধাগ্রস্ত হয় ও পর্বতচূড়া গৃহীত হয়। অবস্থাটি ছিল একেবারে দুর্ভেদ্য, পথ উভয় দিকই পাহাড়ের চূড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রলম্বিত আকারে গিরি-পথ যার এক দিকে খাড়ি ও অন্য দিকে পর্বত গাত্র যা উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে পৌঁছান যেত,

সেই প্রান্তরে প্রতিরক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। যদিও গর্ডনস দরগাই হাইটস নিতে না নিতে তারা সেটিকে উঠিয়ে নেয়, এই কারণে যে অপর্যাপ্ত সরবরাহ ব্যবস্থা এই অবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করে। এই সময়ে বিলম্বিত সরবরাহ পৌঁছিয়েছিল, এই সময়ে আফ্রিদিরা শক্তির দ্বারা পাহাড়ি চূড়া পুনরাধিকৃত করে নেয়। দ্য সিভিল এ্যান্ড মিলিটারি গেজেট পত্রিকার প্রতিবেদক মন্তব্য করেন, 'সামান্য সন্দেহ থাকতে পারে যা উপজাতীয় লোকেরা আমাদের দরগাই পরিত্যাগ কিছু না করে দেখে গেল—যার অজেয়তা তারা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করল—খুব কম করে বলতে গেলে বলা যায় যে একটি বিশাল রণকৌশলগত ভ্রান্তি। উপজাতীয় লোকজন আমাদের সেনাদলের দরগাই পরিত্যাগকে আরোপ করল যে তাদের ধার্মিক লোকজনের নামাযের ফল।' পনেরটি মান গুণতি করে বোঝায় যে পাহাড়ি এই ফাঁড়িটি দু'আড়াই সহস্র সামরিক বাহিনীর লোক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। ঘটনাকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের অনেকেই আধুনিক রাইফেল বন্দুকের পশ্চাদভাগে গুলি ভরার মত করে জালিয়াতি করে এর মধ্যে আবার এনফিল্ড ব্যবহারকারী ব্রিটিশ বাহিনীর সদস্যের কেউ কেউ ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে অবস্থার অবনতি ঘটেছিল।

অভিযানটি তিরাহ্ গ্রামের ভেতরে গভীরতর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে দরগাই হাইটস পুনর্গ্রহণ করতে হত, আর এর পুনর্গ্রহণ হয়ে যায় উসন্যাম মিলসের ভাষ্যমতে, 'শত্রুর মুখে ব্রিটিশ বাহিনীর সাহসিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।' এটি সেনা সদস্যদের মধ্যে বিপুল তিক্ততারও জন্ম দেয়ঃ 'শুধু যে প্রতারণার ভয়াবহ অভিযোগ আর অপ্রয়োজনীয় জীবন নাশ তা-ই নয়, যে সমস্ত সেনারা সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল তাদের মনে অযথা অপ্রয়োজনীয় তুলনার মাধ্যমে এক তিক্ত অনুভূতির সৃষ্টি করা হয়েছিল।'

২০ অক্টোবর অপরাহ্নে এক ধারাবাহিক প্রচণ্ড আক্রমণ সংঘটিত হয়, এটি এমনই তীব্র বর্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল যা জেনারেল লকহার্টের পর্বতারোহী উনিশজন বন্দুকধারীর একযোগে আক্রমণের সমপর্যায় বলা যায়। মিলস লিখেছেন, 'পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে যা আবির্ভূত হলো, সেটি ছিল একটি খাড়া উঁচু পাহাড় যার শীর্ষ সম্মুখ থেকে পাঁচশ গজ দূরে...। শত্রুরা নির্মাণ করেছিল পাথরের কতকগুলো সারিবদ্ধ সুড়ঙ্গ পথ, সেগুলোর কিছু চার ফুট মোটা ও পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা বর্ষণের প্রমাণ। যে কোন সম্মুখ অগ্রসর গোটা পাহাড়ের তিন শ গজ প্রস্থ বেয়ে ধেয়ে আসা গোলা-বারুদের ধোঁয়া ও উদগীরণের সম্মুখীন সমতুল্য। চারটি প্রচণ্ড আক্রমণ সংঘটিত হয়, প্রথম দুইটি সেকন্ড গুর্খা রাইফেলসের প্রথম সেনাদলের রাইফেল সেনারা ঘটায়। তার প্রতিটি বহর যখন উন্মুক্ত ভূমিতে অগ্রসর হচ্ছিল তখন উচ্চ শৃঙ্গে আরোহিত

বন্ধুকধারীদের বিরামহীন গুলি বর্ষণের মুখে পড়ে, আত্মরক্ষার জন্য তাদেরকে যেনতেনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে যেভাবে পারা যায় সামান্যতম ছাউনির আড়াল খুঁজেছিল। যারা অনুসরণ করেছিল তারা আরও ভাল করতে পারেনি। 'সেখানে অবর্ণনীয় ভ্রান্তি ছিল...। ডরসেটস ও ডার্বিশায়ারসের দুই কোম্পানি পার হতে প্রয়াস চালায় আর ছিন্ন হয়ে পৃথকও হয়ে যায়, অতঃপর ৩য় শিখ বাহিনী, যারা আরও চমৎকারভাবে সাহসী তবে সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক প্রয়াস চালায় গুলি-গোলার এলাকা পার হওয়ার...। কিছুই না তবে এক আশ্চর্যজনক প্রয়াস অবস্থাকে নিরাপদ করতে পেরেছিল।'

মজুত গর্ডন পার্বত্যবাসীদের দু'দিন পূর্বে তাদের অনুশীলনের জন্য আহ্বান জানান হয়। এক সময় তারা তাদের আদেশদানকারী কর্মকর্তা কর্ণেল মাথিয়াসের অবস্থানে থেকে তারা অগ্রসর হয়, তিনি তাদেরকে ম্যাগাজিন পাল্টে বেয়োনেট লাগাতে আদেশ দেন এবং তাদেরকে আহ্বান জানান একটি 'উচ্চ, পরিষ্কার কণ্ঠে 'গর্ডন পার্বত্যবাসীরা, আমার কথা শোনো। সেনাপতি বলেন যে কোন বিপদই হোক না এই অবস্থান নিতে হবে, এবং আমরা এটির সমগ্র বিভাগের সম্মুখ ভাগ নেব।" চার মিনিট আত্মরক্ষামূলক প্রতিবন্ধকের পর বন্দুকের গুলি বর্ষণ বন্ধ হলো ও সেখানে নীরবতার মুহূর্ত বিরাজ করল, 'তোমরা কি প্রস্তুত? পুনরায় কর্ণেল ম্যাথিয়াসের কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, ও একটি উন্মত্ত, বন্য হর্ষধ্বনি, সাহস বেরিয়ে আসে যা লোকজনের অন্তরে সুপ্ত রেয়েছে, সেটিই ছিল তাদের সাড়া। 'এসো' কর্ণেল চিৎকার করলেন। অতঃপর বংশীবাদক ব্যাগ পাইপ তীক্ষ্ণ উচ্চ রবে বাজিয়ে সৈন্যদলের যুদ্ধ সঙ্গীত "এবং মধুর সুরে ও লয়ে গান করে একটি বড় প্যারেড করে" প্রাণ চঞ্চল গর্ডন্সরা সম্মুখে এগোয়।

গর্ডন্স হিউজের ও' ক্রমডেলের আওয়াজের পথ অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন, আর যে ফাইন্ডলেটার বাজিয়েছিল পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার ভিক্টোরিয়া ক্রসের উপাধিতে ভূষিত করেছিল তাকে। এই অভিযানে গুলি লেগে তার দুই পা-ই বিকল হয়ে যায়। যারা প্রথম এক শ গজের উন্মুক্ত প্রান্তরে বেঁচেছিল এখন তারা নিজেদেরকে পাহাড়ি প্রাচীরের পশ্চাতে পূর্বের আহতদের সঙ্গে ঠাসাঠাসি অবস্থায় দেখতে পেল। তখন কর্ণেল ম্যাথিয়াস কর্কের শিরস্ত্রাণ নাড়িয়ে তাঁর লোকজনকে সম্মুখে ডাকলেন

> পরিণতি হয়েছিল চমকপ্রদ মনে হলো যেন পুনর্জন্মের দ্বারা সমস্ত গ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আর এক বিশাল জনস্রোত—পার্বত্যবাসীরা, গুর্খারা, ডরসেটেরা শিখরা এবং ডারবিশায়ারবৃন্দ পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে মাথা

> বাড়িয়ে হঠকারিতার সাথে সম্মুখে এগিয়ে আসছে। এই মুহূর্ত থেকে শত্রুর গুলি, যা প্রচণ্ড শিথিল হয়েছিল...। সামান্য শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার প্রয়াসে শেষ আচ্ছাদন—শরীরের পেশীগুলোকে পরিচালনের জন্য চেষ্টা করা—এবং মিশ্র যোদ্ধাবাহিনী চূড়ান্ত হামলার জন্য প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল।

১৮৪৬ ও সমসাময়িক সময়ে দরগাই উপত্যকাই যুদ্ধ ইতিহাসের যুদ্ধ বিজয় এক অনন্য অধ্যায় অধিকার করে রেখেছে। যখন গাইডসরা সংগঠিত হয়েছিল এবং ১৯৪৭ সালে, যখন ব্রিটিশরা অবশেষে ভারত ত্যাগ করে যায়। এটি সাধারণ নিয়মকে বাতিল করে, যার দ্বারা উপজাতিরাই যারা অভিযোগ করে প্রচণ্ডতম বিপদ তুলে নেয়। এই ক্ষেত্রে আফ্রিদি প্রতিরোধকারীরা তাদের কিছু হতাহত ব্যক্তিবর্গকে তাদের সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যায়ের হামলা পর্বত শ্রেণী থেকে উঠিয়ে নেয়। বৈসাদৃশ্যে, তাদের হামলাকারীরা যুদ্ধে দুই শতাধিক নিহত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ভুগেছে, এদের মধ্যে ছিলেন চার জন ব্রিটিশ সেনাকর্তা, পনের জন নন-কমিশণ্ড অফিসারস ও ভাড়াটিয়া সৈন্য, এবং বিশ জন গুর্খা সেনা নিহত হয়। দরগাই উচ্চ পাহাড়ি ও গুর্খাদের নিয়ে একটা মিত্র বাহিনী গড়ে তুলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের জন্য প্রসারিত হয়ে দিল্লি প্রাচীর পর্যন্ত প্রস্তুত হয়েছিল, গর্ডনের বাহিনী যারা গুর্খার নিহত ও আহতদের উদ্ধার কার্যে লিপ্ত ছিল, প্রতিদানে গুর্খারা গর্ডনদের ছাউনি রক্ষার দায়িত্বে ছিল। রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর মালভ্যানীর বর্ণনামতে, ‘গুর্খা ও স্কটরা যমজ।’

সাম্প্রতিক বছরগুলো পর্যন্ত, এই কেবলমাত্র তিরাহ্‌র ভূমিতে প্রথম কোন বিদেশী সেনাদল, মুঘল আফগান, পার্সিয়ান বা ব্রিটিশ—তাদের গ্রামে কখনও প্রবেশ করেনি, বা প্রবেশ করতে পারে নি; তবে তিনটি প্রবল অবস্থান বলপূর্বক অধিকার করে, ও কয়েক সপ্তাহ যাবত অবস্থান করে পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে হাতাহাতি লড়াইয়ে নিযুক্ত থাকে, সেনাদলসমূহ তিরাহ্‌র প্রত্যেক অংশ পরিদর্শনে সফল হয়। যা পত্র কৈফিয়তের দ্বারা দোষ-ত্রুটির প্রকাশিত করেছিল যে উপজাতিদের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করাতে কয়েক মাস লেগেছিল, রাত্রে ও দিনে চোরাগোপ্তা হামলা তিক্ত অভিজ্ঞতা সাথে নিয়ে চলেছিল। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেমন গ্রামে অগ্নিসংযোগ, গবাদিপশু কেড়ে নেওয়া ও জমির ফসল ধ্বংস করার মাধ্যমে লকহার্টের যুদ্ধক্ষেত্র বাহিনী আফ্রিদি আর ওরাকজাই গোষ্ঠীদের আনুগত্য আনতে বাধ্য করেছিল। তিরাহ্ অভিযানের শেষে হতাহতদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৩ জন ব্রিটিশ সেনাকর্তা নিহত ও ৯০ জন আহত; ১৩৬ জন ব্রিটিশ নন কমিশণ্ড অফিসার ও সাধারণ সেনা সদস্য নিহত আর ৪১৫ জন আহত; আর ৩২০ জন ভারতীয় ও গুর্খা নন কমিশণ্ড অফিসার ও সাধারণ লোক নিহত এবং ৮৭১ জন আহত হয়। যখন

সামরিক অভিযান স্তিমিত হয়ে একটা স্বস্তির পথে এগোচ্ছিল তখন হতাহতের ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিল।

সীমান্ত জিহাদিদের নির্মুলকরণে শক্তি প্রয়োগে বিশেষ মূল্য দিতে হয়েছে। একজন ছিদ্রান্বেষী 'ববস' রবার্টস যিনি একচল্লিশ বছর সামরিক বিভাগে চাকরি করার পর ১৮৯৩ সালে ভারত ছেড়ে যান আর এখন কান্দাহারের ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস লিখেছেন, 'জ্বলন্ত বাড়িঘর ক্ষমতা ও আওতার বাইরে ফসল ধ্বংস করার অর্থ হলো ঘৃণা ও প্রতিশোধের ফসল আমাদের আহরণ করার শামিল।'

পাগলা কাফিল সাদুল্লা সম্পর্কে আর কখনও কিছু শোনা যায়নি।

অধ্যায় দশ

ভ্রাতৃত্ব

> ভাগ্যক্রমে তারা সফল হয় নি। আমরা বলি ভাগ্যক্রমে, এই জন্য যদি মিসরকে শক্তিশালী সরকার না করে, তবে ওয়াহ্‌হাবিরা তাদের মাথা চাড়া দেবেঃ না সংখ্যায় বা ধর্মীয় উগ্রবাদের দ্বারা ন্যুনতমভাবে স্তিমিত হয়ে আরব ভূমিকে পিষ্ট করে চলে যাবে এবং তুরস্কের পবিত্র শহরগুলোকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। এ ধরনের একটি ঘটনার ফলাফলসমূহ সমগ্র প্রাচ্যে অসন্তোষ ছাড়াবে।
>
> টি.ই. র‍্যাভেনশ, মেমোর‍্যানডম অন দ্য সেকট অভ দ্য ওয়াহ্‌হাবিস, ১৮৬৪

১৮৬৩ সালের শরৎকালে দু'জন পর্যটক দামেস্ক থেকে হেল নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, হেল পূর্বের উত্তর নেজদের রাজধানী তবে বর্তমান অটোমান প্রদেশ জবল শাম্মারের অংশ। তাঁরা জানান যে তাঁরা সিরীয় খ্রিস্টান ডাক্তার, আর তাঁরা সেই ধরনের পোশাক পরিহিত। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা কেহই ডাক্তার নন ও শুধু একজন সিরীয়। অপরজন, তখন সাঁইত্রিশ বছর বয়স্ক বংশগতভাবে একজন ইহুদী ও লালন-পালনের দিক থেকে একজন খ্রিস্টান, একজন ইংরেজ খ্রিস্টীয় নামধারী উইলিয়াম পলগ্রেভ। তিনি উইলিয়াম ও মাইকেল সোহেলের কাছে তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। অক্সফোর্ডে নিজেকে একজন পণ্ডিত হিসেবে চিহ্নিত করে পলগ্রেভ লেফটেন্যান্টের ৮ম বোম্বে স্বদেশী পদাতিক মিশনের সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সামরিক কাজের যোগ্য ছিলেন না, এবং দুই বছর পরে তার কার্যভার পরিত্যাগ করে ক্যাথলিক ধর্মমতে দীক্ষিত হয়ে একজন খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক হন। ১৮৫৫ সালে তাঁর লেখাপড়া তাঁকে আরব বিশ্বে পরিচিত করে তোলে আর তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নিজের মধ্যে ভাষার দান বিদ্যমান রয়েছে, তিনি সিরিয়ায় ফরাসি খ্রিস্টান মিশনে যোগ দেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এত

গুণান্বিত একজন আরবি বাগ্মী ও স্থানীয় আচার-আচরণে এত সহজ হয়েছিলেন যে তিনি নিজেকে ঐ এলাকার স্থানীয় অধিবাসী হিসেবে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ফরাসি সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি হন আর মিশরে ও মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসীদের স্বার্থ সম্প্রসারণের কাজ করেন, এবং মনে হয় এই অবস্থার মধ্যে তিনি আরবের অন্তর্ভূমিতে তাঁর স্মরণীয় ভ্রমণ সম্পন্ন করেছিলেন, যদিও তিনি পরবর্তীতে বলেছিলেন যে তিনি এক সহজাত অজানাকে জানার কৌতূহল দ্বারা তাড়িত হয়ে; এই যাত্রা করেছিলেন। এ ধরনের অশান্ত বিপজ্জনক কর্ম তৎপরতা ইংরেজদের মধ্যে বিরল কিছু নয়।' তিনি সিরীয় ডাক্তার সেলিম আবু মাহমুদ আল-ইস হিসেবে পর্যটন করেন, ও তাঁর সঙ্গে নেন কয়েক উট বোঝাই ঔষধের বড়ি, গুঁড়া ঔষধ, দামেস্কে ফরাসি মুদ্রা দিয়ে ক্রীত।

যখন পলগ্রেভ ও তাঁর সিরীয় সঙ্গী বরাকাত হেল নগরীতে পৌঁছান, বসরা ও মদিনার মাঝ পথে কম-বেশি তাঁরা আমির কর্তৃক অভ্যর্থনা এবং অতিথি হিসেবে সেবা পেয়েছিলেন। আসলে হেলের অধিবাসীরা এত অতিথি বৎসল ছিল যে পলগ্রেভ এটিকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে মনে করেন, এমন একটি স্থান যেখানে সব জাতি ও ধর্মের জনগণ স্বাধীন ও সমানভাবে মেলামেশা করে। যা হোক, অন্তিম গন্তব্যস্থল হেল নয় তবে রিয়াদ, যে জায়গাটিকে বহিরাগতদের জন্য এত বিপজ্জনক ভাবত যে হেলের অধিবাসীবৃন্দ এটিকে 'এক ধরনের সিংহের আস্তানা, যাতে সামান্য লোকজনই সাহস করে যায়, আর সামান্যতরই ফিরে আসে,' হিসেবে মনে করত। এটি অনুরূপ ছিল কারণ রিয়াদ ও এর আশপাশের গ্রাম, পলগ্রেভের ভাষায়, 'ওয়াহ্হাবিদের খাঁটি দেশ....ধর্মান্ধদের দূর্গ, যারা প্রত্যেকেই মনে করে যে তাদেরকে কাফির বা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধীদের থেকে রক্ষা করবে, এবং যে ধর্মীয় কর্তব্যকর্ম হিসেবে একজন কাফিরকে বা প্রচলিতি ধর্মমতের বিরোধীকে হত্যা করে, সেটি তাঁর নিদেনপক্ষে একটি সদগুণ...। নেজদ তার জন্মানো প্রায় সকল পুত্রের জন্য দ্বিগুণভাবে বিপজ্জনক, আর দ্বিগুণভাবে ঘৃণাব্যঞ্জক হয়েছে।'

১৮১৮ সালে আলী পাশার অভিযানের দুর্ভাগ্যসূচক পরিণামের পরে রাজ বংশ প্রতিষ্ঠাতার প্র-প্র-পৌত্র ফয়সাল ইবনে সৌদের অধীনে পুনর্গঠিত হয়েছিল। ১৮৪২ সালে নিজেকে রিয়াদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার পরে তিনি কিছু সক্রিয় শক্তি ও ধর্মীয় উদ্দীপনা পুনরুদ্ধার করেন, যা মুহাম্মদ ইবনে সৌদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম সৌদি সাম্রাজ্যকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল। যাহোক, ওয়াহ্হাবিরা নেজদের দক্ষিণ অঞ্চল জবল শাম্মার পুনরুদ্ধার করতে পারে নি, যা সৌদিদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনে রশিদ বংশের আবাসস্থল হয়ে গিয়েছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা উইলিয়াম পলগ্রেভকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন হেলের আমির ও তাঁর জনগণ ওয়াহ্হাবিদের

প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন, এবং এত উদ্বিগ্ন যখন তাঁকে জানানো হয় যে রিয়াদ তাঁর প্রকৃত গন্তব্যস্থল।

ভয়াবহতম সতর্কীকরণ ঘন্টা তাঁদের কর্ণকুহরে যেতে যেতেই দুইজন 'সিরীয় ডাক্তার' ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছোট্ট উটের মরুযাত্রীদলের অংশ হিসেবে উষ্ট্রারোহণে হেল থেকে রওনা দেন। জবল শাম্মার সীমান্ত যেখানে তাঁদের নিরাপদ কর্মকাণ্ড ফুরিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তাঁদের পৌঁছাতে লেগেছিল নয়দিন। ১৩ অক্টোবরে ওয়াহ্হাবি রাজধানী রিয়াদের জন্য অগ্রসর হয়ে উত্যক্ত না হয়ে ভালভাবে পৌঁছান। তাঁদের উদ্ধারের জন্য ওয়াহ্হাবি উলেমাদের দিক থেকে ও তাদের অনুমিত সিরীয় খ্রিস্টান পরিচিতি কোন সুস্পষ্ট শত্রু ভাবাপন্ন করে তোলে নি, ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে যে ওয়াহ্হাবিদের প্রকৃত শত্রু খ্রিস্টানরাও নয় ইহুদিরাও নয় তবে সেইসব বহুঈশ্বরবাদীরা যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলে নিজেদেরকে বোঝায়। প্রকৃত ঘটনা এই যে তাঁরা ডাক্তার হিসেবে এসেছিলেন তাদের সহজ উপস্থিতিকে সাহায্য করতে ও, নিজেদেরকে দেখলেন পঞ্চাশটির বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসার্থে তাঁদেরকে তাদের (ওয়াহ্হাবিদের) বিরাট চাহিদা রয়েছে।

পলগ্রেভ ও বরাকাত রিয়াদে অতিবাহিত করেন এবং আলোচনার মধ্যে নগরীর সব অংশ দেখলেন, পলগ্রেভ যেমনটি বর্ণনা করেছেন, 'বিশাল ও চতুর্ভুজাকার, উচ্চ দালানের চূড়ামণ্ডিত আর প্রতিরোধের শক্তিশালী প্রাচীরসমূহ, প্রচুর ছাদ এবং সমতল রাস্তা থেকে একটু উঁচু জায়গায় অবস্থিত একই রকমের ভবন শ্রেণী, যেখানে ফয়সালের রাজকীয় দূর্গ বিপুল কিন্তু অনিয়মিত উচ্চতায় সবার ভ্রুকুটিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, আর এর নিকটে ভিড়তে পারে এমন দৃষ্টি নন্দন প্রাসাদ কমই নির্মিত হয়েছে এবং এই প্রাসাদে বসবাস করেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুল্লাহ্...। বিস্তীর্ণ তিন মাইল এলাকাব্যাপী ঘন পামবৃক্ষের আচ্ছাদন বিশেষ লক্ষণীয় যেটি সংলগ্ন ছিল সবুজের চত্বর ও পর্যাপ্ত পানির আধারে।

পলগ্রেভের পুনরায় বিস্ময়, তাঁকে নগরীর সমতলে ও অসজ্জিত মসজিদসমূহে যেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি বেশ কিছু ওয়াহ্হাবি মৌলভিদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, যারা তাঁকে নিঃসন্দেহে যেখানে ছেড়ে যায় সেটি আল আস শেখ, বা শেখের পরিবারে মুহাম্মদ ইবনে-আব্দ আল-ওয়াহ্হাবের বংশধর হিসেবে, যিনি উলেমাদেরকে নেতৃত্ব দিতেন। পলগ্রেভ ঘোষণা দেন, 'ওয়াহ্হাবি সাম্রাজ্যে সমগ্র পরিবার সর্বোত্তম বিধিবদ্ধ আইন ও ধর্মীয় খুঁটির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করেছে, আমরা আশা করি কেবল সেটা সৎ উপায়েই হয়েছে। এর সদস্যবৃন্দ...রাষ্ট্রে প্রভুত্বকারী প্রভাবের অনুশীলন করেন, এবং যদিও সামরিক বা বেসামরিক

কর্মকর্তাদের মতন অনুরূপ নামকরণ ছিল না তথাপি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব সমানভাবে পরিচালনা করতেন যা তাদের মনিব সৌদি শাসক পর্যন্ত কোনরূপ বিরোধিতা করতেন না, এমনকি যুদ্ধ বা নীতি বিষয়েও এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকত।

যদিও পলগ্রেভ কখনও পীড়িত আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, তবু তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন, যাঁরা একে অপরে সিংহাসনের উপযোগী করে তোলার সংগ্রামের প্রস্তুত নিচ্ছিলেন, যেটি অনুসৃত হবে তাঁদের পিতার মৃত্যুর পর। কনিষ্ঠ সৌদি যুবরাজকে পলগ্রেভের মনে হয়েছিল কোমলমতি ও উদার তবে তাঁর জ্যেষ্ঠ সৎ ভ্রাতা আব্দুল্লাহ্ বিন সৌদ যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন। অতি নিকট থেকে তাঁকে ভীষণ ধুরন্ধর ও কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মনে হয়েছিল। এর জন্য পলগ্রেভ তাঁর পিতা আমিরকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার বিষয়টা ফাঁস করে দিয়েছিলেন। এই অভিযোগ আব্দুল্লাহ্‌কে এতই ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল যে তিনি তাঁকে তাঁর 'সিরীয়' ছদ্মবেশী ইংরেজ মূর্তি প্রকাশ করে হত্যা করানোর হুমকি দিয়েছিলেন। পলগ্রেভ তাঁর সাহস হারান নি, তবে সেই একইরাত্রে তিনি ও তাঁর সঙ্গী রিয়াদ থেকে পলায়ন করেন, আর, নগরীর বহির্দিকে কয়েকদিন লুকিয়ে উপকূল অভিমুখে যাত্রা করেন। বাহরাইনের দূরবর্তী এলাকায় এক জাহাজ ডুবি হয়েছিল যাতে পলগ্রেভের সমস্ত লেখা হারিয়ে গিয়েছিল, এটি ১৮৬৩ সালের শেষ ভাগের আগে নয় যখন তিনি ইউরোপে ফিরে গিয়ে নিজেকে ওয়াহ্হাবিদের সাথে আরবের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎ করার প্রথম পশ্চিমা হিসেবে দাবি উত্থাপন করেন।

পলগ্রেভের যাত্রা আরব ভ্রমণকারী বার্টন, ব্লান্ট ও ডটি ছায়াপাত করেছিলেন এবং একই সাথে তার রিয়াদ অভিমুখে গম ৩য় পশ্চিমা হ্যারি সেন্ট জন ফিলবির দ্বারা বিভিন্ন চাতুর্যপূর্ণ কলাকৌশলে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু তার ওয়াহ্হাবি শাসনের বিবরণ স্মরণ করা যায়। নেজদে তিনি প্রশংসা করার ও করতালি পাওয়ার মত কাজ দেখতে পান ওয়াহ্হাবি সাম্রাজ্য একটি সুসংগঠিত ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল যা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত এবং সকলে সেটা অনুসরণ করত।' এবং তথাপি, 'কত ভ্রান্ত উদ্দীপনা, যা কেন্দ্রীভূত সাহস ও অধ্যবসায়েব ক্ষেত্রে অপব্যবহৃত হয়েছে।' ওয়াহ্হাবি শাসন 'সামরিক শক্তি ধর্মান্ধতার ওপর নির্ভরশীল' এবং তাঁর দৃষ্টিতে, এটি ব্যর্থতায় সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত আভ্যন্তরীণ প্রগতির, বাণিজ্যের প্রতিকূলতা, শিল্পকলায় ও কৃষিতেও অশুভ এবং উচ্চতম মাত্রায় অসহনীয় ও আক্রমণ প্রবণ, এটি না খোদ শ্রেয়তর না অন্যান্যদের উপকারে আসে; যখন কখনও কখনও দেশসমূহকে তাদের বিজয়ের জন্য আদেশ ও প্রশান্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

করতে হয়, রোমান বর্ষ বিবরণ লেখকের লেখনীতে উল্লেখিত হয় উবি সলিতুদিনেম ফ্যাসিয়ান্ট প্যাসেম অ্যাপিল্যান্ট [যেখানে তারা তৈরি করে একটি মরুভূমি তারা এটিকে বলে শান্তি]।

পলগ্রেভ উপস্থাপন করেন, নেজদের ওয়াহ্হাবি সংস্কৃতি যদিও বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজ করছিল তথাপি এটিকে তারা তিক্ত যুদ্ধবাজ ইসলামের বিপক্ষে এক নব মুক্তধারা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। পক্ষান্তরে এটিকে মুক্ত বিশ্বের জন্য একটি হুমকি হিসেবে ধরা হয়েছিল :

> এই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণশীল ছিল যা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জন্য চরম বিপজ্জনক। কারণ ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় রাষ্ট্র এর আগ্রাসনে হারিয়ে গিয়েছিল আর যদি না এটাকে অন্য কোন উপায়ে স্তব্ধ করা যায় এভাবেই এটি সম্প্রসারিত হতে থাকবে এবং অন্যের ভূমি আরও গ্রাস করতে থাকবে...। আমরা আরও বলতে পারি যে এর দুর্বলতম ব্যাপারে নিহিত রয়েছে পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সিংহাসনের উত্তরসূরি হওয়া নিয়ে বিরোধের মধ্যে, যা ওয়াহ্হাবি-বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় আরবের সর্বত্র যোগ দিচ্ছিল, একদিন বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে নেজদীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এটি একেবারে এখনও সম্পূর্ণরূপে বিনাশ বা ধ্বংস হয়নি। কিন্তু ওয়াহ্হাবিবাদ যে পর্যন্ত আরবের কেন্দ্রে ও পার্বত্যঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হবে, সে পর্যন্ত আসলে সভ্যতা, অগ্রগতি, জাতীয় সমৃদ্ধি আরব জাতির জন্য সামান্য প্রত্যাশাই রয়ে যাবে।

রিয়াদে দ্বিতীয় ব্রিটিশ পর্যটকের যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে তিনি পলগ্রেভের থেকে বেশি অবহেলিত হয়েছেন। ১৮৬০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল লিউইস পেলি এক দশক যাবত উপসাগরীয় অঞ্চলে ছিলেন ব্রিটিশ অধিবাসী। পলগ্রেভের ফরাসিদের সৌজন্যে ভ্রমণের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও হতাশ হওয়া সত্ত্বেও পেলি আমির ফয়সালের নিকটে লেখেন আর ১৮৬৫ সালে তিনি (পেলি) তাঁর (আমির) রাজধানীতে আমন্ত্রিত হন। তিনি আমিরকে অন্ধ ও ক্ষীণ শরীরী দেখেন, তবে এখনও প্রতি ইঙ্গিতেই তিনি শাসনকর্তা। তিনি নিজের সম্বন্ধে রাজকীয় বহুবচনান্তে বলেন আর সমগ্র আরবীয় উপদ্বীপ ন্যায়ভাবে 'আমাদের' বলে বিবেচনা করেন—এবং তাঁর নিজের জন্য আমির ও ইমামের দ্বৈত খেতাব ব্যবহার করেন। পেলি তাঁর দাপ্তরিক প্রতিবেদনে লেখেন, 'আমির ফয়সাল সম্পর্কে বেদুঈনরা যা বলে তা শোনাবেন সৌদ (ইবনে সৌদ) বলেন এটি অসাধারণ নয়। কিন্তু খেতাব যা রাজধানীতে তাঁর বর্তমান অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে সেটি হলো ইমাম অর্থ প্রকাশ করে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব...। ইমাম সকল মোল্লার পূর্বাধিকার নেন, এবং গণপ্রার্থনায় (নামায) উল্লেখ করেন এই শর্তে যে সকলে সমান নবীর (নবী

মুহাম্মদ সাঃ) নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। এটি ইসলামের নবীর গুণকীর্তন যেভাবে প্রার্থনায় উচ্চারিত হয়ে থাকে ঠিক তেমনিভাবে খুৎবা বা উপাসনায় বা গণসমাবেশে নিজের গুণাগুণ প্রচার বাধ্যতামূলক করে। ১৭৭৩ সালে ফয়সালের পূর্বপুরুষ আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ববর্তী বিষয় এখনও স্পষ্টভাবে প্রবলধারায় প্রচলিত রয়েছে, এর সাথে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় আমির ও ইমামের বিশেষ উপাসনাকে সংবিধিবদ্ধ করা হয়। আল আস শেখদের আর আল-সৌদদের মধ্যে পারিবারিক কুটুম্বিতাও বজায় রেখে চলছিল আল-ওয়াহ্হাবের পৌত্রীর সঙ্গে আমিরের যুবরাজ আব্দুল্লাহ্র সঙ্গে বিবাহের মধ্য দিয়ে। তথাপি পেলির নিকটে মনে হয়েছিল যে ওয়াহ্হাবিদের থেকে বরং সৌদিরা ছিল ভারপ্রাপ্ত।

তাঁর পূর্বে পলগ্রেভের মত, পেলি ওয়াহ্হাবিদের অবাস্তব চিন্তার দ্বারা অসুবিধার শিকার হয়ে রিয়াদ ত্যাগ করেন। 'আমি এই উপসংহারে এসেছিলাম যে যখন ইমাম স্বয়ং একজন বিশ্বাসযোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, এখনও তিনি অত্যধিক উত্তেজনাকর, দুষ্ট, বিপজ্জনক ও ধর্মান্ধ লোকজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত যে কোনো একজনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারত।' এক দশক পরে পর্যটক চার্লস ডটি তাঁর আরও বিখ্যাত আরবীয় মরুভূমি পারাপারের পর একই উপসংহারে উপনীত হনঃ 'আরবে আমি একটি শুভদিন অতিবাহিত করেছি। অবশিষ্ট সব দিনগুলিই ছিল মন্দ কারণ ধর্মান্ধ জনগণ।'

১৮৬৩ সালে রিয়াদে পলগ্রেভ দেখেছিলেন জ্ঞাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৮৬৫ সালে আমির ফয়সালের মৃত্যুর সাথে সাথে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে খোলা যুদ্ধ বিগ্রহে রূপ নেয়। তাঁর সঙ্কল্পে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে সৌদকে পরাজিত করার জন্য তাঁর পিতার শত্রু হেলের আমির মুহাম্মদ ইবনে রশিদের পক্ষে ঘুরে দাঁড়াতেও জবল শাম্মারকে শাসন করতে হয়। পরবর্তী যুদ্ধে সৌদ নিহত হন ও এই ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার সন্দেহে আব্দুল্লাহ্ কারারুদ্ধ হন, এবং পরবর্তীতে নির্বাসিত হন। অতঃপর ইবনে রশিদ অটোমানদের নামে দক্ষিণ নেজদের দায়দায়িত্ব বুঝে নেন ও তিনি তাঁর রাজত্বের চিহ্ন সরিয়ে ফেলার কথা বলেছিলেন। ফয়সালের জীবিত পুত্র ও পৌত্রদেরকে নির্বাসনে দেওয়া হয়, অনুমতি উত্তরসূরি আব্দুল রহমান ইবনে সৌদ প্রথম পলায়ন করে শূন্য আবাস স্থানে যান এবং অতঃপর তাঁর জ্যেষ্ঠতম পুত্র আব্দুল বিন আব্দুল-রহমান ইবনে সৌদকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান কুয়েতে। এই বিষয়ে বর্ণনায় ভিন্নতা দেখা যায় এই নির্বাসন শুরু হয় বা পুত্রটির বয়স কত ছিল, তবে এটা বলা হয় এগার বছর যাবত তিনি খেতেন 'দুর্ভাগ্যের রুটি।' উলেমাদের উচ্চতর অগ্রজ উত্তরাধিকারি আল আস-শেখেরা নির্বাসনে ইবনে সৌদদের সঙ্গে ছিলেন, তবে অবশিষ্টদের দেখা গেছে নেজদের মরুভূমির উপজাতিদের আশ্রয়ে।

১৯০১ সালে—এই বছরেই আফগানিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিকারী আমির আব্দুর রহমান কাবুলে মৃত্যুবরণ করেন, ও হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের আমির আব্দুল্লাহ্ আলী বুনারে মৃত্যুবরণ করেন—আব্দুল রহমান ইবনে সৌদ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পক্ষে সৌদের গৃহের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভাবে গ্রহণ করেন, যদিও তিনি নেজদের ইমাম খেতাব বজায় রেখেছিলেন। দাপ্তরিক বর্ণনায় দেখা যায় নতুন আমিরের বয়স একুশ বছর। তাঁর আশ্রয়দানকারীর সহায়তায় কুয়েতের নির্বাসিত শেখ মুবারক দ্য গ্রেট তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা করেন।

ইবনে সৌদের আরব ভূমি বিজয়ের (পরবর্তীতে তিনি এই কর্মের জন্যই বহির্বিশ্বে পরিচিত হন) কিংবদন্তীর এটি হলো কৃতিত্ব যিনি এই কৃতিত্বের অর্জনটি আশি বা বিশ জন সৈন্য দিয়েই সম্পন্ন করেছিলেন? উষ্ট্রারোহী বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সে ছদ্মাবরণে মরুভূমি অতিক্রম করে রিয়াদ গমন করেছিল। অবাক লাগে কেমন করে সে পনের সদস্যের বাহিনী নিয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রশিদি গভর্নরের প্রাসাদের হারেমখানায় আত্মগোপন করতে পেরেছিল। পরবর্তী দিনে যখন গভর্নর পার্শ্ববর্তী দূর্গ থেকে এসে পৌছান তখন এই গুপ্তঘাতকের দল তাদের ওপর অতর্কিত চড়াও হয়ে সকলকে হত্যা করে। এভাবেই আমির রিয়াদ দখল করে সৌদ বংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিংবদন্তী দক্ষিণের নেজদের বেদূঈন উপজাতিদের মধ্যে বহমান থাকে তাঁর সশস্ত্র আহ্বানে সাড়া দিয়ে, কুয়েত কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রশিক্ষিত লোক সম্বন্ধে যদিও কমই বলা হয়। দুই বছরের মধ্যে ইবনে সৌদ তাঁর হারানো উত্তরাঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালানোর প্রবল তাগিদ বোধ করেন। ঐ অঞ্চলগুলো এখনো হেলের আমির আব্দুল আজিজ ইবনে রশিদের দখলে রয়েছে। ১৯০৪ সালের জুন মাসে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সাহায্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করে একটি আধুনিক তুর্কী সেনাদল প্রেরণ করেন, এবং উত্তমরূপে পরাজিত হন। এই পরাজয় তাঁকে তাঁর কৌশলের ব্যাপারে পুনঃ চিন্তা করতে চাপ প্রয়োগ করে।

এই সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ইবনে সৌদ দুটি উপজাতি আরতৈবা ও হার্বের লোকজনকে সাহায্য করার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। তারা নেজদের অবশিষ্ট বেদূঈন সমাজ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল এবং নিজেদেরকে কঠোরপন্থী ওয়াহ্হাবিবাদে উৎসর্গ করেছিল। এই মরুভূমিতেই ওয়াহ্হাবিবাদের মশাল প্রজ্বলিত রাখা হচ্ছিল, প্রথম অটোমান অত্যাচারের অন্ধকার দিনগুলিতে ও পরে হেলের ইবনে রশিদের অধীনে—যখন হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধরা সৈয়দ আহমদের ওয়াহ্হাবিবাদের বাণী অতি মাত্রায় মহাবন পার্বত্য এলাকায় জিইয়ে রেখেছিল।

এই ওয়াহ্হাবি ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে আল-ইখোয়ান বা ভ্রাতৃত্ব নামে অভিহিত করেছিল। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে লাগল যাকে তারা হুজার নাম দিল। হিজরা শব্দটি এক বচন—এর উৎস মহানবী (সা.)র বিধর্মী মক্কা পরিত্যাগ করে মদিনায় গমনের বর্ণনার মধ্যে নিহিত ছিল, আর এখন এটি ব্যবহৃত হয় ইখোয়ানদের সত্য মুয়াহিদুন, বা একেশ্বরবাদী, একটি ধর্মীয় রাজ্যে বসবাস করার ইচ্ছাকে বোঝায়, যেমনটি মহানবী (সা.) মদিনায় করেছিলেন। তাদের যাযাবর জীবন পরিত্যাগের বিষয়টি বোঝানোর জন্য তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী মাথার ফিতাগুলো উটকে ঢিলাভাবে বাঁধার কাজে ব্যবহার করা হয় বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের কাফিয়া (মাথার বস্ত্র) ঢিলাভাবে পরিধান করেছিল। তারা পুনরায় নিজেদেরকে বহু ঈশ্বরবাদী ও অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক করতে তারা তাদের দাড়ি গুম্ফসহ সুবিন্যস্তভাবে রেখে মেহেদি রঙ লাগিয়ে সম্মুখে লম্বা করে রাখত—মহানবী (সা.)র হাদিসের পুরণীয় আবশ্যিক শর্তানুসারে অনুরূপ রাখত বলে অনুমিত হয়। তাদের আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ঐতিহ্যবাহী প্রথাসহ এই ধারায় অতিরিক্ত লোকজন দিয়ে শক্তিশালী করলেও মহিলারা থেকে যায় দৃষ্টি ও মনের অন্তরালে।

পরবর্তীতে হ্যারি সেন্ট জন ফিলবি ও অন্যান্যরা জনে জনে প্রচার করেন যে ইখোয়ান অস্বাভাবিক বস্তু যা ইবনে সৌদের মস্তিস্ক প্রসূত শিশু বা ভাব কল্পনা 'দুর্ঘটনার ফলাফল নয় তবে সুবিবেচিত পরিকল্পনা, কল্পনা করা হয় আরব জাতির ত্রুটি প্রশমনের উদ্দেশ্যের থেকে কোন অংশ কম নয়।' ফিলবি সাহেবের মতে, আমির স্বত:প্রণোদিত হয়ে একটি সেনাদল তৈরি করতে লাগেন যার ছিল ধর্মান্ধ ও সুশৃঙ্খল 'আরতৈয়ায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পশুদের জলপান করা স্থান কুয়েত-কাসিম জনপদে, ইখোয়ান বা 'ভ্রাতৃবর্গ' নামে গুপ্ত সংঘের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে এক দশক সময়ে বেদূঈন সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বলা পরে আরও যথার্থ হয় যে ইবনে সৌদ ইখোয়ানদের মধ্যে ওয়াহ্হাবি উলেমাদের থেকে দূরে অবস্থানকারী জনসংখ্যায় সর্বাধিক প্ররোচিত লোকজনের কারণে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আর তারপর এই গুণাবলি তাদের পারস্পারিক সুবিধার কাজে লাগিয়েছিল। ইবনে সৌদের মধ্যস্থতার পূর্বে ওয়াহ্হাবিবাদ ইতিমধ্যে একটি পুনরুজ্জীবনের অধীনে চলে যাচ্ছিল যা কেন্দ্রীয় এশিয়ার ওয়াহ্হাবি ধর্ম প্রচারকের কার্যাবলি থেকে অনুমান করা যায়। ১৮৭১ সালে তুর্কিস্তানে সৌদি বাদল নামে একদল ওয়াহ্হাবি ধর্ম প্রচারকের দ্বারা অনুপ্রাণিত ওয়াহ্হাবি যোদ্ধা হয়ে খোকন্দে রুশ সেনাদলের ঘাঁটিতে হামলা করেছিল। চল্লিশ বছর পরে সৈয়দ শারি মোহামেদ নামে এক ওয়াহ্হাবি তাশকেন্তে প্রচারকদের একটি আবাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন, নেজদে,

ইবনে সৌদের জাতি-নির্মাতা হিসেবে ইখোয়ান ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর আচার-আচরণে তাঁর প্রথম প্রতিভা প্রকাশিত হয়।

সৌদি আমিরগণ দীর্ঘদিন যাবত তাদের নিজেদের জন্য ইমামতির কর্তৃত্ব দাবি করে আসছিল, কিন্তু উক্ত ক্ষেত্রে তাঁর পিতার স্থানে তরুণ সৌদের অবস্থান ছিল অসাধারণ, তাঁর (পিতার) আনুকূল্যে পদত্যাগ করে, তিনি নেজদের ইমাম খেতাব নিজ অধিকারে রেখেছিলেন। এই বাধা অতিক্রম করে ইবনে সৌদ ইখোয়ানদের নিকটে সুনির্দিষ্টভাবে নিজেকে তাদের ইমাম হিসেবে উপস্থাপিত করেন—আর এই সময় থেকে অগ্রবর্তী সময়ে তিনি নিজেকে ইখোয়ানদের মধ্যে আল-ইমাম বলে এসেছেন এবং কখনও 'আমির' বলেন নি। এই উপায়ে ইবনে সৌদ তাঁদের পারস্পরিক শত্রু হেলের অ-ওয়াহ্হাবিদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার কর্তৃত্ব অর্জন করেন।

এটা অসম্ভব যে ইখোয়ানারা ১৯০৬ সালে দুই আমিরের সেনাদলের মধ্যে প্রথম বিশাল যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য ইখোয়ানদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। তবে ঐ সম্মুখ যুদ্ধে হেলের আব্দুল আজিজ ইবনে রশিদের মৃত্যু ইবনে সৌদকে দম ফেলার অবকাশ দিল যে সময়টা ইখোয়ানদেরকে যুদ্ধে প্রস্তুত করার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল। প্রায় ১৯১০ সাল থেকে সম্মুখবর্তী সময়ে ইখোয়ানদের ইমাম বর্তমান ইখোয়ান সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করার নিমিত্তে একটি দুঃসাহসী কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে নতুন সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। তাদেরকে অর্থ দিয়ে চালিয়ে তিনি অন্যান্য বেদূঈন সম্প্রদায়দেরকে আল-ইখোয়ানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মরুদ্যানে বসবাস করতে প্ররোচিত করেন, সকলেই তাদের নিজেদের হুজারে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাদের পরিবারবর্গকে পুনঃস্থাপন করে যাতে প্রাচীন উপজাতীয় রাজানুগত্যের বিলুপ্তি হতে শুরু করে। কৃষি সম্প্রতি ও প্রশিক্ষণের সাথে ইবনে সৌদ বাসস্থানসমূহ, মসজিদগুলো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সবার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষকবর্গের যোগান দেন ওয়াহ্হাবি মোল্লারা উপাসনালয়ে আল-ওয়াহ্হাবা ও তাঁর বংশধরদের আল্লাহ্র একত্বের মতবাদের ওপর শিক্ষা দান করতে পারতেন। পুনরায় এই বাণী চালু করার জন্য তিনি চাইলেন স্থানীয় সর্দারবৃন্দ ও প্রতি হুজারের মুরুব্বীদের রিয়াদ ও ইউইয়ানাহ্র গোপনীয় মসজিদদ্বয়ে ধর্মীয় শিক্ষাক্রমে উপস্থিত করাতে। আমির ও ইমামের এই সমস্ত কর্মসাধনে প্রচুর অর্থ খরচ হয়েছিল যা তিনি স্বল্প পরিমাণে চালাতে পেরেছিলেন, তবে এটি তাঁকে নিরাপত্তা দিয়েছিল একটি সশস্ত্র ও অনুগত সেনাদলের যা তাঁর কাছে এককভাবে উপযোগী হয়েছিল কৌশল অবলম্বন করে ক্ষুদ্রাকারে সমগ্র দেশব্যাপী প্রচার করা। ১৯২০ সালে সেন্ট জন ফিলবি লেখেন,

> 'তাঁর নতুন উপনিবেশসমূহ তাঁর নির্ধারিত ৩০,০০০ বা তারও অধিক লোকের সেনাদলের সেনানিবাস ব্যতীত আর কিছু নয়, আর ওখানে জন্ম নেওয়া হয়। তিনি বেদূঈনদেরকে দেখেন গৃহহীন, ধর্মহীন, ও উপজাতীয় সংগঠনসহ অভিশপ্ত যেখানে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য সম্পাদন করা অসম্ভব এবং বৈরিতা অনিবার্য। তাঁর নতুন উপনিবেশে তিনি তাদেরকে ধর্মভীতি বা আল্লহ্-ভীতি অঞ্চলে বসবাস করতে দিয়েছেন আর অন্তরে আল্লাহ্র বেহেশত পাবার প্রত্যাশা, সাধারণ ধর্মের ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি তথা গোষ্ঠীগত বন্ধনকে, নিজের প্রতি আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে আনুগত্য রূপান্তরিত করে আনুগত্য প্রত্যাশা করা যে উপাদানগুলোর সংমিশ্রণ ইতোপূর্বে সম্ভব হয়নি। একই সাথে তিনি প্রাচীন উপজাতীয় অনুশীলনে যুদ্ধকে অনুশীলনের অবাধ ছাড় দিয়েছেন, তাঁর অঞ্চলগুলোতে হানা ও পাল্টা-হানা নিষিদ্ধ করা হয়, ও অধিকাংশ উপজাতির গোত্রভুক্ত অধিবাসীরা তাঁর এই আইন ভঙ্গের কারণে তাঁর ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ততার উত্তাপ টের পেয়েছিল, যেখানে শান্তি ছিল না সেখানে শান্তি বিরাজ করছে।

এক দশকের ব্যবধানে ইবনে সৌদ এক শতাব্দীরও পূর্বে পূর্বপুরুষগণ যা সম্পাদন করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করতে সফল হন। আল-সৌদ ও আল-ওয়াহ্হাবের বেশ কিছু সংখ্যক অসম উপজাতিদের সমন্বয়ে সংযুক্ত ছত্রচ্ছায়ায় সমন্বয় সাধন করা হয় যারা এখন চিন্তা ও প্রায় একই উপজাতি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু নেজদের ঐক্য সাধন কেবল মাত্র আরম্ভ, এই জন্য হ্যারি সেন্ট জন ফিলবিকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, ওয়াহ্হাবিদের 'সর্বাধিক উল্লেখ্যযোগ্য চরিত্র' ছিল, তাদের 'মুসলিম প্রতিবেশীদের উপরে নিরাপস ঘৃণা...। শিয়ারা স্পষ্টতই কাফির বা বহু ঈশ্বরবাদী বলে নিন্দিত হয়, তবে এটি চারটি সুন্নি মতধারার ধর্মপণ্ডিতবর্গের গোঁড়া সমাবেশ থেকে করা হয়—তুর্কীরা, মিসরীয়রা, হিজাজীয়রা, সিরীয়রা, মেসোপটমীয়রা, ভারতীয়রা এবং এরকম আরও—যে শত্রুতা উপজাতিদেরকে ঐতিহ্যগতভাবে একে অন্যের দিকে নির্দেশ করে নিয়ে গিয়েছিল এখন সেটি বহির্বিশ্বের দিকে পুনঃ নির্দেশিত হচ্ছে।

ইবনে সৌদের ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম দশকে বৃটিশরা বাইরে থেকে দেখে সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অটোমান সাম্রাজ্য অধ্যুষিত স্থিতাবস্থা সংরক্ষণ করা, যা ১৯০১ সালে ইঙ্গো-তুর্কি চুক্তিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল যার জন্য আরবের রাষ্ট্রীয় কার্যাবলির ব্যাপারে ব্রিটেন নিরপেক্ষ থাকতে সম্মত হয়। যার দ্বারা ব্রিটেন আরবের রাষ্ট্রীয় কাজের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে সম্মত হয়। ১৯০৪ সালে ভারত সরকার কুয়েতে তাদের রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে কুয়েতের আমিরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন আর ইবনে সৌদের পরিবারকে অবলোকন করেন 'কেবল ওয়াহ্হাবিদের বংশগত আমির হিসেবে স্মরণীয়' হিসেবে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল, ১৯০৯ সালে

কুয়েতে নতুন রাজনৈতিক প্রতিনিধির আগমনের সাথে সাথে একটি পরিবর্তন সূচিত হলো, উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অপ্রত্যাশিত উদ্ভট নামধারী একত্রিশ বছর বয়স্ক ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন।

পাঞ্জাবের একটি সুপরিচিত ইঙ্গো-ভারতীয় সামরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, অনর্গল আরবিতে কথা বলতেন ও একজন অতি আগ্রহি পরিব্রাজক শেক্‌সপিয়ার তাঁর কুয়েতের পশ্চিম সীমান্তে কিছু কিছু আক্রমণ রচনা করে নিজেকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অতঃপর ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে যখন নেজদের আমির ইবনে সৌদ তাঁর প্রাচীন পৃষ্ঠপোষক ও মিত্রকে সৌজন্য আহ্বানের জন্য অশ্বারোহণে কুয়েত যাচ্ছিলেন তখন তাঁর (আমির) সঙ্গে সাক্ষাতের শেক্সপিয়ারের সুযোগ হয়েছিল। শেক্সপিয়ারের পরিবেশিত তথ্যমতে আব্দুল আজিজ এখন ৩১ বছর বয়স্ক, সুন্দর, সুদেহী, সচরাচর আরবীয় মাপের চেয়ে তিনি বেশি উচ্চতা সম্পন্ন। তার দিল খোলা, মুক্ত চেহারা আর প্রথম দর্শনে গাম্ভীর্যের পর অমায়িক ও বিনয়ী স্বভাবের।' শেক্সপিয়ার আমিরকে 'উদারমনা ও অকপট এবং সৎ' দেখে অবাক হয়েছিলেন, এমন কি ঐ গুণাবলির স্থলে যদি তিনি 'কঠোর ও নির্বাক' হতেন।

এক বছর পরের একটি সভা শেক্সপিয়ারকে উপসংহার টানতে প্রণোদিত করে যে এখানে একজন নেতা রয়েছেন যাঁর বুদ্ধি ও চারিত্রিক শক্তি তাঁর উচ্চাকাঙ্খার সাথে মিলে যায়। ইবনে সৌদ তাঁকে তাঁর পরিবারের সংগ্রাম সম্বন্ধে বলেন এবং অটোমানদের বিরুদ্ধে যাবার জন্য ব্রিটিশদের সঙ্গে কোন মৈত্রী গড়ার ইচ্ছা করেন নি। 'আমরা ওয়াহ্‌হাবিরা তুর্কীদেরকে পারস্যবাসীদের থেকে কম ঘৃণা করি তাদের কাফিরি চর্চার জন্য, যা তারা আমদানি করেছে সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্মে আমাদের কাছে কোরানে প্রকাশিত।' শেক্সপিয়ার তাঁর পরবর্তী প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করেন 'তুর্কীদেরকে ঘৃণ্য মনে হয় সকল উপজাতিদের নিকটে সাধারণ ধারণা আর একমাত্র একটিই যার জন্য তারা তাঁদের পার্থক্যসমূহে নিমজ্জিত হয়ে যাবে', তিনি আর বলেন যে, একটি বিদ্রোহ যদিও প্রত্যাশিত ছিল না তথাপি সমগ্র উপদ্বীপ বংশের সকল গোত্র কর্তৃক অভিনন্দিত হতো।

শেক্‌সপিয়ারের অটোমানদের কৌতূহল পূর্ণ প্রবণতার এক 'আরব বিপ্লব'-এর অগ্রগতি হোয়াইট হলে অংশত গৃহীত হয়নি কারণ বিদেশী দপ্তর বিষয়টি অন্যভাবে নিল যে এটি ছিল ভারত সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। তথাপিও শেক্‌সপিয়ারকে একটি ব্যক্তিগত অভিযান চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যা তাঁকে কুয়েত থেকে রিয়াদে এবং অতঃপর ঠিক আরবীয় মরুভূমি পার হয়ে হিজাজে নিয়ে গিয়েছিল। রিয়াদে তিনি ইবনে সৌদের সঙ্গে ও অবশেষে, এবং পুনরায় বলা হল যে ভবিষ্যৎ আরব ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি মৈত্রী স্থাপনের ওপর নির্ভর করবে। ১৯১৪ সালের মে মাসের শেষের দিকে শেক্সপিয়ার ও তাঁর ভ্রমণ-জীর্ণ দল আঠার শ মাইল পথ হেঁটে ও উষ্ট্রারোহণে

ভ্রমণের পর মরুভূমি থেকে সুয়েজে উদ্ভূত হল, এর অনেক অঞ্চলই মানচিত্র বিহীন ও অলিপিবদ্ধ। তিনি কায়রোর ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির আবাসে সংবাদ পাঠালেন, তিনি কোথায় লর্ড কিচেনারকে দেখেছিলেন ও অন্যান্যরা তাঁর ইবনে সৌদের পক্ষ সমর্থনে প্রভাবিত হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে মাত্র একজনই আরব নেতা ছিলেন—হিজাজের আমির শরিফ হুসেইন ইবনে আলী, যার হাশেমীয় বংশকে ব্যাপকভাবে যদিও অশুদ্ধ বিবেচনা করা হয় মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক পবিত্র উপাসনালয়ের বংশগত অধিকারী মক্কা ও মদিনা নগরীর তত্ত্বাবধায়ক এবং হজ্জের রক্ষক।

১৯১৪ সালের অগাষ্ট মাসে ইউরোপে পরবর্তী যুদ্ধের আকস্মিক প্রকাশ ঘটলে অটোমান সরকার জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁদের ভাগ্যকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির ওপর ছেড়ে দিয়ে খলিফার নামে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তিন রাষ্ট্রের আঁতাতের ক্ষেত্রে একজন মুসলিম নেতাকে এখন খুঁজে বের করা জরুরি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল যিনি তাঁদের সঙ্গে যোগদান করে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আর সেই ব্যক্তিটি ছিলেন স্পষ্টতই শরিফ হুসেইন। কর্ণেল টি.ই. লরেন্সের ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের জন্য যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সুনিপুণভাবে লিখিত প্রতিবেদন যার নাম ছিল রিকন্সট্রাকশন অভ অ্যারাবিয়া (আরবের পুনর্গঠন), এটি সব বলে।

> যখন যুদ্ধ দেখা দিল তখন ইসলামকে বিভক্ত করার একটি জরুরি প্রয়োজন সংযুক্ত হলো, আর আমরা প্রজাদের চাইতে মিত্রদের অনুসন্ধানে অধিকতর সমন্বয় সাধন করলাম। সুতরাং আমরা আরবি ভাষা জনগণের সাথে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অসন্তোষের সুবিধা গ্রহণ করলাম, আর প্রাচ্যদেশীয় প্রজাদের মধ্যে সরকারি কার্যকলাপের অংশীদারিত্বের চেতনা অর্জনের ঝুঁকি ক্রমশঃই ঘনীভূত হওয়ার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের প্রভাব বলয়ে অবস্থানকারী রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা একটি বেষ্টনী গড়ে এই অঞ্চলে নদী ত্রয়ীর (ইরাক) ওপর আমাদের যা রয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রগতিশীল কোন বিদেশী শক্তি যাদের এই নদী কেন্দ্রিক বিশাল এলাকার ওপর দূরভিসন্ধি রয়েছে, তাদের প্রতিহত করব। যুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে আরব আন্দোলনে সব থেকে বড় বাধা ছিল শান্তি -কালীন এর মহত্তম সদগুণ—বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে একত্বের অভাব...। পরিশেষে শরিফ (হুসেইন) কে বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ তিনি ইসলামে চিড় ধরিয়েছিলেন।

শেক্সপিয়ার ইবনে সৌদ ও বেদূঈন উপজাতিদেরকে ব্রিটেনের পক্ষে আনয়নের জন্য আদিষ্ট হন। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কিছু 'দুর্গম, সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর যখন তিনি রিয়াদ থেকে উত্তরদিকে অশ্বারোহণে তাঁর

ইখোয়ান সেনাদল সহযোগে হেলের তুর্কিদের অনুকূলে থাকা আমিরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত যুদ্ধে যাচ্ছিলেন তখন আমিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। যখন পদব্রজে ভ্রমণরত ছিল তখন দু'জন লোক বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করেছিল যার দ্বারা ব্রিটেন ইবনে সৌদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেবে আর নিশ্চয়তা দেয় যে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করবে। তাঁর কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ও ইবনে সৌদের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আসন্ন যুদ্ধের পূর্বেই স্থান ত্যাগ করবেন, শেক্সপিয়ার অবস্থান করাকেই বেছে নেন। ইবনে সৌদের মতানুসারে, তিনি স্থান ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান, ঘোষণা দিয়ে বলেন যে অনুরূপ করলে 'আত্ম সম্মান ও দেশের সম্মানের ওপর কলঙ্ক লেপন করা হবে।' ১৪ জানুয়ারি তিনি তাঁর ভ্রাতার নিকটে এই কথা বলতে লেখেন যে ইবনে সৌদের গাজু (যুদ্ধের দল) তারা সংখ্যায় ছিল কয়েক সহস্র রাইফেলধারী অশ্বারোহী ও একই সংখ্যক ভোজালী ও বল্লমধারী উষ্ট্রারোহী, 'বড় ধরনের যুদ্ধের নিমিত্তে' অগ্রসর হচ্ছিল, এবং তিনি তাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। তিনি এই মন্তব্য সহকারে তাঁর পত্রের ইতি টানেন যে, 'বিন সৌদ আমাকে চান আমি যেন সব খালি করে ফেলি কিন্তু আমি খেলাটি দেখতে চাই আর আমি মনে করি না এটা বাস্তবিক খুব বিপজ্জনক হবে। সবই শুভ হতে পারত যদি সে আরবের পোশাকের জন্য খাকি উর্দি ও উজ্জ্বল রৌদ্রের তাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ওক গাছের ছাল দ্বারা নির্মিত শিরস্ত্রাণ ছুঁড়ে ফেলে দিত, যেমনটি তাকে করতে বলা হয়েছিল।

১৯১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি দুই সেনাদল জরাব মরুদ্যানের নিকটের মরুভূমিতে একে অন্যের ওপর যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। ইবনে সৌদের বিশ্বস্ত সঙ্গীরা এক সঙ্গীন মুহূর্তে দল পরিবর্তন করার কারণে শেক্সপিয়ার আশঙ্কা করেছিলেন যে নেজদের আমিরের নিশ্চিত বিজয় শেষ মুহূর্তে বিনা সিদ্ধান্তে সমাপ্ত হয়েছিল। হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় হেলের আমিরের একদল অশ্বারোহী সেনা মূল যুদ্ধ পলায়ন করে বালিয়াড়িতে আঘাত হানে যেখানে শেক্সপিয়ার দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর সঙ্গের সৌদি রাইফেলধারীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে ক্যাপ্টেন শেক্সপিয়ারকে একটি মাত্র রিভলভারসহ বালিয়াড়ির শীর্ষে একা ফেলে যায়। তাঁর বাবুর্চি যে সংক্ষিপ্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল তবে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তাঁর মতানুসারে, সে পরে শেক্সপিয়ারের নগ্ন শরীর যেখানে পড়ে ছিল সেখানে দেখেছিল, তাঁর শরীরে তিনটি বুলেটের চিহ্নসহ।

বিদেশী দপ্তর কায়রোতে আরব ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এতে কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন বিদেশী মিস গারট্রুড বেল ও টি.ই. লরেন্স, এর প্রধান উদ্দেশ্য শরিফ হুসাইন ও তাঁর চারপুত্রের মাধ্যমে অটোমানদের বিরুদ্ধে

আরব বিদ্রোহ ঘটান। বিলম্বিত চুক্তির পর হুসেইন বিদ্রোহ করতে সম্মত হয় ব্রিটেনকে, শরিফকে আরবের শাসনকর্তা হিসেবে ও 'মক্কার শরিফের দ্বারা প্রস্তাবিত সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহসহ স্বাধীনতা'র স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে। ১৯১৬ সালে জুন মাসে তাঁর নিজের উপজাতীয় সেনারা মক্কার অটোমান দূর্গে হামলা করে, শরিফ হুসাইন সকল মুসলমানকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান তাদের খলিফাকে ক্ষমতাসীন তুর্কী নাস্তিক সরকারের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার করার জন্য—এই আহ্বানকে মুসলিম বিশ্বের অনেক অঞ্চল খিলাফতের বিদ্রোহ হিসেবে দেখল। নেজদের আমির ইবনে সৌদও এটিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করলেন, তবে বিশেষতঃ হুসাইন নিজেকে 'আরবদের বাদশাহ্' হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণে।

এটি এই সময়ে ছিল যে মিস গার্ট্রুড বেল জাতি-নির্মাতা সম্বন্ধে তাঁর কলমে চিত্রল বর্ণনা দেন তিনি লেখেন, 'ইবনে সৌদ বর্তমানে মাত্র চল্লিশ বছর বয়স্ক, একটি চমৎকার শরীরের অধিকারী মানুষ, ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা, তিনি নিজে একজন অভ্যস্ত আদেশদাতার ভাবভঙ্গি নিয়ে চলা ফেরা করেন...। একজন সদবংশীয় আরবের সকল গুণাবলি তাঁর মধ্যে রয়েছে। তাঁর চেহারাটা খোদাইকৃত মুখারযবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, মাংসল নাসা, পুরু ওষ্ঠদ্বয় এবং তাঁর সুডৌল মুখারয়বে সূচাল চিবুক মানানসই আদলে ছাঁটাইকৃত দাড়ি দ্বারা আবৃত।' ঠিক এই মিস গার্ট্রুড বেল এই আগামীদিনের জাতীয় নেতার প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন ইবনে সৌদ এখন কেবলমাত্র চল্লিশের কোঠায়, তিনি লিখেছেন, ছয়ফুট দীর্ঘ তাঁর শারীরিক সৌষ্ঠবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত যাতে মনে হত তিনি আদেশ দেবার জন্যই জন্মেছেন।' তথাপি মানুষটির ভয়ানক সম্মানের ব্যাপারে তিনিও সজাগ ছিলেন 'উষ্ট্রবাহিনীর মধ্যে তিনি একজন অক্লান্ত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাধ্যক্ষ হিসেবে স্বীকৃত। অনিয়মিত সেনাদলের প্রধান হিসেবে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, আর তাঁর সৈনিক গুণাবলির সঙ্গে রাজনীতি বিদ্যাকে আঁকড়ে ধরেন যার জন্য উপজাতীয় লোকজন তাঁকে এখনও আরও পুরস্কৃত করেন। তিনি 'বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আরব জাতি-গোষ্ঠী একত্রিত করে একটি সুশৃঙ্খল জাতি সত্তায় সংগঠিত করেছেন। যদিও সেটা সময় সময় দোদুল্যমান হয়ে পড়ে তথাপি এটি একটি রাজনৈতিক বিশেষত্বে আখ্যায়িত হয়।' এই গুণাবলি দিয়ে এটি দ্বৈতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ইবনে সৌদকে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশবাসীকে উৎসাহী করতে হবে 'শরিফের সঙ্গে পূর্ণ আপস-নিষ্পত্তিতে।'

কুয়েতে শেক্সপিয়ারের কর্মস্থলে একত্রিশ বয়স্ক সদা হাস্যোজ্জ্বল হ্যারি সেন্ট জন ফিলবি এখন উপনীত হন। তাঁর পূর্বসূরির মতই ফিলবি এই উপনিবেশ সিংহলে জন্ম গ্রহণ করেন—তাঁর ক্ষেত্রে—মায়ের দিক থেকে তিনি

ছিলেন ভারতীয়, তবে দেখতে ও মন মানসিকতায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে সম্পূর্ণরূপে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত। একজন বিশালদেহী, দাম্ভিক, আত্ম-প্রত্যয়ী ব্যক্তি যাঁর উইনচেস্টারের গৌরবান্বিত বৃত্তি, ও কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মতো অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত ডিগ্রী ছিল। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সাম্রাজ্যের বেসামরিক কার্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট লোকদের একজন হিসেবে পাঞ্জাবে যান, কিন্তু সেখানকার জনগণকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন রুক্ষ আচরণকারী কিন্তু সদয়চিত্ত ব্যক্তি ও চরমপন্থী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন, আর তিনি অতি সত্বর তাঁর থেকে নিচু শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ করে তাঁর সাধারণ প্রথাকে নাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঠেকানোর ভঙ্গি দেখিয়েছেন। ১৯১৫ সালে ফিলবি যখন ভারতীয় পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে তাঁর বহুবিধ-ভাষা দক্ষতার কারণে স্যার পার্সিকক্সের মেসোপটেমিয়ার তাঁর রাজনৈতিক মিশনে দোভাষী হিসেবে নিয়োগ পান তখন তিনি হতাশায় মন মরা হয়ে পড়ছিলেন। এখানে অবশেষে তিনি তাঁর গুরুত্ব দেখাতে লাগেন, ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর নেতৃত্বে নির্দেশনা দিয়ে রিয়াদে তিনি একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে ইবনে সৌদকে এই সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করেন। নভেম্বর মাস শেষ হওয়ার পূর্বে ফিলবি নিজেকে নেজদ সাম্রাজ্যের আমিরের সম্মুখে উপস্থিত করেন সম্পূর্ণ নতুন গজানো দাড়ি ও আরবীয় বেশভূষায় ছদ্মাবরণে উপস্থাপিত করেন। দশ দিনের কথাবার্তার পর ফিলবির দুই সহকর্মী ফিলবি সাহেবকে একাই ইবনে সৌদের সঙ্গে তাঁর দেন-দরবার চালাতে উপকূলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। প্রাথমিকভাবে ফিলবি ব্রিটিশ পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময়গুলোতে তাঁর মনে আমিরের প্রতি একটা ভক্তিভাব জাগরিত হয়েছিল, তাঁর ব্যক্তিগত সংস্কৃতির প্রতিও একই রকম শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, যে ভক্তিভাব শেষ মুহূর্তে, ফল পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসের আরব বিপ্লবের যার মাধ্যমে শরিফ হুসাইনের জ্যেষ্ঠতম পুত্র আমির ফয়সালের দ্বারা দামেস্কের শেষ সীমা পর্যন্ত দখল করে নেওয়ার গল্পটি সবারই জানা। সৌদিরা যে ভূমিকা পালন করে সেটা এই বাস্তবতায় বিচার করা যায় যে ইবনে সৌদের নামটি ঠিক একবারই লরেন্সের ধ্রুপদী সেভেন পিলারস অব উইসডম (জ্ঞানের সপ্তম স্তম্ভ)-এ উদ্ধৃত হয়, এবং তারপর কেবল প্রচলিত হচ্ছে।

কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে যে লরেন্স এটিকে বেঠিকভাবে নিলেন আর ফিলবি নিলেন ঠিকভাবে যখন এই মেধাবী বিতাড়িত, চিড় ধরান ব্যক্তিদ্বয় প্রত্যেকে আরবদের মধ্যে থেকে একজন করে প্রধানকে বাছাই করেন। শাহ্জাদা ফয়সাল সম্বন্ধে লরেন্সের সুন্দর রঙ চঙে ভাষায়, সুন্দর কল্পনার রঙে

রাঙানো ভাষায়—'বিশুদ্ধ ও খুবই সাহসী নেতা...একজন ধর্মীয় নেতা যিনি, এই আরবীয় বিদ্রোহের পরিকল্পনাকে প্রচ্ছন্নভাবে একটি গ্রহণযোগ্যতা যেন দান করেছিলেন—যা সর্বদা প্রাচ্য প্রতিম কৌশলী কার্য বিশেষ ছিল। সেন্ট জন ফিলবির ইবনে সৌদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বেশ আন্তরিক, যা হোক তিনি নিজে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ঠুর হিসেবে আবির্ভূত হন।

ফিলবি সর্বপ্রথমে ইবনে সৌদের শরিফ হুসেন সম্পর্কে 'দগ্ধকারী হিংস্রতায় আঘাত পান, তাদের প্রথম দিক্কার সভায় যার সম্পর্ক অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ অর্থ তহবিল ও অস্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় যাতে তিনি তাঁর দ্বৈত উচ্চাকাঙ্খাকে পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেন হেলকে পুনরুদ্ধার করা, এবং শতবছর পূর্বে আব্দ-আল-আজিজ ইবনে সৌদ নামীয় তাঁর পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হেল সাম্রাজ্য পুনঃরুদ্ধারের সংকল্পে একতাবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ফিলবি রিয়াদে যত দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে থাকেন ততই তিনি ইবনে সৌদের ব্যবহারে হতবাক হতে থাকেন। কেননা ইবনে সৌদ আচার-আচরণে এবং ভাবে-ভঙ্গিমায় নিজ জাতির পিতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করতে থাকেন। তিনি শারীরিকভাবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থানে ছিলেন আর নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার ও সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রভাবশালী মহলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার দিকে গুরুত্বারোপ করেন, গণনামতে তিনি ২৩৫ জন পত্নী ও ৬৬ জন উপপত্নীর অধিকারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ওয়াহ্হাবি বংশীয়দের মাঝে বিবাহসূত্রে ইবনে সৌদের ঔরসে শাহ্জাদা ফয়সালের জন্ম হয় এবং সেই ওয়াহ্হাবি মতবাদের অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃত হয়, পরবর্তীতে তিনি উত্তরসূরি যুবরাজ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বশেষে বাদশাহ হিসেবে সৌদি সিংহাসনে আসীন হন।

কুয়েতে অবস্থানকালে উদারপন্থী ইসলামে তাঁর সংস্রব ও বাস্তব জ্ঞানোচিত রাজনীতির কারণে ব্রিটিশদের সঙ্গে সদ্ভাব উভয় কৃতিত্বে তিনি ওয়াহ্হাবিদের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেন এবং সকলকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে অনুপ্রাণিত করেন। ফিলবি স্বচক্ষে যা দেখে লিপিবদ্ধ করেন, ইবনে সৌদ ১৯১৮ সালে ওয়াহ্হাবি ইতিহাস ও তাঁর সমগ্র দেশব্যাপী বিতরণের জন্য আল-ওয়াহ্হাবের বেশ কিছু মূল গ্রন্থাংশ বোম্বেতে মুদ্রিত করার আয়োজন করেন। তাঁর পিতার মৃত্যুতে যখন নেজদের ইমাম খেতাব গ্রহণ করছিলেন, তখন তিনি নিশ্চিত করেন যে আল আস—শেখই প্রধান মুফতি থেকে নিম্নের জ্যেষ্ঠ উলেমাদের পদ পূরণ করেন। ফিলবি লেখেন,

> 'তাঁদের সাধারণ নির্দেশনাধীনে, নির্দেশনা ও দেশের ধর্মীয় প্রশাসন উলেমাদের বা ধর্মীয় নেতৃবর্গের নিকটে বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল...। তাঁদের প্রশাসনিক কার্যাদি ব্যতীত এই ধর্মীয় প্রতিনিধি দল শরিয়া আইনে প্রশাসনের জন্য দায়গ্রস্ত থাকে, তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ প্রাদেশিক আমিরদের উপরে আবশ্যিকভাবে পালনীয়, যাঁরা কেবল স্বাক্ষর করেন এবং সেগুলোকে কার্যে পরিণত করেন...। তাঁরা মুতাওয়ায়িন বা নিম্ন শ্রেণীর ধর্মীয় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনার জন্যেও দায়ী থাকে, যারা কোন প্রশাসনিক বা বিচারবিভাগীয় কার্য সম্পাদন করে না, যারা কোন প্রশাসনিক বা বিচারিক দায়িত্বে ছিল না। বেদূঈনদের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত করে প্রতি পঞ্চাশ জনের মাঝে যা একটি করে বাহ্যত বিতরণ করা হয়েছিল। এগুলোর নিম্নে রয়েছে আবার তালমিধের একটি দল বা আদেশ দেওয়ার জন্য প্রার্থীবৃন্দ যারা মুতাওয়ায়িনদের নির্দেশনাধীনে থেকে সাগ্রহে আকাঙ্খা করে একদিন তারাও তাদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হবে আর এভাবেই মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

এই পন্থাসমূহের দ্বারা ইবনে সৌদ তাঁর বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ওয়াহ্‌হাবীয় মতধারাকে এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হন। যেটি আল শেখের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো।

এই সব ধর্মীয় প্রতিনিধিদলের দ্বারা ধর্মমত বেশ সবলভাবে উন্নত হওয়ার প্রেক্ষিতে হ্যারি সেন্ট জন ফিলবির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর পূর্বসূরি পলগ্রেভ থেকে শেক্সপিয়ারের তুলনায় কম শত্রুভাবাপন্ন ছিল না। ইখোয়ানরা তাদের পক্ষ থেকে যখন তিনি আসতেন তখন ঘৃণার সাথে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর সালামের প্রত্যুত্তর দিত না। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় তিনি নিরুত্তাপ আনন্দের সাথে তাদের আপ্যায়িত করেছিলেন। এই গোড়ার সময় থেকে টিকে যাওয়া একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে তিনি লেখেন, 'তাদের অন্তর ধর্মান্ধতায় তিক্ত।' কিন্তু সময়ের সাথে ও পুনরায় প্রকাশে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে পলগ্রেভের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ফিলবি আরবীয় মরুভূমি অতিক্রম করে রিয়াদ থেকে জেদ্দায় যান, হজ্জ যাত্রীদের তাঁবুর পাশে অগ্নি প্রজ্জলনের প্রাচীন ধারা অনুসরণ করে জেদ্দায় তিনি নিজেকে শরিফ হুসাইনের কাছে উপস্থাপিত করেন, যাঁকে তিনি দেখেন 'বৃদ্ধ, ক্ষুদ্র, শান্ত, সৌজন্যের নিদর্শন স্বরূপ; তবে ফিলবির প্রধান শত্রুর শিবির থেকে অঘোষিত আগমন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে। তাঁর পূর্বের শেক্সপিয়ারের মত ফিলবি আরব ব্যুরোর সাথে ইবনে সৌদের ব্যাপারে বিতর্ক চালাতে থাকেন, কেবল অভদ্রভাবে বলেন যে লর্ড কার্জনের বর্ণনা মতে, 'ব্রিটিশ নীতিমালা ছিল

হাশেমীয় ধ্যান-ধারণা ঘেঁষা।' তিনি রিয়াদে এই সংবাদসহ ফিরে এলেন যে ব্রিটেন ইবনে সৌদকে মাসিক স্বর্ণের ভাল ভাতা প্রদান করবে, তবে শরিফ হুসাইনকেও সমর্থন দিয়ে যাবে। ফিলবি তখন ছুটিতে ইবনে সৌদের উপহার আনুষ্ঠানিক তরবারি ও একটি শ্বেত অশ্বসহ গৃহে যান।

এই আকস্মিক বাধায় সৌদের প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর ইখোয়ানদের মুক্ত করে শরিফ হুসাইনের ব্রিটিশ-প্রশিক্ষিত সেনাদের মক্কার উপকণ্ঠে ফেরত পাঠান ও তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ্জাদা আব্দুল্লাহ্কে নৈশকালীন পোশাক পরিধান করিয়ে পলায়নে সাহায্য করেন। ফিলবিকে মধ্যস্থতা করতে বলা হয়, তবে তিনি জেদ্দায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একটি অস্থায়ী শান্তি সাময়িকভাবে মীমাংসা করে ফেলে না। এই সময় থেকে অগ্রবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ কার্যধারার তিনি একজন কট্টর সমালোচক বনে যান আর ইবনে সৌদের পক্ষে আরও উৎসাহী হয়ে সমর্থন দেন এই হিসেবে 'কেবল একজনই মহান ও বিশিষ্ট ব্যক্তি' রয়েছেন আরবে।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে লরেন্সের লোক শাহ্জাদা ফয়সালকে সিরিয়ার শাসনকর্তা ঘোষণা করা হয়, 'বিষয়টি ফ্রান্স নিজের এখতিয়ারে নিয়ে তাঁকে বহিষ্কার করতে পারে।' ১৯২১ সালে ফয়সালের ভ্রাতা শাহ্জাদা আব্দুল্লাহ্র ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় যখন ব্রিটেন তাঁকে ট্রান্স-জর্দানে তাঁর রাজ্য স্থাপনের অনুমতি দেয়। কিন্তু একই গ্রীষ্মকালে রশিদির হেল রাজ্যের যৎসামান্য সেনাসদস্য অবশেষে ইখোয়ানদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই হামলা করে নেজদ রাজ্যকে তাঁর পূর্বাবস্থায় ফেরাতে চায়। শরিফ হুসাইন এখন হিজাজের আমিরত্ব নিয়ে হিজাজ ত্যাগ করেছেন, তবে এখনও তাঁর প্রত্যাশা ব্রিটেন তাঁর বংশকে আরবের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠান নিশ্চিত করে ব্রিটেন তার প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক দ্বারা তুরস্কে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সংরক্ষণশীল মুসলিম মহলে আতঙ্কের কারণ হয়ে মিসরে একটি উদার সরকার গঠিত হয়। শরিফ হুসাইন জবাবে নিজেকে ইসলামের ও তাঁর হাশেমীয় বংশের খলিফা হিসেবে ঘোষণা দিলেন যার ফলশ্রুতিতে আরবীয়রা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তারা ব্রিটিশদের সাথে তাঁর সখ্যতাকে সুনজরে দেখে নাই। অতঃপর তিনি ইখোয়ানদের হজ্জব্রত পালন নিষিদ্ধ করেন—যা ইবনে সৌদের যোদ্ধাদের কাছে একটি সংঘাতিক উত্তেজনা ও পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ করার একটি পরিপূর্ণ অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জেদ্দার দোর গোড়ায় ইবনে সৌদ ইতস্ততঃ করে অপেক্ষা করতে থাকে ব্রিটিশ সরকার শরিফ হুসাইনকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে কিনা তা দেখার জন্য। এর জবাব ছিল তাঁর অধিকার ত্যাগকরণ তত্ত্বাবধান করা এবং নির্বাসনে

প্রহরী সরবরাহ করা। যখন একটি বিকল্প বাহিনীর অগ্রগামী ঝাপটা জর্দান ও ইরাককে শঙ্কায় ফেলেছিল তখন তাদের মূল বাহিনী মক্কা ও মদিনা অধিগ্রহণ করে জেদ্দার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। মনোযোগ ভিন্নমুখী করার জন্য মুসলিম দরবেশদের সমাধিপূজার বিরোধিতার জন্য নবী (সা.)র কন্যা ফাতিমার সমাধিসহ অনেক মুসলিম দরবেশের সমাধির পবিত্রতা নাশ করে ফেলে।

হ্যারি সেন্ট জন ফিলবি এখনও ভারত সরকারের বিদেশী ও রাজনৈতিক কাজের একজন নামমাত্র কর্মকর্তা, বর্ধিত ছুটিতে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করেন। এখন তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আরবে প্রত্যাবর্তন করে ইবনে সৌদের সাথে গোপনে লোহিত সাগরের উপকূলে সাক্ষাত করেন। আর তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি মতে, জেদ্দার দুর্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য প্রদান করেন। তিন সপ্তাহ পরে ইখোয়ানরা জেদ্দা নিয়ে নেয়, ও ইবনে সৌদ নিজেকে হিজাজের আমির এবং পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা দেন। ফিলবি তাঁর নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার স্বরূপ জেদ্দার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন তুরস্ক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এবং ওখানেই তাঁর বসতি স্থাপন করেন।

ইউরোপীয় ক্ষমতা ও প্রশস্ততর মুসলিম বিশ্ব উভয় সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ থেকে ইবনে সৌদ এখন তাঁর গোঁড়া ইখোয়ানদের ধর্মীয় গভীর আগ্রহকে ধরে রাখার জন্য এবং তাঁর ওয়াহ্হাবি জাতিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। আনন্দ ধ্বনি দিয়ে মাঝে মাঝে সতর্ক করা সত্ত্বেও ইখোয়ানরা মক্কার পথে দাঙ্গাবাজিতে লিপ্ত হতো—তবে পবিত্র স্থানগুলো সন্তর্পণে বিপদমুক্ত রাখা হতো এবং অভিযাত্রীদের হজ্জে কোন বাধা দেওয়া হতো না। ওয়াহ্হাবি ধর্ম প্রশাসকের চোখে শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতেন। যারা মান্য করত, এভাবে জননৈতিকতা প্রতিপালন করা হতো; এবং নেজদের ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাবের ধর্মীয় বিধানগুলো বাস্তবায়িত করা হতো। ইবনে সৌদ ফিলবির সহযোগিতায় ব্রিটিশ সরকারকে বিশ্বাস করার জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। যে তিনি ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের স্থায়িত্বের পক্ষের একটি বোঝানোর শক্তি আর তাঁর রাজ্যের দিক থেকে কোন উচ্চাকাঙ্খা ছিল না এবং ওয়াহ্হাবিবাদ ছিল এই অঞ্চলে 'সত্য গণতন্ত্রের' পক্ষের একটি উপায়। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রীয় এশীয় সমাজে লর্ড অ্যালেনবির সভাপতিত্বে এই অভিযানের একটি মত প্রকাশ ছিল ওয়াহ্হাবিবাদের ওপর একটি অসাধারণ বক্তৃতায়। বক্তা হাফিজ ওয়াহাবা বর্ণনা দেন 'হেদজাজের মহারাজ ও শিক্ষা মন্ত্রীর পরামর্শদাতা' হিসেবে। নাম হাফিজ ওয়াহাবা হওয়া সত্ত্বেও তিনি বেদূঈন ছিলেন না তবে একজন মিসরীয় প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন যিনি ১৯২০ দশকের গোড়ার দিকে এই বলে পরিসমাপ্তি টানেন যে আরবের স্বাধীনতা ইবনে সৌদের সমর্থনে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহৃত হবে। ১৯২২ সালে তিনি রিয়াদে অগ্রসর হন ওয়াহ্হাবিবাদকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেন, ইবনে

সৌদের বৈদেশিক সর্বাধিক স্পষ্টবাদী মুখপাত্র হওয়ার জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কেন্দ্রীয় এশীয় সমাজে তাঁর বক্তৃতায় হাফিজ ওয়াহ্হাবা আল-ওয়াহ্হাবের সত্য বলে যথাবিধি দৃঢ় ঘোষণা সম্বলিত ধর্মতত্ত্বের একটি আরবি সংস্করণ উপস্থাপন করেন, আর দেখান এখন কতটা বিশিষ্টভাবে এটি সম্মানীয়। তিনি তাঁর শ্রোতৃবর্গকে নিশ্চয়তা দেন যে উলেমাদের সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তিদ্বয় মিসরের বর্তমান প্রধান মুফতি ও কায়রোর আল-আকসা মসজিদের প্রধান ইমাম—তাঁর আল-ওয়াহ্হাবের ধর্মীয় শিক্ষা পুনরায় ঘোষণা দেন যে 'প্রতি মুসলিম দেশে শিক্ষিত শ্রেণী ওয়াহ্হাবি অনুশীলনে রয়েছে, যদিও নামে ও উৎসে নয়, এটি সেই শ্রেণী যা সকল মুসলিম বিশ্বে যথাযথভাবে স্বীকৃত, যেটি আত্ম-প্রত্যয়ের বাণী প্রচার করে।' উভয় দাবি প্রশ্নাতীত থেকে গেল।

কেন্দ্রীয় এশীয় সমাজে শেখ ওয়াহ্হাবার বক্তৃতাটি সমাজের পত্রিকাতে 'ফিনিক্স' ছদ্মনামের লেখকের প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়, ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের একটি ইঙ্গিত ও এর মতামত দিয়ে, প্রায় নিশ্চিতরূপেই ফিলবি এই পত্রিকার লেখক বনে যান। জিহাদের ওয়াহ্হাবি ব্যাখ্যা এখানে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় 'আইন বলবৎ রাখার জন্য যুদ্ধের প্রতিপালন ও ধর্মান্ধতার জীবনী শক্তি' হিসেবে।'

টি.ই, লরেন্সের নিকটে ইবনে সৌদের আরব সাম্রাজ্য ছিল 'বালির ওপর নির্মিত অলীক স্বপ্নসৌধ।' তিনি ও অধিকাংশ অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে বলেন যে ইবনে সৌদের রাজ্য অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। ওয়াহ্হাবি উলেমারা শত্রুতার সঙ্গে ইবনে সৌদের টেলিফোন ও মোটর গাড়ির মত যান্ত্রিক বস্তু ও যান ব্যবহারে প্রবর্তনের প্রত্যেক প্রয়াসে ওয়াহ্হাবি উলেমারা শত্রুতার সঙ্গে বিরোধিতা করছিল। কেননা এ ধরণের নতুন প্রবর্তনের কথা পূর্বে কোরানে বা হাদিসে বর্ণিত হয় নি। একই সাথে ইখোয়ানরা বিধর্মীদের ইরাক ও সিরিয়ায় অনধিকার হামলা চালিয়ে ক্রমবর্ধমান হারে তাদের ইমামের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করছিল। এটি সত্ত্বর ইবনে সৌদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে যদি ইখোয়ানরা হামলা চালাতে থাকে, তবে ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করবে। তাঁর জবাব ছিল তিনজন সেনাপতিকে বরখাস্ত করা, যাদের সেনাদল কিছু নেজদি বণিককে হত্যা করে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। সমন্বয় সাধনের একটি প্রস্তাব করা হলো ও প্রত্যাখ্যাত হলো এবং ১৯২৯ সালে সৌদি রাজানুগত ব্যক্তিবর্গ চারটি ব্রিটিশ উড়োজাহাজ আর দুই শ রেডিও সজ্জিত মোটর গাড়ি এবং সেনাদল বহনকারী যানের সহায়তা নিয়ে ইখোয়ান অশ্বারোহী সৈন্যদলের সঙ্গে নেয় প্রাচীন রাইফেলসমূহ, বল্লমগুলো ও তরবারি সকল। দশ মাস পরে কুয়েত সীমান্তে অবশিষ্ট বিপ্লবীদের ব্রিটিশ সেনাদলের নিকটে আত্মসমর্পণের সাথে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৩০ সালের শেষে স্থায়ী আন্ত-বিবাদীয় যুদ্ধ যা মহানবী (সা.)র সময়ের পূর্ব থেকে আরবকে বিপর্যস্ত করেছিল অবশেষে সেটির অবসান হয় সৌদি আরবকে ইসলামি রাষ্ট্র করার উপায়ের মধ্য দিয়ে। দেওয়া-নেওয়ার একটি কূটনৈতিক মিশ্রণের দ্বারা ইবনে সৌদ তাঁর ওয়াহ্হাবি উলেমাদের নতুন ধারা প্রবর্তনের সাথে একমত করান যা তাদের কর্তৃত্বে কোন প্রশ্নের অবতারণা করে নি। তিনি নিশ্চিত করেন যে তাঁরা তাদের করসমূহ গ্রহণ করেছেন যেহেতু সেগুলো তাদের পাওনা ও তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এ ধরনের চূড়ান্ত বিষয়ে যেমন তাঁর ইমাম হিসেবে জিহাদ করার জন্য আদেশ দেওয়া ও স্থগিত করার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আছে কি না। প্রত্যুত্তরে আস-শেখের অধীনস্থ উলেমারা তাঁদের সমর্থনে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দেন কেবলমাত্র মসজিদসমূহে ও আইন-আদালতসমূহে ওয়াহ্হাবি শরিয়া প্রয়োগ করলে চলবে না তবে ঠিক সমগ্র দেশব্যাপী সেটা করতে হবে।

হ্যারি সেন্ট জন ফিলবির তাঁর ইবনে সৌদের পক্ষে প্রয়াস চালানোকে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ছোটখাট দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেন। একজন বিদেশী অফিসের কর্মকর্তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে রাষ্ট্রের গুপ্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠান, 'তিনি মধ্যপ্রাচ্যে সরকারে ও এর নীতিমালার বিষয়ে ও ভুল বর্ণনা করার সুযোগ হারান নি। তাঁর পদ্ধতিগুলো যেমনি বিবেকবর্জিত তেমনি হিংসাত্মক। তিনি একজন জনক্ষতিকর ব্যক্তি আর এটি তাঁর প্রাপ্য ও তাঁর গুপ্ত চক্রান্ত যা ইবনে সৌদের—যার ওপরে তিনি দুর্ভাগ্যবশত কিছু প্রভাব খাটান—বিগত কয়েক বছর আমাদের খুবই কষ্ট দিয়েছে।' কিন্তু জেদ্দায় তাঁর নতুন বাসস্থানে ফিলবি খুব কম সন্দেহের উদ্রেক করে নি। ডাচ (ওলন্দাজ) রাষ্ট্রদূত কর্ণেল ভ্যান ডার মিউলেনের কাছে, তিনি নিজেকে একজন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করেন।

'আপাতভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন ইংরেজদের চলতি প্রথাকে কঠিন আঘাত দিতে পোশাকে, চেহারায় এবং সাধারণ সামাজিক আচরণে,' তবে আরও 'সর্বদা দ্বন্দ্বে থাকেন তাঁর মরুযাত্রীদল বিষয়ে আরবদের সাথে, সরকারের সাথে তাঁর নিজের কর্মচারীদের সঙ্গে এবং আমি মনে করি, সব থেকে বেশি তাঁর নিজের সাথে।' ভ্যান ডার মিউলেনের মতে, একটি সময় এলো যখন তাঁর কাছে সমাজচ্যুত ব্যক্তিরা এসে মন্তব্য করল, 'আমরা তো খ্রিস্টান নই, তাহলে আমরা কেন মুসলমান হব না?'

১৯৩০ সালের অগাস্ট মাসে ফিলবি ইবনে সৌদের নিকটে সাগ্রহ আকাঙ্খার কথা জ্ঞাপন করে একটি আনুষ্ঠানিক পত্র লেখেন, 'অন্য সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একজন মুসলিম হওয়ার জন্য।' তিনি জনগণের মধ্যে ঘোষণা দিতে থাকেন যে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ঈশ্বর নেই আর মোহাম্মদ (সা.) তাঁর

দাস ও দূত।' 'ভাল পূর্বপুরুষদের কিতাবসমূহে যে সকল বিষয় লিখিত রয়েছে আর বিশেষত শেখ ইবনে তায়মিয়া (ইবনে তায়মিয়া, মধ্যযুগীয় ব্যবহার—শাস্ত্রজ্ঞ)র বর্ণনাসমূহ, ইবনে কায়েম আজ-জো জিয়াহ্ (আল কায়িম আল-জোজিয়াহ, ইবনে তায়মিয়ার নেতৃস্থানীয় শিষ্য), এবং পরবর্তী যুগের শেখ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব; আল্লাহ্ যেন তাঁকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন।' এগুলোকে উৎসুক হয়ে অনুসরণ করবেন বলে ঘোষণা দেন।

তারপরে ফিলবিকে সত্ত্বর ইবনে সৌদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান হয়। পবিত্র মক্কা নগরীর উপকণ্ঠে তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত একটি তাঁবুতে তিনি তাঁর পোশাক খুলে ওজু করে, হজ্জযাত্রীর শ্বেত পোশাক পরিধান করেন, এবং প্রহরাধীনে মক্কার মহা সমাবেশস্থলে যান যেখানে তিনি কাবার কৃষ্ণ প্রস্তরে চুম্বন করেন এবং পবিত্র জমজম কূপের পানি পান করার পূর্বে সাতবার কাবাগৃহের চতুর্দিকে পাক দেন। পরবর্তী দিন সকালে ফজরের নামাযের পর ওয়াহ্হাবি আমির ও ইমাম তাঁর দুই গণ্ডে চুম্বন দিয়ে তাঁর নাম দেন আব্দুল্লাহ্, যে নামের অর্থ আল্লাহ্র গোলাম।

হোপ গিল নামে একজন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ঐ গ্রীষ্মকালে ফিলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিলবির ধর্মান্তরণ বিষয়ে প্রমাণ-যুক্তির দ্বারা দৃঢ়প্রত্যয়ী হন যে এটি তাঁর একটি সুযোগ গ্রহণের ব্যাপার ছিল। 'যা-ই ঘটুক তিনি দাবি করেন নি যে তাঁর ধর্মান্তরণ ছিল আধ্যাত্মিক।' তবুও সন্দেহ থাকতে পারে না ফিলবি বিশ্বাস করতেন যে তিনি ইবনে সৌদের আরবের উন্নতি বিধান করছিলেন। আমিরের পরামর্শে সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এই খেতাবের ব্যাখ্যা দিয়ে 'কেন আমি ওয়াহ্হাবি হলাম?' এর কিছু অংশ পঠিত হয় 'আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান আরবীয় চরমপন্থী আন্দোলন ভবিষ্যৎ প্রবল নৈতিক ভিত্তির ওপর রাজনৈতিক বিশালতা ও ভীতের বার্তাবাহী যুগারম্ভ...। আরবীয় ধর্ম ও রাজনৈতিক আদর্শকে আরবের বিশালতার উন্নয়নে সর্বোত্তম সহযোগিতার পদ্ধতি হিসেবে আমি আমার সহানুভূতির একটি মুক্ত ঘোষণা দেই।'

তাঁদের প্রথম সাক্ষাতে ফিলবি যখন তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন তখন ইবনে সৌদ উত্তর দিয়েছিলেন 'আমরা আমাদের উপরে উঠাই নি, আমরাও তাঁদের উপরে চড়ে বসি নি। আমরা তাঁদেরকে যা দিতে পারি তা-ই দেই...। এবং যদি তাঁরা তাঁদের সীমা অতিক্রম করে তবে আমরা তাঁদেরকে আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করাব। যা ফিলবি সাহেব ইবনে সৌদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের তাঁর বর্ণনায় সেটি ছিল যে এই শৃঙ্খলার মিষ্টতা ছিল অতিমাত্রায় কঠোর,... কয়েক লক্ষ ভয়ঙ্কর মৃত্যু ও কাটা ছেঁড়ার বিষয়গুলো বর্জন করেছেন। ইখোয়ানরা শহর ও নগরীসমূহ দখল করার সময় সামগ্রিক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইবনে সৌদের প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক

সরকার বিরোধীদের নির্দয়ভাবে দমন করে ওয়াহ্হাবি শরিয়াকে রক্ষা করে। তাঁর নিয়োজিত শাসনকর্তাবৃন্দ জানান যে ইবনে সৌদের চাচাত ভ্রাতা আব্দুল্লাহ্র নেতৃত্ব নিয়ে তাঁর প্রবল উৎসাহে দেশের সর্বত্র থেকে বহু ঈশ্বরবাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে জনতার শিরঃচ্ছেদ আর সাড়ে তিন লক্ষ লোকের তরবারি দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন করেন।

কার্যের দুটি দীর্ঘ মেয়াদেরও উর্ধ্ব সময়ে ১৯২৬ ও ১৯৪৫ এর মধ্যে জেদ্দায় ওলন্দাজ ভ্যান ডার মিউলেন আরবের ঘটনাসমূহের বিরাগপূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে ওঠেন। সৌদি আরব সৃজনের জন্য যে নির্দয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেটি ইবনে সৌদ স্পষ্টত দেখে অনুমোদন করেন—তাঁর প্রতিবেদনে এগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হয়েছে। আমির নিজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে নেদারল্যাণ্ডসের রানি এই বাস্তব ঘটনাসমূহ জানবেন 'আমরা কঠোরভাবে আচরণ করেছি, এমন কি নির্দয় ভাবে...। এটি ভাল যে আপনি আমাদের ধর্মমত সম্বন্ধে ও আমাদের ভ্রাতাদের সম্বন্ধে জানবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ্ মহিমান্বিত একজন আমাদেরকে ব্যবহার করেন তাঁর হাতিয়ার হিসেবে।

ওলন্দাজ ফিলবি সাহেবের থেকে বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে ইবনে সৌদ ও ইখোয়ানদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধকে অনুসরণ করতে পারেন। তিনি পরবর্তীতে লেখেন, 'ইখোয়ানদের আন্দোলন চরম আকার প্রদর্শন করে যাতে ওয়াহ্হাবিবাদ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়। যদি ধর্ম আত্ম-অধিকার ও আদিম আত্মার উৎকৃষ্টতা উৎসাহিত করতে ব্যবহৃত হয় এবং যদি এটি এখন ধর্ম যুদ্ধের কর্তব্য শিক্ষা দেয়, তার ফলাফল বীরত্ব, নিষ্ঠুরতা, মনের সংকীর্ণতা, ও যা দয়ার ক্ষয়িষ্ণুতা আর একজন মানুষের মধ্যে যা সত্যিকার মূল্য এবং এক জনসমষ্টির।'

১৯৩২ সালে তাঁর পূর্বপুরুষদের দেশকে সুদৃঢ়, শান্ত ও শান্ত করার সাথে সাথে ইবনে সৌদ তাঁর দ্বৈত রাজ্য নেজদ এবং হিজাজজে বলে উচ্চ কণ্ঠে জাহির করেন। হাজি আব্দুল্লাহ্, সাবেক সেন্টজন ফিলবি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যাণ্ডার্ড তেল কোম্পানিকে তেল অনুসন্ধানের কাজে ব্রিটিশ ইরাক পেট্রোলিয়ামের প্রতিপক্ষে অবস্থান নেন। এটি আরামকো কনসেশনের গোড়া পত্তন করেছিল যা সৌদি আরবের সম্পদের স্ফূরণ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দেশটির সম্পর্কের ক্ষেত্রে নব দিগন্ত রচনা করেছিল।

১৯৫৩ সালে আরবের প্রতিষ্ঠাতা পিতা মৃত্যুবরণ করেন আর সিংহাসন এবং ইমামতি তাঁর অনেক পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম পুত্র প্রথম সৌদ ও তখনকার ফয়সালের ওপর উত্তরাধিকার সূত্রে অর্পিত হয়। মুসলিম দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠার সাথে অধর্মীয় কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে

মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনের প্রাধান্য পায়, যেমন প্রতিবেশী মিসরে প্রেসিডেন্ট নাসেরের সরকার। মুসলিম বিশ্ব লীগের প্রতিষ্ঠাতা সংস্থা, মসজিদের জন্য বিশ্ব সুপ্রিম কাউন্সিল এবং অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে খাড়া করা হয় বিশেষত ওয়াহ্হাবিবাদকে উন্নত করার লক্ষ্যে। যাহোক, সৌদি আরব রাজ্যের তুলনামূলক দারিদ্র্য প্রাথমিকভাবে সীমান্তের বাইরে ওয়াহ্হাবিবাদকে ফলপ্রসূভাবে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া থেকে উলেমাদের বিরত রাখে—আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের কারণে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত যখন ওপেক (OPEC) সংস্থার সিদ্ধান্তে তেলের মূল্য গগন চুম্বি হয়েছিল। সৌদি আরব সহসা পেট্রোডলারের তরঙ্গে বিধৌত হয়ে যায়, আর অবশেষে ওয়াহ্হাবি কর্তৃপক্ষ বৃন্দ বিপুল পরিমাণে ওয়াহ্হাবি সাহিত্য উপস্থাপন ও যেখানেই সুন্নি সম্প্রদায়ের মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হয়। ভারত উপমহাদেশ এই দানগ্রহীতা দেশ হিসেবে শীর্ষ স্থানে পৌঁছায়।

অধ্যায় এগার

একত্রে আগমন

> সে সময়ের উদ্দীপনা বুঝতে হলে আমাদের তখনকার অনুভূতির ক্ষেত্রগুলোকে মনে করতে হবে—অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, গভীর আগ্রহ, দু:সাহসিকতা, আর বিশ্বমাতৃক ঐক্য—যার মধ্যে ক্রুসেডের অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। এরই সমমাতৃক অবস্থা সীমান্তের অপর পারের উদ্দীপ্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এরই মধ্যে নিহিত ছিল মূল ধারার মোহাম্মদি ইসলামের পূর্ণতাপ্রাপ্ত কিন্তু প্রচ্ছন্ন ও নিষ্ঠুর উদ্যমের বিকাশ, যা রক্ষণশীল ওয়াহ্হাবিবাদের প্রচারণা এটিকে দাবানলের মত জ্বালিয়ে দিয়েছিল।
>
> ১৮৬৮ সালের পাঞ্জাব সরকারের প্রতিবেদন থেকে উদ্বৃতাংশ।

১৯১১ সালে উত্তর ভারতে দুটি খুবই ভিন্ন সমাবেশ উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। রাজকীয় সমাবেশে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও বিলাসবহুল কোন কিছু যা সর্বত্র এক ডাকে পরিচিত ছিল তা হলো দিল্লি দরবার, এখানে রাজা-সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিংহাসন আরোহণকে উদযাপন করার জন্য নির্বাচিত করা হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এর স্থান দিল্লি প্রাচীরের পাশে নির্বাচিত করা হয়েছিল, এই জন্য যে এখান থেকেই ১৮৫৭ সালের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশরা বিদ্রোহী নগরীকে প্রচণ্ড আক্রমণ করার পূর্বে পলায়মান সৈন্যদলকে পুনর্গঠিত করে। দিল্লি সমতলভূমি দীর্ঘ পঁচিশ মাইল জুড়ে ২৩৩টি তাঁবুর আস্তানা গাড়া হয়েছিল যার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল যোগাযোগের জন্য রেল লাইন। এই স্থানের মধ্য ভাগে ছিল চতুর্দিক উন্মুক্ত একটি মঞ্চ (প্যাভিলিয়ন) যেখানে রাজা-সম্রাট নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর নিবিষ্ট ভারতীয় ভক্ত প্রজাদের ১২ই ডিসেম্বরে আনুগত্যের অর্ঘ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী দিনে তিনি ও রানি মেরী মুঘলদের লাল কেল্লার দিকে অগ্রসর হন নিচের উন্মুক্তস্থানে সমবেত ভারতীয় জনগণের কাছে নিজেদেরকে উপস্থাপিত করতে। এখানে, একটি সরকারি পুস্তিকার বর্ণনানুযায়ী, 'এক উত্তাল

জনসমুদ্র পতাকা উড়িয়ে ও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মুসলমান, শিখ ও হিন্দুদের এক বিরাট জনতা পাদশাহ্‌কে অভিবাদন জানাতে সোচ্ছাসে সম্মুখে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল। সমগ্র দৃশ্যপটটি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল যাতে করে মুঘল দরবারে জাঁকজমকপূর্ণ বৈভবের ছাপ দেখে মনে হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা সেই রাজকীয় ঐতিহ্যের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী এবং তারা এখানে অবস্থান করতেই আগমন করেছে।

আট মাস পূর্বে একটি খুবই ভিন্ন ধরনের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, দিল্লির বর্হিদিকে একটি ধীরস্থির অভিপ্রায়মূলক অসি যুদ্ধে প্রত্যাঘাত করার ব্যয়বহুল অনুশীলন তখন দিল্লির বাইরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উত্তরে আশি মাইল দূরে তৎকালীন দার উল-উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার বৃহৎ ময়দানে এই অনুশীলন কার্যটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপন পত্রে পুনর্মিলনী বলে এটি ঘোষিত হয়েছিল, এটি সম্মেলনেরও অধিক ত্রিশ সহস্র শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র উপস্থিত হয়েছিল, এবং সভাপতিত্ব করেছিলেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ষাট বছর বয়স্ক মাওলানা মাহ্‌মুদ উল-হাসান, ভারতে সর্বাধিক প্রভাবশালী মুসলিম ধর্মীয় পন্ডিত এবং যাকে তাঁর প্রশংসাকারীরা শাইখ-উল হিন্দ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

মাহ্‌মুদ উল-হাসানের ধর্মীয় কর্তৃত্বে উত্তরণ তিনি ১৮৬৬ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসায় এর প্রথম ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়ে উৎসর্গ করেছিলেন তার একাগ্রতা এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে মাহমুদ উল-হাসান স্নাতক হওয়ার পর দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ কাসিমের পূর্ণ সহযোগিতায় তিনি তাঁর নিজের সমারাতুত তারবিয়াত (প্রশিক্ষণের ফলাফলসমূহ) প্রতিষ্ঠার কাজ চালাতে থাকেন। সেবকদের ফেদায়ীন, বা 'আত্মত্যাগী ব্যক্তিবর্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো, আর তাদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করা—তবে বাস্তবে এই প্রস্তুতি কার্য খাকি উর্দিতে কুচকাওয়াজে সীমাবদ্ধ ছিল এবং মারাত্মক অস্ত্র বলতে যা বোঝায় সেই লাঠিই ছিল প্রধান অস্ত্র। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে বালক ও তরুণদেরকে নিয়ে গঠিত সামরিক শিক্ষানবিস বাহিনী প্রায় ভীতি প্রদর্শন করছিল, এবং মাহ্‌মুদ উল-হাসানের ফেদায়ীনকে প্রায় মুক্তভাবে কুচকাওয়াজ করার অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৮৮০ সালে মুহাম্মদ কাসিমের মৃত্যুর সাথে সাথে দেওবন্দ সংগঠনের নেতৃত্ব এর প্রথম সহ-প্রতিষ্ঠাতা রশিদ আহমদের ওপর অর্পিত হয় আর তারপরে, ১৯০৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এর দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় দেওবন্দের প্রথম স্নাতকের ওপর।

দার উল-উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষ হিসেবে মাহ্‌মুদ উল-হাসান এই উপ-মহাদেশে দেওবন্দির চিন্তার প্রসারের লক্ষ্যে সমস্ত কার্যধারার পৌরহিত্য

করেছিলেন, এশিয়ার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় যার ফলশ্রুতিতে দেওবন্দির অসংখ্য ধর্মাশ্রমগুলো কট্টর তৌহিদের অনুকূলে, উলেমাদের অনুকূলে, নতুন কিছু প্রবর্তনের বিরুদ্ধে, বহু ঈশ্বরবাদিতার বিরুদ্ধে, মৌলবাদী পুনর্জাগরণ পাঠ্যপুস্তক ও রচনাবলির কেন্দ্রতে পরিণত হয়েছিল যেখানে ওয়াহ্হাবি চিন্তা-চেতনা যা সিরিয়াতে ইবনে তায়মিয়া, এবং ভারতে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত আরবে আল ওয়াহ্হাব হয়েছিল। তবে দেওবন্দি ধারা সুন্নি জীবন ব্যবস্থাকে আরও রক্ষণশীল দর্শনে বিন্যস্ত করেছিল, তাই তারা ব্রিটিশদের প্রত্যাহার ও বিভাজনের কৌশলে কট্টর বিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী মহলের সমর্থনে গঠিত হচ্ছিল, আর এই অবস্থা বহু মুসলিমের মনে আতঙ্ক বৃদ্ধি করে যে ব্রিটিশ ছাঁচের প্রতিনিধি-স্থানীয় সরকার হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠদের দ্বারা শাসিত হবে। এর প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার্থে সর্ব-ভারতীয় লীগ গঠিত হয়। তবে মাহ্মুদ উল-হাসান ও অন্যান্য মৌলবাদীরা দেখলেন যে মুসলিম লীগ ব্রিটিশদের পক্ষাবলম্বন করে তাদের পুরাতন কৌশল 'বিভাজন ও শাসন' বাস্তবায়নে বরং সহায়তা করছিল।

এটি মাহ্মুদ উল-হাসানের সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গিয়েছিল যে তিনি ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে দার উল-উলুম দেওবন্দ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে ঘোষণা করেন যে এখনই সময় ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পুনর্বার শুরু করা। 'মাওলানা নানাউতবি [দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ কাসিম নানাউতবি] এই মাদ্রাসা কি শুধু শিক্ষা দান ও শিখনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন?' জানতে চেয়ে তিনি বলেন। 'এটি ১৮৬৬ সালে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে ১৮৫৭ সালে ক্ষয় ক্ষতি পূরণের জন্য মুসলিমদেরকে প্রস্তুত করে।'

দেখা যায় প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ কিছুটা উৎকণ্ঠার সঙ্গে এই ঘোষণা গ্রহণ করে, আর অবশেষে দার উল-উলুম দেওবন্দে নতুন অধ্যক্ষকে নিয়োগ দিয়ে খণ্ড খণ্ড দলে বিভক্ত হয়ে দেওবন্দ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। যাহোক, মাহ্মুদ উল-হাসানকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আধা বেসামরিক সংগঠন যা তিনি বহু বছর যাবত প্রতিপালন করে আসছেন এখন তিনি জামিয়াত-উল-আনসার বা স্বেচ্ছাসেবকদের দল নামে পুনর্গঠিত করলেন। এর ঠিক উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষবৃন্দকে এড়িয়ে চলা এটি ছিল প্রতিরোধের সেনাবাহিনীর মূল কেন্দ্র। দেওবন্দি স্নাতকবৃন্দ তাদের স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে কর্মকর্তা ও ধর্মীয় প্রতিনিধি পাঠাত, যখন তাদের নিম্ন পদস্থ সৈনিকদেরকে বর্তমানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান উপজাতি থেকে নেওয়া হত।

মাহমুদ উল-হাসানের নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবক দল কর্তৃপক্ষকে উত্তেজিত করে এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার কারণে পুনরায় বেশ কিছু ব্রিটিশ বিরোধী

সমাবেশ করেন। মাহমুদ উল-হাসানের প্রতিক্রিয়া ছিল জিহাদের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে নাজারাত উল-মারিফ (যেটা আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গীকৃত) এর সদর দফতরসমূহে (হেডকোয়ার্টারস) এবং দিল্লিতে একটি নতুন ঘাঁটি স্থাপন করা। অত:পর ১৯১৪ সালের বসন্তকালে হিজরা ও জিহাদের পরিকল্পনা প্রথমে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে সৈয়দ আহমদ উল্লেখযোগ্যভাবে যেমনটি করেছিলেন অনুরূপভাবে তিনি (মাহ্‌মুদ উল-হাসান) কার্যে পরিণত করতেন। তাঁর (সৈয়দ আহমদের) আদলে সমতলে খাদ্য সরবরাহ ও পার্বত্যাঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনাও করেন। মাহ্‌মুদ উল-হাসানের লেফটেন্যান্টদ্বয় মাওলানা ও ওবাইদুল্লাহ্ সিন্ধি ও মৌলভি ফজল ইলাহির যৌথ পরিচালনাধীনে দেওবন্দের পুরোনো বালকদের দ্বারা পনের সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠিত করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করে পেশোয়ার এবং কোহারের অন্য ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তারপরে মহমন্দ গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে সৈয়দ আহমদের অবশিষ্ট হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের সাথে যোগ দেন।

বৃদ্ধ আব্দুল্লাহ্ আলী হিন্দুস্তানিদেরকে চল্লিশ বছর যাবত নেতৃত্ব দিয়ে ১৯০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এক বছর পরে শেষ বারের মত আমানুল্লাহ্ ও অবশিষ্ট বিশ্বাসীগণকে সোয়াত ও বুনার থেকে বহিষ্কার করা হয়। অতঃপর তারা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধরা-ছোঁয়ার বহুদূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন দিরের চমরকন্দ গ্রামে চলে গিয়ে বসবাস শুরু করে। সরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে তারা আর কেবল সামরিক হুমকি হিসেবেই নিজেদের তুলে ধরে না, তারা নিজেদের আত্মপ্রচারের জন্য আল-মুজাহিদ (ধর্মযোদ্ধা) নামে একটি নিয়মিত সমাচার পত্র ও প্রকাশ করতে থাকে। পেশোয়ার গেজেটিয়ার পত্রিকার মতানুসারে তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য হয়ে গিয়েছিল, তবুও তারা জিহাদ প্রচার করছিল। গেজেটিয়ার পত্রিকার লেখক লিপিবদ্ধ করেন, 'রাজনৈতিকভাবে তাদের সর্বাধিক ভয়ঙ্কর মতবাদ হচ্ছে যে সমস্ত মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য কাফিরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করা।'

তাঁরা প্রচণ্ড আগ্রাহান্বিত হয়ে যা প্রচার করেছিলেন সেটি অনুশীলন করতে হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধরা অনাগ্রহী তা দেখতে ওবাইদুল্লাহ্ ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদল ধর্মান্ধ শিবিরে ভালভাবে পৌছান। এই পর্যায়ে ১৯১৪-১৯১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ এর মাঝে শুরু হয়ে যায়, আর এর সাথে তুরস্কের সুলতান মুসলমানদেরকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে জিহাদ করার জন্য আহ্বান জানান। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত মুসলমান সদস্যদের দলত্যাগ করার তীব্র উস্কানি দেওয়া সত্ত্বেও সমতল ভারতে এই আহ্বান ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হয়। 'তোমাদের উপজাতি-লোকজনকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে

ইসলামের সেনাদলে যোগদান কর', ষষ্ঠ আশ্বারোহী বাহিনীর রিসালদার-মেজরের কাছে অজ্ঞাতনামা একটি পাঠানো পত্রে এইলেখা পাঠ করা হয়। 'সমস্ত মুসলমান যারা এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে তারা দোযখে অনন্তকাল অতিবাহিত করবে। যখনই সুযোগ পাও তখনই ইংরেজদেরকে হত্যা কর এবং শত্রুদের সঙ্গে যোগ দাও। সতর্ক থেকো, শত্রুর সঙ্গে যোগ দাও, এবং তোমাদের দেশ থেকে কাফিরদেরকে বিতাড়িত করবে। ইসলামের ঝাণ্ডা প্রস্তুত আর অত্যল্প কাল পরেই সেটিকে উড়তে দেখা যাবে।'

যাহোক, সুলতানের জিহাদের আহ্বান এখন মাহ্মুদ উল-হাসানকে তাঁর পরিকল্পনা পাল্টাতে বাধ্য করে। ওবাইদুল্লাহ্ যখন স্বয়ং জেদ্দায় যাত্রা করছিলেন তখন তাঁকে তাঁর স্বেচ্ছাসেবক ছাত্রদলকে নিয়ে কাবুলের দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যা সংঘটিত হয়েছিল তা সঙ্গত কারণে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই যে আহ্মদের ধর্মযুদ্ধ মাহ্মুদ উল-হাসানের বীরত্বপূর্ন ভূমিকা এমনই বিপর্যয়গ্রস্ত হয়েছিল যে তিনি ও তাঁর সহযোগী সমর্থকরা বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে চেপে গিয়েছিল। কিন্তু সে বিষয়গুলোতে ধারণা দেবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিস্তারিত তথ্য তখনও অক্ষত ছিল যেগুলো দাবি করে যে দার উল-উলুম দেওবন্দ কখনো সশস্ত্র জিহাদ করার উৎসাহ কর্মে সম্পৃক্ত ছিল না।

১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে মাহ্মুদ উল-হাসান এখন নিজেকে আল কায়েদা নেতা, বলে মক্কায় এসে উপনীত হন। ওখানে তিনি গালিব বে-র নিকটে নিজেকে হিজাজের তুর্কি গভর্নর পরিচয় দিয়ে অটোমান খিলাফত চালানোর জন্য অর্থ তহবিল ও অস্ত্রের জন্য সর্নিবন্ধ মিনতি করেন। আতঙ্কের ব্যাপার হলো, তাঁকে ও তাঁর দলকে তিনি (গালিব-বে) আমলে নেন নি, যদিও তাদের এক সদস্য মুহাম্মদ মিঞাকে তাঁর পেশোয়ারের গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়েছিলেন। গালিব-বে সীমান্তবাসী উপজাতীয়দেরকে পাঞ্জাব আক্রমণ করার আহ্বান জানিয়ে মুহাম্মদ মিঞাকে একটি পত্র নিয়ে যেতে বলেন। মুহাম্মদ মিঞা এই মোহমন্দ গ্রামে নিয়ে যান, যেখানে দুই মোল্লা বিষয়গুলো কার্যকর করেন, আর বাবরারই মোল্লা যাঁর পরিণতি সম্পর্কে অনুসারীদের অবস্থা নিশ্চিতই ছিল। একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর বর্ণনা মতে, ১৯১৫ সালে ছোট্ট অভ্যুত্থানে দ্রুত দমনের জন্য কাসুরি সাহিব যথাযথ ভাবে শহীদ আহমদ শাহ্ কর্তৃক সীমান্ত উপজাতিদের জিহাদায়নের মাত্রা বর্ণনা করেছেন। কাসুরি সাহিব তাঁর এক স্মৃতি কথায় লিখেছেন

> 'যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে স্থানীয় মহিলারা ডাফ ও ঢোল (বাঁশি ও ঢোল) সহযোগে পশতু সমরগীত গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসেন...। এক মা তাঁর শহীদ পুত্রের ললাট চুম্বন করেন। এক বোন খুশিতে তার ভ্রাতার

> জন্য কেঁদে ওঠে এবং স্ত্রীরা শহীদ পতিদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁরা তাঁদের প্রিয় সন্তানের জন্য গাইতে থাকেন, 'যাও, আমরা তোমাকে আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দিলাম। কারণ তুমি একজন শহীদ, যাও আর জান্নাহ্ (বেহেশত) উপভোগ কর। আল্লাহকে বলো তিনি যেন তোমার ভাইদেরকে তোমার মত শক্তি দান করেন, যেন তারা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে।'

ইতিমধ্যে ওবাইদুল্লাহ্ ও তাঁর দেওবন্দি স্বেচ্ছাসেবক পর্বতের ওপর দিয়ে আফগানিস্তানে যাওয়ার তাদের পথ করে নেয় আর, কিছু সময় আটক রাখার পর আমির হাবিবুল্লাহ্ তাদেরকে কতিপয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেন কাবুলে ত্রুটি শরণার্থী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ১৯১৫ সালে গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে ওবাইদুল্লাহ্ ও তাঁর সহকর্মী মৌলভি ফজল ইলাহি জুনুদ উল-রাব্বানিয়াহ্, বা আল্লাহ্‌র সেনাদল গঠন করেন। এখনও অনুপস্থিত মাহ্‌মুদ উল-হাসানের নেতৃত্বাধীনে এটি সৈয়দ আহমদের ধাঁচে ভারত আক্রমণের ব্যূহমুখ সৃষ্টি করবে। ওবাইদুল্লাহ্ তখন তাঁর নেতার কাছে তাঁর কাজকর্মের পূর্ণবিবরণ দিয়ে হলুদ রেশমি বস্ত্রের ওপর পার্সি ভাষায় আত্ম-অভিনন্দনসূচক একটি পত্র লেখেন। এই প্রথম পত্রের সঙ্গে দার উল-উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র দলের অন্যএকজন সদস্যের রেশমি বস্ত্রের ওপরে লিখিত আরও দুটি পত্র সংযুক্ত করা হয়। এই পত্রদ্বয়ে আল্লাহ্‌র সেনাদলের সংগঠন ও যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং ভারতে এর যোদ্ধা ও সমর্থকদের নামের তালিকা বর্ণিত হয়। এই রেশমি পত্রত্রয় জ্যেষ্ঠ ছাত্র আব্দুল হককে বিশ্বাস করে নির্দেশনা সহকারে হায়দ্রাবাদের শেখের হাতে হাতে দিতে বলেন, তিনি (শেখ) তখন তাদেরকে মক্কায় মাহ্‌মুদ উল-হাসানের নিকটে পাঠান।

আব্দুল হক নিতান্ত মূঢ়ের মতো লাহোরের কলেজ পলাতক দুই ছাত্র যারা ওবাইদুল্লাহ্‌র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের পিতার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। এই ব্যক্তিটি—প্রতিবেদনে শুধু 'খান বাহাদুর' হিসেবে উল্লেখ রয়েছে—মুলতানে উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি এবং ব্রিটিশদের একজন মহাসমর্থক ছিলেন। যখন তাঁকে পুরো তথ্যটি প্রকাশ না করা পর্যন্ত প্রহার করতে থাকে, তখন কোটের ভেতরে সেলাইকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বহনকারী হিসেবে তাঁর সত্য ঘটনাসহ কোটটি আনীত হলে কোটটি কেটে তিনটি রেশমী পত্র উদ্ধার করা হয়েছিল। পার্সি ভাষায় লিখিত পত্র পড়তে না পেরে খান বাহাদুর পত্রগুলো পেশোওয়ারের কমিশনারের নিকটে নিয়ে যান—যিনি সেগুলোর ওপর ঝটপট এক পলক দেখে ভারত সরকারের অপরাধিদের গোয়েন্দা বিভাগে প্রেরণ করে দেন।

অনিবার্য ফলশ্রুতি হল যে ১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে উত্তর ভারত থেকে ২২২ জন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়, যেটি রেশমী পত্র ষড়যন্ত্র মামলা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। বন্দিদের একটি বিশাল অংশ প্রাক্তন দেওবন্দিভুক্ত ছিল। পুনরায় বিপর্যয়কে টেনে আনার জন্য, হিজাজের শেখ হুসেইন তখন মাহ্‌মুদ উল-হাসান ও তাঁর পরিষদবর্গের পাঁচজন সদস্যকে আটকানোর জন্য ব্রিটিশ সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯১৭ সালে কায়রোতে বিচারের জন্য তাদেরকে উপযুক্ত সময়ে আনা হয়, তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়, এবং মাল্টায় প্রত্যেককে কয়েক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যদিও ওবাইদুল্লাহ্‌ ও তাঁর সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা কাবুলে মুক্ত থেকে যায়, তাদের এখন পুলিশের বিশেষ শাখার 'সর্বাধিক আবশ্যক' ব্যক্তিদের তালিকায় দেখা গেল, আর তাঁরা তাঁদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারল না।

মাহ্‌মুদ উল-হাসান ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের রাষ্ট্রদ্রোহপূর্ণ কার্যাবলি দার উল-উলুম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষের দ্বারা সর্বসাধারণে প্রত্যাখ্যাত হল, তারা ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে দেখাতে সক্ষম হয় যে তাদের তাঁর (মাহ্‌মুদ উল-হাসান) সংগঠনের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বে প্রচণ্ড যোগাযোগ ছিল। এই সময় থেকে অগ্রবর্তী সময় পর্যন্ত দেওবন্দিদের ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থান জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ রাষ্ট্রীয়ভাবে অভিহিত হয়েছিল। এই সংগঠনটি ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের ধর্মীয় মোল্লাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। জেইউ এইচ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য মাহ্‌মুদ উল-হাসানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি যখন মাল্টায় ছিলাম তখন মুসলিম জাতির এই শোচনীয় অবস্থার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য বহু ভেবেছি। আমাদের সমস্যা দেখা দিয়েছিল দুটি কারণে   কোরান এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই বিসর্জন দেওয়া।' সাড়ে তিন বছর কারাভোগের কারণে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ায় এক বছর পরে তাঁর সত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ব্রিটিশ সমর প্রয়াসে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ভারতের অবদান ছিল পর্যাপ্ত। আট লক্ষাধিক সেনাদল স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধ করে, আর আশা ছিল উচ্চ যে ভারত পুরস্কৃত হবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মর্যাদা পেয়ে। এর পরিবর্তে ভারতে ব্রিটিশ সরকার নির্যাতনমূলক রাউলাট আইনের প্রচলন করে দমন নিপীড়নের প্রয়াস চালিয়েছিল, যার মাধ্যমে রেশমী পত্র ষড়যন্ত্রের প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ রাজের বহু অনুগত প্রজাদের জন্য এটি ছিল একটি সন্ধিকাল। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক জনগণ এখন কংগ্রেস পার্টিকে তাদের সমর্থন দেয়, যেমন দিয়েছিল জে ইউ এইচকে। বেসামরিক আইন অমান্য করার জন্য আহ্বান পাঞ্জাবে প্রচণ্ড বিক্ষোভের জন্ম দেয়, যাতে কর্তৃপক্ষ আরও সহিংসতার সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া

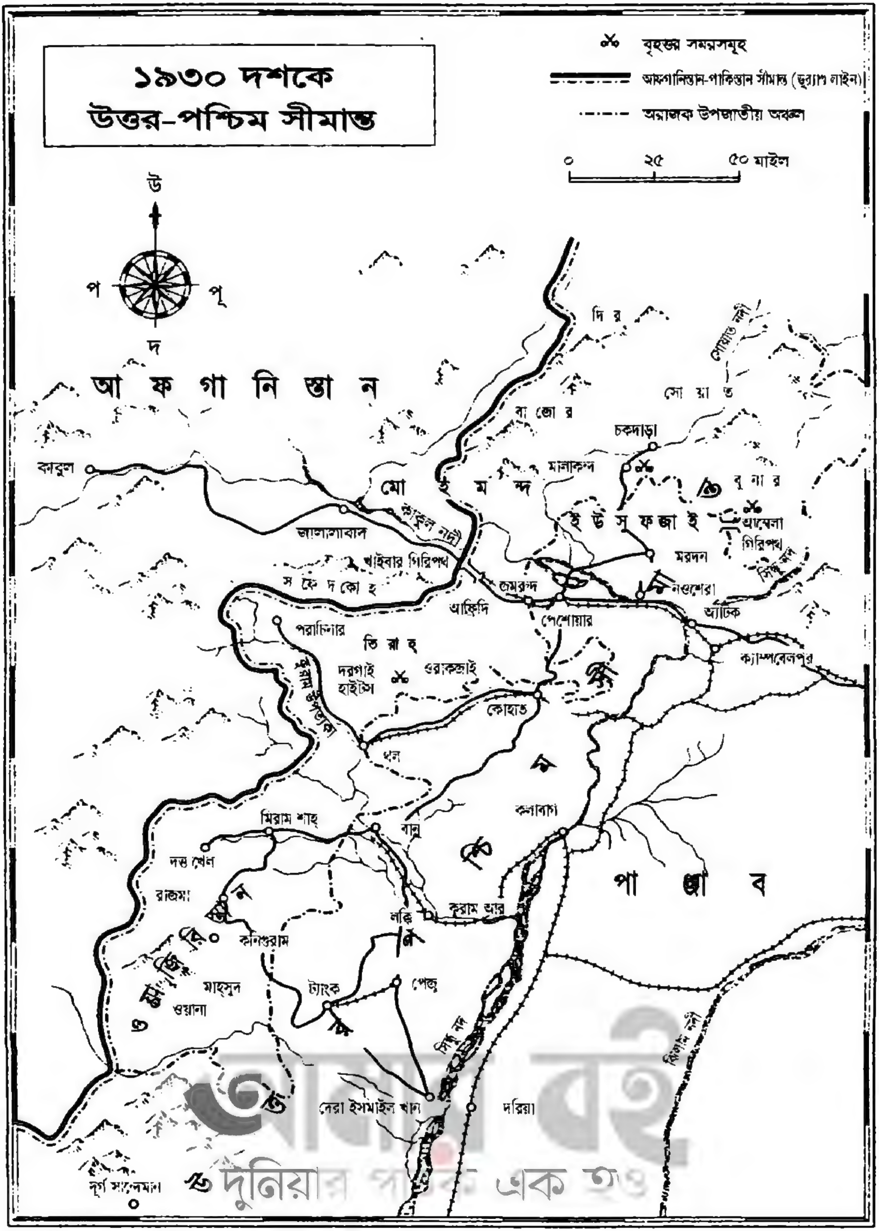

১৯৩০ দশকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

বৃহত্তর সমরসমূহ
আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত (ডুর্যান্ড লাইন)
অরাজক উপজাতীয় অঞ্চল
০
২৫
৫০ মাইল
উ
প
পূ
দ
আফগানিস্তান
কাবুল
জালালাবাদ
কাবুল নদী
মোহমন্দ
খাইবার গিরিপথ
সফেদ কোহ
দির
সোয়াত নদী
সোয়াত
বাজোর
চকদাড়া
মালাকন্দ
বুনার
ইউসুফজাই
আম্বেলা গিরিপথ
মরদন
সিন্ধু নদ
নওশেরা
জমরুদ
আফ্রিদি
পেশোয়ার
অ্যাটক
ক্যাম্পবেলপুর
পরাচিনার
তিরাহ
কুররাম উপত্যকা
দরগাই হাইটস
ওরাকজাই
কোহাত
থল
মিরাম শাহ্
বান্নু
কালাবাগ
পাঞ্জাব
দত্ত খেল
রাজমাক
কানিগুরাম
মাহসুদ
ওয়ানা
লক্কি
কুরাম আর
টাংক
পেজু
সিন্ধু নদ
ডেরা ইসমাইল খান
দরিয়া
ঝিলাম নদী
দূর্গ সান্দেমান

জানায়, অমৃতসর ধ্বংসযজ্ঞ করে সেটা শেষ সীমায় পৌঁছায়। ইত্যবসরে, ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে ইউরোপে প্যারিস সম্মেলনে অটোমান সাম্রাজ্যকে ইসলামের সকল অতীত প্রতিরূপসহ বিচ্ছিন্ন করণের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক মাস পরে আফগানিস্তানের সতর্ক নিরপেক্ষতা সমাপ্ত হয় আমির হাবিবুল্লাহ্‌র হত্যার সাথে যখন তিনি বাইরে শিকারে ছিলেন। ভারতের ভাবভঙ্গী ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁর অধিকতর যুদ্ধাপ্রিয় পুত্র আমির আমানুল্লাহ্‌ খাইবারের পথ ধরে একটি উৎসাহশূন্য আক্রমণ করেন। ফলশ্রুতিতে অতি সীমিত সময়ে তৃতীয় আফগান যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল, যা ২৯ দিন স্থায়ী ছিল এবং নতুন আমিরকে ভীষণভাবে পর্যুদস্ত করেছিল।

কিন্তু ভারতে কিছু সুন্নি মুসলিম আমানুল্লাহ্‌কে ইসলামের নতুন রক্ষাকারী হিসেবে দেখে। যা হিজরত আন্দোলন হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে গ্রীষ্মকালের ঘূর্ণিবাতাসের মত, সহস্র সহস্র মুসলিমদের তাদের চাকরি ও গৃহাদি পরিত্যাগ করে নেতৃত্ব দিয়ে এবং গোপনে প্রস্থান করে তারা আফগানিস্তানের দার উল-ইসলামে গিয়ে উপনীত হয়। তাদের মধ্যে ছিল সাইদ আবু লালা মওদুদি নামে বিশ বছর বয়সী একজন তরুণ, যার পূর্বপুরুষরা ভারতে সুফি পণ্ডিত হিসেবে প্রবেশ করে আর তারপরে প্রথমে মুঘলদের অধীনে চাকরি করে এবং অতঃপর হায়দ্রাবাদের নিজামদের অধীনে। তাঁর পিতার মৃত্যুর কারণে তিনি তাঁর নিজের শিক্ষা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, একজন নব্য তরুণ হিসেবে মওদুদি দিল্লিতে গমন করেন। সেখানে তিনি খিলাফত আন্দোলনের একজন কর্মী হন, যা তুর্কি সালতানাত পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালায়। মুহূর্তের উৎসাহকে চটপট আঁকড়িয়ে ধরে তিনি হিজরতকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের সাথে খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত পরিব্রাজন করেন। এখানে তাঁরা দ্রুত আবিষ্কার করেন যে তাঁদের কোন আবশ্যকতা নাই। আফগানিস্তানের আমির সশস্ত্র সমরের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে তাদেরকে সমর্থন দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নি। কয়েক মাস পরে পেশোয়ারে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ কয়েক সহস্র নিঃস্ব উদ্বাস্তু ও বিক্ষিপ্ত প্রাক্তন আফগান সৈন্যদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদেরকে দেখতে পান।

১৯২০ দশকের গোড়ার দিকে খিলাফত আন্দোলন ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবী তাঁদের নিজেদের ইসলামি রাষ্ট্রের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাঁদের নতুন মুসলিম পরিচিতির সন্ধানে লেগে যান। তাদের মধ্যে তরুণ মওদুদি, যে দিল্লিতে ফিরে এসে সেখানে দার উল-উলুম দেওবন্দের ফতিহ্‌পুরি মাদ্রাসায় ছাত্র হন, পরবর্তী বছরগুলোতে কতক বিষয় তিনি কখনোই স্বীকার করেন নি। এক সময়ে তিনি দেওবন্দি জেইউএইচ-এর

রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন, এখন এটির নেতৃত্বে রয়েছেন মাওলানা হুসেইন আহমদ মাদানি, দার উল-উলুম দেওবন্দের মাহ্‌মুদুল হাসানের উত্তরসূরি অধ্যক্ষরূপে। মাদানির নেতৃত্বাধীনে জে ইউ এইচ কংগ্রেসকে সমর্থন দিতে থাকে আর ভারতীয় উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে মুসলিম লীগকে প্রতিহত করে। জে ইউ এইচ ওয়াহ্‌হাবি আরবের সঙ্গে যোগাযোগও প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯২১ সালে নেজদে এটি মোল্লাদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং তারপর থেকে ইবনে সৌদ ও আল আস-শেখের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।

কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করার কারণে জে ইউ এইচ এটিকে ভেঙ্গে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল গঠন করে। প্রথমটি অনুরূপ করেন নাকশবন্দি মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়ার, যাঁর দল, তাবলিগি জামিয়াত (ধর্ম প্রচারক দল), শাহ্‌ ওয়ালিউল্লাহ্‌র শিক্ষা অনুসরণ করে, তবে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগের প্রয়াস চালানো হয়। দ্বিতীয়টি মওদুদির নেতৃত্বে চলে, তিনি তাঁর ধর্মের ভিত্তিতে একটি নতুন রাজনৈতিক বিষয়সূচি উন্নত করতে লাগেন, আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে গেলে ইসলামকে পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শন নাস্তিক সমাজতান্ত্রিকতার গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করতে হবে। তাঁর বিশ্বাসমতে ইসলামের উদ্দেশ্য হলো অনৈসলামিক চিন্তা ও মূল্যবোধকে সরাসরি আক্রমণ করা যার মাধ্যমে আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যেখানে জনগণ ইসলামি শরিয়া বিধান মতে জীবন ধারা গড়ে তুলবে এবং সমস্ত আধুনিক গণতন্ত্রের নামে ইসলামি ধারার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ সেগুলিকে বর্জন করেছিল। তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামি পুনর্জাগরণ ও স্বাতন্ত্র্যবোধের দর্শনের ভিত্তিতে একটি ইসলামি মঞ্চ গড়ে তোলেন। যেখানে তিনি দেওবন্দ সম্মত ইসলামি ব্যাখ্যা করেন কিন্তু দেওবন্দের সাম্প্রদায়িকতা ধর্মীয় ব্যাখ্যা বর্জন করে জিহাদি রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতে মুক্তির পথ অন্বেষার কথা বলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইসলামি পুনর্জাগরণে এক নতুন বিষয়সূচির সন্নিবেশ করে। ১৯৩৯ সালে মওদুদি লাহোর গমন করেন, সেখানে দুই বছর পরে তিনি ও তাঁর সমমনা ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন কংগ্রেসের স্বপক্ষদল জে ইউ এইচ-এর সরাসরি বিপক্ষে জামিয়াত-ই-ইসলামি (জে আই), ইসলামপন্থীদের দল প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সময়ে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত যেহেতু ভারত ক্রমান্বয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ হচ্ছিল, যখন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌, মুসলিম লীগের আধুনিক নেতা যাদেরকে তিনি 'প্রতিক্রিয়াশীল' নামে অভিহিত করেছিলেন তাদেরকে প্রতিহত করতে মুসলিমদেরকে প্ররোচিত করে আহ্বান জানান 'মৌলভি ও

মাওলানাদের অবাঞ্ছিত অংশ'কে, জে আই, জে ইউ এইচ, তাবলিগি জামিয়াত এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ যারা সুন্নি সম্প্রদায়ে ইসলামের পুনর্জাগরণের ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেছিল। যখন পৃথক মুসলিম জাতি-রাষ্ট্রের দাবি বৃদ্ধি পেল তখন জে ইউ এইচ-এর বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ দেওবন্দি জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম (জে ইউ ই) অর্থাৎ ইসলামের পণ্ডিতবর্গের দল হিসেবে নিজেদেরকে পুনর্গঠিত করার জন্য তাঁদের নেতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটান। এই দলটি ১৯৪৫ সালে মাওলানা শাব্বার আহমদ ওথমানি ও মাওলানা মুফতি মাহ্‌মুদ দেওবন্দি মোল্লাদ্বয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয়। পাকিস্তানকে কোরান ও শরিয়া অনুসারে গঠিত একটি সংবিধানসহ একটি প্রকৃত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে জে ইউ আই ঘোষণা দেয়, তাবলিগি জামিয়াত, এবং বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র উলেমাদের দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে অংশ বন্টন করে।

স্বাধীনতা ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এই ইসলামি দলসমূহ স্পষ্টভাবে সংখ্যালঘু ভোটকেন্দ্রে ভোটদাতাদের প্রতিযোগিতায় অটলভাবে জনসমর্থন পেতে ব্যর্থ হচ্ছিল। যদিও তারা উচ্চ স্তরের নেতৃবৃন্দকে আকৃষ্ট করে তারপরেও তারা আন্ত-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ধর্মীয় বিবাদের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র একটি অঞ্চলেই তাঁরা সফলতা অর্জন করেছে, মুফতি মাহ্‌মুদের নেতৃত্বাধীন জে ইউ আই-এর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি দৃঢ় নিরাপদ স্থান প্রতিষ্ঠা করা উপজাতীয় অঞ্চলগুলোকে দেখা গেল ব্যাপকভাবে রাজনীতি ধর্মীয় দলের অন্তর্ভুক্ত রূপে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আহল-ই-হাদিস দলে পাঠান গোষ্ঠীদের মধ্যে সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটি ছিল উপ-মহাদেশের প্রত্যক্ষভাবে একমাত্র ওয়াহ্‌হাবি দল, এই সংগঠনের গোড়া পত্তন করেন নাজির হুসেইন, তিনি সেই মোল্লা যিনি ১৮৫৭ সালে ওয়াহ্‌হাবি 'দিল্লিবাসীদের' নেতৃত্ব দেওয়ায় পরবর্তীতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়াহ্‌হাবিদের সন্দেহভাজন নেতা হিসেবে ধৃত হন। উত্তর পাঞ্জাবে আহল-ই-হাদিস দলকে স্থানান্তর করে প্রকৃত অর্থে এটি তার মূল জিহাদি এলাকাতেই প্রত্যাবর্তন করে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজের শাসন ক্ষমতা শেষ হওয়ার সাথে উপজাতীয় এলাকার পাঠান তাদের পরম্পরাগত শত্রু হারায়। কেউ কেউ পাখতুনিস্তান অর্থাৎ এক পৃথক পাঠান জাতির মিথ্যে কল্পনাকে সমর্থন জানায়, অন্যান্যরা নিজেদেরকে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে একীভূত করে নেয়। আপাতদৃষ্টিতে কেবল স্বল্প সংখ্যক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নতুন ইসলাম ধর্মীয় দলসমূহে যোগ দেয়।

১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে সামরিক একনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ জিয়া-উল-হকের ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে পাকিস্তানে সব কিছু পাল্টে যায়। তার

সূত্র যাইহোক জেনারেল জিয়া ঐতিহ্যগতভাবে রক্ষণশীল পরিবারভুক্ত ছিলেন আর 'এরই' ধারাবাহিকতায় তাঁর দেশকে তিনি ইসলাম পসন্দ রাষ্ট্র করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি মওদুদির জে আই দলের পথ অবলম্বন করেন, ও তাঁর শাসনের এগার বছরব্যাপী জে আই এবং অন্যান্য ইসলামি দলসমূহ অভূতপূর্ব প্রভাব উপভোগ করে আদর্শিক সঞ্চালন শক্তি সরবরাহ করে যা জেনারেলকে একটি স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সমর্থ করে যাতে পাকিস্তানি জনগণের সমর্থন সামান্যই ছিল। উপ-মহাদেশে এখন নয় সহস্রাধিক দেওবন্দি মাদ্রাসা রয়েছে যার অধিকাংশই রয়েছে পাকিস্তানে। বহু দেওবন্দ প্রশিক্ষিত আদর্শবাদী ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক কর্মে যোগ দেন, যেগুলোতে তাঁরা জেনারেল জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন। পরিশেষে এক বিশাল সংখ্যার বাহিনীকে পাকিস্তানের পরিব্যাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থা (আই এস আই)য় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

জেনারেল জিয়ার ক্ষমতায় আরোহণের দুই বছর পরে, ১৯৭৯ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে মার্কসের অনুগামী শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য সেনাদল পাঠায় যেটি চার বছর পূর্বে এক রক্তক্ষয়ী আক্রমণে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটি আফগানিস্তানের উলেমাদেরকে সরকার বিরোধী জিহাদ ঘোষণা করতে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। উপজাতীয় সর্দারদের অভিভূতকারী সমর্থন সত্ত্বেও পাকিস্তান, আরব ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদ ব্যতীত এই জিহাদে সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণই ছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এই ত্রিজাতি (ইরান, চীন, মিসর এবং এমনকি ব্রিটেনসহ, আরও সীমিত সামর্থ্যে) আফগান মুজাহিদীনদেরকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে পদক্ষেপ নেয়। এই সমর্থনের ফলশ্রুতিতে বেশ কিছু সংখ্যক রুশ-বিরোধী জোট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের জেনারেল জিয়া এদের মধ্যে সাতটি দলকে স্বীকৃতি দিয়ে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। সাতটির মধ্যে ছয়টি পাঠান শাসিত আর চারটি সর্বান্তকরণে ইসলামপন্থী। এই চারটি হল কাবুলিয় এক ধর্মবেত্তা আব্দুল রব রসুল সায়াফ ইসলামি চেতনায় গঠিত ইত্তেহাদি সংস্থা যার সৌদি আরবের সাথে যোগসূত্র পাওয়া যায়। তারা নিজেদেরকে সালাফি হিসেবে অভিহিত করেছিল যা সার্বিকভাবে ওয়াহ্হাবি জঙ্গী সংস্থারই স্বরূপ ছিল;

> মাওলানা মোহাম্মদ নবী মোহাম্মদীর নেতৃত্বে অতি বৃহৎ হরাকাত-ই-ইনকিলাবি-ই-ইসলামি দল গড়ে ওঠে যা কট্টরপন্থী গ্রাম্য উলেমা ও ওয়াজিরিস্তানের উত্তরে আহমদজাই পাঠানদের মাঝে যার প্রচুর অনুসারি ছিল;
>
> পাঠান গুলবউদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বে অতি বৃহৎ হিজব-ই-ইসলামি (হেকমতিয়ার) গড়ে ওঠে যার নাঙগড় প্রদেশে মোহমন্দ, শিনওয়ারি ও

> অন্যান্য পাঠান উপজাতিদের মধ্যে প্রবল সমর্থক ছিল, যা কাবুলের পূর্ব থেকে খাইবার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং দেওবন্দ স্নাতক ইউনিস খালিসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে হিজব-ই-ইসলামি (খালিস) কান্দাহার ও পাখতিয়া প্রদেশদ্বয়ে পাকিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন ছিল, মোল্লা ওমর যার উচ্চপদে যোগ দেন।

১৯৬০ দশকের কাবুলে প্রতিষ্ঠিত জামিয়াত-ই-ইসলামির শাখা হতে শেষ দল দুটি উদ্ভূত হয়। ১৯৭৯ সালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের নিজের দল গঠন করে, তবে পরবর্তীকালে গুলবউদ্দিন হেকমতিয়ারের হিজব-ই-ইসলামি (হেকমতিয়ার) পাকিস্তানে মূল জে আই দলের ও আই এস আই-এর সমর্থন লাভ করে দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী মুজাহিদীন সমর দল হয়।

এক দশকেরও অধিককাল যাবত পাকিস্তান, সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজ নিজ গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কাজ করে। তারা আফগানিস্তানে রুশ সমর্থিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুজাহিদীনদের যুদ্ধ পরিচালনা করে। একই সময়ে বর্হিঅঞ্চলের হাজার হাজার মুসিলম আদর্শবাদী ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জিহাদে যোগ দেন, আর এ রকম করে ত্রিজাতির সক্রিয় সমর্থন নিয়েই। যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের প্রতিনিধিগণ পেশোয়ারের একটি দপ্তর মক্তব আল-খিদামত (সেবা দপ্তর) স্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান যৌথভাবে কাজ করে, যা যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সেনা মোর্চাতে পরিণত হয়।

একই সময়ে বা, নিদেন পক্ষে, ১৯৮৮ সালে তাঁর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত—জেনারেল জিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে পাঠানদেরকে তাঁর সপক্ষে আনার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে এই প্রয়াস উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। এটি তাঁর ইসলামিকরণ পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। যাহোক, এটি কেবল সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তানের ইসলামপন্থী দলসমূহের সমর্থনের দ্বারা যারা শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষা সরবরাহ করেছিল, এবং সৌদি আরব, যে মাদ্রাসাগুলো নির্মাণ ও মেরামতের জন্য অর্থের অধিকতর অংশ দিয়েছিল।

এতে লক্ষণীয় ইসলামি আদর্শবাদের দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন দুই ভিন্ন ধারা প্রবাহিত হয়ে একই সূত্রে গ্রথিত হলো।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান বিভাগের সময় পাকিস্তানের মাটিতে প্রায় দুইশ মাদ্রাসা ছিল। প্রাচীন আদলের অনেকগুলো এখনও রয়েছে। এই ধরনের দুঃস্থ ও কুশিক্ষিত মোল্লা দ্বারা পরিচালিত যবুথবু প্রতিষ্ঠান যেগুলো দেখে এডওয়ার্ডস, বিলিউ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকগণ তামাশা করেছেন। দার

উল-উলুম মাদ্রাসা ও তাদের প্রতিপক্ষের প্রসার ঘটার কারণে এইসব কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল। পেশোয়ার-এ পৌছানোর সাথে সাথে নওশেরা ও এ রকম আরও কিছু স্থানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বরাবর এই আধুনিক মাদ্রাসাসমূহ ও তাদের অধিকতর সুশিক্ষিত এবং আরও অনুপ্রাণিত শিক্ষকবর্গ, বর্ধিষ্ণু সংখ্যক তরুণ পাঠানরা আর আফগানরা মৌলবাদী ও রাজনীতিতে দীক্ষিত হয়ে ওঠে। জে আই, জে ইউ আর এবং অন্যান্য ইসলামপন্থী দলসমূহকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সমর্থন দেওয়ায় প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করে যা সৌদি আরবের অর্থপুষ্ট আরও বেশি বলীয়ান হয়ে ওঠে। বোঝা যায় সৌদি সরকার বিশেষভাবে তাদের মতাবলম্বীদের বিশেষত যারা জিহাদে দীক্ষিত তাদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে থাকেন আর যাদের সঙ্গে কাজ করে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং যারা তাদের জিহাদি দর্শনে বিশ্বাস করেন। যারা প্রকাশ্যভাবে ওয়াহ্হাবি বা ওয়াহ্হাবিদের সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১৯৭২ সালে পাকিস্তানের ৮৯৩ টি মাদ্রাসা, ৩৫৪ বা ৪০ শতাংশ ছিল দেওবন্দি, ১৪৪টি আহল-ই-হাদিস এবং ২৬৭টি বেরেলভি, প্রতিনিধিত্ব করছিল সুন্নি ইসলামের মধ্যপন্থীয় ধারার। ১৯৮০ দশকের শেষে পাকিস্তানের নিরূপিত ৬৫ শতাংশ মাদ্রাসা ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেওবন্দি। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে (প্রথমবার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়) পাকিস্তানের ধর্মমন্ত্রী পাকিস্তানে সর্বমোট মাদ্রাসার সংখ্যা জানান দশ সহস্র, যার মধ্যে ছিল প্রায় চার শ শিয়া, চারশ আহল-ই-হাদিস, পাঁচ শ জে আই—এবং দেওবন্দি সাত সহস্রের কম ছিল না। এই দশ সহস্র মাদ্রাসায় সাড়ে পনের লক্ষ ছাত্রবৃন্দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল, সোয়া ১২ লক্ষ ছাত্র দেওবন্দ-ভিত্তিক আহল-ই-হাদিস ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করছিল।

১৯৮০ দশক জুড়ে রুশ-আফগান বাহিনীর বিরুদ্ধে যেহেতু জিহাদ চলছিল, বর্ধিষ্ণু এই সকল মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করানো ও জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিদ্যালয় হয়ে ওঠে, ওগুলোসহ উপজাতীয় এলাকার অভ্যন্তরে ও সেগুলোর সন্নিকটবর্তী এলাকাসমূহ প্রায় সামগ্রিকভাবে পাঠানদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। এই সকল মাদ্রাসার অনেকগুলোই জে ইউ আই এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, আর এটি ছিল জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষসমূহ ও নামাযের বড় কক্ষগুলোতে যেগুলো পরবর্তীতে তালিবান বালকেরা শিক্ষাগ্রহণ করতে এসে পূর্ণ করেছিল। পেশোয়ারের বাইরে ইসলামাবাদ রাজপথের পাশে আকোরা খাট্টাকে অবস্থিত জামিয়াহ্ দার উল-উলুম হাক্কানিয়া মাদ্রাসা, এর উৎস রয়েছে একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ে যেটি ১৯৩৭ সালে দার উল-উলুম দেওবন্দের অধ্যক্ষ মাদানি ও তাঁর দেওবন্দি-সাথী-

মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল হক (বর্তমান অধ্যক্ষ সামিউল হকের পিতা) কর্তৃক চালু হয়। তালিবান পাঠানদের অনেক নেতাই তাঁদের শিক্ষা হয় এখানে, নতুবা করাচির শহরতলিতে দেওবন্দি মৌলভি মোহাম্মদ ইউসুফ বিন্নোরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জে ইউ আই মাদ্রাসায় গ্রহণ করত। জে ইউ আই সিপাহি-এ-সাহাবা (সাথীদের সৈন্যরা) ও লশকর-এ-ঝাংভি (ঝাংভির সেনাদল) উভয় দলই ভয়ঙ্করভাবে শিয়া-বিরোধী, হিন্দু বিরোধী এবং খ্রিস্টান বিরোধী সন্ত্রাসী দলগুলোর মত বেশ কিছু সংখ্যক সংগঠনও বিশেষত সোয়াত ও দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাম্প্রতিককালে সৌদি আরবের বাইরে স্বল্প কিছু প্রধান মাওলানাদের যে সকল নাম পরিচিত হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে মক্কায় ১৯৯৯ সালের মে মাসে ঊননব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী শেখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বাজ। প্রথম উপ-সাগরীয় যুদ্ধাবস্থায় বিন বাজ সৌদি ও আমেরিকার মহিলা গাড়িচালকদের বিরুদ্ধাচরণ করে ফতোয়া দেওয়ার কারণে বেশ কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, ইতিপূর্বে যারা পৃথিবী গোলাকার বিশ্বাস করে তাদেরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন একজন সৌদি শাহ্জাদা রকেটে চড়ে মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছিলেন তখন তিনি তাঁর এই ধ্যান-ধারণা পাল্টেছিলেন। ১৯১০ সালে রিয়াদে জন্মগ্রহণ করে বিন বাজ স্বচক্ষে ইবনে সৌদকে ক্ষমতায় আরোহণ করতে দেখেন, তবে তিনি তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারান। তখন তিনি আল আস-শেখের তিন সদস্যের কাছে সৌদি আরবের প্রধান মুফতি ইবনে সৌদের শীর্ষস্থানীয় প্রধান মাওলানা শেখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম আল-শেখের অধীনে সৌদি শিক্ষা ব্যবস্থায় দশ বছর যাবত একটি শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁর অন্ধত্ব থাকা সত্ত্বেও শেখ বিন বাজ একজন উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত হন। ১৯৫০-এর পুরো দশক রিয়াদের ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইন-বিজ্ঞান ও শরিয়া অনুষদে শিক্ষকতা করার পূর্বে পনের বছর যাবত বিচারক হিসেবে কর্ম সম্পাদন করেন। পনের বছর তিনি মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-আচার্য ও তারপর আচার্য হিসেব দায়িত্ব পালনের পর ইসলামি গবেষণার সাধারণ সভাপতিত্বের কালে তিনি সভাপতি হয়ে পরিশেষে সৌদি আরবের প্রধান মুফতি হন। সিকি শতাব্দী কাল যাবত তিনি ছিলেন সৌদি আরবের সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, এবং ওয়াহ্হাবিবাদের সর্বজয়ী সক্রিয় সমর্থনকারী। অনেক কমিটির সভাপতি থাকার মধ্যে তিনি ইসলামের প্রসারকরণের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মসজিদের বিশ্ব সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি ছিলেন, মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের সমাজতান্ত্রিক সরকারের এই ধর্মনিরপেক্ষতার বিপক্ষে ওয়াহ্হাবি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা গঠন করেছিলেন। ইতিমধ্যে

ওয়াহ্হাবি উলেমাবৃন্দ সৌদি জাতীয় বাজেট ও যাকাত উভয়ক্ষেত্র থেকেই আর্থিক সহায়তা পুষ্ট হয়েছিলেন, কোরানে সকল ঈমানদারকে তাদের আয়ের এক চল্লিশাংশ ধর্মীয় কর হিসেবে দিতে আদেশ দেওয়া হয়। যাহোক, পূর্বের বর্ণনানুসারে, ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েলের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তেলের মূল্য প্রচুর বৃদ্ধি বিন বাজকে এই তহবিল গঠনে সমর্থ করে তোলে। ১৯৭৯ সাল থেকে অগ্রবর্তী বছরগুলিতে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মাদ্রাসাসমূহ এই দান গ্রহণ করে আসছিল যেখানে ওয়াহ্হাবি উলেমাবৃন্দ পার্শ্ববর্তী ইরানের আয়াতোল্লাহ্র বর্ধনশীল শিয়াদের প্রভাব যেমন যন্ত্রণা দিচ্ছিল তেমনই আফগানিস্তানে রুশরা। তথ্যানুযায়ী জানা যায় সৌদি সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে ইসলামি দূতাবাসগুলিকে ওয়াহ্হাবি শিক্ষা কার্যক্রম প্রসাবের লক্ষ্যে ৭০০০ কোটি ডলার খরচের প্রতিশ্রুতি দেন। এই বিশাল অংকের অর্থ পাকিস্তানে অবস্থিত ১০,০০০ মাদ্রাসা, সহস্রাধিক মসজিদ এবং সারা বিশ্বের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে হাজার খানিক নির্মীয়মান মসজিদ ও কম্যুনিটি সেন্টার পরিচালনায় সংগৃহীত তহবিল দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। পশ্চিমা দেশ জুড়ে মসজিদ, মক্তব-মাদ্রাসা নির্মাণে প্রকল্পের ব্যয়ভার গ্রহণ করা হয়।

যাহোক, সৌদি আরবের অভ্যন্তরে পরিচালিত পাঁচ সহস্র গুদাম ঘরের পরিচালনাকে কেন্দ্র করে ওয়াহ্াবিবাদের পক্ষ-বিপক্ষ উভয়শক্তি ক্রমেই বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যন্ত্রণার একটি প্রথম লক্ষণ ১৯৭৫ সালে দেখা দেয় যখন বাদশাহ্ ফয়সাল তাঁর ভ্রাতুষপুত্র কর্তৃক নিহত হন, যিনি তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের প্রধানের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতেন যখন তিনি টেলিভিশন মাধ্যম চালুর বিরুদ্ধে একটি ওয়াহ্হাবি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অতঃপর ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে, যখন মক্কায় ইসলামের চতুর্দশ শত বর্ষের উৎসব উদযাপন করার জন্য জনগণ সমবেত হয়—এবং ঠিক কয়েক সপ্তাহ পূর্বে রুশরা তাদের ট্যাংক ও সেনা-পরিবহনকারী যান আফগানিস্তানে পাঠায়—কয়েক শ সশস্ত্র সেনাপ্রধান মসজিদে সহসা প্রবেশ করে এটিকে মাহ্দির নামে দখল করে নেয়। তাদের নেতা ছিলেন জুহাইমান আল-উতাইবি নামে একজন নেজদি ইখোয়ান অধ্যুষিত বসতিতে উপনীত হয়ে সৌদি জাতীয় প্রহরীদলের সদস্যদের সমন্বয়ে সৌদি জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সংগঠন করেছিলেন। তিনি ইখোয়ান স্থাপনা গড়ে তুলেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি নিজেকে দাবি করেন ইখোয়ানের একজন ইমামের শিষ্য বলে, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-কাহ্তমি, যিনি ছিলেন সৌদি বংশ ও আল আস-শেখকে উৎখাতের সংগ্রামে আবির্ভূত বহু-প্রতীক্ষিত মাহ্দি। বিপ্লব ভয়ঙ্করভাবে দমন করা হয়, তবে এই কাহিনী সৌদি সরকারকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে যে দেশের অভ্যন্তরের আদর্শবাদীরা ছিল বহিরাগত অ-ওয়াহ্হাবি ইসলামপন্থীদের সঙ্গে যোগদানকারী দল।

এই সকল ইসলাম পন্থীদের অনেকেই তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেখ বিন বাজের কাছ থেকে গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে প্যালেস্টিনীয় শেখ আব্দুল্লাহ্ আজম।

১৯৪১ সালে জেনিনে জন্মগ্রহণকারী আব্দুল্লাহ্ আজম শরিয়ার ওপর পড়াশোনা করেন দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় ও কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৭ সালে ছয়দিন যুদ্ধের পরবর্তী করুণ পরিণতি দেখে তিনি জর্দানে পলায়ন করে সৌদি আরবের আল আস-শেখের অর্থে চালিত শরণার্থী শিবিরে কাজ করেন। ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীনে প্যালেস্টিনীয় প্রতিরোধের শক্তি ধর্ম নিরপেক্ষতা দ্বারা মোহমুক্ত হয়ে আল-আজহারে তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা অব্যাহত রাখতে তিনি মিশরে গমন করেন। এখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত সাইদ কুতবের সমর্থকদের সাথে, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সহ-প্রতিষ্ঠাতা যাকে সম্প্রতি প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁর সহযোগী বাহিনীদের যারা ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামি জিহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের ভূমিকা ছিল এই তাত্ত্বিক গ্রন্থের বাইরে অবস্থিতদের ইসলামি জিহাদের বাণী প্রচার করা। বর্তমানে এই প্রসঙ্গে যা সুসঙ্গত সেটি হচ্ছে এই যে সাইদ কুতব তৌহিদের মূল বিষয়ের ও ইসলামের প্রয়োজনীয়তার জন্য প্রচারাভিযান চালান, যেমনটি পৌত্তলিক বা বিধর্মী পশ্চিমারা প্রতিনিধিত্ব করে এবং মিসরের মত দেশগুলো যাদের সরকাররা পশ্চিমা ধাঁচকে অনুসরণ করে। শেখ বিন বাজ ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের তাঁর সমর্থনে জবাব দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৬৬ সালে দশ বছরের কারাবরোধের পর সাইদ কুতবের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৭৪ বা ১৯৭৫ সালে আব্দুল্লাহ্ আজমকে সৌদি আরবের সরকার মিসরীয় ধর্মগত কারণে নির্যাতন থেকে রক্ষাকল্পে আশ্রয়দান করে তাঁকে জেদ্দায় রাজা আব্দুল আজিজ বিশ্বদ্যিালয়ে প্রভাষক পদে চাকরি দেন, যেখানে তিনি সাইদ কুতবের ভ্রাতা মুহাম্মদ কুতবের সঙ্গে মিলিত হন। দাবি করা হয় যে এই সময়ে আব্দুল্লাহ্ আজম বিন বাজের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীনে চলে এসে একজন ওয়াহ্হাবি বনে যান। এটি বর্ণনা করা সম্ভবত সত্যের আরও নিকটে যাওয়া যায় আব্দুল্লাহ্ আজমকে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের একজন সমর্থক হিসেবে বর্ণনা করাটা সম্ভবত সত্যের আরও নিকটে যাওয়া যায়, তাঁর সৌদি আরবে অবস্থান কালে তিনি ওয়াহ্হাবিবাদের ও ইবনে তায়মিয়ার যুদ্ধরত জিহাদ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে অবগত হয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ আজম প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন 'মুসলমানদের প্রতিরক্ষা' নামক একটি ফতোয়ার পুস্তিকা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মসে আফগানিস্তানে রুশ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই এটি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি ঘোষণা দেন আফগানিস্তানে রুশদের ও প্যালেস্টাইনে

ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সকল মুসলিমগণের জন্য বাধ্যতামূলক। এই ফতোয়া বিন বাজ ও ওয়াহ্হাবি উলেমাদের দ্বারা সমর্থিত হয়। মহানবী (সা.)র ঘোষণা 'আল্লাহ্র পথে জিহাদে কয়েক মুহূর্ত ব্যয় করা গৃহে সত্তর বছর উপাসনায় অতিবাহিত করার থেকে অধিক মূল্যবান'কে তাঁর অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে অতঃপর আব্দুল্লাহ আজম তাঁর পরিবার নিয়ে পাকিস্তানে গমন করেন। প্রথম দিকে ইসলামাবাদে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পাঠদান করেন, কিন্তু অতঃপর তিনি পেশোয়ারে গিয়ে বায়াত আল-আনসার বা আনসারের গৃহ, নামে একটি সংগঠন গড়েন। মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবাদের মক্কা থেকে মদিনায় পলায়নের পর এক ব্যক্তি তাঁদেরকে যে ধরনের গৃহে আশ্রয়দান করেছিলেন সেই মত উক্ত সংগঠনটি স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে জিহাদে অংশ নিতে সীমান্তে পৌঁছানো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সহায়তা দান করা। অবশেষে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন 'জিহাদ ও একমাত্র রাইফেল' কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল; কোন আপস-মীমাংসা নয়, কোন সম্মেলন নয়, এবং কোন সংলাপ নয়।'

আব্দুল্লাহ্ আজমের বহু প্রশংসাকারী দাবি করে যে তিনি আফগান যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত অবদান ছিল একজন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী জ্বালাময়ী নেতা হিসেবে যা শুধু আফগানিস্তানেই নয় পৃথিবীর যে কোন স্থানে বিপন্ন ইসলামের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রণীত গ্রন্থাবলি প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন, 'যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত না হবে ততদিন জিহাদ চলতে থাকবে; জিহাদ চলবে আমাদের মর্যাদা রক্ষা ও দখলকৃত দেশকে পুনরুদ্ধারের জন্য। জিহাদ চিরস্থায়ী গৌরবের উপায়।' ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি অবিরামভাবে কাজ করেন তবে আফগানিস্তানে যুদ্ধরত অনেক মুজাহিদীন সেনাপতিদের পশ্চাদ্ধাবন করতে অকার্যকর থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দূরে সরিয়ে রেখে একযোগে কাজ করেন—আদর্শরূপে, এক নেতার নেতৃত্বাধীনে।

আব্দুল্লাহ্ আজমকে 'ইসলামি জিহাদের আমির' বলা হয়েছে। তবে তাকে গড ফাদার হিসেবে বর্ণনা করা হলে আরও যথাযথ হত। যা অগ্রগমনে অব্যাহত রাখার অবশেষে টেনে নিয়ে যায় বর্তমানে (২০০৫) বিশ্ব জিহাদের আমির সর্বান্তে ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন আওয়াদ বিন লাদেনের দিকে।

১৯৫৭ সালে সৌদি আরবে ওসামা বিন লাদেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইয়েমেনি অভিবাসী ঠিকাদার মুহাম্মদ বিন লাদেনের ৫২ জন সন্তানের মধ্যে ১৭তম, তাঁর মাতা একজন সিরীয় যাঁকে তাঁর পিতা পরবর্তীকালে তালাক দেন। জ্যেষ্ঠ বিন লাদেন সৌদি রাজ পরিবারে তাঁর ঠিকাদারি নির্মাণ কাজ করে এক বিস্ময়কর সঞ্চিত অগাধ সম্পদ গড়ে তোলেন এবং ওসামা বিন

লাদেন প্রাচুর্যের সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে লালিত-পালিত হন, যদিও তিনি কখনও নিজেকে সৌদি অন্দর মহলে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তাঁর পিতা সন্তানদের একই বাসভবনে একত্রে রাখতেন, তাদের ওয়াহ্হাবি ভাবধারায় কঠোর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পরিবারের মূল সুবৃহৎ বাসস্থান ছিল জেদ্দায়, যাহোক, কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে চতুর্থ হিসেবে বিবাহিত হয়ে তালাকপ্রাপ্ত হওয়া ওসামার মাতার মর্যাদা ছিল নিম্ন পর্যায়ে এবং সিরীয় আলওয়াইট সম্প্রদায়ের অনুসারী হওয়ার কারণে তিনি তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারেন নি, আর ওয়াহ্হাবিদের দ্বারা তিনি প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী বলে বিবেচিত হন। তাঁর বয়স যখন এগার তখন তাঁর পিতার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে একজন বহিরাগত হিসেবে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যুবরাজ ফয়সাল তাঁর সন্তানদেরকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে এগিয়ে আসেন এবং তাদের উত্তম শিক্ষার্থে বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করেন কিন্তু ওসামা বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে তাদের জেদ্দায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৭ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একটি পরিবারকে নিয়ে হজ পালন করতে যান, সেই সময় বিশ বছর বয়সী ওসামার বোধ বিভ্রম ঘটে এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে কট্টরপন্থী ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন এবং বেশভূষায় পরিবর্তন করে ইসলামি শিক্ষা অধ্যয়নে ব্রতী হন। ওসামা বিন লাদেন সৌদি আরবে জন্ম নেওয়া ইয়েমেনি ওয়াহ্হাবি মতবাদের পৃষ্ঠপোষক, যিনি আব্দুল্লাহ আজম ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বিপ্লবাত্মক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতবাদের দ্বারা রাজনীতিতে দীক্ষিত হয়ে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন।

১৯৭৯ সালে, যখন তাঁর বয়স বাইশ বছর তখন তিনটি তুলনার অযোগ্য তবে গভীরভাবে বিশৃঙ্খল বিষয়ের জন্য সরাসরি যুদ্ধ করার জন্য বিন লাদেন তাঁর লেখাপড়া পরিত্যাগ করেন। ইরানে আয়াতোল্লাহ্ বিপ্লব; মক্কায় প্রধান মসজিদকে সহিংস অবরোধ; এবং আফগানিস্তানে রুশদের হস্তক্ষেপ। যদি প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সঠিক হয়, তিনিই প্রথম সৌদি যিনি প্রথমে আফগানিস্তানে বিমান যোগে গমন করেন, প্রায় নিশ্চিতরূপেই আব্দুল্লাহ্ আজমের উৎসাহ নিয়ে যাঁকে তিনি অগ্রজ মেনেছিলেন। বিন লাদেন পরিবারের সৌদি রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে গেল। সৌদি আরবের সরকার আফগান বিষয়ে অঙ্গীকার পালন করতে সর্বাধিক উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, যখন শেখ বিন বাজ ওয়াহ্হাবি সহায়তা ও অভিযানকারী সংগঠনসমূহের দেখভাল করছিলেন। সুতরাং বিন লাদেন সৌদি আরবের পক্ষে পাকিস্তানে একজন রাজদূত ও ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি হয়ে যান। তিনি তাঁর নিজের বিপুল ধন-সম্পদ এই আদর্শগত কারণে উৎসর্গ করেছিলেন, এতে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও পারিবারিক

সদস্যবর্গের সমর্থন ছিল। তিনি রণাঙ্গনের সম্মুখ কাতারে উপস্থিত থাকতেন, যদিও তাঁর সম্পর্কে তাঁর হিজব-ই-ইসলামি সংগঠনে আলোচনা হত যে তিনি একজন যুদ্ধ-কঠোর জিহাদি যাকে অবশ্য তাঁর সহযোগীরা ইচ্ছানুরাগী স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করতেন। যেখানে সামরিক সেনাপ্রধানদের জিহাদিদের সব চাইতে বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সেখানে তাদেরকে পাঠানোর মধ্যে তাঁর যথার্থ প্রতিভা নিশ্চয়তার মধ্যে এবং তাদের খাদ্য-অস্ত্র সরবরাহ আসা অব্যাহত রাখার মধ্যে। এই প্রক্রিয়ায় ওসামা মুসলিম জাতির সকল দিক থেকে আসা বহু সহস্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে সরাসরি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আহত মুজাহিদীনদের উদারতাপূর্ণ সেবাদান করে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং শহীদদের পরিবারবর্গ যারা কষ্ট ভোগ করছিল— আর এটি হতে পরে যখন মোল্লা ওমর সম্প্রতি ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরণে একটি চোখ খোয়ান। এই প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ, বলা হয় ১৯৮৯ সালে করাচির শহরতলি বুনুরি এলাকায় ঐকটি দেওবন্দি মসজিদে হয়েছিল। ঐ সময়ে সুস্পষ্টভাবে লম্বা ও সুসজ্জিত আরব 'আল-শেখ' হিসেবে সকলে জানত আর সীমান্ত অঞ্চলব্যাপী সুবিদিত এবং খুব প্রশংসিত হয়ে ওঠেন, একজন বিনীত এবং এই সময়ে তিনি কখনো অতি আকর্ষণীয় একজন যুবক হিসেবে আবির্ভূত হতে দ্বিধাবোধ করতেন যদিও তিনি সৌদি আরব কর্তৃক নিয়োজিত আফগানিস্তানে জিহাদের এক স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

তথাপি বিন লাদেনের অবদান অতি সীমিত থাকত যদি না তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক আব্দুল্লাহ্ আজম কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হয়ে বিদেশী ভূমিতে সদস্য সংগ্রহ করে তাদের সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে সৌদি অর্থ ব্যয়ে এক উঁচুমানের জিহাদি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত হতেন। এটি মক্তব আল-খিদমত এ্যান-মুজাহিদীন, মুজাহিদীনদের কার্যের দপ্তর, আন্তর্জাতিক কর্মজাল (নেটওয়ার্ক) বৈদেশিক শাখাসমূহের সঙ্গে মোবাইল টেলিফোন, ব্যক্তিগত কম্পিউটার ও ল্যাপটপের মাধ্যমে যোগযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠে। এটি বস্তুতঃ পূর্বে পেশোয়ারে স্থাপিত দপ্তর পাকিস্তানের আইএসআই-এর সমান্তরালও হয়ে ওঠে। আব্দুল্লাহ আজমের মুজাহিদীনদের কার্যের দপ্তরের ওপর নিয়ন্ত্রণ তাঁকে সেই সকল মুজাহিদীনদেরকে অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষণ চালাতে অনুমোদন দেয় যাদের কর্মসূচি তাঁর নিজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রধানত, গুলবউদ্দিন হেকমতিয়ারের হিজবি-ই-ইসলামি (হেকমতিয়ার) এবং ইত্তিহাদ-ই-ইসলামি (ইসলামের ঐক্য)। এই দুইজন মুজাহিদীনই সৌদি আরবের নেতৃত্বে ওয়াহ্হাবি লশকর (যুদ্ধদল)-এর অনুসারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

পঁচিশ সহস্রাধিক বিদেশী জিহাদিদের সংগ্রহ দপ্তর অতিক্রম করার বিষয়ে জানা যায়। দপ্তরটি লতা-গুল্মদ্বারা আবৃত পেশোয়ারের বেসামরিক ঘাঁটির মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর জনঅধুষ্যিত প্রাচীন নগরীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তাদের অনেকেই ইসলামি জিহাদ ও হামাসসহ সর্বাধিক সংগ্রামশীল সংগঠনগুলি থেকে ইসলামি বিশ্বে এসেছে। এই স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে একত্রে 'আরবগণ' নামে পরিচিত ছিল ও তারা তাদের সাহস আর ত্যাগের জন্য সমাদৃত এবং সম্মানিত হয়েছিল।

এটি বললে অতিরঞ্জিত হবে না যে এই দপ্তর থেকেই এখনকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উর্বর ও ধারণক্ষম ভূমিতে আন্তর্জাতিক জিহাদের বীজ রোপিত হয়, মৌলবাদী ও পুনর্জাগরণী ইসলামের বিদ্বেষ যা কোথাও কোথাও ধারণার বশবর্তী হয়ে জল সিঞ্চন ও কর্ষিত হয়ে—এবং যা পরিণতিতে সশস্ত্র আল-কায়েদা (সামরিক) ভিত্তিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

যারা যারা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রথমাবস্থায় মক্তব আল-খিদামত এ্যান মুজাহিদীনেরদের দরজায় করাঘাত করে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আইমন আল-জওয়াহরি নামে কিঞ্চিৎ পরিচিত একজন মিসরীয় 'চিকিৎসক'কে উল্লেখ করা যায়। তিনি কায়রোর মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত পরিবার থেকে আসেন, গোড়াতে আরবিভাষী, তাঁর পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অনেকেই নিজেদেরকে কূটনীতিক, শিক্ষক, চিকিৎসক ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ করে তোলেন। তাঁর পিতামহদের একজন সৌদি আরব ও পাকিস্তানে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন এবং ১৯৫০ দশকে রিয়াদে বাদশাহ্ আল সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এক জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য মিসরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন ও ত্রিশ বছর চাকরি করার পর ১৯৪৫ সালে আরব লীগের ভিত্তি স্থাপনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সৌদি বাদশাাহ্ ইবনে সৌদকে উক্ত আনত-মুসলিম দেশীয় সংগঠনে যোগ দিতে উদ্ধুদ্ধ করেছিলেন বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর আর এক জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্য ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কায়রোর আল-আক্সা মসজিদে প্রধান ইমাম পদে চাকরি করেন—তিনিই সেই লোকটি যাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন শেখ হাফিজ ওয়াহ্হাবা। ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় এশীয় সমাজের এক বক্তৃতায় মিসরের প্রধান মুফতির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাবের শিষ্য হিসেবে।

এইভাবে আল-জওয়াহরির পরিবার ও সৌদদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দুই প্রজন্ম যাবত টিকেছিল—আয়মন আল-জওয়াহরির পারিবারিক ঐতিহ্য ছিন্ন করে মিসরে ইসলামি জিহাদ বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

তিনি ছিলেন পুলিশ যে কয়েক শ সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে অনুসন্ধান করছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত আর ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়, এবং তিন বছর পরে একজন তিক্ত-বিরক্ত মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি সৌদি আরবে গমন করেন ও তারপর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে যেখানে ১৯৮০ দশকের গোড়ার দিকে তিনি কুয়েত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে দু'বার চিকিৎসক হিসেবে গমন করেন।

১৯৮৬ সালে বিন লাদেন তাঁর কয়েকজন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েসহ জেদ্দা থেকে পেশোয়ারে বিমানযোগে গমন করেন এবং নগরীর বাইরে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতে লাগেন। ঐ একই গ্রীষ্মকালে বুধবার পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন স্পিন গড় পবর্তের নিচু ধাপে খোস্ট এলকায় তিনি আরব স্বেচ্ছাসেবক দলের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির প্রতিষ্ঠিত করেন। আব্দুল্লাহ্ আজমের অনুকরণে তিনি তাঁর এই শিবিরের নাম দেন বায়াত আল-আনসার বা স্বেচ্ছাসেককদের ভবন, তিনি তাঁর ওপরে বহু পূর্বে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুহাকে তাঁর পারিবারিক পেশায় অর্জিত নির্মাণ ও যন্ত্র সামগ্রী দিয়ে একটি দূর্গ দ্বারা সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলে রূপান্তরিত করেন। পরবর্তী বছরে যখন রুশ বিশেষ সেনাদল তাঁর শিবিরকে আক্রমণ করে এর আরব প্রতিরোধকারীদের সীমান্তের অপর পারে পশ্চাদ্ধাবরন করতে বাধ্য করে, তখন তাঁর পরিকল্পনার উন্নতির পক্ষে একটি অন্তরায় সৃষ্টি হয়। যাহোক, খোস্ট প্রকল্প আফগান সিত্তানার ধর্মান্ধ শিবিরের সমকক্ষ হয়ে টিকে রইল, যেখানে হাজার হাজার আন্তর্জাতিক জিহাদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্নায়ু মেরুকরণ অভিযান স্বদেশের সীমা অতিক্রম করেও বিষয়টি সুদূর প্রসারী আলজেরিয়া, চেচনিয়া ও সিংজিয়াং অবধি বিস্তার লাভ করে।

এই 'আরবগণ'-এর মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি বর্তমানে (সেপ্টেম্বর ২০০৫) ইরাকে বোমা ক্ষেপণ অভিযানের কারণে ও জঘণ্যতম সন্ত্রাসীদের শিরচ্ছেদ এবং বর্বর দুষ্কর্মসমূহে কর্তৃত্ব করে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন জর্দানীয় আবু মুসাব আল-জারকায়ি। ১৯৮৯ সালে আল-জারকায়ি একুশ বছর বয়স্ক যুবক হিসেবে পেশোওয়ারে পৌছান, তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন অলোভনীয় দুর্বৃত্ত ও ভাড়াটে গুণ্ডার সুনাম। তিনি রুশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য যতদূর মনে হয় অস্ত্র-বোঝাই নৌকাকে ধরতে পারেন নি, সুতরাং তিনি চরমপন্থী সংবাদ পত্রে কাজ করতে লাগলেন, এখানে মৌলবাদী মাওলানা শেখ মুহাম্মদ আল-মাকদিসি নামে একজন জর্দানীয় সঙ্গী যাঁর সালাফি বিশ্বাসসমূহ তাঁকে দেওবন্দিদের স্বাভাবিক সাথী করে তোলে তিনি তাঁর প্রভাবাধীনে আসেন। এই বিশ্বাসসমূহ আল-মাকদিসি ও তাঁর নতুন

ছাত্রবৃন্দকে আব্দুল্লাহ্ আজম বা বিন লাদেনের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে অনিচ্ছা প্রকাশের কারণ হিসেবে দেখা দেয়। এতদ সত্ত্বেও, জর্দানে হাশেমীয় রাজতন্ত্রকে পরাস্ত করার বাসনা নিয়ে তারা তাদের নিজেদের দল বায়াত আল-ইমাম বা ইমামদের ভবন নামে গঠিত করেন। দুই ব্যক্তিই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কারণে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইতিমধ্যে মিসরীয় চিকিৎসক আল-জওয়াহরিও বিন লাদেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর পরিবারসহ আরব থেকে পেশোয়ারে বিমানযোগে গমন করেন, এখানে তিনি ও তাঁর মিসরীয় বিপ্লবীরা মিসরীয় ইসলামি জিহাদ নামে একটি স্থানীয় বিরোধী দল প্রতিষ্ঠিত করেন। অনিবার্যভাবে, একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে দেখা দিল। মিসরীয়দের পক্ষে নেতৃত্বে ছিলেন আল-জওয়াহরি ও আরবদের পক্ষে মুজাহিদীনদের কার্যাবলীর দপ্তর থেকে নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ আজম। যখন ১৯৮৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানে ক্ষতি এড়ানোর জন্য তাদের সেনাদলকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন এই বৈসাদৃশ্য তীব্র হয়ে ওঠে। এক দশকব্যাপী রুশ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ কঠোর ও উচ্চ রাজনীতি আয়িত আন্তর্জাতিক দলের সৃষ্টি করেছিল। আব্দুল্লাহ্ আজম চেয়েছিলেন আফগানিস্তানে এই বিদেশী জিহাদিরা থাকুক ও এটি ইসলামিকরণ নিশ্চিত করতে, যার পরে তারা দেওবন্দি রাজনীতি-ধর্মীয় দলের ও অন্যান্য ইসলামি দলসমূহে যোগ দেয় পাকিস্তান ও কাশ্মিরকে মুক্ত করার জন্য। যাহোক, আল-জওয়াহরি যুক্তি প্রদর্শন করেন যে রুশ-বিরোধী ঘটনাকালে সমগ্র-ইসলামি সশস্ত্র আন্দোলনের সৃষ্টি করে এখন সেটিকে সমগ্র মুসলিম জাতিকে মুক্ত করতে মিসরকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেছিল।

১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মকালের শেষে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তিবর্গের শেখ আব্দুল্লাহ্ আজমকে গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায় যখন আগ্নেয়াস্ত্র ছোড়ার বারুদসহ বিস্ফোরক দ্রব্যের স্থান একটি মসজিদের ধর্ম প্রচার মঞ্চের নিচে দেখা যায়, যেখানে তিনি ধর্ম প্রচার করতে যাচ্ছিলেন। সম্মুখ বাগযুদ্ধে আল-জওয়াহরি আব্দুল্লাহ্ আজমকে অভিযুক্ত করে গো-হাটা রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার জন্য ধিক্কার দেন। যখন ডাক্তার তাঁর শিবিরে তাঁর পক্ষে আদর্শিকভাবে অনুগত ও মানসিক অনুভূতি প্রবণদের চিন্তা ধারায় দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখনই কেবল এই প্রচেষ্টার অবসান হয়েছিল। যাকে তিনি কিডনি রোগের চিকিৎসা করছিলেন ওসামা বিন লাদেনের বয়স একত্রিশ বছর আর আল-জওয়াহরির আটত্রিশ। ঐ একই বছরের ২৪ নভেম্বর শুক্রবার আব্দুল্লাহ্ আজম এখন বর্ধিষ্ণুভাবে বিচ্ছিন্ন, যখন তাঁর কিশোর পুত্রদের সঙ্গে তাঁর নিজ বাসভবন থেকে তিনি স্থানীয় মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করতে

যাওয়ার পথে আরও একবার গুলির নিশানায় পড়েন। মসজিদ থেকে ঠিক অল্প দূরবর্তী গলিতে তাঁদের গাড়ি থেকে বাকি পথটা তাঁরা হেঁটে যাচ্ছিলেন—যেখানে বোমা সশব্দে ফেটেছিল। আব্দুল্লাহ্ আজমকে উৎসর্গ করে একটি ওয়েব সাইট চালু করে

> 'নগর থেকে বজ্রপাতের একটি বিকট শব্দ শোনা যায়, লোকজন মসজিদ থেকে বেরিয়ে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে। কনিষ্ঠ পুত্র ইব্রাহিম ১০০ মিটার শূন্যে উড়ে যায়, অন্য দুজন তরুণ একই দূরত্বে ছিটকে পড়ে, এবং তাদের শরীরের অবশিষ্টাংশসমূহ গাছের মধ্যে ও বৈদ্যুতিক তারগুলোতে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আব্দুল্লাহ্ আজমের নিজের বিষয়ে বলতে হয়, তাঁর শরীরটি একটি দেওয়ালে হেলানো, সম্পূর্ণরূপে অক্ষত ও মোটেও বিকৃত হয়নি, শুধু মুখ থেকে কিছু রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা গেল। ঐ সাংঘাতিক বিস্ফোরণ প্রকৃতপক্ষে শেখ আব্দুল্লাহ্‌র পার্থিব ভ্রমণ সমাপ্ত করে দেয়, যেটি আল্লাহ্‌র রাহে সংগ্রাম, বিবাদ এবং করে অতিবাহিত হয়েছে।'
>
> যদিও সি আই এ-কে দোষারোপ করা হয়, শেখ সাহেবের মৃত্যুর কারণে সরাসরিভাবে যিনি উপকৃত হয়েছিলেন তিনি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থলে বিদায়ী প্রশংসাসূচক কথা বলেন ডাক্তার আয়মান আল-জওয়াহরি বর্তমানে বিশ্ব জিহাদের নেতৃস্থানীয় ভাববাদী হয়ে যান।

যদিও ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তান থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহার করা হয় তথাপি সম্মিলিত মুজাহিদ বাহিনীর প্রয়াসে রুশ সমর্থিত আফগান সরকারকে ১৯২২ সালে উৎখাত করা হয়। তাদের বিদেশী পৃষ্ঠপোষকদের নিকটে আতঙ্কের ব্যাপার, সাত জন মুজাহিদীন সেনা একে অপরের ওপর তখন তাদের বন্দুক তাক করে, বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আকস্মিক মহাদুর্যোগপূর্ণ ঘটনার দিকে মোড় নিচ্ছিল। ১৯৮০ সাল থেকে আফগান শরণার্থীরা যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তান ও ইরানের সীমান্তাঞ্চল পার হচ্ছিল, কিন্তু যখন ১৯৯০ দশকের গোড়ার দিকে তাদের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যেখানে পাকিস্তান সরকার স্বয়ং এটি দেখে ত্রিশ লক্ষ শরণার্থীকে আত্মীভূত করে ভালভাবে আশ্রয়দান করে, এদের অধিকাংশই পাঠান।

১৯৪৪-৫ সালে শীতকালে তালিবানদের উত্থান, যতদূর মনে হয় কোথাও থেকে নয়, আর এর দ্রুত ক্ষমতায় আরোহণ, ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাবুলে দখল সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায়, এ সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সতর্কতার সাথে পাকিস্তানি সাংবাদিক আহমেদ রশিদ তাঁর ধারাবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এই একই সময়ে বিন লাদেন ও আল-কায়েদার বিষয়ে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর গবেষণা ও ভৌগলিকভাবে ম্যালিস

রুথভ্যান, বার্নার্ড লিউইস, গাইলস কেপেল, জ্যাসন বার্ক এবং অন্যান্য সম্মানিত কর্তৃপক্ষবর্গ কর্তৃক বিবৃত হয়েছে। এই দুই আন্দোলনের সমধর্মিতার কিছু শেষ ফাঁক পূরণ হওয়ার জন্য রয়ে গেছে।

রুশ সেনাদল প্রত্যাহারের পর বিদেশী জিহাদিদের অনেকেই তাদের স্বদেশে সংগ্রাম করার জন্য আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ত্যাগ করে যায়। তবে 'আরবগণ' দল থেকে চূড়ান্ত প্রস্থানের পূর্বে ১৯৮৮ সালে বসন্তকালে বিন লাদেনের শিবিরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে আল-জওয়াহরি তাঁর সমমনা কিছু জিহাদিদের নিয়ে একটু ঢিলেঢালা একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার উদ্দেশ্যই ছিল সর্বস্তরে ইসলামের প্রসার ঘটানো এবং যেখানে ইসলাম বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেখানে অভিযান জোরদার করার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এর সামরিক ভিত্তিক স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যাদিসহ আল-কায়েদা, এই সংগঠনটির নাম দেওয়া হয়, এটিকে ১৮২৭ সালে মহাবন পার্বত্যাঞ্চলে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বড় গোডাউন বা 'বড় ভাণ্ডার ভবন' ব্রিটিশদের নিকটে হিন্দুস্তানি বা ধর্মান্ধদের শিবির বলে পরিচিত, তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে মর্মে দেখা যায়। খোস্টে এই সভার পর ওয়াহ্হাবি ইত্তিহাদ-ই-ইসলামি দলের নেতা আব্দুল রব রসুল সায়াফ তাঁর বিপুল সংখ্যক অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে সরাসরি ফিলিপাইনের উদ্দেশ্যে গমনের জন্য পেশোয়ার ত্যাগ করেন যেখানে 'আবু সায়াফ দল' হিসেবে পশ্চিমা শান্তিপ্রিয়দের কাছে তারা ওয়াহ্হাবি ভীতিকে উপস্থাপিত করেন। অন্যান্যরা ইসলামি বিপ্লব সংঘটনের আন্দোলনে বাতাস দিচ্ছিল যতদূর সম্ভব উত্তরে চেচনিয়া ও কিরগিজস্তান আর পশ্চিমে আলজেরিয়া, মরোক্কো—এবং যুক্তরাষ্ট্রে।

খোস্ট সমাবেশে বিন-লাদেন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না, তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে জেদ্দায় তাঁর বাসভবনে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ ফেরত আরব যোদ্ধাদের কল্যাণের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। জেদ্দায় তিনি অবস্থান করতে পারতেন তবে ১৯৯০ সালের অগাস্ট মাসে কুয়েতে ইরাকের আক্রমণ, যা তাঁকে অবিলম্বে সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শাহ্জাদা সুলতানের সঙ্গে সৌদি আরবকে রক্ষার্থে তাঁর বৈশ্বিক কর্মজাল (নেটওয়ার্ক)-এর অংশ হিসেবে সাবেক আফগান জিহাদিদেরকে আহ্বানের প্রস্তাবসহ সম্পর্ক স্থাপন করেন, এখন কয়েক সহস্র ঝানু জিহাদিরা আরবে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করেছে। একটি বর্ণনা মতে, তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে তিনি সভা ত্যাগ করেন, ফল হল যে পরবর্তীকালে যখন তিনি জানতে পারলেন যে সৌদি সরকার তাঁর প্রস্তাব গ্রহণের পরিবর্তে আমেরিকার দিকে মোড় ঘুরিয়েছেন, তখন মনে হলো এটি যুগল প্রতারণা। তাঁর ওয়াহ্হাবি চেতনার আরব ভূমিতে বিধর্মীদের পদচারণা করতে কখনোই সম্মতি দেয় নি। যেটিকে তিনি একটি সরাসরি মহানবী

(সা.)-র নিষেধাজ্ঞার অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা হিসেবে দেখেন যে আরবে দুইটি ধর্ম থাকবে না। কয়েক মাসের মধ্যে বিন লাদেন যে জীবন যাত্রায় অগ্রসর করানো হয় সেটি হলো সৌদ পরিবারের তিক্ত শত্রু এবং ওয়াহ্হাবি প্রতিষ্ঠান যা এর প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষদের প্রতারণা করে এই জন্য তাঁকে স্থায়ী নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। যদিও সৌদি আরবে তাঁর সম্পদ কমে এসেছে, তাঁর এখনও আল জওয়াহরির ইসলামি জিহাদ আল-কায়েদা মিত্র সঙ্ঘের ব্যাংকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মত যথেষ্ট তহবিল রয়েছে।

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কের বাণিজ্য কেন্দ্র (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার)-এ বোমা নিক্ষেপ করে ছয়জন ব্যক্তিকে নিহত করা হয়। এটি ছিল আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের আল-কায়েদার প্রথম ভয়াবহ আগ্রাসি কর্ম, এবং এই অভিযান পরবর্তী কালে সোমালিয়া ও মিসরে সংঘটিত হয়েছিল।

অধ্যায় বার

অশুভ আঁতাত

> একটি ঝর্ণা ধারাকে তার উৎস মুখে শীর্ণ একটি বৃক্ষ শাখা দিয়ে গতি পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যখন সেটি একটি নদীতে পরিণত হয়, একটি হাতিও তা অতিক্রম করতে পারে না।
>
> শেখ মুসলি হু-উদ-দিন, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিরাজের এক বিখ্যাত মুসলিম আধ্যাত্মিক কবি সাদী নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পেশোয়ার উপত্যকার পূর্ব সীমান্তে তাওজবা গ্রামের সমতল ভূমির উপরে সাদা ক্যানভাস ও সূতীর শামিয়ানা দিয়ে অসংখ্য তাঁবু তৈরি করা হয়েছিল। তিন দিনের অধিক কাল যাবত কার্যধারা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সেটি হল পাকিস্তানে এ যাবত কালের সর্ববৃহৎ দার উল-উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা আন্দোলনে কার্য সম্পাদন উদযাপিত হয়। এর সংগঠকদের মতানুসারে জেইউআই দশ লক্ষাধিক প্রতিনিধি মাদ্রাসাগুলোকে উপস্থাপন করছিল সুদূর যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশগুলিতে এটি প্রসারিত হয়েছিল। বিশোর্ধ দেশ থেকে প্রথিতযশা ইসলামি ব্যক্তিত্বকে পাঠিয়ে অভিনন্দন বার্তা পাঠ করে শোনান হয়েছিল, যাদের মধ্যে ছিলো লিবিয়ার কর্ণেল গাদ্দাফি। যাহোক, দুটি বক্তৃতা যা উচ্চতম প্রশংসার সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল সে দুটিই ছিল টেপকৃত বার্তা। প্রথমটি আফগানিস্তানের ইসলামি আমিরাতের আমির উল-মোমিনীন, মোল্লা ওমরের কাছ থেকে। দ্বিতীয়টি, সম্মেলন সংগঠকদের পক্ষে সর্বতোভাবে অস্বীকার করেন 'আল-শেখ'ঃ ওসামা বিন লাদেন।

সম্মেলনে পৌরহিত্যকারী ছিলেন মাওলানা ফজল-উর-রহমান হৃষ্টপুষ্ট বিশালদেহী লম্বা-চওড়া, স্বাস্থ্যবান, সাদা-পাগড়ীধারী এবং, অবশ্যই শ্মশ্রুমণ্ডিত যাঁর বয়স পঞ্চাশের প্রথমার্ধে, জ্বালানী অনুমোদন দেওয়া অপ্রমাণিত অপবাদের কারণে তিনি পাকিস্তানে 'ডিজেল মাওলানা' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে জেইউআই সংগ্রামরত বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে তাঁর

অবস্থান পান তাঁর দার উল-উলুম দেওবন্দ-শিক্ষিত পিতা মাওলানা মুফতি মাহ্মুদের কাছ থেকে, যিনি জেইউআই দলকে দাঙ্গা-হাঙ্গামাপূর্ণ ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে পরিচালনা করতেন। এখন তিনি পাঁচটি সম্মিলিত দেওবন্দি রাজনৈতিক দলের সভাপতি ও তালিবানদের 'বিজ্ঞ পরামর্শদাতা' বলা হয় তাঁকে। তাঁর অন্তিম বক্তৃতার যখন মুসলিমরা কোন বিপদে পড়বে তখন তাদের মুসলিম ভ্রাতৃবর্গের পেছনে দাঁড়ানোর জন্য তিনি মুসলিমদেরকে আহ্বান জানান। তিনি সমাপ্তি টানেন, 'বিশ্বের যে কোন অংশে তালিবান বা মুসলিমদের স্বাধীনতা ও পরিচিতির লড়াইয়ে সমর্থন দেওয়াতে আমাদেরকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।' দিনটি ছিল ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগন যুগল অট্টালিকায় সমন্বিত আক্রমণের পাঁচ মাস পূর্বে।

১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জনমত থেকে জানা যায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এক মোল্লা একটি হত্যার দৃশ্য দেখে ফেলেন একটি পরিবার গাড়িতে করে হেরাত থেকে কান্দাহারে গমন করার সময় এক স্থানীয় সামরিক নেতা তাদেরকে আটক করে পরিবারের সকল মেয়েকে ধর্ষণ করে বালকদেরসহ হত্যা করে। কতিপয় স্থানীয় তালিবানের সহায়তা নিয়ে মোল্লা মৃতদেহগুলোকে ধৌত করে তাদেরকে যথাযথভাবে দাফন করেন। তিনি ছিলেন একজন ঘিলজাই পাঠান বংশীয় নেতা মোল্লা ওমর যার কোন শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না এবং তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভূমিহীন। তিনি ছিলেন একজন স্বনামখ্যাত জিহাদি ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চোখ হারিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অন্যান্য যুদ্ধবাজ সেনাধ্যক্ষদের দুর্নীতিতে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে এ কে-৪৭ বন্দুক পরিত্যাগ করে কোরান শরীফ চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তিনি ১৮৮০ সালে কান্দাহার প্রদেশের সিঞ্জসারে স্যাং-ই-হিসার মাদ্রাসায় তাঁর ধর্ম পাঠে নিয়োজিত হন। জায়গাটি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আফগানের বিজয় স্থল থেকে বেশি দূরে নয়। এই সাম্প্রতিক বর্বর দুষ্কার্য দেখে মোল্লা ওমরের এতই অসুস্থতার উপক্রম হলো যে তিনি একদল ঝানু মুজাহিদীনকে একত্রে জড় করে শপথ গ্রহণ করেন যে আফগানিস্তানকে যারা ধ্বংস করছে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে সত্যকার শরিয়া পুনরুদ্ধার করবেন। এই ক্ষুদ্র দলটি স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের জন্য মসজিদে মসজিদে যেতে থাকল, এবং এর স্থানীয় প্রতিক্রিয়া সেখানে উন্নত হলো হিজব-ই-ইসলামি ও পাকিস্তানের আইএসআই-তালিবানের থেকেও অধিক সামরিক সহায়তাসহ।

যে ব্যক্তিটি প্রায় দৈবক্রমে তালিবানদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি ভাববাদী ছিলেন না, তবে যে লোকগুলো তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ও যারা তাঁর ঘনিষ্ঠতম প্রতিনিধি হয়ে অত্যধিক বেশি একটি ধরণের হয়ে যান, এই

জন্য যে তারা প্রায় প্রত্যেক মাদ্রাসার এক একজন ছাত্র হয়ে যান হয় এই ছাঁচে বা অন্য ছাঁচে। যেমনটি আহমেদ রশিদ তাঁর গ্রন্থ তালিবানে বলেন : দ্য স্টোরি অভ দ্য ওয়ার লর্ডস, 'তালিবানরা নিজেদেরকে ব্যতীত তারা কাউকে উপস্থাপন করেনি।' তারা নিজেদেরকে সুন্নি বলে বর্ণনা দেয় যারা ইসলামি আইন বিজ্ঞানের হানাফি ধারাকে অনুসরণ না করে তার পরিবর্তে তারা না দেওবন্দি, না ওয়াহ্হাবি, না অন্য কোন ধর্মীয় দলের অনুসারী। তবে তাদের একটি বিমূর্ত ভিত্তি রয়েছে, যা 'দেওবন্দি মতবাদের একটি চরম পন্থা'র সঙ্গে সম্পর্কিত। যেটিকে রশিদ ব্যাখ্যা করেন, 'তালিবান ও চরমপন্থী দেওবন্দি দলের মধ্যে সংযোগ অপরিবর্তনীয় কারণ তারা সাধারণ ভিত্তিমূল সূত্রকে ভাগাভাগি করে । দেওবন্দি প্রথা উপজাতি ও সামন্ত প্রথা থেকে ভিন্ন, যেখান থেকে তালিবানদের উপজাতীয় প্রথা ও গোষ্ঠী সর্দারদের সম্বন্ধে অবিশ্বাসের বংশ বিস্তার লাভ করে।'

১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে মোল্লা ওমরের হস্তক্ষেপের নয় মাস পর, কান্দাহারে পাঠান নেতৃবৃন্দের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এটি সচরাচর আন্ত-উপজাতি সমাবেশের মত ছিল না তবে আরবের উলেমাদের সমাবেশ, একটি শুরা বা ধর্মীয় পরিষদ প্রচলিত সাধারণ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে এড়িয়ে নতুন পথ ধরে এগোয়। এটি সেই শুরা যেখানে মোল্লা ওমর নবী (সা.)র মত নিজেকে ঢিলা বড় জামা পরিধানের ও যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছ থেকে আনুগত্যের (বায়াত) শপথ গ্রহণের পূর্বে আমির উল-মোমিনীন (বিশ্বাসীদের সেনাপতি) নির্বাচিত হয়েছিলেন। অতঃপর মোল্লা ওমরকে প্রধান করে দশ সদস্য বিশিষ্ট পাঠান শাসিত একটি পরিষদ গঠিত হয়, এবং যে সকল মুসলিমরা এর কর্তৃত্ব স্বীকার করল না তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হলো। এই কাজগুলো আফগানিস্তানের পাঠান জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে তবে তাজিকরা, উজবেকরা এবং অন্যান্য দলগুলো, যারা অর্ধেক দেশ জুড়ে একত্রে অন্য একটি পরিষদ গড়ে তাদের কাছে এটি সমাদৃত হয়নি (গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের পক্ষে পাকিস্তানের সমর্থন ও সেই সুবাদে সৌদি সহায়তা সত্ত্বেও হিজব-ই-ইসলামি (হেকমতিয়ার) সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান তালিবান শক্তি ১৯৯৬ সালের সমগ্র গ্রীষ্মকালব্যাপী কাবুল নগরী অবরোধ করে রেখেছিল যেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে কাবুল অভিযানে রূপ নিয়েছিল এবং সহস্র সহস্র মাদ্রাসা শিক্ষানবিশ অতি দ্রুততার সাথে সেই অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তালিবানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কখনো আরবের বাইরে, কখনো ভেতরে দেখা গেছে শরিয়া বিধানের কঠোরতম অনুশাসন দেশটিতে চাপিয়ে দিতে।

আসলে এটি সৌদি আরবকে এর আদল হিসেবে নেয় আর এটি ওয়াহ্হাবিবাদের প্রতিষ্ঠাতা নেজদের মুহাম্মদ ইবনে আল-ওয়াহ্হাব-এর ধর্মতত্ত্বের অনুসারে ছিল। কেবল দুটি সরকার তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল সৌদি আরব এবং পাকিস্তান।

১৯৯৬ সালে মে মাসে যখন কাবুল আক্রমণ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে, বিন লাদেন ও তাঁর ভাববাদী ড. আল-জওয়াহরিকে যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক বল প্রয়োগ দ্বারা তাদেরকে সুদান ত্যাগ করার চাপ দেয়, যেখানে বিন লাদেন ওয়াহ্হাবি ছাঁচে একটি দার উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালান। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চেচনিয়ায় পৌছানোর পূর্বে স্থানীয় যোদ্ধাদের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে যুক্ত হয়ে মিসরীয়রা দেশ থেকে দেশে গমন করে। ইতিমধ্যে তাঁর ইয়েমেনি সঙ্গী আফগানিস্তানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারবর্গকে সঙ্গে ভাড়া করা জেটবিমানে জাল্লালাবাদে গমন করেন, এর থলি উক্ত অনুযায়ী আমেরিকার ডলারে ভরে যায়। পাঠানদের বিদেশীদের সম্বন্ধে অহেতুক ভীতি এতক্ষণে পুনরায় দৃঢ়রূপে বলতে শুরু করে 'আরবগণ' আর সমাদৃত হয় না তবে 'আল-শেখ'-এর পর্যাপ্ত সমর্থন ও মহত্ত্বের স্মৃতি নিশ্চিত করে যে তাকে জাল্লালাবাদের বাইরের দিকে হাড্ডায় আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। ঐ একই বছরের অক্টোবর মাসে বিন লাদেন বিমান যোগে গমন করে সেখানকার নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত তবে অদ্ভুত ধরণের নির্জনে বসবাসকারী আমির উল-মোমিনীনের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি মোল্লা ওমরকে তাঁর শর্তহীন ও অর্থনৈতিক সমর্থন দেন, আর প্রতিদানে তালিবান সরকার তাকে সুরক্ষা দেয়, এটি এত অশুভ আঁতাতের সূত্রপাত করে যে অবশেষে তালিবান সরকারকে সেটি ধ্বংসের দিকে চালিত করে।

শাসন ব্যবস্থার সমর্থনের নিশ্চয়তা পেয়ে বিন লাদেন খোস্টের নিকটবর্তী তাঁর বায়াত আল-আনসার শিবির প্রকল্পে প্রত্যাবর্তন করে সেখানে ওপরে একটি বাসভবন নির্মাণ শুরু করেন যার সম্বন্ধে জ্যাসন বার্ক এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, 'পৃথিবী কখনো দেখেছে এই ধরণের সর্বাধিক দক্ষ সন্ত্রাসীদের সংগঠন।' ১৯৯৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বিন লাদেন যথেষ্ট আত্ম-বিশ্বাসের সাথে নিজের ধর্মীয় কর্তৃত্বের কোনরূপ যথার্থতার প্রমাণ না দিয়ে তাঁর প্রথম ধর্মীয় ফতোয়া জারি করেন।

তিনি ঘোষণা দেন সকল মুসলমানের একটি কর্তব্য সম্বন্ধে 'আমেরিকাবাসীদের যে কোন দেশে যেখানে সম্ভব, আমেরিকাবাসী ও তাদের মিত্রদের বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের হত্যা কর।'

১৯৯৭ সালে এপ্রিল মাসে পেশোয়ার থেকে বিন লাদেন সতর্ক বার্তা পান যে সিআইএ তাঁর বায়াত আল-আনসার একটি সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি

নিচ্ছে, মোল্লা ওমর আক্রমণে তিনি তখন পরিত্যক্ত রুশ বিমান ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত হন। ঐ একই মাসে আল-জওয়াহিরি দাজেস্তানে গ্রেপ্তার হন। তাঁর অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে সংঘটিত একাধিক সহিংস ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকায়, রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য ছয় মাসের আটকাদেশ দেন। বিন লাদেন তাঁর জামিন দিয়ে ও দু'জন যথারীতি আফগানিস্তানে মিলিত হন, যেখানে বিন লাদেন খোস্টে তাঁর বায়াত আল-আনসার পুনর্দখল করেন।

যখন এই তিনজন একে অপরের সঙ্গে একটি মিথোজীবী সম্পর্কে জড়িয়েছিল তখন একটি তিনগুণ আঁতাত যুক্ত হয়েছিল। যৌক্তিকভাবে, ইমামের ঐতিহ্যগত ভূমিকা মোল্লা ওমরকে দিয়ে করানো উচিত ছিল। কিন্তু মোল্লা ওমর যখন আফগানিস্তানের অধিকাংশ পাঠানদের নিঃশর্ত সমর্থনে তাদের আমির উল-মেমিনীন হিসেবে দায়িত্ব পালনে রত ছিলেন, মধ্যযুগীয় বিশ্বকে ঐটি ধরে তিনি অসাধ্যভাবে প্রাদেশিক থেকে যান যাতে কাবুলও তাঁর কাছে বিদেশী রাষ্ট্র মনে হচ্ছিল। বিন লাদেন ধর্মীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই একজন অপণ্ডিত সুলভ নেতা তবে প্রথম দিকে তাঁর ওয়াহ্হাবিবাদের ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল। আল-জওয়াহিরি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান গরিমায় অপরাপর সঙ্গীদের ছাড়িয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনায় ইসলাম বিরোধী এবং অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ছিল। যৌক্তিকভাবে মিসরীয়টিই সেই লোক যিনি আমিরের দায়িত্বভার নেন—এই যে যথাযথভাবে মোল্লা ওমর ও বিন লাদেনের মত পূর্ণ মাত্রায় তাঁদের গুণাবলি ব্যতীতই তিনি ছিলেন আমির আকর্ষণ ও নেতৃত্বের পদ। সুতরাং আল জওয়াহিরি একজন সংগঠক প্রকৃত ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ওয়াজির (উপদেষ্টা) হিসেবে একজন মহাব্যক্তিত্বের ছায়তলে বিরাজ করতেন এবং এতেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন যে যাঁর পাশে ইসলামের বিশ্ব সম্প্রদায় বিশ্ব জিহাদের আমির ও ইমাম হিসেবে সকলে সমবেত হত : ওসামা বিন লাদেন, ইসলামের অতীত ও ভবিষ্যত ঐতিহ্যের একজন আদর্শিক স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন এবং সম্ভবত তিনি কেয়ামতি ধ্বংসের চিত্র অবলোকন করতেন। অন্তরে তিনি ছিলেন নিবিষ্ট ওয়াহ্হাবি কিন্তু মাহ্দি 'প্রত্যাশিত একজন-এর আবির্ভাবের যন্ত্রনায় কাতর ছিলেন যিনি সব বিষয়গুলোকে ঠিক করে দেবেন—এবং তাঁর 'আরবগণ' ও পাঠান ও আফগানদের কাছ থেকে ইতিমধ্যে যে 'আল-শেখ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন সে সম্পর্কে বেশ সচেতন এ কারণে তিনি পশ্চিমা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একজন জাগ্রত প্রতিবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯৯৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে খোস্টে বিন লাদেন ও ড. আল-জওয়াহিরি প্রকাশ করেন, 'ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট এগেইনস্ট জুস অ্যান্ড ক্রুসেডারস' নামে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

একটি যৌথ ফতোয়া। ১৯৯৮ সালের ৭ অগাস্টে পূর্ব আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে বোমা আক্রমণ করা হয়, ১২ অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের কোল জাহাজে আত্মঘাতি আক্রমণ চালান হয়।

১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে জর্দানীয় আল-জারকায়ি জর্দানে অনভিপ্রেতভাবে সাধারণ রাজক্ষমার অংশ হিসেবে কারাগার থেকে মুক্ত হন। কারাগারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পুনরায় কঠোর হয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধের পর তিনি পেশোয়ারে গমনের পরে বিন লাদেনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে কান্দাহারে যান। যাহোক, আল-জারকায়ির রাজনৈতিক বিষয়সূচি—জর্দান ও সিরিয়ার উদ্ধার করণ—আল-কায়েদার জন্য উপযোগী হয় নাই ও অবশেষে তিনি তাঁর নিজের উদ্ভাবনে আফগানিস্তানের পূর্বদিকে হেরাতের বহির্দিকে তাঁর নিজের দার উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর নিজের সংগঠন তৌহিদ ওয়াল জিহাদ (একেশ্বরবাদ ও ধর্মযুদ্ধ)। তালিবান সরকারের পরাজয় দেখে তিনি ও তাঁর দল সীমান্ত পার হয়ে ইরানে পলায়ন করে তারপরে উত্তর ইরাকের পার্বত্যাঞ্চলে গিয়ে সেখানে তিনি কুর্দিস ইসলামি দল আনসার-ই-ইসলাম-এর দলে যোগ দেন। ইতিমধ্যে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন অভিযানে তাকে তার অভিযান পরিচালনা এবং সংগঠনকে দাঁড় করানোর জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় যার মধ্যে এই জিহাদে শেখ ওসামা বিন লাদেনের শুধু সঙ্গী নয় তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হন।

বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় অভিভূতকারী ধার্মিক, আইন-অমান্যকারী প্রবল নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নারী-পুরুষদের নিয়ে গঠিত যারা তাদের মুসলিম ও অমুসলিম পড়শীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করা ছাড়া আর কিছু চায় না। তারা অন্যদেরকে দেখতে চায় তাদের ধর্মকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছে, তবে খ্রিস্টান প্রটেস্টান্টভুক্তদের যারা মানবজাতিকে 'নিরাপদ' দেখতে চায় তাদের থেকে কমও নয় বেশিও নয়। ওসামা বিন লাদেনের মত ব্যক্তি ও তালিবানদের সংগঠনের মত সংগঠন ইসলামি মৌলবাদকে যেমনটি অবয়ব দিয়েছে তাতে এটি মুসলিম জাতির প্রতি যেমন হুমকি তেমনি পশ্চিমাদের প্রতিও। এটি বিশ্বাস করে যে অন্য ধর্মের মূল্যবোধ ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার অন্তর্ভুক্তি ও তাদের প্রতি সহনশীলতাবোধ বিশ্ব জনীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রতিবন্ধকতা, এবং এই উদ্দেশ্যেই সহিংসতা, নির্যাতন এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে উদ্দেশ্য হাসিলের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে মৌলবাদী রাষ্ট্র কাজ করে না কারণ জনগণ এটাকে সহজভাবে ধৈর্য সহকারে সহ্য করে না। সমাজে এটা এমনইভাবে পদচিহ্ন রাখবে যে পরবর্তীতে অজ্ঞাত অশিক্ষিতদের মাঝে এটি এমনভাবে বেঁচে থাকবে যে যার অস্তিত্বকাল এর প্রচারকের জন্মকালকে ছাড়িয়ে যাবে।

এর সাধারণ ধারা হচ্ছে খণ্ড খণ্ড দলসমূহের অসম্পূর্ণ অংশ, যারা প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করছে। সৌদি আরব শাসনে ব্যতিক্রম হয়, প্রাথমিকভাবে কারণ একটি মাওলানা ও একটি শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অদ্বিতীয় সন্ধি যেগুলো উভয় দলকে লাভবান করে দেয়, এবং অবশেষে তেল ও বৈশ্বিক রাজনীতির অনুপম শৃঙ্খলের কারণে যা এক পরিবারের কয়েক সহস্র পুরুষ পেট্রোডলার কোটিপতি করে দিয়েছে—যাদের পিতামহ বা প্র-পিতামহ (আব্দুল-রহমান ইবনে সৌদ) আক্ষরিকভাবে নিরূপিত ছিলেন, তাঁর জীবন নির্বাহের উপায় হত উট, ছাগল ও ভেড়া থেকে। তারপরে সৌদি আরবে ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষা করা হয় সৌদি পরিবারের ব্যবসা লভ্যাংশের অর্থানুকূল্যে, আর সৌদ পরিবারকে চালানো হয় আমেরিকা সরকারের অর্থে। বিশ্ব যতদিন সৌদি আরব থেকে তেল ক্রয় করবে, আরবে ওয়াহ্হাবিবাদ ততই সমৃদ্ধি লাভ করবে।

ইতিহাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে জনসাধারণ তখনই ধর্মীয় উগ্রবাদকে সমর্থন দেয় যখন তারা মনে করে তাদের ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা অথবা তাদের সহ-ধর্মীরা কোন কারণে অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। তার অর্থ এই নয় যে লোকে মৌলবাদীদেরকে অনুসরণ করবে, কিন্তু এটি অর্থ করে যে তারা জন সমর্থন পাবে। এই কারণে সৈয়দ আহমদের ওয়াহ্হাবিবাদ বিশেষ ধরনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পুনর্জাগরণ ভারতীয় ভূমিতে বদ্ধমূল হয়ে যায়, কেন দেওবন্দি মতধারা এর অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতাসহ ইসলামে ঢাল হিসেবে দেখা যায়; কেন ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানে সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব—এবং বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তরুণ মুসলিমদের মধ্যে অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র। একই সঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে যে মৌলবাদী মাদ্রাসার বহুল সংখ্যায় আকস্মিক বৃদ্ধি যা শুরু হয়েছিল ১৯৭০ দশক থেকে—সেটি জনপ্রিয় ধর্মীয় আবেগপূর্ণ প্রকাশ ছিল না তবে সরাসরি সৌদি আর্থিক সহায়তায় রাজনৈতিক হস্তেক্ষেপ অপরিহার্য করে তুলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আরবের বাইরে, 'ওয়াহ্হাবি' মৌলবাদের দেওবন্দি মতধারার মূল আধার, তবে এটিকে ক্ষুদ্র ইতিহাস যেমনভাবে প্রকাশ করে থাকতে পারে অনুরূপ এক পেশে নয়। এর শুরু থেকে এটি বহু উল্লেখযোগ্য এশীয় নেতৃবৃন্দকে উপস্থাপিত করে, তাঁদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যক সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশাররফ এই বইটি লেখার সময় (২০০৫), তিনি একজন দেওবন্দ শিক্ষার ফল, এবং উপমহাদেশে যে কেউ পরিচিত সে জানবে দেওবন্দিরা ভারতীয় ও পাকিস্তানি উভয় সমাজে স্তম্ভ। একই সত্য বিদেশে দেওবন্দিদের ও দেওবন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তথাপি এটি অস্বীকার করা যায়

না যে দেওবন্দিদের ও তাদের অধিকতর স্পষ্টতই ওয়াহ্হাবি প্রতিদ্বন্দ্বী, আহল-ই-হাদিস, তাঁরা নিজস্ব ধারায় ইসলামে পুনঃজীবন সঞ্চারের উদ্দীপনা রাখে, দেওবন্দিরা ইসলামি কট্টর মতবাদকে দক্ষিণ এশিয়ার এবং আরো দূরবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত করেছিল।

খ্রিস্টান এবং ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমাদেরকে প্রায়শঃই ইসলাম তাদের নিজস্ব সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দোষারোপ করে আসছে। ১৮৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'ওরিয়েন্ট্যালিজম' (প্রাচ্যদেশীয় বৈশিষ্ট্য) এবং তখন থেকে বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাইদ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আরবদের অনগ্রসরতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, 'আরবদের বিষয়টি একটি পশ্চাৎপদ নিন্দিত আদর্শিক মতবাদ দ্বারা বিকৃত হয়ে পড়ে' এবং ঐ সমস্ত ব্যর্থতা যা 'এর রাজনৈতিক ব্যর্থতা, মানবাধিকারের অপব্যবহার...সেটার বাস্তবতা এই যে সমস্ত আধুনিক মননশীল জনগণকে তৈরিতে ক্রিয়াশীল, একারণে আমরা গণতান্ত্রিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে অনগ্রসর রয়েছি।' যাহোক, সাইদের 'ওরিয়েন্ট্যালিজম'-এর মূল অভিযোগ এই যে পশ্চিমা ছাত্রবৃত্তি ছিল সাম্রাজ্যবাদের একটি অস্ত্র, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশক জুড়ে এটি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যে মূল প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, এবং ব্যাপকভাবে সংশোধনবাদী ও কল্পনাপ্রয়াসী চেতনায় অবদান রেখেছিল যা অনেক মুসলমানদের মধ্যে তাদের ইতিহাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছিল; সেটি বিশেসত মুসলিম সমগ্র জাতির পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক নির্যাতনের সচিত্র বাস্তবতা তুলে ধরেছিল যেখানে মুসলমানদের মধ্যে ধারণা হয় যে তারা বিনা অপরাধে পশ্চিমাদের নির্যাতনের শিকার। প্রাক-ইহুদিবাদে একটি মিথ্যাচারের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল অটোমান (ওসমানীয়) সাম্রাজ্যে পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট ইহুদি-খ্রিস্ট্রীয় ধিম্মিদের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণেই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রদূত, উপরাষ্ট্রদূত ও পর্যটকগণের যে কোন প্রতিবেদন পাঠে জানা যাবে যে এটি বিশুদ্ধ কাল্পনিক ও উদ্ভট বিষয়।

এবং তথাপি... একদিকের এই ব্যর্থতা ও বিদ্যমান রাজনৈতিক বৈষম্য পশ্চিমা সরকার আর তাদের মুসলিম শাসন ব্যবস্থা যা সংশোধন করতে পারত। ঐ সমস্ত ত্রুটির মধ্যে প্রথমটি প্যালেস্টাইনকে সক্ষম রাষ্ট্র গড়তে সহায়তা দিতে ব্যর্থতা। অপরিণামদর্শী ইরাক আক্রমণ—আমবেলা অভিযান প্রায় গোটা বিশেক উপাদান দ্বারা একটি সূত্রকেই প্রভাবিত করেছিল। এই ধরনের প্রকৃত দুঃখের কারণসমূহ বজায় রাখার অনুমোদন দিয়ে, পশ্চিমারা ইসলামি মৌলবাদকে প্রচুর ও অব্যাহত সুবিধা দিয়েছিলেন। এটি অনুমোদন দিয়েছে চরমপন্থীদেরকে মুসলিম উম্মা (বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়)কে অবলম্বন করে বলতে, 'আমরা তোমাদেরকে যেমন বলেছি! কেবল আমরা তোমাদেরকে

সাহায্য করতে পারি। একত্রে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা, পশ্চিমা জোয়ারে ফিরে যেতে এবং গৌরবময় অতীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। বিক্ষোভের কারণসমূহ দূর করলে চরমপন্থী ও আতঙ্কবাদীরা জনসমর্থনের অভাবে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে ওসামা বিন লাদেনের ধর্মান্ধ শিবির অংশত টিকে রয়েছে, কারণ তাঁকে ও তাঁর অবশিষ্ট 'আরবদের' ও তালিবান মিত্রদেরকে আশ্রয় দান করা হয়েছে, এছাড়াও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জিহাদি পাঠানদের সক্রিয় পরোক্ষ সম্মতি ও বিস্তর পাকিস্তানি জনগণের সহযোগিতা পান। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে তালিবানের স্বপক্ষ ও আমেরিকা-বিরোধীদের সম্মেলন পাঁচটি রাজনীতি-ধর্মীয় দলগঠিত হয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়। জেআই, জেইউআই এবং আহল-ই-হাদিস দ্বারা শাসিত হয়ে, এর নেতৃবৃন্দ তখন থেকে ফতোয়া জারি করে আমেরিকাবাসীদের মৃত্যু ও ওসামা বিন লাদেনকে মৌন সমর্থনের ঘোষণা দিয়ে ওয়াহ্‌হাবি শরিয়াকে পুনঃ প্রবর্তনের প্রয়াস চালান। এই সম্মেলনের পক্ষে এত ব্যাপক সমর্থন যে পাকিস্তান সরকার আজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। তথাপি, ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে একই শিক্ষা কার্যকর হলে মূলধারার অনুগ্র ইসলাম স্বকীয়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শ্রেয়তর সুযোগ পাবে।

নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিবর্গ

নামগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে সংক্ষিপ্ত নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হলো। (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে)

আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ	মুহম্মদ ইবনে সৌদের পুত্র, প্রথম ওয়াহ্হাবি আরবের নাম সর্বস্ব ইমাম (পরবর্তী নিম্নে প্রদত্ত ইবনে সৌদের সঙ্গে বিভ্রান্ত করা যাবে না)।
আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল ইবনে সৌদ আব্দুল্লাহ্ আলী	বেলায়েত আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৮৫৮ সালে তাঁর পিতৃব্য ইনায়েত আলীর মৃত্যুর পর হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০১ সালে তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নেতৃত্বে থাকেন।
আব্দুল্লাহ ইবনে সৌদ	১৮৬৫ সালে নেজদের আমির হিসেবে ফয়সাল ইবনে সৌদের উত্তরাধিকারি হন তবে হেলে আমির কর্তৃক নির্বাসিত হন।
আব্দুল্লাহ্ আজম	প্যালেস্টিনীয় ভাববাদী সৈয়দ কুতবের অনুসারী, 'ইসলামী জিহাদের আমির' বলা হয়, আফগানিস্তানে মাজাহিদীনের পক্ষে আফগানিস্তানে মুসলিম বল্লম ধারীরা। মৌলবাদী ইসলামপন্থী, ১৯৮৯ সালে পেশোয়ারে হত্যা করা হয়।
আব্দুল গাফুর	সুফি সাধক, প্রথমে 'সাইদু বাবা' নামে পরিচিত কিন্তু পরবর্তীতে সোয়াতের আখুন্দ হিসেবে বিরাট মহত্ত্ব অর্জন করেন।
আব্দুল-রহমান ইবনে সৌদ	আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান ইবনে সৌদের (ইবনে সৌদ দেখুন) নির্বাসিত পিতা।
আব্দুর রহমান	আফগানিস্তানের আমির ও ইমাম ১৮৮০-১৯০১।
আহমদ সরহিন্দি	শেখ আহমদ সরহিন্দি, ষোড়শ শতাব্দীর কট্টরপন্থী নাকশবন্দি সুফি।
আখুন্দ	আব্দুল গাফুর দেখুন।

আল-ওয়াহ্হাব	নেজদের মুহাম্মদ ইবনে আল-ওয়াহ্হাব, ওয়াহ্হাবিদের প্রতিষ্ঠাতা, মাওলানা বংশের আল আস-শেখের পিতা।
আল-জারকায়ি	আবু মুসাব আল-জারকায়ি, চরমপন্থী মাওলানা আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসির জর্দানীয় অনুসারী, ১৯৯৯ সালে হেরাতে তৌহিদ ওয়ালদ জিহাদ (সন্ত্রাসী দল) প্রতিষ্ঠিত করেন, যোগ দেন আনসার-ই-ইসলামে ইরাকে আল-কায়েদাকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।
আল-জওয়াহরি	আয়মান আল-জওয়াহরি, মিশরীয় চিকিৎসক ও চরমপন্থী ইসলামপন্থী, আল-কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা ভাববাদী।
আমির আমানুল্লাহ	১৯১৯ সালে তাঁর পিতার স্থলে উত্তরাধিকার সূত্রে আফগানিস্তানের আমির হন, তৃতীয় আফগান যুদ্ধ করেন।
আমির খান	টঙ্কের নবাব বিদেশী সৈন্যদলের সৈনিক, ১৮১৮ সালে টঙ্কের শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।
বিন বাজ	শেখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বাজ, ১৯৮৯ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সৌদি আরবে ওয়াহ্হাবি কর্তৃপক্ষ।
বিন লাদেন	ওসামা বিন মুহাম্মদ বিন আওয়াদ বিন লাদেন, সৌদিতে জন্মগ্রহণকারী ইয়েমেনি কট্টরপন্থী ইসলামবাদী 'আল-শেখ' হিসেবে সম্মানিত, আল-কায়েদার নামমাত্র নেতা।
এলাহি বক্স	তিন পাটনা পরিবারের একটির প্রধান কর্তা, আহমদ উল্লাহ্ ও ইয়াহিয়া আলীর পিতা।
ফয়সাল ইবনে সৌদ	নেজদের আমির, ১৮৪২-৬৫, মুহাম্মদ ইবনে সৌদের প্রো-পৌত্র।
ফরহাত হুসেইন	মুহাম্মদ হুসেইনের কন্যাকে বিবাহ করেন, ১৮৩০ ও ১৮৪০ দশকের ওয়াহ্হাবি নেতা।
ফতেহ্ আলী	পাটনার তিন পরিবারের এক পরিবারের প্রধান কর্তা, বেলায়েত আলী ও ইনায়েত আলীর পিতা।
ফিরোজ শাহ্	শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্-এর ভ্রাতুষপুত্র, ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, অতঃপর বহু বছর নির্বাসনে অতিবাহিত করেন।

গাজন খান	পানি পথে অশ্বারোহী পুলিশের দফাদার, যে তার পুত্রকে সাথে নিয়ে ১৮৬৩ সালে ওয়াহ্হাবি চালানের পথকে সাক্ষ্য দিয়ে উন্মুক্ত করে দেয়।
গোলাম রসুল	হাজি আব্দুল হক নামেও পরিচিত, প্রথমে ভারতে ওয়াহ্হাবি হিসেবে পরিচিত, সৈয়দ আহমদের সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার পূর্বে বেনারসে বেলায়েত আলীর শিক্ষক ছিলেন।
হাফিজ ওয়াহ্হাবা	শেখ হাফিজ ওয়াহ্হাবা, ওয়াহ্হাবিবাদে মিশরীয় দীক্ষিত ব্যক্তি যিনি ১৯২০ দশকে সৌদের রাষ্ট্রদূত হন।
হেদায়েত আলী	রিসালদার শেখ হেদায়েত আলী, র‍্যাটরের শিখ বাহিনীতে জ্যেষ্ঠ ভারতীয় কর্মকর্তা।
ইবনে সৌদ	আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল-রহমান ইবনে সৌদ, আব্দুল রহমান ইবনে সৌদের পুত্র, নেজদের আমির, সৌদি আরবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর জ্যেষ্ঠতম পুত্র সৌদ কর্তৃক ১৯৫৩ সালে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন।
ইবনে তায়মিয়া	দামেস্কের শেখ ইবনে তায়মিয়া, চতুর্দশ শতাব্দীর কট্টরপন্থী হানবলি ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁর শরিয়ার পুনর্ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইসলামি চরমপন্থার গডফাদার।
ইমদাদুল্লাহ্	হাজি ইমদাদুল্লাহ্, সাইদ নাজির হুসাইনের শিষ্য, ১৮৫৭ সালে মুহাম্মদ কাসিম রশিদ আহমদ ও রহমতুল্লাহর শিক্ষক।
ইনায়েত আলী	ফতেহ্ আলীর পুত্র, হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের নেতা হিসেবে উত্তরাধিকারী বেলায়েত আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
মওদুদি	সায়িদ আবু লালা মওদুদি, চরমপন্থী ইসলামবাদী, ১৯৩৯ সালে জামিয়াত-ই-ইসলামি (জেআই) প্রতিষ্ঠিত করেন।
মওলা বকশ	দেওয়ান মওলা বকশ, পাটনায় কমিশনার টেইলরের অধীনস্থ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
মাহ্মুদ উল-হাসান	দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম শিষ্য, পরবর্তীতে এর অধ্যক্ষ, ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে নিষ্ফল জিহাদ পরিচালনার প্রয়াস চালান।
মুফতি মাহ্মুদ	১৯৪৫ সালে জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-ইসলাম (জে ইউ

	আই) এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দেওবন্দি দলসহ অনুসরণকারী, বর্তমান নেতা ফজল-উর-রহ্মানের পিতা।
মুহাম্মদ হায়াত	সিন্ধুর মুহাম্মদ হায়াত, ইবনে তায়মিয়া এবং আহমদ সরহিন্দির প্রশংসাকারী, তাঁর পিতার সঙ্গে মদিনায় আল-ওয়াহ্হাব এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্কে শিক্ষা দেন।
মুহাম্মদ ইবনে সৌদ	দরিয়ার বেদূঈন সর্দার, ওয়াহ্হাবিদের ও প্রথম আমির ও আল সৌদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার জন্য আল-ওয়াহ্হাবের সঙ্গে একটি মৈত্রী গড়েন।
মুহাম্মদ হুসেইন	সৈয়দ মুহাম্মদ হুসেইন, তিন পাটনা পরিবারের একটির প্রধান কর্তা, যাঁর সাদিকপুর লেনের ভবন আন্দোলনের সদর দফতর (হেড কোয়ার্টারস) হয়।
মুহাম্মদ জাফর	থানেশ্বরের দরখাস্ত-লেখক যাঁর অভিযুক্তকারী পত্র প্রথম ১৮৬৩ সালে ওয়াহ্হাবি ষড়যন্ত্রের সাক্ষ্য দান করে, কারামুক্তির পর তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন।
মুহাম্মদ কাসিম	মুহাম্মদ কাসিম নানাউতায়ি, সাইদ নাজির হুসাইন ও ইমদাদুল্লাহ্র ছাত্র, দেওবন্দ মাদ্রাসার রশিদ আহমদের সহিত সহ-প্রতিষ্ঠাতা।
মোল্লা ওমর	কান্দাহারের মোল্লা মুহাম্মদ ওমর, তালিবানদের আমির।
মোল্লা সাদুল্লাহ্	বুনারের মোল্লা সাদুল্লাহ্, 'পাগলা ফকির' মাসতুন মোলা, বা সারতর ফকির নামেও পরিচিত, ১৮৯৭ সালের মালাকন্দ বিপ্লব করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
নাসিরুদ্দিন	মৌলভি নাসিরউদ্দিন, ওয়াহ্হাবি খলিফা, সিন্ধুতে হিন্দুস্তানিদের যুদ্ধদলকে নেতৃত্ব দেন ও পরবর্তীতে গজনিতে।
ওবায়ইদুল্লাহ্ সিন্ধি	মাহ্মুদ উল-হাসানের সহকারি, ১৯১৫ সালে কাবুলে নির্বাসনে সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।
পানিপথি	মৌলভি কাসিম পানিপথি, সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর সিত্তানায় হিন্দুস্তানিদেরকে নেতৃত্ব দেন এবং গুপ্ত ইমামের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হন।
পীর আলী	পীর আলী খান, পাটনার পুস্তক বিক্রেতা, ১৮৫৭

রহমতুল্লাহ্	রহমতুল্লাহ কাইরনবি, সাইদ নাজির হুসেইন ও ইমতা ইমদাদুল্লাহ্‌র ছাত্র, ১৮৫৭ সালে আরবে পলায়ন করেন।
রশিদ আহমদ	রশিদ আহমদ গ্যাঙ্গোহি, সাইদ নাজির হুসেইন ও ইমদাদুল্লাহ্‌র ছাত্র, দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহাম্মদ কাসিমের সঙ্গে সহ-প্রতিষ্ঠাতা।
সায়েদ আকবর শাহ্	সিত্তানায় সায়েদ গোষ্ঠীর প্রধান, সৈয়দ আহমদের হিন্দুস্তানিদের জমি দান করেন, পরবর্তীতে তাঁকে সোয়াতের পাদশাহ্ করা হয়।
সায়েদ ফিরোজ শাহ্	সায়েদ আকবর শাহের পৌত্র, সায়েদ মুবারক শাহের পুত্র।
সায়েদ মুবারক শাহ্	সায়েদ আকবর শাহের পুত্র, সিত্তানার সায়েদদের নেতা হিসেবে তাঁর পিতৃব্য সায়েদ উমর শাহ্‌কে উত্তরাধিকার দান করেন, হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের পৃষ্ঠপোষক।
সায়েদ উমর শাহ্	সায়েদ আকবর শাহের ভ্রাতা, সোয়াতের পাদশাহ্‌র স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হন, হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের পৃষ্ঠপোষক।
সাইদ নাজির হুসেইন	দিল্লির সাইদ নজির হুসেইন মুহাদ্দিস, শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃস্থানীয় উত্তরাধিকারী, ১৮৫৭ সালে দিল্লিতে ওয়াহ্হাবি সন্দেহভাজন নেতা, জামিয়াত আহল-ই-হাদিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।
শাহ্ আব্দুল হাই	শাহ্ আব্দুল আজিজের জামাতা, সৈয়দ আহমদের দ্বিতীয় শিষ্য।
শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক	দিল্লির শাহ্ আব্দুল আজিজের পুত্র ও তাঁর উত্তরসূরি, যদিও অনুসারী নন, তবু সৈয়দ আহমদের প্রতি ভক্তি প্রণত।
শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল	শাহ্ আব্দুল আজিজের ভ্রাতুষ্পুত্র, সৈয়দ আহমদের প্রথম শিষ্য।
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্	শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেলহবি, মুহাম্মদ হায়াতের নাকশবন্দি সুফি ছাত্র, ইবনে তায়মিয়ার দ্বারা প্রভাবিত মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, শাহ্ আব্দুল আজিজের পিতা।

শরিয়তুল্লাহ্	বাংলার হাজি শরিয়তুল্লাহ, ১৮১৮ সালে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ফারায়েজি আন্দোলন প্রতিষ্ঠার জন্য।
শরিফ হুসেইন	শরিফ হুসেইন ইবনে আলী, হিজাজের হাশেমীয় আমির, মক্কা ও মদিনার তত্ত্বাবধায়ক, আরবের শাসনকর্তা হওয়ার প্রয়াস চালান কিন্তু ১৯২৪ সালে পদচ্যুত হন।
শেরে আলী	আফ্রিদি অশ্বারোহী আর্দালী, দোষী সাব্যস্ত হয়ে নির্বাসিত হয়, ১৮৭২ সালে বড় লাট লর্ড মায়োকে হত্যা করে।
সৈয়দ আহমদ খান	শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক ও সাইদ নাজির হুসেইনের ছাত্র, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক প্রতিষ্ঠাতা।
সৈয়দ আহমদ	রাইবেরিলির শাহ্ সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ গোলাম মুহাম্মদ নামে রাইবেরিলিতে জন্মগ্রহণ করেন, ধর্মপ্রণেতা জাগানোর ব্যক্তি ও বিপ্লবী, ভারতে ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি।
তিতু মীর	বাংলার মীর নাসির আলী নামে জন্মগ্রহণ করেন, আরবে সৈয়দ আহমদের অনুসারী হন, ১৮৩১ সালে ওয়াহ্হাবি বিপ্লবীদেরকে নেতৃত্ব দেন ও যুদ্ধে নিহত হন।
তুর্কি ইবনে সৌদ	মুহাম্মদ ইবনে সৌদের পৌত্র, নেজদের আমির ১৮৪২-৬৩ ওয়াহ্হাবি সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালান।
বেলায়েত আলী	মৌলভি বেলায়েত আলী, ফতেহ আলীর পুত্র ও ইনায়েত আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ওয়াহ্হাবিবাদে প্রথম দিকে দীক্ষিত, সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর ভারতীয় ওয়াহ্হাবিবাদকে পুনর্জাগরিত করেন।
ইয়াহিয়া আলী	এলাহি বক্সের পুত্র, আহমদুল্লাহ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ১৮৫০ ও ১৮৬০ দশক ব্যাপী নেতৃস্থানীয় ওয়াহ্হাবি।
জাইদুল্লা খান	ড্যাগারের জাইদুল্লাহ খান, বুনারের সর্দার যিনি ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ সেনাদলকে স্বল্প সময়ের জন্য আশ্রয় দান করেন।

পরিশিষ্ট ১ ঃ আল সৌদ-আল-ওয়াহ্হাব পরিবারের মৈত্রীর ভিত্তি

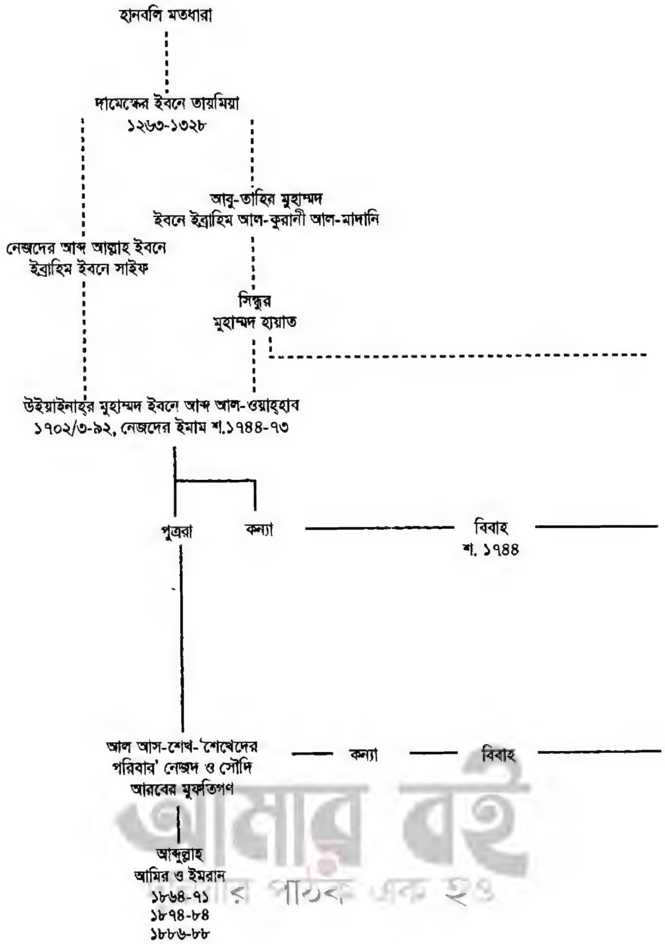
হানবলি মতধারা
দামেস্কের ইবনে তায়মিয়া
১২৬৩-১৩২৮
আবু-তাহির মুহাম্মদ
ইবনে ইব্রাহিম আল-কুরানী আল-মাদানি
নেজদের আব্দ আল্লাহ ইবনে
ইব্রাহিম ইবনে সাইফ
সিন্ধুর
মুহাম্মদ হায়াত
উইয়াইনাহ্‌র মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাব
১৭০২/৩-৯২, নেজদের ইমাম শ.১৭৪৪-৭৩
পুত্ররা
কন্যা
বিবাহ
শ. ১৭৪৪
আল আস-শেখ-'শেখেদের
পরিবার' নেজদ ও সৌদি
আরবের মুফতিগণ
কন্যা
বিবাহ
আব্দুল্লাহ
আমির ও ইমরান
১৮৬৪-৭১
১৮৭৪-৮৪
১৮৮৬-৮৮

আমার বই
বাংলার পাঠক এক হও

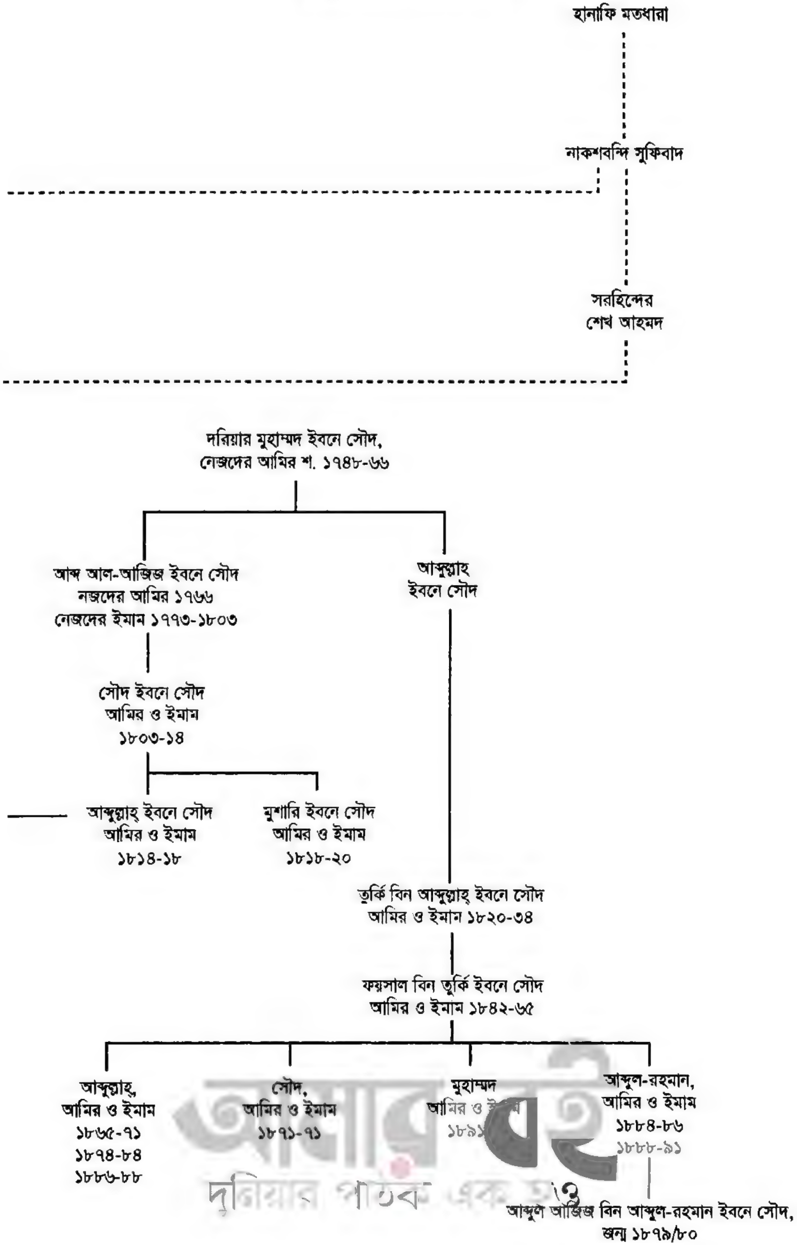
হানাফি মতধারা
নাকশবন্দি সুফিবাদ
সরহিন্দের শেখ আহমদ
দরিয়ার মুহাম্মদ ইবনে সৌদ, নেজদের আমির শ. ১৭৪৮-৬৬
আব্দ আল-আজিজ ইবনে সৌদ নজদের আমির ১৭৬৬ নেজদের ইমাম ১৭৭৩-১৮০৩
আব্দুল্লাহ ইবনে সৌদ
সৌদ ইবনে সৌদ আমির ও ইমাম ১৮০৩-১৪
আব্দুল্লাহ্ ইবনে সৌদ আমির ও ইমাম ১৮১৪-১৮
মুশারি ইবনে সৌদ আমির ও ইমাম ১৮১৮-২০
তুর্কি বিন আব্দুল্লাহ্ ইবনে সৌদ আমির ও ইমাম ১৮২০-৩৪
ফয়সাল বিন তুর্কি ইবনে সৌদ আমির ও ইমাম ১৮৪২-৬৫
আব্দুল্লাহ্, আমির ও ইমাম ১৮৬৫-৭১ ১৮৭৪-৮৪ ১৮৮৬-৮৮
সৌদ, আমির ও ইমাম ১৮৭১-৭১
মুহাম্মদ আমির ও ইমাম ১৮৯১
আব্দুল-রহমান, আমির ও ইমাম ১৮৮৪-৮৬ ১৮৮৮-৯১
আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল-রহমান ইবনে সৌদ, জন্ম ১৮৭৯/৮০

পরিশিষ্ট ২ ঃ ভারতে 'ওয়াহ্হাবি' বংশ তালিকা

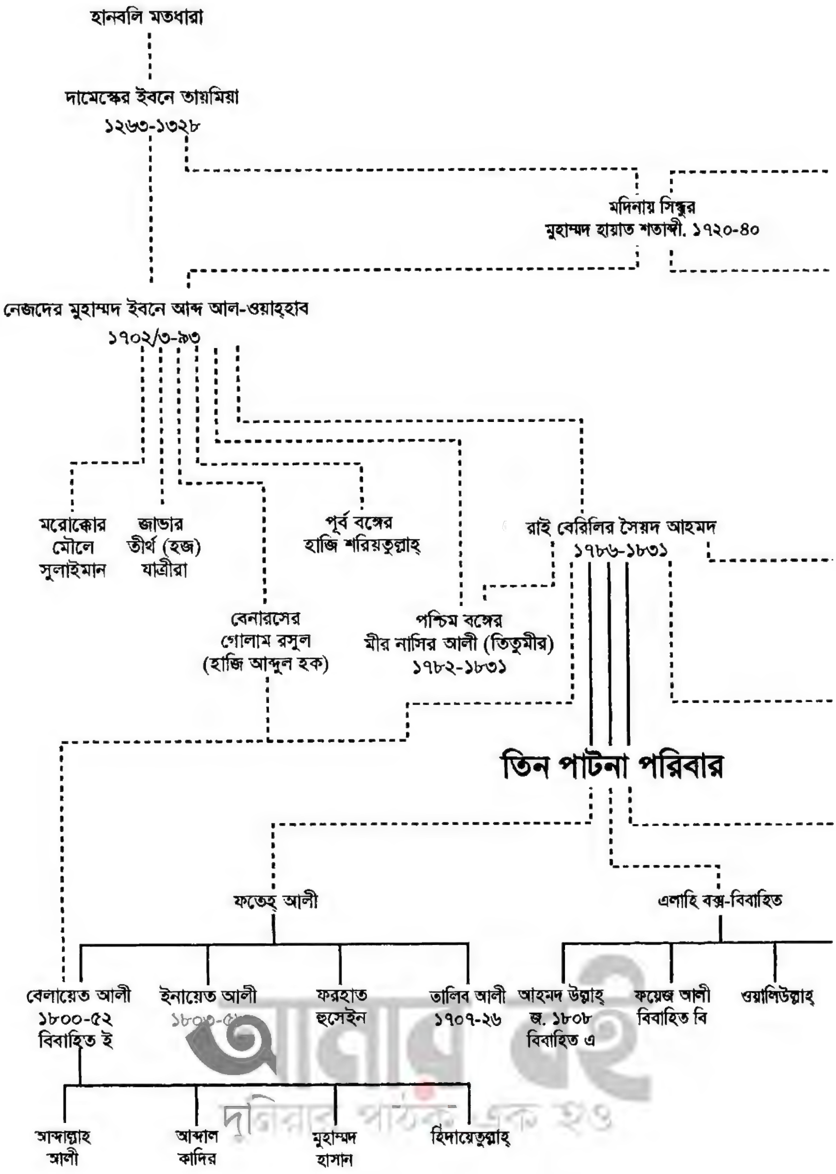
হানবলি মতধারা
দামেস্কের ইবনে তায়মিয়া ১২৬৩-১৩২৮
মদিনায় সিন্ধুর মুহাম্মদ হায়াত শতাব্দী. ১৭২০-৪০
নেজদের মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাব ১৭০২/৩-৯৩
মরোক্কোর মৌলে সুলাইমান
জাভার তীর্থ (হজ) যাত্রীরা
পূর্ব বঙ্গের হাজি শরিয়তুল্লাহ্
রাই বেরিলির সৈয়দ আহমদ ১৭৮৬-১৮৩১
বেনারসের গোলাম রসুল (হাজি আব্দুল হক)
পশ্চিম বঙ্গের মীর নাসির আলী (তিতুমীর) ১৭৮২-১৮৩১
তিন পাটনা পরিবার
ফতেহ্ আলী
এলাহি বক্স-বিবাহিত
বেলায়েত আলী ১৮০০-৫২ বিবাহিত ই
ইনায়েত আলী ১৮০৩-৫
ফরহাত হুসেইন
তালিব আলী ১৭০৭-২৬
আহমদ উল্লাহ্ জ. ১৮০৮ বিবাহিত এ
ফয়েজ আলী বিবাহিত বি
ওয়ালিউল্লাহ্
আব্দাল্লাহ আলী
আব্দাল কাদির
মুহাম্মদ হাসান
হিদায়েতুল্লাহ্

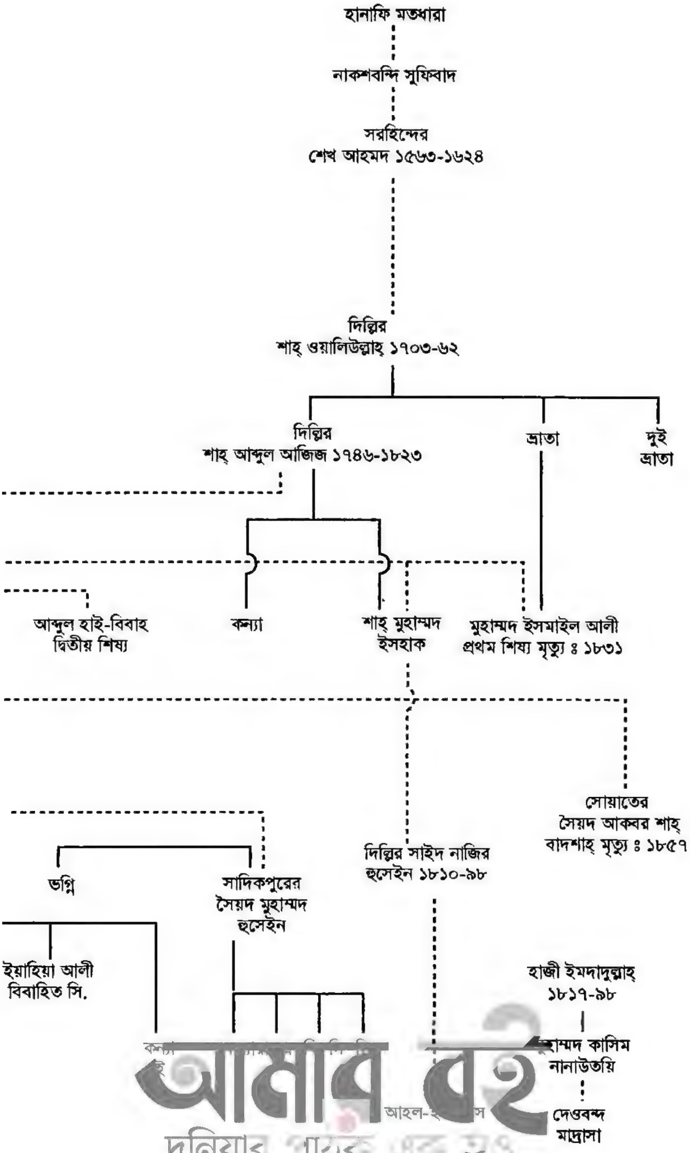
হানাফি মতধারা
নাকশবন্দি সুফিবাদ
সরহিন্দের
শেখ আহমদ ১৫৬৩-১৬২৪
দিল্লির
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ১৭০৩-৬২
দিল্লির
শাহ্ আব্দুল আজিজ ১৭৪৬-১৮২৩
ভ্রাতা
দুই
ভ্রাতা
আব্দুল হাই-বিবাহ
দ্বিতীয় শিষ্য
কন্যা
শাহ্ মুহাম্মদ
ইসহাক
মুহাম্মদ ইসমাইল আলী
প্রথম শিষ্য মৃত্যু ঃ ১৮৩১
সোয়াতের
সৈয়দ আকবর শাহ্
বাদশাহ্ মৃত্যু ঃ ১৮৫৭
ভগ্নি
সাদিকপুরের
সৈয়দ মুহাম্মদ
হুসেইন
দিল্লির সাইদ নাজির
হুসেইন ১৮১০-৯৮
ইয়াহিয়া আলী
বিবাহিত সি.
হাজী ইমদাদুল্লাহ্
১৮১৭-৯৮
কন্যা
হাম্মদ কাসিম
নানাউতয়ি
আহল-
দেওবন্দ
মাদ্রাসা

পারিভাষিক শব্দকোষ

আরবি, পার্সী ও পশতু শব্দসমূহ সহজভাবে পঠনের জন্য নির্দেশনার বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকেই দেখানো হয়েছে। আরবি বানানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল আস-শেখ	শেখদের পরিবার, মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাব এর বংশধরগণ।
আদ দয়া লিল তৌহিদ	'ঐক্যের আহ্বান' নামটি মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাব কর্তৃক তাঁর ধর্মমতানুসারে প্রদত্ত হয়েছে, ওয়াহ্হাবিবাদের প্রতিষ্ঠাতা।
আহল	জনতা, এভাবে আহল আল-কিতাব—'গ্রন্থের জনতা', তারা যারা একটি প্রকাশিত গ্রন্থে ইসলামের সঙ্গে অংশ ভাগাভাগি করে, এভাবে খ্রিস্টানরা ও ইহুদিরা, 'আহল-ই-হাদিস— 'হাদিসের জনতা'; জামিয়াত আহল-ই-হাদিস দেখুন।
আখুন্দ	শিক্ষক, আব্দুল গাফুরকে ব্যবহার করা হতো, সোয়াতের শিক্ষক।
আল-মুয়াহিদুন	একেশ্বরবাদী, এই নামেই ওয়াহ্হাবিরা নিজেদেরকে সম্বোধন করে।
আল-কায়েদা	'সেনাদল ভিত্তিক' ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বে ঢিলেঢালা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের কর্মজাল (নেটওয়ার্ক)-এর আনুষ্ঠানিক নাম, জামাত আল-তকফির ওয়া আল-হিজরার দ্বারা প্রলোভিত হয় ওয়াহ্হাবি, সালাফি, এবং ইখোয়ান- উল-মুসলিমীন রাজনৈতিক-ধর্মীয় দর্শন।
আলী	মহানবীর জামাতা ও চাচাত ভ্রাতা, যাঁর অনুসারীরা শিয়া সম্প্রদায় গড়ার জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আলিম	ইসলামের পথে শিক্ষিত জন; বহুবচন উলেমা।
আমির	সেনাপতি, রাজ্যপাল, স্থানীয় শাসনকর্তা, এভাবে আমির উল-মোমিনীন—বিশ্বাসীদের সেনাপতি, খলিফাদের সরকারি উপাধি, এবং আমির-এ-শরিয়া—বিধানের নেতা।
বদল	পাঠানদের মধ্যে রক্ষক্ষয়ী বিবাদ।
বাদাউইন	উষ্ট্র-মালিকগণ, বেদূঈন, আরবের দিক থেকে স্বচ্ছ—মেষ-মালিকগণ।
বদমাশ	মন্দ চরিত্র।
বাদশাহ্	পাদশাহ্ দেখুন।
বায়াত	ধর্মীয় আনুগত্যের শপথ।
বেরেলভি	১৮৭০ দশকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত একটি হানাফি ধর্মীয় মতধারা যা ঐতিহ্যগত সুফি ধর্মবিশ্বাস ও অনুশীলনসমূহকে সম্মিলিত করে এবং দেওবন্দিদেরকে কাফির হিসেবে বিবেচনা করে।
বিদাত	নূতন প্রথা প্রবর্তন, ওয়াহ্হাবিদের দৃষ্টিতে মহাপাপ।
বুনারী	বুনারের লোকজন, কয়েকটি ইউসুফজাই উপজাতি নিয়ে গঠিত।
বর্কা	মুসলিম মহিলাদের সারা শরীর ঢাকার বস্ত্র।
কলিফ	খলিফা দেখুন।
ক্যান্টনমেন্ট	ব্রিটিশ ভারতে স্টেশনের স্থায়ী শিবির বা সেনানিবাস।
চামলাওয়ালরা	চামলার জনগণ।
দফাদার	ভারতীয় অশ্বারোহী সেনানী বিশেষ।
দফতর, দফতার	অফিস বা লিখিত বিবরণ।
ডাক	নির্দিষ্টস্থান; সামরিক আড্ডা; মুঘলদের দ্বারা প্রতিষ্টিত ভারতে ডাক-ব্যবস্থা; এভাবে পর্যটকদের জন্য ডাক-বাংলো।
দার	রাজ্য, এভাবে দার উল-ইসলাম—'বিশ্বাসের ধর্মের ক্ষেত্র', ইসলামি শরিয়া বা অনুশাসনের

	দেশ; দার উল-হার্ব—'যুদ্ধের বা শত্রুতার ক্ষেত্র', ইসলামকে বিরোধিতাকারী দেশ; দার উল-জাহিলিয়া—অজ্ঞতার দেশ; দার উল-কুফর—ধর্মহীনের বা অবিশ্বাসের দেশ; দার উল-উলুম-ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্র, ১৮৭৯ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা সম্মানসূচক খেতাব দেওয়া হয়।
ডার্ব	পথ; তারিকও দেখুন।
দাড়াহ্	পার্বত্য পথ।
দয়া	আহ্বান, আমন্ত্রণ।
দীন	পথ (ইসলামের)।
দেওবন্দ	উত্তর ভারতে দেওবন্দ অঞ্চলে ১৮৬৬ সালে একদল আধা-ওয়াহ্হাবিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি সুফিবাদের বিষয় সূচি ও অন্যান্য অনুশীলন বিদাত বলে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ ও সৈয়দ আহমদ থেকে নেওয়া সুন্নি ইসলামের একটি কঠোর মৌলবাদি শিক্ষা কাঠামোতে উন্নীত করে; এভাবে দেওবন্দি; সালাফি দেখুন।
এমির	আমির দেখুন, আরবে ও উত্তর আফ্রিকায় স্থানীয় শাসনকর্তা।
ঈদ	রমজান মাস শেষে মুসলিম উৎসব।
ফকির	পবিত্র মানব।
ফরজ	বাধ্যতামূলক কর্তব্য।
ফতোয়া	ইসলামি শরিয়ার বিষয়ে একজন মুজতাহিদ বা মুফতির ন্যায় সিদ্ধান্ত।
ফেদায়ীন	উৎসর্গকারী লোকজন।
ফিকহ্	ইসলামি আইনশাস্ত্র।
ফরমান	লিখিত আদেশ।
ফিৎনা	মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুঈশ্বরবাদিতার কার্যাবলির কারণে বিরোধ।
গড়	পর্বত, এভাবে স্পিন গড়, শ্বেত পর্বত।

গাজু	ধর্মীয় কারণে সমর দল; এভাবে গাজি—'ধর্মীয় প্রধান ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে একজন 'ধর্মান্ধ'।
হাদিস	'ঐতিহ্য' মহানবীর (সা.) জীবনের কার্যাবলি যা তাঁর সাহাবাবৃন্দ পবিত্র কোরানের সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে সংগ্রহ করে আর একটি সংকলিত গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, শরিয়ার ভিত্তি; সুন্নাহ্ও দেখুন।
হজ	মক্কায় তীর্থ যাত্রা; ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি; এভাবে হাজি—যিনি তীর্থ যাত্রা করেছেন সেইজন।
হাকিম	বিচারক বা চিকিৎসক।
হানবলি	আহমদ বিন হানবল (মৃত্যুঃ ৮৫৫ সাল) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনের সুন্নি মতধারা, সুন্নি ইসলামে আইনের চার মত ধারার শেষটি এবং অনেকের কাছেই অসহিষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল মনে হয়।
হারাম	নিষিদ্ধ।
হেজিরা	হিজরা দেখুন।
হিজাজ	পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরী এবং জেদ্দার সামুদ্রিক বন্দরসহ তীরবর্তী আরবীয় প্রদেশ লোহিত সাগরের তীরবর্তী আরবীয় প্রদেশ ঐতিহ্যগতভাবে মক্কার শেরিফদের দ্বারা শাসিত।
হিজরা, হিজরত	পশ্চাদপসরণ, প্রত্যাহার, এভাবে খ্রিস্টান পঞ্জিকার ৬২২ সালে নবী (সা.)র মক্কা থেকে মদিনায় অভিগমনের নাম দেওয়া হয়েছে, পরবর্তীতে ইসলামে ইতিহাসের প্রারম্ভ হিসেবে বাছাই করা হয়, যা ইসলামি পঞ্জিকায় প্রথম বর্ষ হিসেবে শুরু হয়, সাধারণত লিখিত হয় এএইচ।
হিন্দুস্তান	সিন্ধুনদের পূর্বের হিন্দুদের দেশ, এভাবে হিন্দুস্তানি ঐ ভারতের একজন অধিবাসী, এবং সেখানে মিশ্র ভাষায় কথা বলা হয়।

হিজব	সম্প্রদায় বা দল এভাবে হিজব উল-তাহির আল-ইসলামি—ইসলামি সংগ্রামের দল, বিশ্বব্যাপী খিলাফত ও শরিয়া পুনরুদ্ধার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত।
ইবনে / বিন	পুত্র।
ইজমা	সম্প্রদায়ের মতবাদে সকলের ঐক্য, সুন্নি ইসলামের প্রধান অবলম্বন।
ইজতিহাদ	শরিয়ার বিষয় ব্যাখ্যায় স্বাধীন বিচার শক্তির প্রয়োগ প্রায় ৯০০ সালের দিকে এটি সম্মত হয়ে ইজমার দ্বারা সকল বিষয়াবলি মেনে নিতে সম্মত হয়, এভাবে 'ইজতিহাদের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়; মুজতাহিদ।'
ইখোয়ান	'ভ্রাতৃত্ব' প্রায় ১৯২২ সালে নেজদের ওয়াহ্হাবি ধর্মের পুনর্জাগরণকারীরা নিজেদেরকে এই নাম দেন, যাদের আরব বিজয় হয় উপজাতীয় প্রধান আব্দুল আজিজ ইবনে সৌদের নেতৃত্বাধীনে এবং সৌদি আরব গঠিত হয়। ১৯৩০-এর দশকে মিশরে এই নামটি ইখোয়ান-উল-মুসলিমীন—মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দ্বারা গৃহীত হয়, একটি রাজনীতি ধর্মীয় বিপ্লবী দল ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামের জন্য গঠিত।
ইমাম	জনসাধারণের নামাযের নেতা তবে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবেও খেতাবটি নির্দেশ করে; নবী (সা.)র সরাসরি বংশজাতের গুণে শিয়াদের মধ্যে তাদের সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতা; শিয়ারা ও কিছু সুন্নি আরও বিশ্বাস করে যে ইসলামের বিজয় ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর অন্তিম লগ্নে একজন শেষ বা গুপ্ত ইমাম তথাপি আসবে।
ইত্তিহাদ	স্বধর্মত্যাগ শরীয়ানুসারে প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ।
আই এস আই	স্বধর্মত্যাগ, শরীয়ানুসারে প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ। ইন্টার-সার্ভির্সেস ইনটেলিজেন্স ডাইরেকটোরেট পাকিস্তানের সিআইএ-এর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

	সমমানের, যা মুজাহিদীনদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র চালনায় ১৯৮০-এর পুরো দশক জুড়ে এবং তালিবানদের ১৯৯০-এর মধ্য দশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ইসলাম	‘আত্মসমর্পণ’ এভাবে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ শাহাদায় যেভাবে রয়েছে, ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি।
জাহিলিয়াহ্	‘অজ্ঞতার যুগ’ এভাবে নবী (সা.)র আল্লাহর ওহী গ্রহণের পূর্ব-সময়, তবে মৌলবাদীরা অনৈসলামিক সরকারকেও বর্ণনা করত।
জামাত / জামিয়াত	সমাবেশ, রাজনৈতিক দল, এভাবে জামিয়াত আহল-ই-হাদিস—ঐতিহ্যের জনগণের দল, ১৮৭০ শতাব্দীতে সাইদ নাজির হুসেইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক-ধর্মীয় দল; জামাত-ই-ইসলামি (জেআই), ইসলামি দল, দেওবন্দি উৎসসহ পাকিস্তানি রাজনৈতিক দল; জামিয়াত-এ-উলেমা-এ-ইসলাম (জেইউআই), ইসলামি পণ্ডিতবর্গের সমবেত, আল-কায়েদা ও তালিবানদের সঙ্গে সংযুক্ত দেওবন্দি উৎসসহ চরমপন্থী পাকিস্তানি রাজনৈতিক দল; জামাত-উল-দওয়া, আহ্বানের জন্য দল (ইসলামে) ওয়াহ্হাবি উৎসসহ রাজনৈতিক দল; তাবলিগি জামাত—ধর্মপ্রচারের সমাজ, দেওবন্দি উৎসসহ পাকিস্তানি রাজনৈতিক দল। জামাত আল-তকফির ওয়া আল—হিজরা অভিবাসনের দল, ১৯৮০ দশকে মিসরে মিসরীয় বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠিত হয়, যেটি ওয়াহ্হাবি এবং ইখোয়ান-উল-মুসলিমীন উভয় দলকেই রাজনীতি ধর্মীয় দর্শনের দ্বারা প্রলোভিত করে এবং যে দেশ মুসলিম বিশ্বে প্রতারক তাকে ধ্বংস সরার জন্য আহ্বান জানায়, ইত্যাদি।
জমাদার	উষ্ট্র রক্ষক, ভারতীয় সেনাদলে একজন কনিষ্ঠ ভারতীয় কর্মকর্তা।

জিজেইল	দীর্ঘ-নল বিশিষ্ট চকমকি পাথরযুক্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আফগান ও পাঠানদের মানসম্পন্ন অস্ত্র।
জিহাদ	'যুদ্ধ' এভাবে 'আল্লাহর পথে যুদ্ধ' প্রায়ই অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় তবে, আরও সূক্ষ্মভাবে আল্লাহর ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ; দুইটি মূল উপাদানে গঠিত জিহাদ আকবর বা মহা ধর্মযুদ্ধ—আত্মযুদ্ধ করা (শয়তানের কৌশলের বিরুদ্ধে আত্ম-সংগ্রাম); এবং জিহাদ কবীর বা জিহাদ আসগর, ছোট ধর্মযুদ্ধ নামেও পরিচিত—শয়তানের বলের বিরুদ্ধে দৈহিকভাবে যুদ্ধ ও যারা ইসলামের বিস্তারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, কখনও কখনও 'তরবারির যুদ্ধ' বলেও উল্লেখিত হয়; এভাবে জিহাদি—যে যুদ্ধ করে সে, সাধারণত 'ধর্মযোদ্ধা' নামে উল্লেখিত হয়। অনেক মুসলিম অশুদ্ধভাবে জিহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বলে অভিহিত করে।
জিরগা	উপজাতীয় সমাবেশ বা পাঠানদের মধ্যে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ, এভাবে লয়া জিরগা— আন্ত-উপজাতীয় সমাবেশ।
জিজিয়াহ্	ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বল পূর্বক প্রদেয় কর।
কাফিয়া	আরবীয়দের মস্তক আবরণ।
কাফিলা	বসবাসের উপযোগী ঢাকা বড় গাড়ি, সাধারণ উটের মরুযাত্রিদল।
কাফর, কুফর	বিধর্মীর আচরণ বা আচার; এভাবে কাফির, কুফির—বিধর্মীরা, পৌত্তলিকরা।
খলিফা	সহকারি, এভাবে নবী (সা.)র উত্তরসূরি, বিশ্বমুসলিম সম্প্রদায়ের খলিফা হিসেবে শাসনকর্তা; এভাবে খিলাফত—নবী (সা.)র উত্তরসূরিদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র।

খান	প্রভু, পাঠানদের মধ্যে গোষ্ঠী বা উপজাতির প্রধান।
খাসাদর	উপজাতীয় অঞ্চলে আধা-সামরিক পুলিশ।
খতিব	ধর্ম প্রচারক।
কোরান	কুরান দেখুন।
কোতাল	একটি গিরিপথের চূড়া।
কাচারী	জেলা কর্মকর্তার দপ্তর বা আদালত ভবন।
লশকর	আফগান/পাঠান উপজাতীয় সেনাদল বা সমর দল।
লাঠি	যষ্টি, এভাবে লাঠিয়াল—একজন লাঠি-বহনকারী বা 'প্রয়োগকারী।'
মাদ্রাসা	ইসলাম ও শরিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহাবিদ্যালয়, বহুবচন মাদ্রারিস (তবে এখানে লিখিত মাদ্রাসাস—(মাদ্রাসা সমূহ); পাকিস্তানে দীনি মাদারিস হিসেবে পরিচিত—ধর্মের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
মহাবন	'বড় বন' বুনারে একটি স্তূপ-পর্বত।
মাহ্দি	'প্রত্যাশিত একজন' ইসলামের স্বর্গীয়ভাবে— নিয়োজিত ত্রাণকর্তা, দ্বাদশতম বা গুপ্ত ইমাম যিনি পৃথিবীর অন্তিম দিনগুলোতে ইসলামি শাসন করতে পুনার্বিভূত হবেন, শিয়াদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস, এভাবে মাহ্দিবাদ; মুহাম্মদ আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত একটি খেতাব, যিনি নিজেকে সুদানে ১৮৮১ সালের জুন মাসে আল মাহদি আল-মুন্তাজার বলে ঘোষণা দেন, বহু গোঁড়া সুন্নিদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় কারণ পবিত্র কুরানে মাহ্দির কোন উল্লেখ করা হয় নি, তথাপি এই ধারণাকে জনপ্রিয় দেখা যায়; ইমামও দেখুন।
মজলিস	সমাবেশ, পরিষদ বা মন্ত্রণা-সভা (আরব)।
মালিক	রাজা, তবে পাঠানদের মধ্যে প্রধানব্যক্তি।

মসজিদ	মসজিদ, প্রতিদিন নিয়মিত নামায পড়ার, শুক্রবারের নামায পড়ার স্থান।
মাওলানা	মোল্লাদের থেকে বেশি বিজ্ঞ মুসলিম শিক্ষক।
মৌলভি	মোল্লার থেকে বেশি বিজ্ঞ মুসলিম ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।
মেলমস্তিয়া	পাঠানদের মধ্যে আতিথেয়তার বিধান।
মিঞা	সাধু বা দরবেশ যিনি রাজনীতি ও সহিংসতা থেকে দূরে থাকেন।
মুফতি	ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, আরবে জ্যেষ্ঠ বিচারক যিনি ফতোয়া জারি করেন।
মুহাজির	যে অভিবাসন করে সে বা বসবাসের নিমিত্তে অন্যদেশে গমন করে।
মুজাহিদীন	তারা যারা কঠোর প্রতিযোগিতা করে ধর্মের জন্য যুদ্ধং জিহাদে অংশ গ্রহণ করে; একবচন মুজাহিদ; কখনো কখনো ব্যাখ্যা করা হয় একজন 'ধর্ম যোদ্ধা' হিসেবে। যারা আফগানিস্তানে রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদেরকে মুজাহিদীন বিবেচনা করা হয় তবে যখন তারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তখন এটি কলঙ্কিত হয়।
মুজতাহিদ	ইজতিহাদ অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত পণ্ডিত।
মোল্লা, মৌলা	'সে যে দেখায়' এভাবে ধর্মীয় শিক্ষক, মসজিদে নামাযের নেতা; মাওলানা, মৌলভিও দেখুন।
মুমিনীন	'বিশ্বাসীগণ' এভাবে মুসলিমগণ।
মুনশি	ধর্মগুরু, দোভাষী বা ভাষা শিক্ষক।
মুরিদ	অনুসরণকারী।
মুশরিক	সে যে শিরক করে, মিথ্যে ঈশ্বরদের পূজারী, এভাবে বহুঈশ্বরবাদী।
মুসলিম	'সে যে নিজেকে সমর্পণ করে' (আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে); আরও শুদ্ধভাবে মুসলিমুন; এভাবে মুসলমানস—মুসলমানগণ।

মুতাউইহিন	'তারা যারা মান্য করে' এভাবে জনগণের নৈতিকতার বলবৎকারী। নেজদের মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হা কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় প্রতিনিধির একটি আদেশ।
নানাওয়াতি	পাঠানদের মধ্যে পবিত্র স্থান (মসজিদ)-এর বিধান।
ন্যাং	পাঠানদের মধ্যে শ্রদ্ধার বিধান।
নাকশবন্দি	বোখারায় উৎপন্ন হওয়া কঠোর সুফি প্রথা যা ভারতে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র অনুসারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।
নাকশবারি	প্রথম খলিফা আবু বক্কর (আঃ) এর উত্তরাধিকারকে দূরে সরিয়ে। সুফি প্রথা গূঢ়, জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টায় রত ছিল যখন সুন্নি মুল্যবোধ সমুন্নত ছিল ধ্যানের মাধ্যমে।
নাসরানি	নাজারীনস—নাজরীনরা এভাবে খ্রিস্টগণ।
নবাব	'সহকারি' এভাবে মুসলিম আইনের অধীনে একটি প্রদেশ বা রাষ্ট্রের শাসনকর্তা।
পাদশাহ্	সর্বোচ্চ শাহ্ বা রাজাধিরাজ।
পাগড়ি	মস্তক আবরণ।
পাখতুন, পশতুন	পাঠান দেখুন।
পাখতুনওয়ালি	'পাখতুনদের জীবন যাত্রার ধরণ' পাঠানদের সামাজিক বিধান।
পাঠান্স	পাকিস্তান/আফগানিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে বিভাজিত উৎস, ভাষা ও সংস্কৃতিসহ কর্তৃত্বকারী এক বিশাল উপজাতীয়দের দল।
পিণ্ডারিস	প্রধানত পাঠান/আফগান লুণ্ঠনকারীদের দল যারা অষ্টাদশ পুরো শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্য ভারতে লুণ্ঠন করত।
পির	একজন সাধু, এক সুফি প্রথার প্রধান।
পিরজাদা	পিরের বংশধর।
পবিন্ধা	যাযাবর, মোল্লা পবিন্দাহ্‌কে নামটি দেওয়া হয়েছে।
প্রোফেট	একটি সম্মানজনক বিষয় মুহাম্মদ (সা.)কে

	বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়, 'নবীদের সীল মোহর' খ্রিষ্টীয় ৫৭০ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামি মতে মুসা (আঃ) ও যিশু রসুল—আল্লাহ্‌র দূত—যেক্ষেত্রে মুহাম্মদ একজন নবী—সার্বজনীন নবী। তাঁর শিক্ষাদানের পরে তিনি নির্যাতনের শিকার হয়ে ৬২২ সালে মদিনায় পলায়ন করেন, পরে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন মক্কা বিজয় করতে এবং প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ্‌র কাছে থেকে শ্রুত তাঁর ওহী (প্রত্যাদেশ) কোরান হিসেবে লিখিত হয়, যখন তাঁর বাণী ও কার্যাবলি তাঁর সাহাবাবৃন্দ স্মরণ করে হাদিস হিসেবে লিখে রাখেন। মুহাম্মদ (সা.) মক্কায় ৬৩২ সালে ইন্তেকাল করেন।
পর্দা	পর্দা, কিছু ইসলামি সংস্কৃতিতে মহিলাদের গোপনীয়তা রক্ষার্থে বিশেষ ব্যবস্থা।
কাদি, কাজি	বিচারক।
কুরান	'আবৃত্তি' আল্লাহর মূলবাণী ও ওহী (প্রত্যাদেশ) সম্বলিত লিখিত একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যা নবী (সা.)কে ফেরশতা জিব্রাইল শ্রবণ করিয়েছিলেন।
কুতবী	মিসরীয় ইসলামি বিপ্লবী সাইদ কুতবের রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী।
রমাদান	উপবাসের মাস, ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি।
রশিদুন	'সঠিকভাবে পরিচালিত চার জনকে; খেতাব দেওয়া হয়েছে প্রথম খলিফা চতুস্টকে যারা নবী (সা.) কে ইসলামি বিশ্বের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে অনুসরণ করেন, সংস্কারকগণ তাঁদেরকে ইসলামের স্বর্ণযুগের অনুকরণীয় শাসনকর্তা হিসেবে দেখেছেন।
রেওয়াজ	পাঠান প্রথার আইন, যা ঐতিহ্যগতভাবে শরিয়ার পূর্বেই স্থান করে নেয়।

রিসালদার	সুবেদার দেখুন।
সাহিব, সাহেব	‘প্রভু’ পদস্থ ব্যক্তির আরবিতে খেতাব, ব্রিটিশভারতে ইউরোপীয়দেরকে সম্বোধন করা হতো।
সালাম	‘শান্তি’, এভাবে সালাম আলাইকুম—‘আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’, মুসলিমদের পরম্পরাগত সাদর সম্ভাষণ।
সালাফ	‘পূর্বপুরুষগণ’, আলা সালাফ আল-সালিহ্ থেকে—‘ধার্মিক পুর্বপুরুষগণ’ নবী (সা.)র দুই প্রজন্মের সাহাবা ও পণ্ডিতবর্গ যাঁরা তাঁদের পরে আসেন, এভাবে সালাফি—‘পরবর্তী পূর্বপুরুষগগণ’, এবং সালাফিয়া—পূর্বপুরুষদের অনুসারীরা’ পূর্বের ইসলামের পুর্বপুরুষদের আদর্শের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করার বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব দেন ইবনে তায়মিয়া আধুনিক ইসলামে ব্যাপকতর অন্তর্নিহিত অর্থ আছে যদিও এখনও মৌলবাদীদের সঙ্গে মনে মনে এটি যুক্ত যারা প্রথম দিক্কার মুসলিমদের সমকক্ষ হতে প্রয়াস চালায় এবং বিদাত ও শিরককে প্রত্যাখ্যান করে।
সালাত	প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামায।
সাঙ্গার	পার্বত্য যুদ্ধ কার্যে আত্মরক্ষার জন্য বুক সমান উঁচু মাটির বাঁধ।
সরাই	পর্যটকদের বিশ্রামালয়, এভাবে ক্যারাভ্যান সরাই; প্রাসাদ (আরব)।
সাওম	রমযান মাসের রোযা (উপবাস); ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি।
সাইয়েদ, সায়েদ, সৈয়দ	নবী (সা.)র বংশধর; সায়েদসও দেখুন।
সায়েদস	উত্তর হাজারার কাগান উপত্যকায় বসবাসরত একটি সংশয়পূর্ণ উপজাতি যারা নবী (সা.)র বংশধর বলে দাবি করে।

সিপাই	ভারতীয় সেনাদলে পদাতিক সৈন্য।
শাহ্	রাজা, সাইয়েদের সম্মানজনক উপাধি।
শাহাদাহ্	আল্লাহ্ ও তাঁর নবী (সা.)র ধর্মের প্রকাশ্যে ঘোষণা। ‘আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই ও মুহাম্মদ তাঁর রসুল’; ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি।
শহীদ	ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি।
শাইখ, শেখ	আরব পরিবারের নেতা, বিজ্ঞজন।
শরিয়া	‘কর্মপন্থা’ ইসলামের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ থেকে সৃষ্ট বিধান যাতে মুসলিমদের সকল আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিবৃত রয়েছে। প্রায় ৯০০ সালে এটি সুন্নিদের মধ্যে গৃহীত হয় যা চার মতধারা—হানাফি, শাফি, মালিকি ও হানবালি কর্তৃক সকল বিষয় মীমাংসিত হয়েছে এতে ইজতিহাদ অনুশীলনের কোন ফাঁক রাখা হয় নি।
শরিফ, শেরিফ	সে যে নবী (সা.)-র সরাসরি বংশধর, আরব উপজাতীয়দের অভিজাত-সম্প্রদায়; পবিত্র স্থানসমূহের শাসনকর্তা।
শিয়া	‘দল’ মুসলিমদের সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। যে দলটি ইমাম আলী (রাঃ) ও তাঁর বংশধরগণকে নবী (সা.)-র ন্যায় সঙ্গত বংশধর মনে করে এবং এভাবে সারা ইসলামি বিশ্বের নেতৃবৃন্দ; এটি নিজেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় আর সুন্নিদের কর্তৃক প্রচলিত ধর্ম মতের বিরুদ্ধবাদী বিবেচিত হয় কারণ এটি ইজমার শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে ইমামদের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে আলী (রাঃ)র মতবাদ থেকে দূরে সরে যায়।
শিরক	আল্লাহ্‌র কর্মের সঙ্গে অন্য কিছুকে জুড়ে দেওয়া, যা ওয়াহ্‌হাবিদের দৃষ্টিতে একটি পাপ কর্ম।
শুরা	ধর্মীয় পরিষদ / সম্মেলন।

শিখ	'শিষ্য' এভাবে গুরু নানকের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়ে শিখ ধর্মের অনুসারী।
সোওয়ার	ভারতীয় অশ্বারোহী সৈনিক।
স্টেশন	ব্রিটিশ ভারতে, যে অঞ্চলে ব্রিটিশ কর্মকর্তাবৃন্দ বসবাস ও কাজ-কর্ম করত।
সুবেদার	ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর সর্বাধিক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার পদ, অশ্বারোহী বাহিনীতে রিসালদার পদটি সম্মানের।
সুফি	ইসলামি মরমীবাদের ধর্মানুষ্ঠান যাকে অনেক সুন্নি সংস্কার করা প্রচলিত ধর্ম মতের বিরোধী হিসেবে দেখেছেন।
সুন্নাহ্	'প্রথা' পূর্ব দৃষ্টান্তসমূহ যা নবী (সা.) জীবনাচার ও তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরিদের কাছে থেকে পূর্ব হতে হাদিসে সংগৃহীত, অপরিবর্তনীয় মুসলিমরা কোরানের মতই অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচিত করে।
সুন্নি	'সুন্নাহ্ সম্বন্ধীয়', ইসলামের মূলধারার দল, যারা সুন্নাহ্ মতকে গ্রহণ করে এবং যে সব খলিফারা নবী (সা.)র পর এসেছিল তাদের মতধারাকে গ্রহণ করে।
তালিব-উল-উলম	'জ্ঞানান্বেষণকারী' এভাবে ধর্মীয় ছাত্র, বহুবচন তালিবান, এভাবে তালিবান, ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে শরিয়া আনয়নের নিমিত্তে কান্দাহারের মোল্লা মুহাম্মদ ওমর কর্তৃক যুদ্ধনিরত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়।
তলোয়ার	খোদিত যুদ্ধের তরবারি।

তাকলিদ	শরীয়ার অতীত ব্যাখ্যা যেমনটি ইসলামি শাস্ত্রে চার মতধারায় ব্যাখ্যা যেমনটি ইসলামি শাস্ত্রে চার মতধারায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।
তরিক	পথ, এভাবে তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া, 'মুহাম্মদের পথ' নামটি সৈয়দ আহমদ পুনর্জাগরণী আন্দোলনে দিয়েছিলেন।
তৌহিদ	আল্লাহ্র একত্ববাদের মত, পূর্ণাঙ্গ একেশ্বরবাদ বা ত্রিমুর্তিবাদে অবিশ্বাসী, ওয়াহ্হাবিবাদের মূল স্তম্ভ।
থানা	পুলিশদের নির্দিষ্ট স্থান।
সেরাই	চিরস্থায়ীভাবে কোন দরবেশকে বা অনুসারীদেরকে বরাদ্দকৃত জমি।
উলেমা, উলামা	ইসলামি মতাবলম্বী সেই সকল বিজ্ঞ জন, এভাবে ইসলামি পণ্ডিতবর্গের সম্মিলিত দল ও অন্যান্যদেরকে বিচারগণ, শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দসহ ইসলাম ধর্মীয় উত্তরাধিকারী; একবচন আলিম।
উলম, উলুম	ইসলামি শিক্ষা।
উম্মা	ইসলামের বিশ্ব সম্প্রদায়।
ওয়াদি	শুষ্ক জল প্রবাহের খাত।
ওয়াহ্হাবি	আরবের সংস্কারক ও বিপ্লবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাবি (শ-১৭০০-৯২), যিনি সালাফিদের একটি বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান জানান এবং তাঁর ও তাঁর অনুসারী যাঁরা পৌত্তলিকদের, বহু ঈশ্বরবাদীদের এবং স্বধর্মত্যাগীদের

	বিরুদ্ধে ভয়াবহ জিহাদ ঘোষণা করেন; এভাবে ওয়াহ্হাবিবাদ, ইসলামি মৌলবাদের তন্ত্র এখন সৌদি আরবকে শাসন করেছে; আল-মুয়াওয়াহিদুন দেখুন।
ওয়ালি	আল্লাহর দোসর, সম্মানজনক খেতাব। সাধারণত সুফিগণ ব্যবহার করেন, এভাবে সোয়াতের ওয়ালি।
ওয়াজির	উজির, প্রধানমন্ত্রী, পরিষদ, ওয়াজিরি পাঠান উপজাতির নামও।
জাই	পুত্র, এভাবে ইউসুফজাই—জোসেফের পুত্রগণ, একটি বৃহত্তর পাঠান উপজাতি।
যাকাত	টিথে (এক-দশমাংশ) সকল মুসলিমকে ধর্মীয় কর দিতে হয়; ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি।
জমিন	জমি; এভাবে জমিন্দার—জমিদার বা ভূমির মালিক।
জান	মহিলাবৃন্দ, এভাবে জানানা—মহিলাদের বাসস্থান সমূহ।
জার	স্বর্ণ।

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জি

ইংরেজিতে মূল উৎসসমূহে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতিবেদনগুচ্ছ যেমন বুশায়ার ও অন্যত্র পারস্য উপসাগর ভিত্তিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন, পরবর্তীতে বেশ কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা যাদের মধ্যে ছিলেন জে. এইচ. রেইলি, জন কলভিন, ড. এইচ. ডব্লিউ, টি.ই. র‍্যাভেনশ, জেমস ও' কিনীলি, এডওয়ার্ড বেহাটসেক এবং স্যার উইলিয়াম হান্টার। যা আশা করা যায়, তাঁদের লিখনসমূহ ঘোষিত ওয়াহ্হাবি-বিরোধী এবং ব্রিটিশ পক্ষে পক্ষপাতকে তুলে ধরে।

ঠিক এর বিপরীতমুখীতা প্রয়োগ করেন তাঁদের লেখনীসমূহ সেয়াম উদ্দিন আহমদ, বলখি ফসিহুদ্দিন, বুরহান উদ্দিন কাসমি, তৌফিক আহমদ নিজামি এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের অন্যান্য ঐতিহাসিকবৃন্দের ইংরেজি লেখনীতে, যাঁরা ভারতে ওয়াহ্হাবিদেরকে হয় জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা বা জিহাদি ও শহীদ হিসেবে ভাষায় স্পষ্ট বর্ণনা করেন। উপরোদ্ধৃতদের মধ্যে পাটনা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রয়াত অধ্যাপক ও দ্য ওয়াহ্হাবি মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (ভারতে ওয়াহ্হাবি আন্দোলন)-এর লেখক কেয়াম উদ্দিন আহমদের গ্রন্থটি এর নিজস্বতায় একটি ভাল শ্রেণীভুক্ত হয়েছে এবং তিনি যে সব বিষয় উন্মোচিত করেছেন তা থেকে আমি প্রচুর উপাদান নিয়েছি, বিশেষত পাটনা ও এলাহাবাদের সরকারি নথিপত্রে যে সকল পত্রাবলি ও প্রতিবেদনগুচ্ছ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ ছিল সেগুলোকে গ্রহণ করেছি। সৈয়দ আহমদের জীবনের শৈশব ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস শাহ্ ইসমাইল শহীদের তাকওয়াত উল-ঈমান (ঈমানের ক্ষমতা), গোলাম রসুল মেহরের ভূমিকা সম্বলিত সম্প্রতি দার-উস-সালাম প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

অপরাপর আধুনিক ও অধিকতর বৈষয়িক বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আলোচিত হয়েছেন মুসলিম হিস্ট্রি ইন সাউথ এশিয়া (দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম ইতিহাস) সম্বন্ধে লেখার জন্য ফ্রান্সিস রবিনসন এবং জন ভল; দেওবন্দি মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (ভারতে দেওবন্দি আন্দোলন)-র উপরে লেখেন বারবারা মেটকাফ; ওয়াহ্হাবি থিওলজি (ওয়াহ্হাবি ধর্মতত্ত্ব)-এর উৎস সম্বন্ধে নাটানা

জে.ডি লং-বাস, এবং ইসলাম ইন সাউথ এশিয়া (দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম) কে নিয়ে যোগিন্দার সিকান্দ, আজিজ আহমদ, আকবর এস. আহমদ এবং তারিক রহমান লেখেন। আমি আলী রহনেমা সম্পাদিত ও পায়োনিয়ারস অভ ইসলামিক রিভাইভ্যাল (ইসলামি পুনর্জাগরণের পৃষ্ঠপোষকগণ) নামে গ্রন্থটির প্রাবন্ধিকদের বিষয়েও আলোকপাত করেছি।

সাম্প্রতিক বিষয়ে, আমি কেবল স্বল্প সংখ্যক গ্রন্থের নামের তালিকা করেছি যেগুলো আমি বিশেষত প্রয়োজনীয় মনে করেছি, সর্বাধিক স্বতন্ত্রভাবে আহমেদ রশিদের তালিবান আন্দোলন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য গবেষণা। বিশ্বব্যাপী ওয়েবও (ওয়েব সাইট) সরবরাহ করেছে যথেষ্ট ধ্যান-ধারণা, যদিও সেগুলির প্রাপ্তিস্থল বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এমনকি অতি আবছা কোন সূত্রের মাধ্যমে জিহাদ, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, ওয়াহ্হাবি মতাদর্শ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বিপুল দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যার মুখোমুখি হয়ে একজন ঐতিহাসিক উত্তমভাবে সজাগ হতে পারেন যে তাঁর উৎসসমূহ কোথা থেকে আসছে, এবং তাঁর নিজের কুসংস্কার সমূহ ও পূর্বধারণা সম্বন্ধে। আমার আরবি, ফারসি ও উর্দূ ভাষায় জ্ঞানের অভাব জনিত কারণে বেশ কিছু মূল উৎস অনালোচিত রয়ে গেল সে সম্বন্ধে পাঠকবৃন্দের সচেতন থাকা উচিত।

আরব এবং মধ্যপ্রাচ্য : প্রাথমিক ও ঐতিহাসিক উৎসসমূহ (১৯৪৭-পূর্ব)

এইচ.জে ব্রিজেস, এ্যান এ্যাকাউন্ট অভ দ্য ট্রানজেকসন্স অভ হিজ ম্যাজেসটিস মিশন টু দ্য কোর্ট অভ পারসিয়া ইন দ্য ইয়ারস ১৮০৭-১১, যাতে এ ব্রিফ হিস্ট্রি অভ দ্য ওয়াহ্হাবি, ভল. ২য়, ১৮৩৪ (ওয়াহ্হাবিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৮৩৪)

জে.এল. বার্কহার্ডট, ট্রাভেলস ইন অ্যারাবিয়া ১৮২৯ (আরবে ভ্রমণ ১৮২৯)

—নোটস অন দ্য বেদূঈনস অ্যাণ্ড ওয়াহ্হাবিস, ১৮৩০ (বেদূঈন ও ওয়াহ্হাবিদের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পত্রগুচ্ছ, ১৮৩০)

স্যার রিচার্ড বার্টন, এ পিলগ্রিমেজ টু আল মদিনা অ্যাণ্ড মক্কা, ১৮৯৩ (পবিত্র মদিনা ও মক্কায় একটি তীর্থযাত্রা, ১৮৯৩)

লুইস আলেকজাণ্ডার ওলিভিয়ার ডি কোরানসেজ, হিস্তোরি, দে ওয়াহ্হাবিস দেপ্যু লির ওরিজিন জাসকোয়া লা ফিন দ্য, ১৮০৯, ১৮১০, পুনঃ প্রকাশিত হিস্ট্রি অভ দ্য ওয়াহ্হাবিস ট্রান্স. আর. এম. বুরেল (ওয়াহ্হাবিদের ইতিহাস নামে পুনঃ প্রকাশিত, হিস্ট্রি অভ দ্য ওয়াহ্হাবিস ট্রান্স. আর.এম. বুরেল (ইতিহাস নামে পুনঃ প্রকাশিত আর.এম.বুরেল অনূদিত), ১৯৯৪

গিওভানি ফিনাতি, ন্যারেটিভ অভ দ্য লাইফ এ্যাণ্ড এ্যাডভেঞ্চারস অভ গিওভানি ফিনাতি হু আণ্ডার দ্য অ্যাসিউমড নেম অভ ম্যাহোমেট মেড দ্য ক্যাম্পেইন্স এগেইনস্ট দ্য ওয়াহ্হাবিস ফর দ্য রিকভারি অভ মক্কা এ্যাণ্ড মদিনা, এডিটেড বাই ডব্লিউ জে. ব্যাঙ্কস, ১৮৩০ (গিওভানি ফিনাতির জীবন কাহিনী ও অদ্ভুত ঘটনাপঞ্জি যিনি মোহাম্মদ (সা.) : কাল্পনিক নাম নিয়ে মক্কা ও মদিনাকে পুনরুদ্ধারের জন্য ওয়াহ্হাবিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান, ডব্লিউ. জে. ব্যাঙ্কস কর্তৃক সম্পাদিত, ১৮৩০

এ.বি. কেমবল, অবজারভেশন্স অন দ্য পাস্ট পলিসি অভ দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট টুওয়ার্ডস অ্যারাব ট্রাইবস অভ দ্য পারসিয়ান গাল্ফ, পাঞ্জাব ইনডেক্স ৬৮৭, ১৮৪৫ (পারস্য উপসাগরের আরব উপজাতীয়দের সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের অতীত কার্যধারার প্রতি পর্যবেক্ষণ, (ওয়াহ্হাবি বিষয়াবলির সঙ্গে সম্পর্কিত) ১৭৯৫-১৮৪৪, পাঞ্জাব সূচক ৬৮৯, শ. ১৮৫৪) পাঞ্জাব সূচক, ৬৮৭, শ. ১৮৪৫ সময়ানুক্রমিক সারণী।

—(ক্রনোলজিক্যাল টেবিল অভ ইভেন্টস কানেকটেড উইথ...দ্য ওয়াহ্হাবি ট্রাইব ১৭৯৫-১৮৪৪, পাঞ্জাব ইনডেক্স ৬৮৯, শ. ১৮৫৪

আর.এইচ. কিয়ারন্যান, দ্য আনডেইলিং অভ অ্যারাবিয়া (আরবের উন্মোচন), ১৯৩৭

টি.ই. লরেন্স, রিকন্সট্রাকশন অভ অ্যারাবিয়া, রিপোর্ট টু দ্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ১৯১৯ (আরবের পুনর্নির্মাণ, ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাতে প্রতিবেদন)

—সেভেন পিলারস অভ উইসডম, (জ্ঞানের সপ্ত স্তম্ভ), ১৯২৭

—রিভোল্ট ইন দ্য ডেজার্ট (মরুভূমিতে বিপ্লব), ১৯২৭

—দ্য লেটারস অভ টি.ই.লরেন্স (টি.ই. লরেন্সের পত্রগুচ্ছ), ১৯৩৮

—জে.জি. লরিমার, গেজেটিয়ার অভ দ্য পারসিয়ান গাল্ফ (পারস্য উপসাগরের ভৌগলিক অভিধান), ১৯১৩

ডব্লিউ. ডব্লিউ লোরিং, এ কনফাডারেট সোলজার ইন ইজিপ্ট (মিসরে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ একজন সৈনিক)

ভি. ভ্যান ডেন মিউলেন, দ্য ওয়েলস অভ ইবনে সৌদ (ইবনে সৌদের ভাল দিকগুলো), ১৯৫৭

সি.সি.আর মার্ফি, সোলজারস অভ দ্য প্রফেট (নবীর সেনানীরা), ১৯২১

উইলিয়াম জি. পলগ্রেভ, সেন্ট্রাল এ্যাণ্ড ইস্টার্ন অ্যারাবিয়া (মধ্য ও পূর্ব আরব) ১৮৬৫

লিউইস পেলি, রিপোর্ট অন এ জার্নি টু দ্য ওয়াহ্হাবি ক্যাপিটাল অভ রিয়াদ ইন সেন্ট্রাল অ্যারাবিয়া (মধ্য আরবে ওয়াহ্হাবি রাজধানী রিয়াদ পর্যটনের উপরে প্রতিবেদন), ১৮৬৫, রিপ্রিন্টেড (পুনর্মুদ্রিত) ১৯৭৮

হ্যারি সেন্ট জন ফিলবি, অপারেশন্স অভ দ্য নেজদ মিসন (নেজদ দলের হামলা) অক্ট-নভে. ১৯১৭, ১৯১৮

—রিপোর্ট অভ এ ট্রিপ টু সাউদার্ন নেজদ এ্যাণ্ড দওয়াসির (দক্ষিণ নেজদ ও দওয়াসির ভ্রমণের একটি প্রতিবেদন), ১৯১৮

—দ্য হার্ট অভ অ্যারাবিয়া (আরবের মধ্যস্থল), ১৯২২

—'দ্য ট্রাম্ফ অভ দ্য ওয়াহ্হাবিস' (ওয়াহ্হাবিদের বিজয়), ইন জার্নাল অভ দ্য রয়্যাল সোসাইটি ফর এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স খণ্ড ১৩(৪), ১৯২৬

—অ্যারাবিয়া অভ দ্য ওহ্হাবিস (ওয়াহ্হাবিদের আরব), ১৯২৮

—অ্যারাবিয়ান ডেজ (আরবের দিনগুলি), ১৯৪৮

—লেটারস (পত্রগুচ্ছ) ১৯০৮-১৯৬১, সেন্ট অ্যানথোনিস কলেজ, অক্সফোর্ড 'ফিনিক্স' (সম্ভবত এইচ. সেন্ট জে. ফিলবি), 'এ ব্রিফ আউটলাইন অভ দ্য ওয়াহ্হাবি মুভমেন্ট; (ওয়াহ্হাবি আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত মোটামুটি খসড়া), ইন জার্নাল অভ দ্য রয়্যাল সোসাইট ফর এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স, খণ্ড ১৭ (৪), ১৯৩০

শেখ হাফিজ ওয়াহ্হাবা, ওয়াহ্হাবিজম ইন অ্যারাবিয়া, প্রেজেন্ট এ্যাণ্ড পাস্ট' (আরবে ওয়াহ্হাবিবাদ, বর্তমান ও অতীত), ইন জার্নাল অভ দ্য রয়্যাল সোসাইটি ফর এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স, খণ্ড ১৬ (৪), ১৯২৯

ফ্রান্সিস ওয়ার্ডেন, হিস্ট্রিক্যাল স্কেচ অভ দ্য ওয়াহ্হাবি ট্রাইব অভ অ্যারবস (ওয়াহ্হাবি উপজাতি ও আরবদের ঐতিহাসিক পটভূমি) ১৭৯৫ থেকে ১৮১৮, উইথ কন্টিন্যুয়েশন (১৮১৯-১৮৫৩) বাই লেফটেন্যান্টস এম. হেনেল।

এ.বি. কেমবল এ্যাণ্ড এইচ.এফ. ডিসব্রো, পাঞ্জাব ইনডেক্স ৬৯৯, শ. ১৮৫৩

অ্যারাবিয়া এ্যাণ্ড দ্য মিডল ইস্ট সেকেন্ডারি এ্যাক্ট মডার্ণ সোর্সেস (পোস্ট-১৯৪০)

(আরব ও মধ্যপ্রাচ্য : মধ্য যুগীয় ও আধুনিক উৎসসমূহ ১৯৪০-উত্তর

ইশরাত আনসারি, 'মুসলিম রিলিজিয়াস লিডারস ইন ইণ্ডিয়াস ফ্রিডম স্ট্রাগল' (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) [illegible] আইএম জার্নাল, অগাস্ট ১৯৯৭

হামিদ আলগার, ওয়াহ্হাবিবিজম এ ক্রিটিক্যাল এসে, (ওয়াহ্হাবিবাদ একটি সংকট পূর্ণপ্রবন্ধ), ২০০2

এন.এন.ই. ব্রে, এ প্যালাদিন অভ অ্যারাবিয়া (আরবের একজন প্যালাদিন), ১৯৩৬

অ্যানথোনি কেভ-ব্রাউন, ট্রিজন ইন দ্য ব্লাড : (রক্তে রাজদ্রোহ)

সেন্ট জন ফিলবি, কিম ফিলবি এ্যাণ্ড দ্য স্পাই কেস অভ দ্য সেঞ্চুরি (কিম ফিলবি এবং শতাব্দীর গুপ্তচর মামলা), ১৯৯৪

নাটানা জে.ডিলং-বাস, ওয়াহ্হাবি ইসলাম ফ্রম রিভাইভ্যাল এ্যাণ্ড রিফর্ম টু গ্লোবাল জিহাদ, (ওয়াহ্হাবি ইসলাম পুনর্জাগরণ ও পুনর্গঠন থেকে বৈশ্বিক জিহাদ পর্যন্ত), ২০০৪

ডোর গোল্ড, সৌদি সাপোর্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম, টেস্টিমনি প্রেজেন্টেড টু দ্য ইউএস সিনেট কমিটি অন গর্ভনমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স ৩১ জুলাই ২০০৩

ফিলিপ গ্রেভস, দ্য লাইফ অভ স্যার পার্সি কক্স (স্যার পার্সি কক্সের জীবন), ১৯৪১

ই.এ্যাণ্ড আই. কার্শ, এম্পায়ারস ইন দ্য স্যাণ্ড দ্য স্ট্রাগল ফর মাস্টারি ইন দ্য মিডল ইস্ট (মরুভূমিতে সাম্রাজ্য সমূহ : মধ্যপ্রাচ্যে মোড়লি করার জন্য সংগ্রাম) ১৭৮৯-১৯২৩, ২০০১

এলি কেদৌরি, ইন দ্য অ্যাংলো অ্যারব লেবিরিন্থ (ইঙ্গো-আরবে জটিল সমস্যা), ১৯৭৬

বার্নার্ড লিউয়িস, দ্য মিডল ইস্ট (মধ্যপ্রাচ্য), ১৯৯৫

মিডল ইস্ট মিডিয়া রিসার্চ (মধ্যপ্রাচ্য গণমাধ্যম গবেষণা) ইন্সটিটিউট, স্পেশ্যাল ডেসপ্যাচ সিরিজ নং-৫২৬ঃ সৌদি আরব, ২০ জুন, ২০০৩

এলিজাবেথ মোনরো, ফিলবি অভ অ্যারাবিয়া (আরবের ফিলবি), ১৯৭৮, রিপ্রিন্টেড (পুনর্মুদ্রিত) ১৯৯৮

ফালগাস নিকল, দ্য সোর্ড অভ দ্য প্রফেট দ্য মাহ্দি অভ সুদান এ্যাণ্ড দ্য ডেথ অভ জেনারেল গর্ডন (নবীর তরবারি সুদানের মাহ্দি এবং সেনাপতি গর্ডনের মৃত্যু), ২০০৪

জন সাবিনি, আরমিস ইন দ্য স্যাণ্ড : দ্য স্ট্রাগল ফর মেক্কা এ্যাণ্ড মেদিনা (মরুভূমিতে সেনাদল : মক্কা ও মদিনার জন্য সংগ্রাম), ১৯৮১

ইউ.এম. সালিহ্, দ্য পলিটিক্যাল থট অভ ইবনে তায়মিয়া (ইবনে তায়মিয়ার রাজনৈতিক চিন্তা), ১৯৯০

রবার্ট স্পেন্সার, 'দ্য পিপল অভ সৌদি অ্যারাবিয়া অ্যালাইস অ্যাগেইনস্ট টেরোরিজম? (সৌদি আরবের জনগণঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ?), ইন ফ্রন্ট পেজ ম্যাগাজিন. কম. ১৫/৭/০৩

টেড থর্নটন, হিস্ট্রি অভ দ্য মিডল ইস্ট ডাটাবেস (মধ্যপ্রাচ্য ডাটাবেসের ইতিহাস), ডব্লিউ. ডব্লিউ. ডব্লিউ. এনএম স্কুল, ও আরজি/থর্নটন/মেহিস্ট্রি/ডাটাবেস

চার্লস ট্রিপ, ‘সায়িদ কুতব দ্য পলিটিক্যাল ভিশন’ (রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গি),
ইন আলী রেহনেমা, পায়োনিয়ারস অভ ইসলামিক রিভাইভ্যাল (ইসলামি পুনর্জাগরণের পৃষ্ঠ পোষকগণ), ১৯৯৪

জন ভল, মুহাম্মদ হায়া আল-সিন্ধি এ্যান্ড মুহাম্মদ ইবনে আব্দ আল-ওয়াহ্হাব : এ্যান এ্যানালাইসিস অভ এ্যান ইনটেলেকচুয়াল গ্রুপ ইন এইটিনথ সেঞ্চুরি মদিনা (অষ্টাদশ শতাব্দীতে মদিনায় একটি বুদ্ধিজীবী মহলের বিশ্লেষণ), ইন বুলেটিন অভ দ্য স্কুল অভ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ৩৮ নং, ১, ১৯৭৫

এইচ. ভি. এফ. উইনস্টোন, ক্যাপ্টেন শেক্সপিয়ার : এ পোরট্রেইট, ১৯৭৬

—দ্য ইল্লিসিট অ্যাডভেঞ্চার (অবৈধ বিপজ্জনক কাজ) দ্য স্টোরি অভ পলিটিক্যাল এণ্ড মিলিটারি ইনটেলিজেন্স ইন দ্য মিডল ইস্ট ফ্রম এইটিননাইন হাণ্ড্রেড নাইনটি এইট টু নাইনটিন হাণ্ড্রেড টুয়েন্টি সিক্স (মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক ও সামরিক গোয়েন্দা কাহিনী) ১৮৯৮ থেকে ১৯২৬, ১৯৮২

ইণ্ডিয়া, আফগানিস্তান এ্যাণ্ড সেন্ট্রাল এশিয়া : প্রাইমারি এ্যাণ্ড হিস্ট্রিক্যাল সোর্সেস (প্রি-নাইনটিন ফর্টি সেভেন)

[ভারত, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়া : প্রাথমিক এবং ঐতিহাসিক উৎসসমূহ (১৯৪৭-পূর্ব)]

জেমস অ্যাবোট, ‘ফার্স্ট এক্সপিডিশন এগেইনস্ট ব্ল্যাক মউানটেইন, হাজারা ইন এইটিন হাণ্ড্রেড ফিফটি থ্রি’ (১৮৫৩ সালে হাজারার কৃষ্ণ পার্বত্য এলাকার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান), ওআইওসি ইইউআর, এমএসএস.সি. ২১০

—দ্য চিফস অভ হাজারা’ (হাজারার প্রধানগণ), ১৮৫০ ও আই ও সি ইইউআর, এমএসএস.সি ১২০

জন অ্যাডি, সিত্তানা এ মাউনটেইন ক্যাম্পেইন অন দ্য বর্ডারস অভ আফগানিস্তান ইন এইটিন সিক্সটি থ্রি (১৮৬৩ সালে আফগানিস্তান সীমান্তসমূহে একটি পার্বত্য অভিযান), ১৮৬৭

সায়িদ আহমদ অভ বেরিলির (সায়িদ আহমদ), ‘খুতবাহ্স এ্যাণ্ড করেসপণ্ডেন্স, সাম ইন অ্যারাবিক, কম্পাইল্ড ফর জেমস ও কিনীলি’ আনডেটেড, ওআইওসি এমএসএস.অর. ৬৬৩৫

শেখ হেদায়েত আলী, এ ফিউ ওয়ার্ডস রিলেটিভ টু দ্য লেট মিউটিনি অভ দ্য বেঙ্গল আর্মি, এ্যাণ্ড দ্য রিবেলিয়ন ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ১৮৫৮ (বাংলার সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু কথা, এবং বাংলা বিদ্রোহ, ১৮৫৮)

মীর শাহমত আলী, 'ট্রানস্লেশন অভ দ্য তাকউয়িয়াত উল-ইমাম (স্ট্রেং দেনিং অভ ফেইথ] [তাকউয়িয়াত উল-ঈমান] (ঈমানের ক্ষমতা)-এর অনুবাদ] প্রিসেডেড বাই এ নোটিশ অভ দ্য অথর, মৌলভি ইসমাইল আলী' ইন জার্নাল অভ দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৩, ১৮৫২

মুহাম্মদ আলী 'মাখজান-ই-আহমদি, এ বায়োগ্রাফি অভ সায়িদ আহমদ শহিদ', আনডেটেড (সায়িদ আহমদ শহিদের জীবনী, তারিখবিহীন), ও আইওসি এমএসএস, অর. ৬৬৫০

অ্যানন, আঢ়া দ্য সিজ, ডিফেন্স এ্যাণ্ড ভিকটোরি অভ, ইন জুলাই ১৮৫৭, বাই ওয়ান অভ দ্য গ্যারিসন, ১৮৯৭

জন এফ. ব্যাড্ডলি, দ্য রাশিয়ান কনকোয়েস্ট অভদ্য কওফাসাস, ১৯০৮

জে. আর. বেচার, মেমোর‍্যাণ্ডাম অন দ্য হাজারা ডিস্ট্রিক্ট ডিউরিং দ্য মিউটিনি ইন ইণ্ডিয়া, ১৮৫৮

এইচ.ডব্লিউ বিলিউ, এ জেনারেল রিপোর্ট অন দ্য ইউসুফ জাই, (ইউসুফ জাইয়ের উপরে একটি সাধারণ প্রতিবেদন)

—এ্যান এনকোয়ারি ইন টু দ্য এথনোগ্রাফি অভ আফগানিস্তান (আফগানিস্তানের আদিবাসীদের সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান), ১৮৯১

—(এ্যাজ 'এ পাঞ্জাব অফিস্যাল), আওয়ার পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার, উইথ এ কনসাইজ এ্যাকাউন্ট অভ দ্য ভেরিয়াস ট্রাইবস বাই হুইচ দ্য নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার অভ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ইনহ্যাভিটেড (বিভিন্ন উপজাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ যারা ব্রিটিশ ভারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসবাস করত), ১৮৬৮

গভট অভ বেঙ্গল, করেসপণ্ডেন্স অভ দ্য কানেকটেড দ্য রিমুভ্যাল অভ মি. ডব্লিউ. টেইলর ফ্রম দ্য কমিশনারশিপ অভ পাটনা এ্যাণ্ড দ্য অ্যারেস্ট এ্যাণ্ড ট্রায়াল অভ লুতফ আলী খান, এ ব্যাঙ্কার ইন পাটনা (বাংলার সরকার মি. ডব্লিউ টেইলরের পাটনার কমিশনার পদের যে বিচ্যুতি থেকে গ্রেপ্তার ও পাটনার ব্যাঙ্কার লুতফ আলী খানের বিচার সম্পর্কিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান), ১৮৫৮

এইচ.পি. ব্লাভতস্কি, 'দ্য আখুন্দ অভ সোয়াত, দ্য ফাউণ্ডার অভ মেনি মিস্টিক্যাল সোসাইটিজ' (সোয়াতের আখুন্দ, বহু মরমী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা), ইন দ্য নিউইয়র্ক ইকো, ১৮৭৮

আর. ভি. রয়েল. ব্রিফ ন্যারেটিভ অভ দ্য ডিফেন্স অভ দ্য (আঢ়া দূর্গ রক্ষার নিমিত্তে সৈন্যদলের প্রতিরক্ষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা), ১৮৫৮

স্যার ওয়েন টিউডর বার্ন কালেকশন (সংগ্রহ), পেপারস রিলেটিং টু অ্যাসাসিনেশন অভ লর্ড মায়ো' (লর্ড মায়োর গুপ্তহত্যা সম্পর্কিত কাগজপত্র), ওআইওসি এমএসএস. ইইউআর. ডি. ৯৫১/১৫-১

নেভিল চেম্বারলিন পেপারস, ও আইওসি এমএসএস. ইউউ আর.সি ২০৩ হিউজ চিচেস্টার লেটারস, ওআইওসিএমএসএস. ইইউআর, ফটো-২৭১

উইন্সটন চার্চিল, দ্য স্টোরি অভ দ্য মালাকন্দ ফিল্ড ফোর্স এ্যান এপিসোড অভ ফ্রন্টিয়ার ওয়ার (মালাকন্দ রণক্ষেত্রের গল্প সীমান্ত যুদ্ধের একটি কাহিনি), ১৮৯৮

—ইয়াং উইন্সটন ওয়ারস দ্য ওরিজিন্যাল ডেসপ্যাচেস অব উইন্সটন এস. চার্চিল, এড. এফ. উডস (তরুণ উইন্সটনের সমরসমূহ উইন্সটন এস.চার্চিলের মূল সরকারি কাগজপত্র এফ. উডস সম্পাদিত), ১৯৭২

জন রাসেল কলভিন, রিপোর্ট টু দ্য গভর্নমেন্ট অভ বেঙ্গল অন দ্য ডিস্টারবেন্সেস এ্যাট বারাসাত, (বারাসাতে বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে বাংলার সরকারের নিকটে প্রতিবেদন), ১৮৩১

—(এ্যাজ ‘জে.আর.সি’), নোটিশ অভ দ্য পিকিউলিয়ার টেনেটস হেল্ড বাই দ্য ফলোরাস অভ সৈয়দ আহমদ, টেকেন চিফলি ফ্রম দ্য সিরাত-উল-মুস্তাকিম, রিটেন বাই মৌলভি মোহাম্মদ ইসমাইল’ (সৈয়দ আহমদের অনুসারীদের দ্বারা সংরক্ষিত অদ্ভুত মতবাদের পর্যবেক্ষণ, মৌলভি মোহাম্মদ ইসমাইল লিখিত সিরাত-উল-মুস্তাকিম কিতাব থেকে গৃহীত হয়েছে), ইন জার্নাল অভ দ্য এশিয়াটিক সোসাসইটি অভ বেঙ্গল, ১, ১৮৩২

সিডনি কটন, নাইন ইয়ারস ইন দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার অভ ইন্ডিয়া (ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নয় বছর), ১৮৬৮

লর্ড ডালহৌসি, মাইনিউট অন ওয়াহ্হাবিস (ওয়াহ্হাবিদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ), ১৮৫২

—করেসপনডেন্স (চিঠিপত্র), বিএল এমএসএস অ্যাড. ৪৮৫৯০, ৫৭৪১১-১২ অ্যালগার নন ডুর‍্যাণ্ড, দ্য মেকিং অভ এ ফ্রন্টিয়ার (একটি সীমান্তের নির্মাণ), ১৮৯৯

লেডি এডওয়ার্ডস, মেমোরিয়্যালস অভ দ্য লাইফ এ্যাণ্ড লেটারস অভ স্যার এইচ. বি. এডওয়ার্ডস (স্যার এইচ.বি.ওয়ার্ডসের জীবনের স্মৃতি-চারণা ও পত্রগুচ্ছ) ১৮৮৬

স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস, এ ইয়ার অন দ্য পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার (পাঞ্জাব সীমান্তে এক বছর), ১৮৫১

—দ্য লাইফ অভ স্যার হেনরি লরেন্স (স্যার হে[illegible] লরেন্সের জীবন), ১৮৭২

আর.এম. এডওয়ার্ডস, ‘মিউটিনি ডাই[illegible]’ ([illegible]কাশ্য বিদ্রোহের রোজনামচা) ওআইওসি এমএসএস ইইউআর সি১৪০/১[illegible]

পি.সি. এলিওট-লকহার্ট অ্যাণ্ড এ.ই. মুরে, এ ন্যারেটিভ অভ দ্য অপারেশন্স অভ দ্য মালাকন্দ এ্যাণ্ড বুনার ফিল্ড ফোর্সেস (মালাকান্দ ও বুনারের যুদ্ধক্ষেত্রের আক্রমণের একটি কাহিনি), ১৮৯৭-৯৮, ১৮৯৮

মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন, এ্যান এ্যাকাউন্ট অভ দ্য কিংডম অভ কাবুল (কাবুল রাজ্যের একটি বিবরণ), ১৮১৫

জর্জ এলসমি, নোটস অন সাম অভ দ্য কারেকক্টারইস্টিক্স অভ ক্রাইম এ্যাণ্ড ক্রিমিন্যালস ইন দ্য পেশোয়ার ডিভিশন অভ দ্য পাঞ্জাব, এইটিন হাণ্ড্রেড সেভেনটি টু এইটটিন হাণ্ড্রেড সেভেনটি সেভেন (পাঞ্জাবের পেশোয়ার বিভাগে অপরাধ ও অপরাধীদের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্যসমূহ ১৮৭২ থেকে ১৮৭৭), ১৮৮৪

জি. ডব্লিউ. ফরেস্ট, লাইফ অভ ফিল্ড-মার্শাল স্যার নেভিল চেম্বারলিন (সেনাপতি স্যার নেভিল চেম্বারলিনের জীবন), ১৯০৯

আলেকজাণ্ডার গার্ডনার, সোলজার এ্যাণ্ড ট্রাভেলার মেমোয়্যারস অভ আলেকজাণ্ডার, কর্ণেল অভ আর্টিলারি ইন দ্য সার্ভিস অভ মহারাজা রণজিৎ সিংহ এড. এইচ.পিয়ারস (সৈনিক ও পর্যটক আলেকজাণ্ডারের স্মৃতিকথা, মহারাজা রণজিৎ সিংহের চাকরিতে গোলন্দাজ বাহিনীর কর্ণেল, এইচ.পিয়ারস সম্পাদিত), ১৮৯৮

গভট অভ ইণ্ডিয়া, ফ্রন্টিয়ার এ্যাণ্ড ওভারসীজ এক্সপিডিশন্স ফ্রম ইন্ডিয়া (ভারত সরকার, ভারতের সীমান্ত ও বিদেশী অভিযান), শ. ১৯০০

স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে, মাইনিউট দ্য মিউটিনিজ অ্যাজ দে অ্যাফেকটেড দ্য লোয়ার প্রোভিনসেস আণ্ডার দ্য গভর্নমেন্ট অভ বেঙ্গল (পুঙ্খানুপুঙ্খ বাংলার সরকারের অধীনে যখন তারা উত্তরের প্রদেশসমূহকে আক্রমণ করেন),

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস : আর দে বাউণ্ড ইন কনসাইন্স টু রিবেল এগেইনস্ট দ্য কুইন? (আমাদের ভারতীয় মুসলমানগণ তারা কি রানির বিরুদ্ধে বিবেকের দিক থেকে বিদ্রোহ করতে বাধ্য?), ১৮৭৬

——এ লাইফ অভ দ্য আর্ল অভ মায়ো (আর্লের মায়োর একটি জীবন), ১৮৭৫

এইচ.ডি. হাচিনসন, দ্য কাম্পেইন ইন তিরাহ্ (তিরাহ্য় অভিযান) ১৮৯৭-৯৮, ১৮৯৮

হিউজ আর.জেমস, রিপোর্ট অন দ্য সেটলমেন্ট অভ দ্য পেশোয়ার ডিস্ট্রিক্ট (পেশোয়ার জেলায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিবেদন), ১৮৬৪

লায়োনেল জেমস (রয়টারস), দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্রন্টিয়ার ওয়ার, বিয়ং এ্যান এ্যাকাউন্ট অভ দ্য মোহমন্দ এ্যাণ্ড ট্রায়াল এক্সপিডিশন্স (ভারতীয় সীমান্ত সমর, মোহমন্দদের ও বিচার অভিযানের বর্ণনাসহ) ১৮৯৭, ১৮৯৮

স্যার চার্লস প্যাটন কেয়েস কালেকশন, 'লেটারস (পত্র গুচ্ছ) ১৮৬০-৬৩ ওআইওসি এমএসএস ইইউআর/ডি ১০৪৮/৭; মিলিটারি পেপারস (সামরিক পত্রগুচ্ছ)১৮৬০৬৯', ওআইওসি, এমএসএস. ইইউআর/ডি ১০৪৮/৩

আমির খান, দ্য গ্রেট ওয়াহ্হাবি কেস, বিয়িং এ ফুল রিপোর্ট অভ দ্য প্রোসিডিং স ইন দ্য ম্যাটারস অভ আমির খান এ্যাণ্ড হাশমাদাদ খান বিফোর অনারেবুল মি. জাস্টিস নরম্যান ইন দ্য হাইকোর্ট ক্যালকাটা, ১৮৭০

এম.এ. খান, সিলেকশন্স ফ্রম ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রেকর্ডস রিলেটিং টু ওয়াহ্হাবি ট্রায়ালস (ওয়াহ্হাবি বিচার সম্পর্কিত ব্রিটিশ সরকারের নথিসমূহ থেকে নির্বাচন), ১৯৬১

স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, দ্য কজেস অভ দ্য ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট, রিটেন বাই সৈয়দ আহমেদ খান বাহাদুর (সৈয়দ আহমেদ খান বাহাদুর লিখিত ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ সমূহ); সিএসআই, ইন উর্দূ ইন দ্য ইয়ার এইটিন হাণ্ড্রেড ফিফটি এইট এ্যাণ্ড ট্রান্সস্লেটেড ইন টু ইংলিশ বাই হিজ টু ইউ-রোপীয়ান ফ্রেণ্ডস (১৮৫৮ সালে উর্দূতে এবং তাঁর দুই ইউরোপীয় বন্ধু কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত), ১৮৭৩

সৈয়দ এমদাদ আলী খান, ট্রান্সস্লেশন অভ এ্যান এপিটোম অভ দ্য হিস্ট্রি অভ দ্য ওয়াহ্হাবিস, এডিটেড বাই মৌলভি সৈয়দ এমদাদ আলী খান, বাহাদুর, জজ অভ স্মল কজেস কোর্ট, তিরহুত (তিরহুতের স্মল কজেস কোর্টের জজ মৌলভি সৈয়দ এমদাদ আলী খান, বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত, ওয়াহ্হাবিদের ইতিহাসের), ১৮৭১

জেমস ও' কিনীলি, 'দ্য ওয়াহ্হাবিস ইন ইণ্ডিয়া' (ভারতে ওয়াহ্হাবিবর্গ), ইন দ্য ক্যালকাটা রিভিউ, খণ্ড সি এবং সি আই, ১৮৯৫

এডওয়ার্ড লকউড, দ্য আর্লি ডেজ অভ মার্লবোরো কলেজ, উইথ এ চ্যাপটার অন পাটনা ডিউরিং দ্য মিউটিনি (মার্লবোরো কলেজের প্রথম দিনগুলি, পাটনার বিদ্রোহের সময়ের একটি অধ্যায়সহ), ১৮৯৩

এইচ.বি. লামসডেন, 'রিপোর্ট অন দ্য ইউসুফজায়ী ডিস্ট্রিক্ট ইন পাঞ্জাব পেপারস, ('ইউসুফজায়ী জেলার উপরে প্রতিবেদন', পাঞ্জাবের কাগজপত্রে), ১৯৫৩

জি.বি. ম্যালসন, হিস্ট্রি অভ দ্য ইণ্ডিয়ান মিউটিনি (ভারতীয় প্রকাশ্য বিদ্রোহের ইতিহাস), ১৮৭৮

ফ্র্যাঙ্ক মার্টিন, আণ্ডার দ্য অ্যাবসুল্যুট আমির (পরি[illegible] আমিরের অধীনে, ১৯০৭

এইচ.ম্যাসন, রিপোর্ট অন দ্য ব্ল্যাক মাউন্টেইন্স (কৃষ্ণ পর্বতমালার উপরে প্রতিবেদন), ১৮৮৮

—'দ্য হিন্দুস্তানি ফ্যানাটিক্স (হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধরা), ইন জার্নাল অভ দ্য ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইন্সটিটিউশন অভ ইণ্ডিয়া, ১৮৯০

এল.এ. মেগুেস রিপোর্ট অভ প্রোসিডিংস ইন দ্য ম্যাটারস অভ আমির খান এ্যাণ্ড হেশমেতদাদ খান, ১৮৭০

সি.টি. মেটকাফ, টু নেটিভ ন্যারেটিভস অভ দ্য মিউটিনি ইন দিল্লি (দিল্লিতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের দুটি স্বদেশী বর্ণনা), ১৮৯৮

এইচ. ডব্লিউ. মিলস, 'দ্য পাঠান রিভোল্ট ইন নর্থ-ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া, এইটিন হাণ্ড্রেড নাইনটি সেভেন (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান বিদ্রোহ, ১৮৯৭), ১৯৯৮

—দ্য তিরাহ্ ক্যাম্পেইন (তিরাহ্ অভিযান), ১৮৯৮

এইচ.এল. নেভিল, ক্যাম্পেইন্স অন দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্লন্টিয়ার (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিযানসমূহ), ১৯১২

স্যার মাইকেল ও' ডয়ার, ইণ্ডিয়া অ্যাজ আই নিউ ইট (ভারতকে আমি যেমন জেনেছি), ১৯২৫

এডওয়ার্ড এ.অলিভার, অ্যাক্রস দ্য বর্ডার অর পাঠান এ্যাণ্ড বিলোচ (সীমান্ত পারে : অথবা পাঠান এবং বিলোচ), ১৮৯০

ডব্লিউ. এইচ. প্যাগেট, রেকর্ডস অব এক্সপিডিশন্স এগেইনস্ট অভ দ্য নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার সিন্স দ্য অ্যানেক্সেশন অভ দ্য পাঞ্জাব (এইটিন হ্যাণ্ড্রেড সেভেনটি ফোর, রিভাইজড এ্যাণ্ড আপডেটেড এইটিন হাণ্ড্রেড এইট্টি ফোর। (পাঞ্জাবের সঙ্গে সংযুক্তির সময় থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বিরুদ্ধে সকল অভিযানের নথিপত্রে সংশোধিত), ১৮৭৪, এবং ১৮৮৪

পাকিস্তান গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট, সিলেকশন্স ফ্রম বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রেকর্ডস অন ওয়াহ্হাবি ট্রায়ালস, ১৮৬৩-১৮৭০, ১৯৬১

ই. গ্যাম্বিয়ার প্যারি, রেইনেল টেইলর, ১৮৮৮

পিয়ার্স কালেকশন, 'কনসার্নিং দ্য সাপ্রেসন অভ দ্য রিভোল্ট ইন এইটিন হাণ্ড্রেড ফিফটি টু ইন কাগান' (১৮৫২ সালে কাগানে বিদ্রোহ দমন প্রসঙ্গে), ১৮৫২, ও আইওসি এমএসসি, ইইউআর. ই. ৪১৭/১০

থিওডোর এল. পেনেল, অ্যামং দ্য ওয়াইল্ড ট্রাইবস অভ দ্য আফগান ফ্রন্টিয়ার (আফগান সীমান্তের বুনো উপজাতিদের মধ্যে), ১৯১২

পায়োনিয়ার প্রেস, দ্য রাইজিংস অন দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অভ্যুত্থান), ১৮৯৭-৯৮, ১৮৯৮

গভর্ট অভ দ্য পাঞ্জাব, রিপোর্ট অন হিন্দুস্তানি ফ্যানাটিক্স অভ সিত্তানা (পাঞ্জাব সরকার, সিত্তানার হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধদের উপরে প্রতিবেদন), ১৮৬৪

রিপোর্ট শোয়িং দ্য রিলেশন্স অভ দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইউথ দ্য ট্রাইবস অন দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার অভ দ্য পাঞ্জাব (পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক দেখিয়ে প্রতিবেদন), ১৮৬৪

—মিউটিনি রেকর্ডস করেস্পণ্ডেন্স এ্যাণ্ড রেকর্ডস, পার্ট টু (প্রকাশ্য বিদ্রোহের নথিপত্র : চিঠিপত্র ও নথিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯১১

—গেজেটিয়ার অভ দ্য দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট (দিল্লি জেলার গেজেটিয়ার), ১৮৮৩-৮৪

—গেজেটীয়ার অভ দ্য হাজারা ডিস্ট্রিক্ট (হাজারা জেলার গেজেটিয়ার), ১৯০৭

—গেজেটিয়ার অভ দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রোভিন্স (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গেজেটিয়ার), ১৯৩১

—গেজেটিয়ারস অভ দ্য পেশোয়ার ডিস্ট্রিক্ট (পেশোয়ার জেলার গেজেটিয়ারসমূহ), ১৮৯৮, ১৯১০, ১৯৩৩

—সিলেকশন্স ফ্রম দ্য পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস (পাঞ্জাব সরকারের নথিপত্র থেকে নির্বাচিত অংশ), খণ্ড ৭-৮, ১৯১২

—পেপারস কানেকটেড উউথ দ্য ট্রায়াল অভ মৌলভি আহমেদুল্লাহ অভ পাটনা, এ্যাণ্ড আদারস, ফর কন্সপিরাসি এ্যাণ্ড ট্রিসন (পাটনার আহমেদুল্লাহ্ ও অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের জন্য বিচার সম্পর্কিত কাগজপত্র) ১৮৬৪-৬৫, ১৮৬৬, পাঞ্জাব ইনডেক্স ফাইভ হাণ্ড্রেড থারটি এইট, আনডেটেড (পাঞ্জাব সূচক ৫৩৮, তারিখ বিহীন)

—রিপোর্ট অন দ্য ইউসুফজায়ী ডিস্ট্রিক্ট বাই লেফটেন্যান্ট লামসডেন, লেফটেন্যান্ট (ইউসুফজায়ী জেলার উপরে প্রতিবেদন), ১৮৫৩, পাঞ্জাব ইনডেক্স (সূচক), ১৯৫৪

আব্দুর রহমান (আব্দ আল-রহমান খান), দ্য লাইফ অভ আব্দুর রহমান : আমির অভ আফগানিস্তান (আব্দুর রহমানের জীবন : আফগানিস্তানের আমির), ১৯০০ চার্লস রাইক্স, নোটস অন দ্য নর্থওয়েস্ট প্রোভিন্স অভ ইণ্ডিয়া (ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের উপরে মন্তব্যসমূহ), ১৮৫২

—নোটস অন দ্য রিভোল্ট ইন দ্য নর্থওয়েস্ট প্রোভিন্সেস অভ ইণ্ডিয়া (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে বিদ্রোহের উপরে নোটস), ১৮৫৭

টি.ই. র‍্যাভেনশ, পাটনা ম্যাজিস্ট্রেটস রিপোর্ট (পাটনা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিবেদন), ১৯ অগাষ্ট ১৮৫২

—হিস্ট্রিক্যাল মেমোর‍্যানডম অন দ্য সেক্ট অভ দ্য ওয়াহ্হাবিস ওয়াহ্হাবি সম্প্রদায়ের উপরে ঐতিহাসিক মেমোর‍্যানডম) শ. ১৮৬৪

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

এডওয়ার্ড রেহ্যাটসেক, 'দ্য হিস্ট্রি অভ দ্য ওয়াহ্হাবিস ইন অ্যারাবিয়া এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' (আরবে এবং ভারতে ওয়াহ্হাবিদের ইতিহাস), ইন জার্নাল অভ দ্য বোম্বে ব্রাঞ্চ অভ দ. রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, খণ্ড ১৪শ, ১৮৭৮-৮০

ফ্রেডারিক রবার্টস, ফর্টি-ওয়ান ইয়ারস ইন ইণ্ডিয়া; ফ্রম সুবলটার্ন টু কম্যাণ্ডার ইন-চিফ (ভারতে একচল্লিশ বছর : সুবলটার্ন থেকে প্রধান সেনাপতি পর্যন্ত), ১৮৯৭

জেমস রুটলেজ, ইংলিশ রুল এ্যাণ্ড নেটিভ ওপিনিয়ন ইন ইণ্ডিয়া, ফ্রম নোটস টেকেন ইন এইটিন হাণ্ড্রেড সেভেনটি-সেভিনটি ফোর (১৮৭০-৭০৪-এর নোটস থেকে গৃহীত, ভারতে ইংরেজ শাসন ও স্বদেশী মতামত), ১৮৭৪

এডওয়ার্ড আলেকজান্ডার স্যামুয়েলস, রিমার্কস অন মি. উইলিয়াম টেইলরস 'ব্রিফ ন্যারেটিভ অভ ইভেন্টস' (মি. উইলিয়াম টেইলরের বিষয়াবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণে-এর উপরে মন্তব্যসমূহ), ১৮৫৮

সায়িদ মুবারক শাহ্, 'ন্যারেটিভ অভ সায়িদ মুবারক শাহ্' (সায়িদ মুবারক শাহের বিবরণ), ওআইওসি এমএসএস. ইইউআর. বি ১৩৮

শাহ্ ইসমাইল শহীদ, তাকওয়াত-উল-ইমান, ১৮২৭, ট্রান্সস্লোটেড অ্যাজ স্ট্রেংদেনিং অভ দ্য ফেইথ বাই মীর শাহামত আলী, উইথ এ প্রিফেস বাই গোলাম রসুল মেহর (গোলাম রসুল মেহরের ভূমিকা সহ মীর শাহামত আলী কর্তৃক ঈমানের ক্ষমতা হিসেবে অনূদিত), তারিখবিহীন

উইলিয়াম টেইলর, আওয়ার ক্রাইসিস অর থ্রি মান্থস অ্যাট পাটনা ডিউরিং দ্য ইনসারেকশন অভ এইটটিন হাণ্ড্রেড ফিফটি সেভেন (আমাদের সংকট অথবা পাটনায় ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময় তিন মাস), ১৮৫৮

—ব্রিফ ন্যারেটিভ অভ ইভেন্টস কানেকটেড উইথ দ্য রিমুভ্যাল অভ মি. টেইলর ফ্রম দ্য কমিশনারশিপ অভ পাটনা (মি. টেইলরের পাটনার কমিশনার পদ থেকে অপসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলির উপরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ), ১৮৫৭

—ভেরিতাস ভিকট্রিক্স; বিয়িং লেটারস এ্যাণ্ড টেস্টিমোনিয়্যালস রিলেটিং টু দ্য কনডাক্ট অভ ডব্লিউ টেইলর ইন দ্য ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, আনডেটেড

—থার্টি এইট ইয়ারস ইন ইণ্ডিয়া (ভারতে আটত্রিশ বছর), ১৮৭৮

—জাস্টিস ইন দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি এ্যান অ্যাপিল টু ব্রিটিশ অনার (ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিচারক : ব্রিটিশ), ১৮৮৫

মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী, কালাপানি তারিখ এ আজীব (দ্য ব্ল্যাক ওয়াটার এ স্টোরি), ১৮৮৪; ট্রান্সস্লোটেড এ্যাণ্ড [illegible]শড অ্যাজ ইন

এগজাইল (এ স্ট্রেঞ্জ স্টোরি) [নির্বাসনে (একটি অদ্ভুত গল্প) হিসেবে অনূদিত ও প্রকাশিত], ১৯৬৪

ক্যাপ্ট এল.জে. ট্রোটার, উইলিয়াম টেইলর অভ পাটনা এ ব্রিফ অ্যাকাউন্ট অভ দ্য স্প্লেণ্ডিড সার্ভিসেস, হিজ ক্রুয়েল রংস, এ্যাণ্ড থার্টি ইয়ারস স্ট্রাগল ফর জাস্টিস (পাটনার উইলিয়াম টেইলর চমৎকার সরকারি কার্যাবলির বিবরণ, তাঁর নিষ্ঠুর ভ্রান্তিসমূহ, এবং তাঁর ত্রিশ বৎসর ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রাম), ১৮৮৭

—লাইফ অভ দ্য মার্কেস অভ ডালহৌসি (ডালহৌসির মার্কেসের জীবন), ১৮৯৫

স্যার রবার্ট ওয়ার বার্টন, এইটটিন ইয়ার্স ইন দ্য খাইবার (খাইবারে আঠার বছর) ১৮৭৯-৯৮, ১৮৯৮

জেমস উইলসন, হোয়াই ওয়াজ লর্ড মায়ো অ্যাসাসিনেটেড? (লর্ড মায়োকে কেন গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল?) ১৮৭২

এইচ.সি.উইলি, ফ্রম দ্য ব্ল্যাক মাউনটেইন টু ওয়াজিরিস্তান (কৃষ্ণ পর্বত থেকে ওয়াজিরিস্তান), ১৯১২

জি.জে. ইয়াং হাসবেণ্ড, দ্য স্টোরি অভ দ্য গাইডস (তরুণ স্বামী, গাইডসের গল্প), ১৯০৮

ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়া :

মধ্যস্থ এবং আধুনিক উৎসসমূহের, (১৯৪৭-উত্তর)

অ্যানন, 'দ্য স্ট্রাইভিং শেখ আব্দুল্লাহ্ আজম' (সংগ্রামরত শেখ আব্দুল্লাহ্ আজম) ইন নাইদৌল ইসলাম ম্যাগাজিন, জুলাই-সেপ্টেম্যার ১৯৯৬ আজিজ আহমদ, 'পালিটিক্যাল এ্যাণ্ড রিলিজিয়াস আইডিয়াস অভ শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ অভ দিল্লি' (দিল্লির শাহ্ ওয়ালি-উল্লারহ্‌র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শসমূহ), ইন মুসলিম ওয়ার্ল্ড, খণ্ড ৫২, ১, ১৯৬২

—স্টাডিজ ইন ইসলামিক কালচার ইন দ্য ইণ্ডিয়ান এনভাইরনমেন্ট (ভারতীয় পরিবেশে ইসলামি সংস্কৃতির পঠন-পাঠন), ১৯৬৭

—ইসলামিক মডার্নিজম ইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড পাকিস্তান (ভারতে ও পাকিস্তানে ইসলামি আধুনিকতা), ১৮৫৭-১৯৬৪, ১৯৬৭

—এ্যান ইনটেলেকচ্যুয়াল হিস্ট্রি অভ ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া (ভারতে ইসলামের একটি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ইতিহাস), ১৯৬৯

খালেদ আহমদ, 'দ্য গ্র্যাণ্ড দেওবন্দি কনসেনসাস' (বৃহৎ দেওবন্দি সকলের মতৈক্য), ইন দ্য ফ্রাইডে টাইমস অভ পাকিস্তান, ৪/২/২০০০

কেয়ামউদ্দিন আহমদ, দ্য ওয়াহ্‌হাবি মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া (ভারতে ওয়াহ্‌হাবি আন্দোলন), ১৯৬৬; রিভাইজড (সংশোধিত) ১৯৯৪

আকবর এস. আহমেদ, পুখতুন ইকোনোমি এ্যাণ্ড সোসাইটি (পুখতুন অর্থনীতি ও সমাজ), ১৯৮০

—মিলেনিয়াম এ্যাণ্ড ক্যারিসমা অ্যামং পাঠানস (পাঠানদের মধ্যে সহস্র বছর ও উৎসাহ-উদ্দীপনাদি সৃষ্টির ক্ষমতা), ১৯৮০

হামজা আলায়ি, দ্য রাইজ অভ রিলিজিয়াস ফাণ্ডামেন্টালিজম ইন পাকিস্তান (পাকিস্তানে ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান), তারিখবিহীন

চার্লস অ্যালেন, সোলজার সাহিবস দ্য মেন হু মেড দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার (সেই সব ব্যক্তিবর্গ যারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গড়েছিল), ২০০০

ফ্রেড্রিক বার্থ, পলিটিক্যাল লিডারশিপ অ্যামং সোয়াত পাঠানস (সোয়াতপাঠনদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব), ১৯৫৯

এ.কে. বিশ্বাস, আনসাং মারটায়ারস অভ এইটিন হাণ্ড্রেড ফিফটিসেভেন (১৮৫৭ সালের কবিতায় বা গীতে কীর্তিত না হওয়া শহীদেরা), ২০০০

জ্যাসন বার্ক, আল-কায়েদা ইন দ্য অভ টেরর (আল-কায়েদা সন্ত্রাসের ছায়াতলে), ২০০৩

স্যার ওলাফ ক্যারো, দ্য পাঠানস, ১৯৫৮

এইচ. চট্টোপাধ্যায়, 'মিউটিনি ইন বিহার', ইন বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, (বিহারে বিদ্রোহ, বাংলায় অতীত ও বর্তমান), খণ্ড ৬৪, ২য় অংশ ১৯৫৫

—ইনসারজেন্সি অভ তিতুমীর (তিতুমীরের বিদ্রোহ), ২০০২

এস.বি. চৌধুরী, সিভিল ডিস্ট্রারব্যান্সেস ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া (ভারতে বৃটিশ শাসনামলে বেসামরিক বিশৃঙ্খলা), ১৯৫৫

জন কে. কুলে, আনহোলি ওয়ারস আফগানিস্তান, আমেরিকা এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম (অশুভ সমরসমূহ : আফগানিস্তান, আমেরিকা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ), ২০০০

সৌল ডেভিড, দ্য ইণ্ডিয়ান মিউটিনি (ভারতীয় প্রকাশ্য বিদ্রোহ), ২০০২

মহাশ্বেতা দেবী, তিতু মীর, ২০০০

ক্রিস্টাইন ডবিন, ইসলামিক রিভাইভ্যালিজম ইন চেঞ্জিং সেন্ট্রাল সুমাত্রা পিজ্যান্ট ইকোনোমি (পরিবর্তনশীল কৃষক অর্থনীতিতে ইসলামি পুনর্জাগরণে মধ্য সুমাত্রা), ১৭৮৪-১৮৪৭, ১৯৮৩

বলখি ফসিহ্‌উদ্দিন, ওয়াহ্‌হাবি মুভমেন্ট (ওয়াহ্‌হাবি আন্দোলন), ১৯৮৩

স্যার ডব্লিউ. কে. ফ্রেসার-টাইটলার, আফগানিস্তান, ১৯৫০

আলেকজাণ্ডার, ইগ্যানটেঙ্কো, 'অর্ডির্নারি ওয়াহ্হাবিজম' (সাধারণ ওয়াহ্হবিবাদ), ইন রাশিয়ান জার্নাল, ইন্টারন্যাশনাল ইউরো এশিয়ান ইন্সটিটিউট ফর ইকনোমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল রিসার্চ, ২৭ ডিসেম্বর ২০০১

লরেন্স জেমস, দ্য মেকিং এ্যাণ্ড আনমেকিং অভ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া (ব্রিটিশ ভারত নির্মাণ ও অনির্মাণ), ১৯৯৭

ইব্রাহিম ক্যালিন, সায়িদ জামাল আল-দিন মুহাম্মদ বিন সফদার আল-আফগানি, নরহরি কবিরাজ, ওয়াহ্হাবি এ্যাণ্ড ফরাজি রিবেলস অভ বেঙ্গল (বাংলার ওয়াহ্হাবি ও ফরাজি বিদ্রোহীগণ), ১৯৮২, ডব্লিউ. ডব্লিউ. ডব্লিউ. সিস ক্যা. অর্গ/ভয়েসেস, ৬ জান-২০০৪

এন. আর. কেডি, 'সায়িদ জামাল আল-দিন আল-আফগানি, ইন আলী রেহনেমা, এড., পায়োনিয়ারস অভ ইসলামি রিভাইভ্যাল (ইসলামি পুনর্জাগরণের পৃষ্ঠপোষকগণ), ১৯৯৪

মুহাম্মদ আসিফ খান, দ্য স্টোরি অভ স্টোরি অ্যাজ টোল্ড বাই দ্য ফাউণ্ডার (সোয়াতের গল্প প্রতিষ্ঠাতা যেমনটি বলেছেন, মিঞা গুল আব্দুল ওয়াদুদ বাদশাহ্ সাহিব মুহাম্মদ আসিফ খানের নিকটে, তারিখবিহীন (সিঙ্গারে যেমনটি উদ্ধৃত রয়েছে)

মুইন-উদ-দিন আহমদ খান, তিতুমীর এ্যাণ্ড হিজ ফলোওয়ারস ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান রেকর্ডস (ব্রিটিশ ভারতীয় নথিপত্রে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা), ১৯৭৭ কৃষাণ লাল, 'দ্য স্যাক অভ দিল্লি এইটিন হাণ্ডেড ফিফটি সেভেন-ফিফটি এইট অ্যাজ উইটনেসড বাই গালিব', বেঙ্গল পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট ('গালিবের দেখা ১৮৫৭-৫৮ সালের দিল্লির ধ্বংস সাধন ও লুণ্ঠন', বাংলার অতীত ও বর্তমান), খণ্ড ৬৪, দ্বিতীয় অংশ, ১৯৫৫

ক্রিস্টিনা ল্যাম্ব, ওয়েটিং ফর আল্লাহ্ পাকিস্তানস স্ট্রাগল ফর ডেমোক্রেসি (আল্লাহ্র জন্য অপেক্ষা : গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানের সংগ্রাম), ১৯৯১

কামাল মতিনউদ্দিন, দ্য তালিবান ফেনোমেনন আফগানিস্তান ১৯৯৪-১৯৯৭, ১৯৯৯ বারবারা ডি. সেটকাফ, ইসলামিক রিভাইভ্যাল ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া (ব্রিটিশ ভারতে ইসলামি পুনর্জাগরণ) দেওবন্দ ১৮৬০-১৯০০, ১৯৮৯

——"ট্র্যাডিশন্যালিস্ট" ইসলামিক অ্যাকটিভিজম ("ঐতিহ্যবান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ" ইসলামি সক্রিয়তা) দেওবন্দ তাবলিগি ও তালিবগণ, এসএস আর সি ওয়েবসাইট, ২০০২

এ. ডব্লিউ. মিঞা গুল, দ্য স্টোরি অভ সোয়াত (সোয়াতের গল্প), ১৯৬২

সৈয়দ বলি রেজা নাসর, 'মওদুদি এ্যাণ্ড জামাত-ই-ইসলামি দ্য ওরিজিনস্, থিওরি এ্যাণ্ড প্রাকটিস অব ইসলামি রিভাইভ্যালিজম' (মওদুদি ও জামাত-ই-ইসলামি উৎসসমূহ, ইসলামি পুনর্জাগরণের তত্ত্ব ও অনুশীলন),

ইন আলী রেহনেমা, এড., পায়োনিয়ারস অভ ইসলামিক রিভাইভ্যাল (ইসলামি পুনর্জাগরণের পৃষ্ঠপোষকগণ), ১৯৯৪

তৌফিক আহমদ নিজামি, মুসলিম পলিটিক্যাল থট এ্যাণ্ড অ্যাকটিভিটি ইন ইণ্ডিয়া ডিউরিং দ্য ফার্স্ট হাফ অভ দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি (ঊনবিংশ শতাব্দী প্রথমার্ধে ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যধারা), ১৯৬৯

ডেভিড ওমিসি. এড., ইণ্ডিয়ান ভয়েসেস অভ দ্য গ্রেট ওয়ার সোলজারসেস লেটারস (মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় মতামত সৈনিকদের পত্রগুচ্ছ) ১৯১৪-১৮, ১৯৯৯

ডেভিড পেজ, এডিটোরিয়্যাল, কিপলিং জার্নাল, সেপ্টেম্বর ২০০৪

ডি পাল, দ্য নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) ১৮৪৩-১৯৪৭, ১৯৪৯

এম. বুরহানউদ্দিন কাসমি, দারুল উলুম দেওবন্দ এ হিরোইক স্ট্রাগল এগেইনস্ট দ্য ব্রিটিশ টাইর‍্যানি (ব্রিটিশ আরাজকতার বিরুদ্ধে একটি বীরোচিত সংগ্রাম), ২০০১

তারিক রহমান, 'দ্য মাদ্রাসা এ্যাণ্ড দ্য স্টেট অভ পাকিস্তান' (মাদ্রাসা ও পাকিস্তানের অবস্থা), ইন হিমাল সাউথ এশিয়ান ম্যাগাজিন, ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

'মাদ্রাসা রিলিজিওন, পোভার্টি এ্যাণ্ড দ্য পোটেনশ্যাল ফর ভায়োলেন্স ইন পাকিস্তান' (মাদ্রাসা ধর্ম, দারিদ্র্য এবং পাকিস্তানে সহিংসতার জন্য), ইন আইপিআরআই জার্নাল, খণ্ড ৫, নং-১, শীতকাল ২০০৫

আহমেদ রশিদ, তালিবান মিলিট্যান্ট ইসলাম, অয়েল এ্যাণ্ড ফাণ্ডামেন্টালিজম ইন সেন্ট্রাল এশিয়া (মধ্য এশিয়ায় বিবদমান ইসলাম, তৈল এবং মৌলবাদ), ২০০০, রিপাব্লিশড অ্যাজ তালিবান দ্য স্টোরি অভ দ্য আফগান ওয়ারলর্ডস (তালিবান হিসেবে পুনঃপ্রকাশিত আফগান যুদ্ধবাজদের গল্প), ২০০১

—জিহাদ দ্য রাইজ অভ মিলিট্যান্ট ইসলাম ইন সেন্ট্রাল এশিয়া (মধ্য এশিয়ায় বিবদমান ইসলামের উত্থান), ২০০২

ফ্রান্সিস রবিনসন, ইসলাম এ্যাণ্ড মুসলিম হিস্ট্রি ইন সাউথ এশিয়া (দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস), ২০০০

—দ্য উলামা অভ ফারাঙ্গি মহল এ্যাণ্ড ইসলামিক কালচার ইন সাউথ এশিয়া (দক্ষিণ এশিয়ায় ফারাঙ্গি মহলের উলামা এবং ইসলামি সংস্কৃতি), ২০০১

এস.এ.এ. রিজভি, 'দ্য ব্রেকডাউন অভ ট্র্যাডিশন্যাল সোসাইটি' ('ঐতিহ্যবাহী সমাজের পতন') ইন ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অভ ইসলাম (ইসলামের ক্যামব্রিজ ইতিহাসে), খণ্ড ১১, ১৯৭০

সুরেন্দ্র নাথ সেন, এইটিন হাণ্ড্রেড ফিফটি সেভেন, ১৮৫৭, ১৯৫৭

যোগিন্দার সিকন্দ;, 'মাদ্রাসা এডুকেশন ইন সাউথ এশিয়া', দক্ষিণ এশিয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষা), ইন কোলান্দার ম্যাগাজিন ডব্লিউ. ডব্লিউ. ডব্লিউ. ইসলামি ইন্টারফেইথ অর্গ

—ইসলামিস্ট মিলিট্যান্সি ইন কাশ্মির দ্য কেস অভ দ্য লশকর-ই-তায়েবা (কাশ্মিরে ইসলামি সংগ্রাম প্রবণতা লশকর-ই-তায়েবার ঘটনা), ২০০৩

আঁদ্রে সিঙ্গার, লর্ডস অভ দ্য খাইবার (খাইবারের শাসনকর্তাগণ), ১৯৮৪

এরিখ স্টোক্স, দ্য পিজ্যান্ট আর্মড দ্য ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট অভ এইটিন ফিফটি সেভেন (সশস্ত্র কৃষক : ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিপ্লব), ১৯৮৬

পার্সি এম. সাইক্স, এ হিস্ট্রি অভ আফগানিস্তান (আফগানিস্তানের একটি ইতিহাস), ১৯৪০

মুররে টিটমাস, ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড পাকিস্তান (ভারত ও পাকিস্তানে ইসলাম), ১৯৬০

ভেরিয়াস, 'প্রাইমার এ গাইড টু রিলিজিয়াস এ্যাণ্ড এক্সট্রিমিস্ট গ্রুপস ইন পাকিস্তান (প্রার্থনা পুস্তক ধর্মীয় ও চরমপন্থীদের পাকিস্তানে একটি পথ-নির্দেশ), ইন দ্য ভার্চুয়্যাল ইনফরমেশন সেন্টার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

রহিমুল্লাহ্ ইউসুফজাই, র‍্যাথ অভ গড ওসামা বিন লাদেন ল্যাশেস আউট এগেইনস্ট দ্য ওয়েস্ট (আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ ওসামা বিন লাদেন পশ্চিমাদেরকে প্রবলভাবে আঘাত হানে), ইন টাইম ম্যাগজিন, ১১ জানুয়ারি ১৯৯৯

মুহাম্মদ কাসিম জামান, 'মর্ডানিটি এ্যাণ্ড রিলিজিয়াস চেঞ্জ ইন সাউথ এশিয়ান ইসলাম' ('দক্ষিণ এশীয় ইসলামে আধুনিকতা ও ধর্মীয় পরিবর্তন), ইন জার্নাল অভ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, সিরিজ ৩, খণ্ড ১৪, অংশ-৩ ২০০৪

জেনারেল এ্যাণ্ড রেফারেন্স : প্রাইমারি এ্যাণ্ড সেকেণ্ডারি সোর্সেস (সাধারণ এবং নির্দেশ : প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী উৎসসমূহ), (১৯৪৭-উত্তর)

হামিদ আলগার, এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ইসলাম (ইসলামের সূচনা), ২০০০

জ্যাসন বার্ক, 'মেকিং অভ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান' (বিশ্বের সর্বাধিক ঈপ্সিত ব্যক্তির গঠন)

ইন দ্য অবজারভার ফোকাস স্পেশ্যাল, ২৮ অক্টোবর ২০০১

—আল-কায়েদা কাস্টিং এ শ্যাডো অভ টেরর (সন্ত্রাসের একটি প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ), ২০০৩

ক্যালেব কার, দ্য লেসন্স অভ টেরর, এ হিস্ট্রি অভ ওয়ারফেয়ার এগেইনস্ট সিভিলিয়ান্স (সন্ত্রাসের পাঠ : বেসামরিক জনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস), ২০০২

পিটার ক্লার্ক, দ্য ওয়ার্ল্ডস রিলিজিওন্স ইসলাম (বিশ্বের ধর্মসমূহ ইসলাম), ১৯৯৮

জন কে. কুলে, আনহোলি ওয়ারস আগফানিস্তান, আমেরিকা এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশন্যাল টেরোরিজম (আশুভ সমরসমূহ আফগানিস্তান, আমেরিকা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ), সেকণ্ড এড. (দ্বিতীয় সংস্করণ), ২০০০

এম. এস. ডোরান, 'গডস এ্যাণ্ড মনস্টারর্স (দেবতাগণ এবং দানবরা'), ইন হাউ দিস হ্যাপেন? টেরোরিজম এ্যাণ্ড দ্য নিউওয়ার (এটি কিভাবে ঘটে? সন্ত্রাসবাদ এবং নতুন যুদ্ধে), ২০০১

জন এল. এসপোসিতো, ইসলামিক রিভাইভ্যালিজম (ইসলামি পুনর্জাগরণ), ২০০২

—দ্য ইসলামি থ্রেট মিথ আর রিয়্যালিটি? (ইসলামি হুমকি মিথ অথবা বাস্তবতা?), ১৯৯৯

—আনহোলি ওয়ার টেরর ইন দ্য নেম অভ ইসলাম (অশুভ যুদ্ধ ইসলামের নামে সন্ত্রাস), ২০০২

—এড., অক্সফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অভ দ্য মডার্ন ইসলামি ওয়ার্ল্ড (সংস্করণ, আধুনিক ইসলামি বিশ্বের বিশ্বকোষ), ১৯৯৫

রিউভেন ফায়ারস্টোন, জিহাদ : দ্য ওরিজিন অভ হলি ওয়ার ইন ইসলাম (জিহাদ : ইসলামে ধর্মযুদ্ধের উৎস), ১৯৯৯

টেরি গ্যামবিল, 'আবু মুসাব আল-জারকায়ি এ বায়োগ্র্যাফিক্যাল স্কেচ' (একটি জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ), ইন দ্য জেমস টাউন ফাউণ্ডেশন

এইচ. এ.আর গিব এ্যাণ্ড জে.এইচ. ক্র্যামার্স, শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অভ ইসলাম (ইসলাম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ), ১৯৫৩

জি.এফ. হাড্ডাড, 'আহমদ ইবনে তায়মিয়া এ ব্রিফ সার্ভে (আহমদ ইবনে তায়মিয়া একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ), ইন লিভিং ইসলাম (প্রচলিত ইসলামে), এইচটিটিপি ডব্লিউ. ডব্লিউ. ডব্লিউ. লিভিং ইসলাম. অর্গ, ২০০২

ইয়োভন হাড্ডাড, 'মুহাম্মদ আব্দুঃ পায়োনিয়ার অভ ইসলামিক রিফর্ম, (মুহাম্মদ আব্দুঃ ইসলামি পুনর্গঠনের পৃষ্ঠপোষক), ইন আলী রেহনেমা, এড. পায়োনিয়ারস অভ ইসলামি রিভাইভ্যাল, ১৯৯৪

টি.পি. হিউজেস, ডিকশনারী অভ ইসলাম (ইসলামের অভিধান), ১৮৯৫

গাইলস কেপেল, জিহাদ দ্য ট্রেল অভ পলিটিক্যাল ইসলাম (রাজনৈতিক ইসলামের নির্যাতন), ২০০২

বার্নার্ড লিউইস, হোয়াট ওয়েন্ট রং? দ্য ক্লাশ বিটুইন ইসলাম এ্যাণ্ড মডার্নিটি ইন দ্য মিডিল ইস্ট (কী অন্যায় হলো? মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে সংঘর্ষ), ২০০২

এমইএমএএমআর আই 'আল-হায়াত ইনকোয়ারি দ্য সিটি অভ আল-জারকা ইন ব্রিডিং গ্রাউণ্ড অভ জর্দানস সালাফি জিহাদ মুভমেন্ট (আল-হায়াত অনুসন্ধান জর্দানের সালাফি জিহাদ আন্দোলনের সূত্রপাতের কারণ), ডেসপ্যাচ, ১৭ জানুয়ারি ২০০৫

রুডলফ পিটারস, জিহাদ ইন ক্ল্যাসিক্যাল এ্যাণ্ড মডার্ন ইসলাম (ধ্রুপদী ও আধুনিক ইসলামে জিহাদ), ১৯৯৬

অলিভার রয়, গ্লোবাল ইসলাম দ্য মার্চ ফর এ নিউ উম্মাহ্, (বৈশ্বিক ইসলাম : ইসলামের নতুন বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য অনুসন্ধান), ২০০৪

রাজ গ্রুথি, এনসাইক্লোপিডিয়া অভ জিহাদ (জিহাদের বিশ্বকোষ), খণ্ড ২য় এবং চতুর্থ, ২০০২

সমির রাফাত, 'আয়মান আল-জওয়াহরি ওয়ার্ল্ডস সেকন্ড মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান' (আয়মান আল-জওয়াহরি পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বাধিক ঈপ্সিত লোক'), ইন ফিচার আর্টিকল, এইচ//টিটিপি//ইজিওয়াই. কম /পিপুল

ম্যালিস রুথভেন, ইসলাম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড (বিশ্বে ইসলাম), ১৯৯৮

—ফাণ্ডামেন্টালিজম দ্য সার্চ ফর মিনিং (মৌলবাদ অর্থানুসন্ধান), ২০০১

—এ ফিউরি ফর গড দ্য ইসলামিস্ট অ্যাটাক অন আমেরিকা, রিভাইজড এডিশন (আল্লাহ্র জন্য উগ্র আবেগ আমেরিকায় ইসলামবাদীদের আক্রমণ, সংশোধিত সংস্কারণ), ২০০৪

এডওয়ার্ড সাইদ, ওরিয়ন্ট্যালিজম (প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য), ১৯৭৮

জন ও. ভল, 'মুহাম্মদ হায়াত আল-সিন্ধি এ্যাণ্ড মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়াহ্হাব এ্যান অ্যানালাইসিস অভ এ্যান ইনটেলেকচুয়্যাল ইন এইটিনথ সেঞ্চুরি মদিনা' (মদিনার অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি বুদ্ধিজীবী মহলের একটি বিশ্লেষণ), ইন বুলেটিন অভ দ্য স্কুল ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, খণ্ড ৩৮, নং-১, ১৯৭৫

—'ফাউণ্ডেশন্স ফর রিনিউয়্যাল এ্যাণ্ড রিফর্ম ইসলামিক মুভমেন্টস ইন দ্য এইটিনথ এ্যাণ্ড নাইনটিনথ সেঞ্চুরীরিজ' (নুতনত্ব সম্পাদন ও পুনর্গঠনের জন্য ভিত্তিসমূহ : অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইসলামি আন্দোলন), ইন দ্য অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অভ ইসলাম, (ইসলামের অক্সফোর্ড ইতিহাসে), ১৯৯৯

বেঞ্জামিন ওয়াকার, ফাউন্ডেশন্স অভ ইসলাম : দ্য মেকিং অভ এ ওয়ার্ল্ড ফেইথ (ইসলামের ভিত্তিসমূহ : একটি বিশ্ব ধর্মের বিনির্মাণ), ১৯৯৮

নির্ঘণ্ট

১১ সেপ্টেম্বর ২০১, ৪২, ৩০২
আল আস-সেখ (শেখেদের পরিবার) ৭৯, ২৫৩, ২৫৬, ২৭২, ২৮২, ২৮৯-৯১,
আল-শেখ, শেখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম ২৮৯,
অ্যাবোট, জেমস, ৩৩-৩৫
আব্দালি, আহমদ শাহ্, ৫০
আব্দুল আজিজ, শাহ, ৪৯-৫০, ৫৩, ৫৪, ৮৬, ৮৮, ৯২, ৯৫, ১১৬, ১৫৪, ২১৯,
আব্দুল হামিদ, সুলতান, ২২৬, ২২৮,
আব্দুল হক, ২৮০,
আব্দুল হক, মাওলানা, ২৮৯,
আব্দুল রহমান, ৭৯,
আব্দুল্লাহ (পাঠান গুপ্তঘাতক) ২০৯, ২১১,
আব্দুল্লাহ আলী, আমির, ১৮০, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৬, ২০৭-৮, ২২৯, ২৩১,
মৃত্যু, ২৭৮,
বংশধরেরা, ২৮৯,
আব্দুল্লাহ, খলিফা, ২২৭,
আব্দুল্লাহ্, শাহ্জাদা, ২৬৮, ২৭৩,
আব্দুর রহমান, আমির, ২২৫-২৮, ২৩০, ২৩৬, ২৫৭,
আদ দেয়া লিল তৌহিদ (ঐক্যের জন্য আহ্বান), ৬৭-৮, ৭১,
আদ-দজ্জাল, ৮০,
অ্যাডেন, ২২৮,
অ্যাডি, কর্ণেল জন, ৩২, ১৮০-৮১, ১৮৭,
আফগান উপনিবেশ, ২৮,
আফগানিস্তান, ৫০, ৯৬, ১০৪, ১১৩, ২০৯, ২৮০, ২৯৬,
রুশ (সোভিয়েত), সম্পৃক্ততা, ২৪, ২৭, ১০৯, ২২৪, ২৮৬-৮৮, ২৯০-৯১, ২৯৩, ২৯৬-৯৮, ৩০৫,
মুজাহিদীন, ২৪, ২৮৬-৮৭, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৭-৮,
সীমান্ত এলাকা, ৩১, ৯৪, ১৩৬, ১৯৩, ৩০৯,
ব্রিটিশ আক্রমণ, ১১৭, ২২৪,
আফগান যুদ্ধ, ১২১, ১৫২,
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, ২২৫, ২৪৯,
জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল, ২৫৭,
প্রতিরোধের অবসান হয়েছিল, ২৮৩,
তৃতীয় আফগান যুদ্ধ, ২৮৩,
উলেমা, ২৮৬,
জিহাদের স্থান, ২৮৬-৮৮, ২৯১-৯২, ২৯৪, ২৯৭,
ওয়াহ্হাবি সম্পৃক্ততা, ২৮৬,
মাদ্রাসাসমূহ, ২৯০,
তালিবানের উত্থান, ৩০২-০৩,
আফগানরা, ১৭৪,
মৌলবাদের অন্তর্ভিক্ত, ২৮৮,
আফ্রিদিরা, ১৯৬-৯৭, ২১০-১১,
আকাখেল, ২২৮, ২৪৫-৪৬, ২৪৯,
আগ্রা, ৯০,
আহল আল-কিতাব, ২৯,
আহল-হি-হাদিস, ২৮৫, ২৮৮,
আহমদ, মুহাম্মদ, ২২৭,
আহমদ, নিজামউদ্দিন, ৮৯,
আহমদুল্লাহ্, মৌলভি, ৪৫, ১১২, ১২৪, ১৩৬, ১৫১-২, ১৭১,

ওয়াহ্হাবি নেতা হন, ১৯৯,
গ্রেপ্তার এড়ান,
গ্রেপ্তার ও বিচার, ২০৪-০৮,
মৃত্যু, ২১২,
আহমদজাইরা, ২৮৬,
আকবর, সম্রাট, ৩০, ৫১,
আকবরি আলী, ১৪৯,
আকোরা খাট্টাক, ২৮৮,
আল মুজাহীদ (ধর্মযোদ্ধা/জিহাদি), ২৭৮,
আলেপ্পো, ৭০,
আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, ৯৬,
আলেকজান্ডার, মি, ১০৯,
আলজেরিয়া, ২৯৬, ২৯৯,
আলী ভাতৃবর্গ, ৩৩, ৪৫, ৪৮, ৫৮,
ইনায়েত আলী দেখুন; বেলায়েত আলী,
আলী মসজিদ, ২২৪, ২৪৫,
আলী পাশা, ২৫২,
আলী, খলিফা, ৩৮,
আলীগড়, ১১৬, ১৭৬, ২০০, ২০৬, ২২১, ২২৬,
আল-ইখোয়ান (ভ্রাতৃত্ব), ৪০, ২৫৮-৬০, ২৬৩, ২৬৮-৭০, ২৯০,
ওয়াহ্হাবিবাদের চরমপন্থা, ২৭২-৭৩,
এলাহাবাদ, ১৫০,
অ্যালেন, জর্জ, ২০৪, ২১০,
অ্যালেনবি, লর্ড, ২৬৯,
অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ, ২৭৭, ২৮৪,
আল মকদিসি, শেখ মুহাম্মদ, ২৯৬,
আল-মুখতার, হাসিয়্যা র‍্যাড,
আল-মুয়াহিদুন (একেশ্বরবাদীগণ), ৪০, ৬৭,
আল-কায়েদা, ৪১, ২৯৫, ২৯৮-৩০০, ৩০৬,
আল-কাহ্তনি, মুহাম্মদ, ২৯০,
আল-কায়িম আল, জোজিয়াহ্, ২৭১,
আল-সালাফ আল সালিহ্, ৭৮,
আল উতবি জুহাইমান, ২৯০,
আল-ওয়াহ্হাব, মুহাম্মদ ইবনে- আব্দ, ৬০, ৬৪-৭৯, ৮১, ৮৪, ২২৭, ২৭৭, ২৯৫,
এবং ইবনে সৌদ পরিবার, ৬৯, ২৬০, ২৬৬,
ইমাম হিসেবে পদত্যাগ, ৭৮, ৮৭, ৯১-২, ২১৭, ২৬০, ২৭২,
তাঁর শিক্ষায় ধারা বাহিকতা, ৭২, ৭৬-৭, ২০৬, ২৪৩, ২৫৬,
এর ইতিহাস, ১২১-২২,
দেওবন্দি দৃষ্টিভঙ্গির, ২১৯,
সংরক্ষন শীলতা হিসেবে ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপিত, ১৭০,
শিক্ষায় তালিবানকে স্থির করে, ৩০৪,
আল-ওয়াহ্হাব সুলাইমান ইবনে-আব্দ, ৬৮,
আল-জারকায়ি, আবু মুসাব, ৪১, ২৯৬,
আল-জওয়াহরি, আয়মান, ২৭, ৪১, ২৯৫-৩০০, ৩০৪-৬,
আমানুল্লাহ্ আলী, ২৭৮,
আমানুল্লাহ্, আমির, ২৮৩,
আমাজাইরা, ৩২, ১৯৪-৯৬, ২২৯,
আম্ব, খানের, ৪৬-৪৭, ১২৭, ১৮০,
আমবাল্লা, ৪৫, ১৮৩,
এবং ওয়াহ্হাবি বিচার, ১৯৯-২০২, ২০৩-০৪, ২০৭-৮,

আমবেলা অভিযান, ৩১-৩২, ১৮০-৯৫, ২০৭, ২২৪, ২২৯-৩০, ২৩৫, ৩০৮,
আমবেলা গিরিপথ, ১৮১, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৬,
ঈগলের বাসা, ১৮৮,
ক্র্যাগ পিকেট, ১৮৮-৯,
আমির খান, নবাব, ৫৪-৫৫, ৯৪, ৯৭,
আমির-উল-মোমিনীন, ২৬,
অমৃতসর, ১০৫,
ধ্বংস, ২৮৩,
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ১৯৭-৮, ২০৫, ২১০, ২১১,
আনিজা উপজাতি, ৬৯,
আনসার-ই-ইসলাম, ৩০৬,
অনুমোদনকারীগণ/রাজসাক্ষী, ২০০-১, ২০২, ২০৪,
আরব লীগ, ২৯৫,
আরব বিপ্লব, ২৬১-৬,
আরব, ৮৭-৯, ৯৪, ৯৮, ২৭৭, ২৯৬,
আল-ইখোয়ানের আবির্ভাব, ৪০,
সৈয়দ আহমদের অনুসারীরা পৌছায়, ৫৯,
মানচিত্র, ৬১,
আধ্যাত্মিক বিজয়, ৬৯,
এর মধ্যে বিভাজনসমূহ, ৭০,
আরব পরিচিতি অর্জন, ৭৯-৮২,
মুহাম্মদ ইসহাকের নির্বাসনের মাঝে, ১১৬, ১৫৪, ১৭২,
ওয়াহ্হাবিবাদের দ্বারা দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধৃত, ২৫৫,
মরুভূমি অতিক্রম, ২৫৭, ২৬৭,
সৌদি আরব হিসেবে সংযোগ/ সংযোজন, ২৫৬-৫৭,
ভারতীয়দের যোগাযোগ, ২৮৪,
এর মধ্যে ওয়াহ্হাবি প্রবীন ব্যক্তিবর্গ, ২৯৯,
আরবি, ৫০, ৫৬, ২১৮, ২৫২,
আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধ (১৯৭৩), ২৯০,
আরবরা, ৭৯,
'আরবগণ', ২২৫, ২৪৬, ২৯৫-৬, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৮,
আরাফাত, ইয়াসির, ২৯১,
আরামকো, ২৭৩,
আরজিলের, ডিউক, ২০৬,
প্রতিশোধের সেনাদল, ১১৮,
সিন্ধুনদের সেনাদল, ১১৭-১১৮,
আড়া, ১৩৫, ১৪৬-৭, ১৬৮,
আরতৈবা, ২৫৭,
আরতাইয়া, ২৫৮,
আসর সহসর (শেষ দিবসের সংকেত), ১১৪,
আতাতুর্ক, কামাল, ২৬৮,
অ্যাটক, ৩৪, ৩৬,
ঔরঙ্গজেব, সম্রাট, ৫০, ৫২-৫৩, ৫৭,
অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, ২৬২,
অস্ট্রিয়ারা, ৫২,
আজিমগড়, ১৫০,
আজম, ইব্রাহিম, ২৯৮,
আজম, শেখ আব্দুল্লাহ, ২৯১-৩, ২৯৫-৮,
বাবরাহই মোল্লা, ২৭৯,
বড়াকশন, ১০৪,
বাদশাহ, সাহিব মিঞাগুল, আব্দুল ওয়াদুদ, ১২৬,

বাদশাহ্ শাহ্আলম, সম্রাট, ৫৩,
বাগদাদ, ৬০, ৭৯, ৮২,
বাহাদুর, খান, ২৮০,
বাহাদুর শাহ্, সম্রাট, ১২৫, ১৩৬, ১৪৫, ১৫৫, ১৭৩, ২০৮,
বাহরাইন, ২৫৪,
বায়াত আল-ইমাম, ২৯৭,
বায়াত, ৫৫,
বাজোর, ১০৪,
বাজোরীরা, ১৯০,
বখত খান, সুবেদার মুহাম্মদ, ১৫৫,
বালাকোট, যুদ্ধের, ১০৩-৫, ১১১, ১১৬, ১৫৩,
বেলুচিস্তান, ৯৬, ২৮৭,
বামিয়ান, ২২৫,
বাংলাদেশ, ৫১,
বান্নু, ৩৯,
বরাকত (পলগ্রেভের সঙ্গী), ২৫২-৩,
বদরের যুদ্ধ, ৬৩,
বেরিলি, ১৫৫, ১৫৯,
ব্যারাকপুর, ১৩৪-৫,
বশির আহমদ খান, ৩১, ৩৩,
বসরা, ৬৫, ২৫২,
বাতালভি, মৌলভি মুহাম্মদ হুসেইন, ২১৭,
বঙ্গোপসাগর, ১৯৭-৮,
বাজার, ২২৮,
বেচার, মেজর, ১৫৯-৬০,
বেদূঈন, ৩৬, ৬৫, ৭০-৭২, ৮২, [illegible], ২৫৭, ২৬২,
বেলজিয়াম, ৩৯,
বেল, গার্ট্রুড, ২৭৩,
বিলিউ, ডঃ হেনরি, ২৯-৩০, ৯৭, ৯৯, ১৯২, ২২৪, ২৮৭,
মোল্লাদের বিবরণ, ৩৮-৯৯, ২৮৭,
বেনারস, ৮৬, ৮৯, ১৩০, ১৫০, ১৬৩, ২১৬,
বাংলা, ৮৬, ১২১, ১২৪,
ব্রিটিশ শাসনের সূচনা, প্রারম্ভ, ৫৩, ১২৯,
মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারী (ধর্ম প্রচারক) গণ ৫৬; তিতুমীরের বিপ্লব, ১০৭-৮, ১১০, ১১৫,
তাঁতীরা ওয়াহ্হাবিদের সঙ্গে যোগ দেয়, ১১৯,
প্রদেশ হয়, ১৩২,
সিপাহী বিপ্লবের সময়, ১৩৫, ১৬৭,
ওয়াহ্হাবি কর্মজাল (নেট ওয়ার্কস), ২০৭, ২১৩,
বাংলার সরকারি (বেসামরিক) চাকরি, ২৩১-২,
বাংলার স্বদেশী পদাতিক বাহিনী, ৪৬,
এবং সিপাহী বিপ্লব, ১৩১, ১৩৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৬০, ১৬৩-৪,
বিদ্রোহ-প্রবণ ৫৫তম বাহিনী, ১৫৬-৭,১৫৯-৬০, ১৭৯, ১৮৫,
বেনি তেমিন উপজাতি, ৬৫ বেরার, ২১৩,
ভারতপুর, ৯০, ৯৩,
ভোপাল, ২১৭,
বিহার, ১২২, ১২৯, ১৩৩, ১৬৬, ১৬৯, ২১৬,
ওয়াহ্হাবি কর্মজাল (নেটওয়ার্কস), ২০৭,
বিন বাজ, আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ্, ২৮৯-৯৩,

বিন হানবল, আহমদ, ৬৩,

বিন লাদেন, মুহাম্মদ; ২৯৩,

বিন লাদেন, ওসামা, ২৭, ১৮, ২২৪, ২৪৬, ২৯২-৪, ২৯৬-৯, ৩০১, ৩০৯,

ওয়াহ্হাবিবাদ, ৪১, ২৯৩-৪, ৩০৫-৭,

ওয়াহ্হাবিবাদ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, ৩০০,

তালিবানের সঙ্গে আঁতাত, ৩০৪-৫

নেতৃত্ব অর্জন করেন, ৩০৬-৭,

ইসলামের ব্যাখ্যা, ৩০৬,

বিন রহমতুল্লাহ্, মিসকিন, ৮৫,

বিন্নরি, মৌলভি মোহাম্মদ ইউসুফ, ২৮৯,

কৃষ্ণ পর্বতমালা, ২২৯,

ব্লাভতস্কি, মাদাম, ২২৩,

ব্লাড, জেনারেল (সেনাপতি) বিণ্ডন, ২৩৫-৬,

বোখারা, ৫২, ২৩১,

র আমির, ৯৫,

বোলান গিরি পথ, ৯৬,

বোম্বে, ৮২, ৮৮-৯০, ১১৫, ১৬,

বয়েল (প্রকৌশলী), ১৬৪,

ব্রিটিশ, ৮১, ৮৭, ১২৬, ২১১, ২৩০,

সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থা, ৯০, ৯৩-৯৫, ২১৫,

নীল চাষীরা, ১০৯,

আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ, ১১৭-৮, ২৩৩,

বিরুদ্ধে জিহাদ, ১২৭-৮, ১৩৬, ১৫৪-৬, ১৫৮, ১৭৩, ১৯৯-২০০, ২০১-৩, ২৬২, ২৭৬, ২৭৮,

রাজ্যের ব্যাপ্তি, ১২৮-৯,

মুসলিমদের মতামত, ১১২-৪,

দরবেশদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতা, ২২৭,

হতাহত, ১৩৬, ২৪৯-৫০,

সাহস, ২৪৭,

এবং ইবনে সৌদ, ২৬০-৬১, ২৬৬, ২৬৮-৭১,

বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম, ২৭৭-৮,

মিসরে, ২৯৫,

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ৩৭, ২২৮,

ব্রিটিশ ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি, ২৭৩,

বৌদ্ধরা, ৩২, ৮৫,

বুনার, ৩২, ৫৪, ১৫৭, ১৯০,

উপজাতিসমূহ, ২৮, ৩০-১,

স্থান বিবরণ, ৯৭,

সৈয়দ আহমদ মধ্যে আশ্রয় নেন, ৯৪, ১০৩, ১১৩, ১১৮,

সোয়াতের আখুন্দদের প্রভাব, ১২৬, ১৮৬-৮৮, ২২৪,

'পাগলা ফকিরের আবির্ভাব, ২৩০-১, ২৩৬,

মানচিত্র, ২৩২,

ধর্মান্ধরা বহিস্কৃত, ২৭৮,

বুনারীরা, ১২৬, ১৮১-২, ১৮৪, ১৮৫-৬, ১৯১-৬,

বার্ড হার্ডট, জে.এইচ, ৭০-৭২, ৭৭, ৭৯,

বার্ডেন, লেফটেন্যান্ট, ৮৪,

বর্ধমান, ১৩৩,

বুরজান, হাজি মোল্লা, ২৬,

বার্ক, এডমাণ্ড, ২৪৫,

বার্ক, জ্যাসন, ২৯৯, ৩০৪-৫,

[illegible]র্মা, [illegible]৬,

[illegible]রেন্দো, [illegible]০,

বার্টন, স্যার রিচার্ড, ৩৬, ২৫৪,

বুশায়ার, ৮২, ৮৪,

বুচার, ফ্লোরা, ৩৯,

বক্সার, ১৬৭,

কায়রো, ৮৪, ২৬২, ২৬৩, ২৮১, ২৯৫,

আল-আকসা মসজিদ, ২২১, ২৭০,২৯৫,

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯১,

কলকাতা, ৪৬, ৫৯, ৮৭, ৯০, ১০৭-৯, ১২০, ১৩০, ২০১,

সিপাহী বিদ্রোহের সময়, ১৩৪-৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৬৩-৪, ১৬৮-৯,

বিচারক নরম্যানের হত্যা, ২০৯-১০,

সুন্নি সমাবর্তন, ২১৫,

ক্যানিং, লর্ড, ১৩৪, ১৩৫, ১৬৯, ১৭২, ১৭৯-৮০,

কারন্যাক, চার্লস, ৪৫-৬,

কারন্যাটিক, ৫৩,

কারো, স্যার ওল্যাফ, ৩৬,

কানপুর, ১৬০,

সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি, ৭২,২৬৯, ২৯৫,

সিংহল, ২৬৪,

চকদাড়া, ২৩৩-৪,

চমরকন্দ, ২৭৮,

চেম্বারলিন, ব্রিগেডিয়ার (পরবর্তীতে,মেজর জেনারেল) নেভিল, ৩৬, ১৮৩-৯০, ২০০, ২২৪-৫,

চামলা উপত্যকা, ১৭৯, ১৮০, ১৮৪-৫, ১৮৮, ১৯৪-৫, ২৩৫,

চামলাবাসীরা, ৩২, ১৮১-২, ১৮৪, ১৮৫,

চেচনিয়া, ২৯৬, ২৯৯, ৩০৪,

চীন, ২৬, ২৮৬,

চিত্রল, ১০৪,

খ্রিস্টানারা, ৪২-৩, ৭৯, ১৭৪, ২৫১, ২৫৩, ৩০৪,

নাজারিনরা, ৩৪, ৯৩, ১১৪, ১২৮-২৯, ১৫৪, ১৫৬, ১৬১

ধর্মপ্রচারকগণ, ৫৬, ২১৯,

শত্রুতার দিকে, ৫৮,২৮৯,

বাইজানটাইন খ্রিস্টান রাজ্য, ৬৩,

মৌলবাদীরা, ৭৫

খ্রিস্টীয় ধর্ম / ইসলাম ধর্ম, ১২০, ৩০৬,

ক্ষীয়মাণ ক্ষমতা, ২২৭-৮,

ছাপড়াহ্, ১৪৬

চার্চিল, উইন্সটন, ৩৮, ২২৮, ২৩০, ২৩৫-৬,

সিআইএ, ৩০৪,

বেসামরিক ও সামরিক গেজেট, ২৪৫, ২৪৭-৮,

কন্সটান্টিনোপল, ৮৪, ৮৮, ২৩১,

কটন, মেজর-জেনারেল স্যার সিডনি, ৪৪, ১৭৭-৯, ১৮৪-৫, ১৮৬,

কক্স, স্যার পার্সি, ২৬৫,

কার্জন, লর্ড, ২৬৭,

দজেস্তান, ৩০৫,

দ্যাগার, ১৯৫,

দৈনিক টেলিগ্রাফ, ২৩৫,

ডাক, ১২৩, ১৩০

ডালহৌসি, লর্ড, ৪৩, ৪৫-৬, ১২৭, ১৩২-৩,

দামেস্ক, ৬০, [illegible] ৭৯, ২২১, ২৫১-২, ২৬৫, ২৯১,

দার উল-ইসলাম, ৪১, ৫৭, ৮৭-৮,
মদিনায়, ৬৯, ৯৪,
মহাবন পর্বতে, ৯৭, ১২৭,
নারকলবাড়িয়া, ১০৮,
দিল্লিতে, ১৫৫, ১৭৩, ২৩১,
থানা ভবনে, ১৭৪, ২১৮,
এবং ব্রিটিশ শাসন, ২১৪-৫,
সোয়াতে, ২৩৩,
আফগানিস্তানে, ২৮৩,
সুদানে, ৩০৪,
হেরাতের বহির্দিকে, ৩০৪,
দার উল-উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা, ২২১, ২৭৬-৮, ২৭৯, ২৮১-৩, ২৮৮-৯, ৩০১-২, ৩০৭,
দরান গিরিপথ, ১৮৪,
দরগাই হাইটস, যুদ্ধের, ২৪৭-৫০,
দরিয়াহ্, ৬৯, ৮৩-৮৪,
ডি কোরানসেজ, লুইস আলেকজাণ্ডার অলিভার, ৭০-৭১, ৭৬, ৭৭, ৮১,
ডীন, মেজর হ্যারল্ড, ২৩৩-৫,
দাক্ষিণাত্য, ১১৮,
দীন মুহাম্মদ, ১০৮, ১১০,
দিল্লি, ৪৯-৫১, ৬৬-৭, ৯১, ১২৫, ১২৮, ২৭৮, ২৮৩,
মাদ্রাসা-ই-রহিমিয়া, ৪৯, ৫১, ৫২-৪, ৯২, ১১৬, ১৫৪, ২১৬-৭,
আকবর আবাদি মসজিদ, ৫৪,
লাল দূর্গ, ৫৪, ১২৫, ২৭৫,
ষোড়শ শতাব্দীর সুলতানগণ, [illegible]
'দিল্লি-বাসীরা', ৯৩, [illegible] ১৫৫, ১৭২, ১১৬-৭, ২৮৫,
জাম্মা মসজিদ, ৯৩, ১৫৪, ১৭৬-৭,
সুন্নি মোল্লারা, ১১৬,
দিল্লি কলেজ, ১১৬, ২১৮
ব্রিটিশ আবাসিক এলাকা, ১২৫,
সিপাহী বিপ্লবের সময়, ১৩৬-৭, ১৫০, ১৫৩-৫৫, ১৫৯-৬১, ১৭০, ১৭২-৫, ১৮৪,
স্বাক্ষরিত ফতোয়া, ১৫৪, ১৫৫, ১৭৩,
দার উল-ইসলাম, ১৫৩-৪, ১৭৪, ২৩১,
এবং ওয়াহ্হাবি বিচার, ১৯৮, ১৯৯-২০০, ২০৩, ২০৮-৯, ২৮৫,
সুন্নি সমাবর্তন, ২১৫-৬,
সিংহাসনের উত্তরাধিকারি, ২৩১,
দিল্লি দরবার, ২৫১-২,
দিল্লি মেইল, ২০৫,
দিল্লি প্রাচীর, ১৭৩, ২৪৯, ২৭৫
দেওবন্দ আন্দোলন, ২১৮-২৩, ২২৬, ২৭৬-৭, ২৭৯-৮৫, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৬-৭, ৩০১-২, ৩০৭,
দার উল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাও দেখুন
দেওবন্দি, মোল্লা মাহমুদ, ২১৮,
ধের, ১৯২,
দিনাপুর, ১৩১, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৭-৪৯, ১৬০, ১৬৪-৫, ১৬৭-৮, ১৭১,
দির, ২৩৩, ২৭৮, ২৮৯,
দগার, ২৩৪,
ডটি, চার্লস, ৩৬. ২৫৬,
ডুর্‌র্যাণ্ডলাইন (আফগান-পাকিস্তান সীমান্ত), ৩১, ২২৩,
ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ৮৬,
পূর্ব আফ্রিকা, ৩০৬,

পূর্ব বাংলা,৫১,
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ২৮, ৮১-২, ৮৬, ৯৫, ১১০, ১৩১,
ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করে, ৫৩, ৮৭, ৯০, ৯৫, ১২০, ১২৯,
দিল্লি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, ১১৬,
আফগানিস্তান আক্রমণ করে, ১১৭-৮,
অযোধ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, ১৩৩,
শাসন সমাপ্ত হয়, ১৭৯,
এডওয়ার্ডস, স্যার হার্বার্ট, ৩৬-৮, ১২০, ১৫৭, ১৭৭-৭৮, ১৮০, ১৮৩-৪, ২২৭,
মোল্লাদের বিবরণ, ৩৭-৮, ২৮৮,
ওয়াহ্‌হাবিদেরকে বিচারে আনেন, ২০০, ২০-৪
এডওয়ার্ডস মি., ১৭৪
মিসর, ২২৭, ২৫২, ২৬৮, ২৭৪, ২৮৬, ২৯১, ২৯৫,
প্রধান মুফতি, ২৭০, ২৯৫,
সংগ্রামের জন্য পরিকল্পনা, ২৯৮,
মধ্যে আল-কায়েদা হামলা, ৩০০,
মিসরীয়রা, ৮২-৩, ৮৭, ২৬০, ২৯৭,
এলাহি বকশ, ২০৪-৫,
এলাহি বক্স, ৫৮, ৯০, ১৫২, ২০০-১,
তাঁর পুত্ররা, ৯৫, ১১১, ১২২, ১২৪, ১৩৬, ১৫৯,
এলজিন, লর্ড, ১৭৯, ১৮১,
এলিওট-লকহার্ট, লেফটেন্যান্ট পি.সি, ২৪৩,
এলফিনস্টোন, মাউন্টস্টুয়ার্ট, ২৯-৩০,
এলসমি, জজ, ৩০
ইংরেজি ভাষা, ২১২-[illegible], [illegible]
আয়ার, মেজর ভিনসেন্ট, ১৬৭-৭০,
ফয়সাল, বাদশাহ্, ২৯০,
ফয়েজ আলী, ২০৮,
ফারেয়েজি, ৮৭,
ফরহাত হুসেইন, ১১২, ১২৪,
ফরিদুন, ৯৬,
ফরকুহারসন, মি. জাস্টিস, ১৪৫-৬, ১৬৩, ১৬৯,
ফতেহ আলী, ৫৮, ৯০, ১১১,
ফাতিমা, ৫০, ৯৪,
সমাধিপ্রস্তরের পবিত্রতা নাশ করেফেলে, ২৬৯
ফতোয়াগুলো, ৪৫, ৫৬,
ওয়াহ্‌হাবিদের বিরুদ্ধে, ১১৫-৬, ২১৭,
দিল্লি, ১৫৪, ১৫৫, ১৭৪,
ব্রিটিশ শাসনে, ২১৫-৬,
দেওবন্দি, ২১৯,
মহিলা গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে, ২৮৯,
মুসলিম দেশের প্রতিরক্ষা, ২৯১,২;
বিন লাদেনের বিষয়সমূহ, ৩০৪-৫
ফজল-উর-রহমান, মাওলা না, ৩০১,
ফেদায়ীন, ২৭৬-৭,
ফয়সাল, শাহ্‌জাদা, ২৫২-৩, ২৫৬-৭, ২৬৫-৬, ২৬৮, ২৯৩
ফিরোজপুর, ১২১
ফিনাতি, গিওভান্নি, ৮৩,
ফাইগুলেটার, পাইপার,২৪৮,
আগ্নেয়াস্ত্র, ৭৬, ১৮৫,
ফিরোজশাহ্‌, শাহ্‌জাদা, ২০৮, ২৩১স, ২৩৪;
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ২৬২, ২৭৮, ২৮২১,

জমরুদ দূর্গ, ২৪৫,

প্রাগ্রসর নীতি ২৯

ফাউণ্ডিং কমিটি অভ দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ (মুসলিম বিশ্ব লীগের প্রতিষ্ঠাতা কমিটি), ২৮৯,

ফ্রান্স, ২৬২, ২৬৮,

ফ্রেসার-টায়াটলার, স্যার কার, ২২৪,

ফরাসি, ৫২;

গাদ্দাফি, কর্ণেল, ৩০১;

গাদুনরা, ৩২;

গঙ্গা নদী, ৩৩, ৫৮, ১৩০, ১৬০, ১৬৬, ১৭১;

গাঙ্গোহি, রশিদ আহমদ, ১৭৩, ১৭৫, ২১৮, ২১৯, ২৭৩;

গার্ডনার, কর্ণেল আলেকজান্ডার, ১০৩-৪;

গ্যারেট, মি, ১৪৬;

গার্ভক, জেনারেল, ১৯৩;

গয়া, ১৬৭-৮;

পঞ্চম জর্জ, রাজা-সম্রাট, ২৭৫;

জার্মানি, ২২৮, ২৬২

গাফুর, আব্দুল, সোয়াতের আখুন্দ ৯৯-১০০,১২৬-৭,১৫৭, ২২৯;

আমবেলা অভিযানে ভূমিকা, ১৮১-২, ১৭৮-৮,১৮৯, ১৯২-৩;

র ব্রিটিশ উপলব্ধি, ২২৩-৪;

মৃত্যু, ২৪;

বিবদমান উত্তরাধিকারীগণ, ২৩০-১;

গালিব বে, ১৭৮-৯;

গনি খান, ২৩;

গাজন খান, দফাদার, ১৮২-৩, ১৯২, ১৯৮-৯;

গাজিরা, ১৫৫-৬, ১৭৮, ১৯৪;

গাজনি, ১১৮;

ঘিলজাইরা, ৩০১;

গোলাম মাসুম, ১০৯-১০;

গোলাম রসুল (হাজি আব্দুল হক), ৮৬-৭;

গিলগিট, ১০৪;

গিল, হোপ, ২৭২;

গোলকোণ্ডা, ১১৭;

গোড়, ২৪;

গর্ডন পার্বত্যবাসীরা, ২৪৬, ২৪৮-৯;

গর্ডন, জেনারেল, ২২৭;

গ্রীস, ২২৮;

উপসাগরীয় যুদ্ধ, ২৮৯;

গুর্খারা, ২৭৯, ১৯৩, ২৪৭-৫০;

গুরু পার্বত্যাঞ্চল, ১৮৮, ১৯১;

গোয়ালিয়র, ৯৫;

হাবিবুল্লাহ্, আমির, ২৮০, ২৯৩;

হাড্ডা, ৩০৪;

এর মোল্লা, ২২৮, ২৩৬-৭;

হাদিস, ৫০, ৬৩; ৮৪, ১১৩, ২৬৮;

জিহাদে ঘোষণা, ৬৩;

নেজদ সম্পর্কিত গল্প, ৬৫;

এবং শরিয়া, ৬৫;

এর শিক্ষকবৃন্দ, ৬৬, ১৫৪, ১৭৩-২০৯; ১১৮, ২৮৯;

ওয়াহ্হাবীয় ব্যাখ্যা, ৬৭, ৭৪, ১১৪;

এবং পশ্চিমা জ্ঞানের প্রভাব, ২১২;

এবং প্রবর্তন, ২৭৯;

হেল, ২৫১, ১-২৫৬-৯, ২৬৩, ২৬৬,

২৯৮;
হজ্জ, ২৬৩, ২৬৮;
হাজি, ৩৭;
হ্যালিডে, ফ্রেডারিক জেমস, ২৩২-৩৪-১৪৬, ১৪৮-৫০, ১৫৩-৪, ২০১-২০৫-৬;
হামাস, ২৯৫;
হরাকাত-ই-ইনকিলাব-ই-ইসলাম, ২৮৬;
হার্ব, ২৫৭;
হাসান, মুহাম্মদ, ২২৯;
হাশেমীয় বংশ, ২৬২, ২৬৭-৮, ২৯৭;
হেস্টিংস, ওয়ারেন, ২০৬;
হাজারা, ৩১-৪, ৪৫, ৪৯, ১০৩, ১২২, ১৫৯-৬০, ২০৮-৯;
হাজারা যুদ্ধক্ষেত্র, ২২৯;
হাজারারা, ২২৫;
হেদায়েত আলী, সুবেদার, ১২১-২, ১২৯, ১৩৪-৬, ১৪৯, ১৫২, ১৬১, ১৬৩;
হেকমতিয়ার, গুলবউদ্দিন, ২৮৬, ২৯৪, ৩০৩;
৭ম হেনরি, রাজা, ২৮;
৮ম হেনরি, রাজা, ৭৮;
হেরাট, ৩০২, ৩০৬;
হিজাজ, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৬-৭ ২০৯, ২৬০-১, ১৬৮-৯, ২৭৩-২৭৯, ২৮১;
হিজরা, ৯৪-৫, ১১৩, ১১৫, ১২১, ১৫৮, ২৭৮;
হিজরত আন্দোলন, ২৮৩; .
হিমালয়, ১৭৯,
হিন্দু, ৪২;
বর্ণপ্রথা, ৫১, ২;
ইসলামের সঙ্গে চুক্তি, ৫১;
হিন্দুরা, ৭৯, ৯৪-৫, ১০৮, ১২০, ২৩৬;
মহাবনে ৩২;
শত্রুতার দিকে, ৫২, ৫৮, ২১৯, ২৮৯;
মৌলবাদীরা, ৭৫;
জাভায়, ৮৫;
ব্রাহ্মনরা, ১০৮, ১২০;
এবং অযোধ্যার সংযুক্তি, ১৩৩;
এবং সিপাহী বিদ্রোহ, ১৪৮, ১৫৪-৫, ১৫৭, ১৬১;
ওয়াহ্হাবি অপহরণ করে, ১৮০;
কর নির্ধারকগণ, ২০০-১;
মহারাজারা, ২১৫;
৫ম জর্জ কে অভিবাদন, ২৭৫;
বৃহত্তর শাসন দ্বারা, ২৭৭;
হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধরা, ৪৫-৪৯, ১০৫, ১১৩, ১২৬-২৮, ১৫৮, ২৯৯;
সিত্তানায় প্রতিষ্ঠিত, ৩৩-৪;
ওয়াহ্হাবিদের সাথে সমীকরণ করে, ৪০, ২৯৫-৬;
সিপাহী বিদ্রোহে ভূমিকা, ২৫৬-৮, ১৭২;
ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঘোরে, ১৭৬-৮৭, ১৯৯-২০০;
অননুমত শান্তি সম্পর্কে আসে, ২০৭-৮;
এবং সীমান্ত সংঘাত, ২২৯-৩০, ২৩৩, ২৩৫;
স্বেচ্ছা সেবকবৃন্দ যোগ দেয়, ২৭৭-৮, ২৮০;
হিজব-ই-ইসলাম, [illegible]৮৬, ২৯৬-৫, ৩০২-[illegible];
হিটলার, [illegible] ৭৫;

হলকার, জসবন্ত রাও, ৫৪;
সমকামিতা, ২২০;
হোল্স্ট, লেফটেন্যান্ট, ২৫৮;
হটি মর্দান, ২৮, ২৯, ৯৯, ১৫৬-৭, ১৭৭, ১৮০, ১, ২০৭, ২৩৩;
হুজার, ২৫৮, ২৬০;
হামফ্রে, মি, ৮১;
হুন্দ, ৯৯-১০০;
হান্টার, স্যার উইলিয়াম, ৫৭, ১০১, ১২৪-৫, ১৯৮, ২১৩;
হুরায়মিলা, ৬৮;
হুসেইন, শেখ, ২৮১;
হায়দ্রাবাদ, ৫১, ৯৩, ১১৭, ১১৮-৯, ১৮০;
এর নিজাম, ২১৬-৭, ২৮৩;
ইবনে আল-আরাবি, ৬২;
ইবনে ইব্রাহিম, শেখ আবু তাহির মুহাম্মদ, ৬৬;
ইবনে রশিদ বংশ, ২৫২;
ইবনে রশিদ, আমির আব্দুল আজিজ, ২৫৭, ২৫৯;
ইবনে রশিদ, মুহাম্মদ, ২৫৬;
ইবনে সৌদ, ২৫৬-৭৯, ২৮৯, ২৯৫;
ইবনে সৌদ, আব্দ আল-আজিজ, ৬৯, ৭৬-৮০, ৮২, ৮৪-৫, ২২৫, ২৫৬, ২৬৬;
ইবনে সৌদ, আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল রহমান, ইবনে সৌদ দেখুন
ইবনে সৌদ, আব্দুল্লাহ্ ৮৩-৮৪, ৭৮, ২৫৩-৪, ২৫৬;
ইবনে সৌদ, আব্দু[illegible]
ইবনে সৌদ, মুহাম্মদ, ৭২, ৭৬, ৭৮, ২৫২;
ইবনে সৌদ, সৌদ, ৮২-৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৯৩;
ইবনে সৌদ, তুর্কি, ৮৭;
ইবনে সাইফ, আব্দ আল্লাহ্ ইবনে ইব্রাহিম, ৬৫;
ইবনে তায়মিয়া, শেখ, ৬০, ৬১-৪, ৭২, ৭৫;
যুদ্ধরত জিহাদের দর্শন, ৬৬, ৭৫, ২৯১;
সালফি মতবাদ, ২২১;
তাঁর শিক্ষার ধারাবাহিকতা, ২৭০, ২৭২, ২৭৭, ২৯১;
ইব্রাহিম পাশা, ৮৩;
ইখোয়ান-উল-মুসলিমীন (মুসলিম ভ্রাতৃত্ব), ২২৭;
ইলাহি, মৌলভি ফজল, ২৭৮, ২৮০;
ইলম ঘর, ২৩০;
ইলিয়াস, মাওলানা মুহাম্মদ, ২৮৪;
ইমাম আলী, ৫১, ৮৯;
ইমাম হুসেন, ৭৬, ৭৯;
ইমাম-মাহদি, ৮৯, ৯৪, ৯৯-১০০, ১০২, ১১৩-১৪
ইমদাদুল্লাহ্, হাজি, ১৭৩-৪, ১৭৫;
ইনায়েত আলী, মৌলভি, ১০৭, ১১১, ১৪২-১২৪-৬;
নেতৃত্ব অর্জন করে, ১২৭, ১২৮, ১৫৬-৮, ১৭৭;
মৃত্যু, ১৭৭-৮;
ভারত : দণ্ডবিধি, ৩১;
স্বাধীনতা, ১৮৪;
বিভাজন, বিভক্তি, ২৮৭;

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ২৭৭, ২৮২, ২৮৪;

ইন্দরেজ, ২২৮;

সিন্দু নদ, ২৮-৯, ৩১, ৩২, ৩৪, ৪৮-৯, ৯১, ৯৬-৭, ১০২-৩, ১১১- ১৫৭, ১৫৯, ১৮০, ১৮৯, ২০৭;

ইরান, ১৮৬, ২৯০, ২৯৩, ২৯৮, ৩০৬;

ইরাক, ৭৯, ৮২, ২৬২, ২৭০, ২৯৬, ২৯৯;

যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ, ২০৯, ৩০৫, ৩০৯;

ইসাজাইরা, ৩২;

ইসহাক, শাহ্‌মাহমুদ, ৯২-১১৬, ১৫৩-৪, ১৭২, ২১৬, ২১৮;

আইএসআই, ২৫, ২৮৬-৭, ২৯৪, ৩০২;

ইসলাম, ৪০, ৪১;

অটোমান (ওসমানি) সাম্রাজ্য, এবং, ৪২, ২৮৩;

পশ্চিমাদের থেকে হুমকি, ৪২;

সর্ব-ইসলামবাদ, ৪২, ২২৬-৭, ২৯৮;

মধ্যযুগীয় ও আধুনিক, ৫০;

সিন্ধুর নদের পূর্বে, ৫১;

সমস্ত নাগরিকের জন্য সমান অধিকারের মতবাদ, ৫১-২;

তৌহিদ (একত্ব), ৫২, ৫৬-৭, ৬৭-৮, ৯১-২, ২১৮, ২৬৯, ২৭৭, ২৯১;

পুনর্জাগরণ, ৫৩, ৫৬, ৬৬, ৮০, ৯০-১

বিদাত, ২৪২, ২১৯, ২২৬-৭, ২৭৭, ২৮৪-৫, ২৯৫;

বিদাত, ৫৬-৭, ৬২, ৬৭, ৯১;

বিবদমান, ৫৯-৬০, ৬৭, ৯২, ৯৫, ৯৯, ৩০৬;

এর শত্রুরা, ৬৪;

শান্তির ধর্ম হিসেবে, ৭৪-৫;

আত্মবলির মতবাদ, ৭৬;

এবং 'গুপ্ত ইমাম', ৮৯;

এর বিজয়, ১৪৪;

এর স্বর্ণযুগ, ১১৬, ২২৭;

এবং পশ্চিমা জ্ঞানের প্রভাব, ২১২;

ব্রিটিশ বিরোধী, ২১৮, ২২৭;

দেওবন্দ আন্দোলনের প্রভাব, ২১৯, ২২১-২২;

উদার, ২৬৬;

পশ্চিমা পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে, ২৮৪;

চতুর্দশ শততম বার্ষিকী, ২৯০;

এর চরম সংস্করণ, ২০৩, ২০৬-৭;

এর বিশ্ব সম্প্রদায়, ৩০৪-৫;

অনুগ্র, ৩০৯;

ইসলামাবাদ, ২৯২;

রাজপথ, ২৮৮;

ইসলামি জিহাদ, ২৯১, ২৯৫-৭, ২৯৮-৯৯;

ইসলামি মৌলবাদ, ৭৫, ২৯১, ৩০৬০৭;

ইসমাইল, শাহ মুহাম্মদ, ৫৫০৬, ৮৭০৮, ৯০-২, ১০৪-৫, ১৬৬, ১১৮;

ইসরায়েলিরা, ২৯১;

ইস্তানবুল, ৮২;

ইত্তিহাদ-ই-ইসলামি (ইসলামের ঐক্য), ২৮৬, ২৯৫, ২৯১;

জামিয়াহ্‌ দার উল-উলুম হাক্কানিয়া মাদ্রাসা, ২৮৮;

জাফর, মুহাম্মদ, ১৮২, ১৯৮-২০৪, ২০৫; ২১০-২১২;

জগদীশপুর, ১৩৩;

জাহিলিয়া, ২৯১;

জামাত আহল-ই-হাদিস [নবী (সাঃ)র ঐতিহ্যের দল], ২৬১-১৭

জামাত-ই-ইসলামি (জেআই), ২২৭, ২৮৪-৮;

জেমস, লায়োনেল, ২২৩;

জেমস, মেজর হিউজ, ১৮৪, ১৯২-৩, ১৯৬;

জামিয়াত-ই-উলেমা-ই-হিন্দ (জেইউএইচ), ১৮২;

জামিয়াত-ই-উলেমা-ইসলাম (জেইউআই), ২৮৭-৮, ৩০০-১;

জামিয়াত-উল-আনসার (স্বেচ্ছা-সেবকদের দল), ২৭৭;

জান মাহোমেদ খান, ১৫৭;

জবর, ২৬৩;

জৌনপুর, ৮৮, ১১৪;

জাভা, ৮৫;

জেদ্দা, ৫৯, ৮২-৩, ৮৬, ২৬৬-৮, ২৭২-৩, ২৮০;

বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯১, ২৯৩;

বিন লাদেন পারিবারিক ভবন, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৯;

জাহান, শাহ্, ৫৮;

জাহাঙ্গীর, সম্রাট, ৫১;

জাল্লালাবাদ, ২৫, ১৯২, ৩০৩;

জেরুজালেম, ৮৮;

যিশুর মতাবলম্বীরা (জেস্যুটরা), ২২১, ২৫২;

যিশু খ্রিষ্ট, ৮৮, ১২৮-৯;

ইহুদিরা, ৭৬, ৭৯, ২৫১, ২৫৩;

জিহাদ, ২৫, ৫৭-৮, ৬৬-৭, ৯১, ১২১, ১২৩, ২০৯, ২৯১;

জিহাদ কবীর, ৬৩, ১০১, ১১৫;

জিহাদ আকবর, ৬৩-৪; ১১৫

ওয়াহ্হাবি ব্যাখ্যা, ৭১-২, ৭৪-৫, ২৭০-১;

সৈয়দ আহমদের অধীনে, ২৮৭, ৯৩-৪, ৯৬-৭, ৯৯, ১০৯, ১১২, ১১৮, ১২৬, ১৭২-৩, ২৮৮, ২৩৩, ২২৬-৮, ২৮০-১;

তিতুমীরের অধীনে, ১০৮;

বেলায়েত আলীর অধীনে, ১০৫-৬;

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পরিচালিত, ১২৭-৯, ১৩৬, ১৫৪-৭, ১৫৮-৯, ১৭২-৩, ১৮৯-৯, ২০০-১, ২৬২, ২৭৬, ২৮০;

ইমদাদুল্লাহ্র অধীনে, ১৭৩;

সোয়াতের আখুন্দের অধীনে, ১৮৭-৮;

এর জামাত আহল-ই-হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি, ২১৬;

দেওবন্দি শিক্ষায়, ২১৯, ২৮০, ২৮৪;

আব্দুর রহমানের অধীনে, ২২৬, ২২৮;

সীমান্তে ধ্বংস করে, ২৫০;

আফগানিস্তানে, ২৮৫-৭, ২৯১-২, ২৯৩, ২৯৮;

বিশ্ব, ২৯১, ২৯৫, ২৯৮;

তলিবানের অধীনে, ৩০২;

জিন্নাহ্, মুহাম্মদ আলী, ২৮৪;

জর্দান, ২৬৮, ২৯১, ২৯৭, ৩০৫;

জুদুন, ১৭৮;

জুম্মা নদী, ৫৬, ১৭৪;

জুম্মা, ১১১;

জুনুদ উল-রাব্বানিয়াহ্ (আল্লাহ্র

সেনাদল), ২৮১-২;
কাবুল, ১০৩-৪, ১১৭, ১২১, ১৮৯, ১৯২, ২৫৭;
তালিবানেরা আক্রমণ করে, ২৫, ২৯৮, ৩০৩-৪;
যুদ্ধে ক্ষতি, ২৭-৮;
ধর্মান্ধদেরকে অভিবাদন জানায়, ৯৬, ৯৮;
ব্রিটিশরা অধিকারে রাখে, ১১৮;
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে, ২২৬-৬;
ধর্মীয় সম্মেলন, ২২৯-২৩১;
এবং স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন, ২৮০-২;
রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে, ২৮৬-৭;
কাবুল, এর আমির, ২৮৯-৯, ৩০১, ২২৪-৫, ২২৮;
কাবুল যুদ্ধক্ষেত্র, ২২৫;
কাবুল নদী, ২৪-২৫, ২৮;
কাফিরস্তান, ১০৩-৪, ২২৬;
কাইরানবি, রহমতুল্লাহ্, ১৭৩;
কালা পানি : তারিখ-এ-আজীব (কালো পানি এক অদ্ভুত গল্প), ১৯১;
কালাশ, ২২৬;
কান্দাহার, ২৪-৬, ২২৫-৭, ২৫০, ২৮৬-৭, ৩০১-৫
করাচি, ২৮৮, ২৯৩;
কারবালা, ৭৬, ৭৯, ৮২;
করীম, আলী, ১৬০;
কারমার পাহাড়, ১০২-৩;
কর্ণাল, ১৮২;
কাশগার, ২০৯;
কাশ্মির, ১০৩-৪, ১০৯, ১৫৭, ১৫৯, ২৯৭;
কাসরা, ৯৬;
কপ্পেল, গাইলস, ২৯৮;
কেয়েস, মেজর, ১৮৯-৯০;
খাদি খান, ৯৯, ১০০;
কাগান উপত্যকা, ৩৩, ১০২-৪, ১৫৯;
খলিফা, ৪১, ৫৮;
খিলাফত আন্দোলন, ২৮৩;
খালিস, ইউনিস, ২৮৬-৭;
খারটুম, ২৮৬-৭;
খোকন্দ, ২৫৯;
খোস্ট, ২৯৬, ২৯৮-৯, ৩০৪-৫;
খুদু খেল, ৩২, ১৯২;
খাইবার গিরিপথ, ২৩, ৩৯, ৯৬, ১১৮, ২২৪, ২৩৮-৯, ২৮৩, ২৮৬-৭;
কিলা মুজাহিদিন (ধর্মযোদ্ধাদের দুর্গ), ২৩০;
কিপলিং, রুডইয়ার্ড, ২১৪, ২৪৯;
কিতাব আল-জিহাদ, ৭৪-৫;
কিতাব আল তৌহিদ (ঐক্যের গ্রন্থ), ৬৮, ৭৩-৫;
কিচেনার, লর্ড, ২৬২;
কোহাট, ৩৯, ১৯২, ২৭৭;
কোহিস্তান, ১৫৯;
কোটলা, ৪৮, ১২৭;
কুমার সিংহ, রাজা, ১৩৩, ১৩৫, ১৫৩, ১৬৫-৭, ১৬৯;
কুনহার নদী, ১৫৯;
কুর্মা, ২৬৬;
কুচ, ১১২;
কুয়েত, ২৫৭-৮, ২৬১-২, ২৬৫-৬, ২৭০, ৩০০;

কুয়েত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ২৯;
কিরগিজস্তান, ৩০০;
লাহোর, ৩৩, ১২৮, ১৮১, ১৯২, ২২৮, ২৩০, ২৩৭;
শিখ শাসনাধীনে, ৯৮;
এইটচিসন কলেজ, ২১৫;
এবং স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন, ২৮৯;
জেআইএ প্রতিষ্ঠিত, ২৮৪;
লালু পর্বত শ্রেণী, ১৮৭, ১৯১, ১৯৪, ১৯৫;
ল্যাঙ্কশায়ার মিলস, ১২০;
ল্যাণ্ডি কোটাল, ২৩৮;
লশকর-এ-ঝানভি (ঝানভির সেনা দল), ২৮৮;
লরেন্স, কর্ণেল টি.ই., ৩৫, ২৬২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৯;
লরেন্স, স্যার হেনরি, ৩৩, ৩৫, ১৫০, ১৬০, ১৮৬;
লরেন্স, স্যার জন, ১৮০, ২০৯, ২২৪;
লিয়ার, এডওয়ার্ড, ২২৩;
লিউইস, বার্নার্ড, ২৯৮;
লিউইস, মি, ১৬২;
ললয়েড, মেজর-জেনারেল জর্জ, ১৪৮, ১৫৯, ১৬২-৪, ১৬৭-৮;
লকহার্ট, জেনারেল স্যার উইলিয়াম, ২৩৯-৪০, ২৪৯;
লকউড, এডওয়ার্ড, ১৫০-২, ২, ১৫৯-৬২, ১৬৩, ১৬৫-৬, ১৬৯-৭০, ২০৬;
লণ্ডন, ৭২, ১২০;
লুতফ আলী খান, ১৫০;
লরিং উইলিয়াম উরি[illegible]
লোউইস, জে.এম. ১৪৯;
লয়েন, ডেভিড, ২৪, ২৫;
লক্ষ্ণৌ, ৫২, ৫৭, ৮৫;
সিপাহী বিপ্লবের সময়ে ১৩৬, ১৩৮, ১৫০, ১৫৯-৬১, ১৬৯;
লুধিয়ানা, ১২৫,
লামসডেন, লেফটেন্যান্ট হ্যারি, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৫, ৪৫, ১২২, ১৮০;
লুথার, মার্টিন, ৭২,
লিয়্যাল, আলফ্রেড, ২১৩;
লিয়্যাল, ডঃ রবার্ট, ৪৮, ১৩৮, ১৬০;
লিটন, লর্ড, ২২৪-৫;
ম্যাকসন, কর্ণেল, ফ্রেডারিক, ৪৩-৫, ৪৭-৪৯, ১২১, ১২৮;
ম্যাকন্যাগটেন, এনভয়, ১৫২;
মাদানি, মাওলানা হুসেইন আহমদ, ২৮৩-৪, ২৮৮;
মাদ্রাজ, ২১২;
মাদ্রাসাসমূহ, ১১৬, ২১৮, ২২১-২২, ২৭৫, ৩০১-২, ৩০৩;
পাকিস্তানি, ২৪, ২৭, ২৮৬, ২৮৭-৮, ২৯০, ৩০৮;
জন্য সৌদি আর্থিক সহায়তা, ২৮৭, ৪০৮;
দার উল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাও দেখুন
মহাবন পর্বত ৩২, ৪৭, ৪৯, ৯৭, ৯১, ১০৭, ১২৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৭২, ২৩১, ২৫৮;
ভূগোল, ৩০;
মানচিত্র, ৩১;
উপজাতি সমূহ, ৩২;
বড় গোডাউন, ১২৪, ৩০০;

ওয়াহ্হাবিদের বিতাড়িত করে ব্রিটিশরা প্রবেশ করে,
ধর্মান্ধরা প্রত্যাবর্তন করে, ২২৯;
মাহ্দয়িরা, ৮৮-৯, ১১৪;
মাহ্দি মতবাদ, ৮৮-৯;
মাহ্দিয়াহ্ আন্দোলন, ২২৬-৭;
গজনির মাহমুদ, ৬৮;
মাহমুদ, মাওলানা মুফতি, ২৮৫, ৩০১-২;
মাহসুদরা, ২২৮, ২৩৯;
মইনুদ্দিন হাসান খান, ১৭০;
ময়ওয়ান্দ, ২২৫, ৩০১;
মক্তব আল-খিদামত এ্যান-মুজাহিদীনের কার্যাবলির দপ্তর, ২৯৫;
মালাকন্দ, ৩০, ১০২, ২৩১, ২৩৩-৫;
মালাকন্দ যুদ্ধক্ষেত্র, ২৩৫-৬;
মালাকা, ১৭৮-৯, ১৮২, ১৮৫, ১৮৯, ১৯৪-৬;
ম্যালসন, কর্ণেল জি.বি ১৬৭, ১৭১;
মাল্টা, ২৮১-২;
মান্দভি, ৮৯;
মঙ্গলথানা, ১২৬, ১৫৭-৮, ১৭৭-৯, ১৮৬;
ম্যাঙ্গলস, রস, ১৮৪-৫;
মানকি মোল্লা, ২২৮;
মনশেরা উপত্যকা, ৩০-১
মারাঠারা, ৫১, ৯০-১;
মারকাজ আদ-দয়া ওয়াল ইরশাদ (প্রবর্তন ও নির্দেশনার জন্য কেন্দ্র), ২৯১;
মার্টিন, ফ্র্যাংক, ২২৭;
মেরী, রানি, ২৭৬;
মাস্তান মোল্লা, ২২৮;
ম্যাথিয়াস, কর্ণেল, ২৪১;
মায়ো, লর্ড, ৪০, ২০৯-২২, ২১৩, ২২৪;
মক্কা, ৩৭, ৫৮, ৬৬, ৭০, ৮৮, ৯১-২, ১০৩, ১৭৫, ২৩১, ২৬৬;
এবং হিজরা, ৭০, ১১৫, ২৫৮;
ওয়াহ্হাবি দখল ও পুনর্দখল, ৭৩, ৮২-৩, ৮৫, ৮৬-৭, ১১৬;
ব্রিটিশ প্রশাসনাধীনে, ১২৮;
এর অভিভাবকত্ব, ২৬২;
অটোমান গ্যারিসন আক্রমণ করে, ২৬;
ইখোয়ানদের ওপর আক্রমণ, ২৬৭;
ফিলবি হজ করেন, ২৭১;
আল-কায়েদ পৌছান, ২৮১, ২৮২;
বড় মসজিদ দখল করে নেয়, ২৯, ২০৩;
মদিনা, ৫৮, ৬৬-৭, ৬২, ৭৫, ২৫২;
এবং হিজরা, ৭০, ১১৫, ১২১, ২৫৮;
ওয়াহ্হাবি দখল ও পুনর্দখল, ৮০, ৮২, ৮৪-৫, ৮৭, ১১৬'
নবী (সাঃ)র স্মৃতিস্তম্ভের পবিত্রতানাশ, ৮০, ৮৫;
ব্রিটিশ প্রশাসনাধীনে, ১২৮;
এর অভিভাবকত্ব ২৬২;
ইখোয়ানদের ওপর আক্রমণ, ২৬৭;
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯০;
মীর বাজ খান, ১৫৭-৮;
মীরাট, ৪৫, ১৩৭, ১৫৪;
মেসোপটেমিয়া, ২৬৪;
মিলস, উসন্যাম, ২৩৭-৮-২৪০;
মীর আলম খান, ১০৩, ১৭৭;
মিসবাহ্-উস-সারি, ১২১;

মোহাম্মদ ওয়াজির খান, ৯৫, ১৫৬;
মোহাম্মদি, মাওলানা মোহাম্মদ নবী, ২৮৫;
মোহামন্দ এর মানচিত্র, ২৩২;
মোহমন্দরা, ২২৮, ২৩৬-৮, ২৭৭, ২৮১, ২৮৯;
মকররব খান, ১৫৭;
মানি, অ্যালোঞ্জো, ১৬৬-৮;
মঙ্গলরা, ৪১, ৬১-২, ৬৪;
মন্তগোমারি, স্যার রবার্ট, ১৮১-২, ১৮৪-৫, ১৯১-২;
মাউন্ট হ্যারিয়েট, ২০৪;
মওলা বকশ, দেওয়ান, ১৩৮, ১৫৩, ১৫২;
মুবারক দ্য গ্রেট, ২৫৭;
মুবারিজ-উদ-দৌলা, শাহ্জাদা,
মুহাম্মদ, নবী (সাঃ), ২৪, ৪৭, ১১৬, ১৫৫, ২১২, ২১৯, ২৫৬;
  এর দৃষ্টি ২৫, ৩০২;
  এর আলখাল্লা, ২৪, ২১৮;
এর বংশধরেরা, ৩৬, ৫০, ৫২-৩, ৯৪, ৯৭;
এবং জিহাদ, ৫৯, ৬৩-৪, ৭৪, ১২১, ২৯২; ৬৩, ৬৪;
খিলাফত, ৬৫;
এবং নেজদ, ৭০, ৮৫, ১১৫, ২৫৮, ২৯২;
হিজরা, ৬২-৩;
অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রারম্ভের সংগ্রাম, ৬২-৩;
দ্বারা মধ্যস্থতা, ৬৪;
তাঁর জগুদিন, ৬৪;
অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি, ৭৬;
মৃত্যু, ৭৮-৯;
সমাধি প্রস্তরের পবিত্রানাশ করে, ৮০, ৮৫;
তাঁর অনুসারীরা, ৯০, ২১৮, ২২১, ২৯২;
এবং হাদিসের গঠন, ১১৪;
এর পোশাক, ২২৬;
আরব জুড়ে নিষেধাজ্ঞা, ৩০০;
মুহাম্মদ আলী পাশা, ৮২-৩;
সিন্ধুর মুহাম্মদ হায়াত, ৬৬-৭;
মুহাম্মদ হুসেইন, শাহ্, ১১০, ১২৩;
মুহাম্মদ মিঞা, ২৮১
মুজাহিদীন, ১০১-৩, ১১৭, ১১৯, ১৫৭-৮, ১৭৭-৯, ১৯৬;
আফগান, ২৪, ২৮৬-৭, ২৯৩, ৩০১-২;
মুজাহিদ, ৫১, ৬৩, ২২৫;
মুলতান, ২৮১-২;
মুর্শিদাবাদ, ১২১;
মুসকাট, ৭৪;
মুশাররফ, জেনারেল পারভেজ, ৩০৮;
মুশরিকগণ, ৯২-৩১;
মুসলিহ্-উদ-দিন, শেখ, ৩০১;
মুসলিম ভ্রাতৃত্ব, ২৯১, ২৯২-৩;
মুতাউইহিন, ৭১-২, ২৬৭-৮;
মুজাফফরনগর, ১৭৪;
মুজহির আলী, মোল্লা, ১০২-৩১;
নাজদ-উদ-দিন, ২৩৬;
নানাউতায়ি, মুহাম্মদ কাসিম, ১৭৩-৫, ২১৭-৯, ২৭৬-৭;
নাংগড়, ২৮৬-৭;

নারিনজি, ১৫৭, ১৫৮-৯;
নারকলবাড়িয়া, ১০৮-৯;
নাসিরউদ্দিন, মৌলভি, ১০৯, ১২২, ১১৭;
নাসরানি রাজ, ১২৮-৯;
নাসের, প্রেসিডেন্ট, ২৭৪, ২৯০;
নাসের, প্রেসিডেন্ট,
নেশন, মেজর, ১৪৭
নাজারাত উল-মারিফ (আল্লাহ্‌র কর্মে নিয়োজিত হয়ে), ২৭৭-৮;
নেজদ, ২০৯, ২২৫, ২৬৬, ২৭২-৩;
ওয়াহ্‌হাবি মধ্যদেশ হিসেবে, ৬১, ৬৫-৭, ৬৯-৭০, ৭২, ৭৮, ৭৯, ৮২, ৮৫-৬, ৯১, ২৩৮, ২৮৪;
জবল শাম্মার, ২৫০-১. ২৫৩, ২৫৭;
উপজাতিদের ঐক্য, ২৫৭-৬০'
এর আমির, ইবনে সৌদ দেখুন
নিউইয়র্ক, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র, ৩০০, ৩০১-২;
নিকলসন, জন, ৩৫, ৩৮, ১৫৭;
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত (এডব্লিউ এফপি) ৪৯, ১৯২, ২২৭-৩০, ২৩৮, ২৪৯, ২৮৫;
প্রদেশ হয়, ৩৫, ২৭৭-৮;
মানচিত্র, ২৭৯;
এ মাদ্রাসাসমূহ,২৮৭;
এ বিনলাদেনের প্রভাব, ২৯৬-৭
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহ ১২২;
নওশেরা, ৯৭, ১৫৭, ১৮৪, ১৯৪, ২৮৭;
নজীব পুলিশ, ১৩১, ১৩৭, ১৪৫-৬, ১৩৬, ১৬৭;
ওবাইদুল্লাহ্ সিন্ধি, মাওলানা, ২৭৭-৮, ২৮১-৩;
নিয়ামতুল্লাহ্‌র সঙ্গীত, ১২৮;
অয়েল, ২৭৪, ২৯০, ৩০৬;
ও'কিনীলি, জেমস, ১২৭;
ওমান, ৭৮-৯, ৮১;
ওমর ইবনে আল-খাত্তাব, খলিফা, ২৫;
ওমর, মোল্লা মুহাম্মদ, ২৪-৭, ৪১, ২৮৬, ২৯৩, ২০১-৫;
গাঁজা / মাদক, ১৩১, ১৩৬, ১৪৬;
ওবাকজাইরা, ২৩৮-৯, ২৪৯;
উড়িষ্যা, ১২৮;
ওথমানি, মাওলানা শাব্বার আহমদ, ২৮৫;
অটোমানরা, ৪১, ৫৪, ৫৮, ২৫৭-৮, ২৮১;
ওয়াহ্‌হাবিরা এবং ৮০-২, ৮৭;
দিকে ব্রিটিশ পন্থা, ২৬১-২;
বিরুদ্ধে 'আরব বিদ্রোহ', ২৬৩-৭;
সাম্রাজ্যের, ধ্বংস ২৮২;
অযোধ্যা, ৫০, ১৩২-৩, ১৩৬, ১৪৯;
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, ২১৫;
পাদ্রী আন্দোলন, ৮৫;
পাখতিয়া, ২৮৫;
পাকিস্তান, ২৯৫-৬, ২৯৬, ২৯৭-৮, ৩০১-২;
মাদ্রাসাসমূহ, ২৪, ২৭, ২৮৬, ২৮৭-৮, ২৯০, ৩০৮;
সীমান্তাঞ্চল, ৩০, ৩০৯;
জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে জণ্ড নেয় ২৮৫, ৩০৮;
আফগানিস্তান ছড়িয়ে পড়ে, ২৮৬;
তালিবানের জন্য সমর্থন, ৩০২-৩

পালাম মোল্লা, ২২৮;
প্যালেস্টাইন, ২৯২ম ৩০৮;
পলগ্রেভ, উইলিয়াম গিফোর্ড, ৩৫, ৭৬, ২৫০-১, ২৫৬, ২৬৭-৮;
পামির পর্বতমালা, ৯৮;
পানিপথ, ১৮১-২
পানিপথি, মৌলভি কাসিম, ১০৯-১০, ১১৯-২০
প্যারিস সম্মেলন, ২৮২;
পার্সন্স, ক্যাপ্টেন, কিউ, ডি, ১৯৯-২০১ম ২০২, ২০৪;
পশতু, ২৪, ২৮১;
পাঠানরা, ২৮-৩১, ৩২, ৩৫-৯৭৬, ১২৭, ১৫৪, ২৩৩;
পাখতুনওয়ালি আইন, ২৪, ১০২;
উপজাতীয় দেশ সমূহের বিভাজন, ৩০, ২২৬;
এবং সৈয়দ আহমদের অধীনে ওয়াহ্হাবিরা ৯৬-৮, ১০০, ১০২-৪;
আন্ত-উপজাতীয় সমাবেশ, ৯৭-৮, ১০০, ১০২-৩, ১০৯,
নাঙ্গ-ই-পুখাতনা বিধান, ১০২-৩
নানাউতায়ি বিধান, ১০২-৩, ১৯৬
আমবেলাতে ১৯০-৪
মোল্লাদের প্রভাবাধীনে, ২২৭-৮;
স্বেচ্ছাসেবকদের দলে যোগ দেয়, ২৭৭;
রাজনৈতিক উন্নয়ন, ২৮৫-৬;
এবং আফগানিস্তান, ২৮৬-৮, ৩০২, ৩০৪;
শরণার্থীরা, ২৯৮;
কান্দাহারে শুরা, ৩০২;
বিদেশীদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়, ৩০২;
বিন লাদেনের পক্ষে সমর্থন, ৩০৪, ৩০৯;
পাটনা, ১৩০-৩১;
ওয়াহ্হাবিদের কেন্দ্র হিসেবে, ৩৩-৪, ৪৫-৭, ৫৭, ৫৯-৬০, ৯০, ৯৪-৫, ১১০, ১১৮, ১২২-৩, ১৩৬, ১৫২, ২২৯;
পাটনা-চলমান
সাদিকপুর জেলা, ৪৬, ৫৯, ১০০, ১২৩, ১৫৩, ২০০, ২০৬;
'পাটনা-বাসীরা', ৯১-২, ১৬৬, ১৫২;
ছোট গোডাউন, ১২৩-৪, ১২৭, ১৫২, ১৭০, ১৮২, ২০০, ২০৬;
সিপাহী বিপ্লবের সময়, ১৩২-৪, ১৩৫-৬, ১৪৬, ১৪৭-৫১, ১৫৭-৭২, ২০৬;
ওয়াহ্হাবি নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হয়, ১৪৯-৫২, ১৫৭, ১৬১, ১৯৯, ২০০;
ওয়াহ্হাবি নেতৃবৃন্দ মুক্ত হয়, ১৬৯-৭০;
এবং ওয়াহ্হাবি বিচার, ১৯৯, ২০০-১, ২০৪-৭, ২১৭;
দেশপ্রেমিকদের সংস্থা, ২২০;
পেলি, লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল লিউইস, ২৫৫-৬;
পেনেল, ড. থিওজের, ৪১;
পেন্টাগন, ৩০১
পারস্য, ৬৩, ৭৪
পারস্যবাসী, ৫১, ৫৭, ২৮১;
পারস্য উপসাগর, ৮১-২, ৮৪
পারস্যবাসীরা, ৭৯, ২৬২;
পেশোয়ার, ২৪, ৪৩-৫, ১২১, ১২৫, ১২৮, ২০৫, ২৩৩, ২৩৭-৮;
আধুনিক নগরী, ২৮;
শিখ শাসনাধীনে,

সিপাহী বিপ্লবের সময়ে ৩৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৭৩;
খ্রিস্টান অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ৯৬, ১০০;
এবং পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ১০২-৩;
সৈয়দ আহমদের মাথা প্রদর্শিত হয়, ১০৬;
ব্রিটিশ সক্রিয়তার ভিত্তি, ১৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৭, ১৯২;
এডওয়ার্ডস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ২১৫;
সীমান্ত উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া, ২২৪, ২২৮, ২৮৩;
এবং স্বেচ্ছা সেবক আন্দোলন, ২৭৭, ২৮১-২
মক্তব আল-খিদামত (কার্যাবলির দপ্তরসমূহ), ২৮৬-৭, ২৯৬, ২৯৬;
মাদ্রাসাসমূহ ২৮৭-৮,
বায়াত আল-আনসার (আনসারের ভবন) ২৯২, ২৯৬, ৩০৪;
বিন লাদেন পৌছান, ২৯৬;
আল-জওয়াহরি পৌছান, ২৯৬;
আল-জারকায়ি পৌছান, ৩০৫;
পেশোয়ার গেজেটিয়ার, ২৮১;
ফিলবি, হ্যারি সেন্ট জন, ৩৫, ৭০, ২৫৪-৫, ২৫৯-৬১, ২৬৫-৮২;
ইসলামে ধর্মান্তরণ, ২৭১-৪
ফিলিপাইন, ৩০০;
পিণ্ডারি লুন্ঠনকারীরা, ৯০, ৯৭;
পায়োনিয়ার, ২০৪, ২০৬, ২০৫, ২০৬;
পীর আলী খান, ১৬১;
পীর বাবা, ৪৯, ৯৭;
পীরবৃন্দ, ৯১, ১৫০-
পলাশি, এর যুদ্ধ, ১২৮;
পলক, ফ্রেডারক, ১৯৭;
পবিন্দাহ্, মোল্লা, ২২৮, ২৩৯;
প্রেমসিংহ, সিপাই, ২৬৫;
মুদ্রণ মাধ্যম, ৫৭, ১২৯, ১২৮, ২১০, ২২৮;
পাঞ্জাব, ৪৬, ১০৭, ১২২, ২০৭, ২৬৫;
শিখ শাসনাধীনে ২৮, ৯০, ৯৬ ৯৮, ১০২;
মীমাংসিত এলাকা, ৩০;
উপজাতীয় অঞ্চলসমূহ, ৩১;
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, ৩৫, ৪৩, ১০১, ১১৪, ১৫৭, ১৭৭, ১৮৪ ২৮১;
মুজাহিদীনের আবির্ভাব, ১০১;
ব্রিটিশ প্রদেশ হয়, ১২০;
সিপাহী বিপ্লবের সময়, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৭, ১৮;
এ হিজরত আন্দোলন, ২৮৩;
এ মাদ্রাসাসমূহ, ২৮৭;
পাঞ্জাব সীমান্ত সেনাদল, ১৮৪-৫, ১৮৯;
পাঞ্জতর, ১৫৭-৮, ১৭৭;
সংরক্ষণশীলতা, ৭২-৩;
কায়েস বিন রশিদ, ২৪;
কাসুরি সাহিব, ২৮১;
রানির নিজের গাইডসের
অশ্বারোহী ও পদাতিক
বাহিনীর একটি সেনাদল, ২৮, ৩৩, ১০০, ১৮০-১, ১৮৪-৫, ২২৫, ২৩৪, ২৪৯;
কুম,
কোরান, ৭২, ১০৫, ১২১, ১২৫, ২০০, ২৮২, ২৮৫, ৩০১;

মাদ্রাসাসমূহে নির্দেশনা, ৩৫, ২১৮;
এর শিক্ষকবৃন্দ ৩৮;
পারস্য ভাষায় অনূদিত, ৫১;
এর আক্ষরিক ব্যাখ্যা, ৬৩, ৬৪;
এবং শরিয়া, ৬৬
এর ওয়াহ্হাবীয় ব্যাখ্যা, ৬৮-৯, ১১৫;
যাকাতের জন্য চাওয়া; ৭২, ২৯০-১;
এর মধ্যে বৈপরীত্য, ৭৪;
অহিংস সুরাসমূহ, ৭৫;
'তরবারির সুরা', ৭৫-৬
এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসন, ১২৮;
থেকে মতবাদ, ২০৭;
কালমা, ২০৫
এবং পশ্চিমা জ্ঞানের প্রভাব, ২১১-২;
অধিবাসীদেরকে হত্যার আদেশ, ২২৭;
পারস্যবাসীদের দ্বারা কলঙ্ক বা দুর্নীতি, ২৬২;
নতুন নিয়ম প্রবর্তন, ২৭০;
কুতব, মুহাম্মদ, ২৯১, ২৯২;
কুতব, সায়িদ, ২৯১;
রায় বেরিলি, ৫০, ৫৫, ৫৮, ৮৬, ১৫৪;
র‍্যাফলস, স্ট্যামফোর্ড, ৮৫;
রাজস্থান, ৯৪;
রাজপুতরা, ১২১, ১৩৩, ১২৮, ১৬৩;
রেঙ্গুন, ২১২;
রানিগঞ্জ, ১৩৫;
রণজিৎ সিংহ, মহারাজা, ৯৬, ১০১, ১০৩, ১০৬;
রশিদ, আহমেদ, ২৯৮, ৩০২;
র‍্যাটরে, ক্যাপ্টেন টমাস, ১৩৫-৬, ১৪৬-৮, ১৪৯-৫০, ১৬০, ১৬৩, ১৬৬, ২৩৫;
র‍্যাটরে, লেফটেন্যান্ট হ্যারি, ২৩৩, ২৩৫;
র‍্যাভেনশ, টি.ই., ৮০, ৯১, ২০৪, ২০৯, ২৫০;
রাওয়ালপিণ্ডি ৪৫, ২০৮;
লোহিত সাগর, ২৬৭;
রেইলি, জে.এইচ, ২০৭-৯, ২২৯;
রিপন, লর্ড, ২১১;
রিসালা জিহাদ, ১০১
রিয়াদ, ৭৫, ৬৯, ৮৩-৪, ৮৩-৭, ২৬০, ২৬৬, ২৬৯;
ব্রিটিশরা ওয়াহ্হাবি দূর্গে, ২৫২-৫৬, ২৬২, ২৬৩;
ফিলবি প্রতিষ্ঠা করেন রাজনৈতিক সংস্থা, ২৬৫-৬;
ধর্মীয় গবেষণার ইন্সটিটিউট, ২৯২;
বাদশাহ্ আল সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯৬;
রবার্টস, মেজর (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) ফ্রেডারিক 'ববস', ১৯০, ১৯২, ১৯৪-৬, ২২৫, ২৫০;
রোহেলখন্দ, ৩৪, ১২১, ১৫৪;
রোমান ক্যাথলিজম, ২৫২;
রোজ, স্যার হিউজ, ১৮১, ১৮৪, ১৯২-৩;
রুটলেজ, জেমস, ২০৪;
রোক্রফট, জর্জ, ৩৭-৮;
রোলাট অ্যাকটস, ২৮২;
রাশিয়া, ২২৮, ২৬২;
রুশরা, ৫৪, ২৫৯;
আফগানিস্তানে সোভিয়েত অন্তর্ভুক্তি, ২৪, ২৭, ১০৮, ২৪৪, ২৮৩-৮৮, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬-৮, ৩০৪;

রুথভেন, ম্যালিস, ২৯৮;
সাদাত, প্রেসিডেন্ট, ২৯৬;
সাদুল্লাহ্, মোল্লা, ২৩০;
(পাগলা ফকির) ২৩০-১, ২৩৩-৫, ২৩৮, ২৫০;
সফেদ কোহ অঞ্চল, ২৩৯;
সাইদ আকবর, আখুন্দজাদা, ২৮৮, ২৩৮;
সৈয়দরা, ৩৭, ৪৯, ৫৩, ৮৭, ৯৭, ৯৯, ১২৬-৭;
সালাফি, ৪০, ২২১, ২৯৬;
সামারাতুত তারবিয়াত (প্রশিক্ষণের ফলাফলসমূহ), ২৭৬;
সামিউল হক, ২৮৮
স্যামুয়েলস্, এডওয়ার্ড, ১৩২, ১৬৯-৭০;
সাং-ই-হিসার মাদ্রাসা, ৩০১-২
সরফরাজ আলী, মৌলভি, ১৫৪;
সৌদ, এর ভবন, ২৫৭-৮, ২৬১, ২৯০, ২৯৩, ৩০০, ৩০৬-৭;
সৌদ-ওয়াহ্হাবি বংশ,৭০;
সৌদি আরব, ২৭স ৪০, ২৯৬-৬;
সৌদি ওয়াহ্হাবি শাসনাধীনে পড়ে, ৭০;
ওয়াহ্হাবিবাদ প্রাতিষ্ঠানিকতার অন্তর্ভুক্ত, ২৬-৭;
জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, ২৭০, ২৭২-৪;
সম্পদ, ২৭৪-৫;
আফগানিস্তানে জড়ানো, ২৮৬-৭;
মাদ্রাসাসমূহের তহবিল, ২৮৭, ৩০৭;
এর প্রধান মুফতি, ২৯০;
সৌদ ভবন থেকে বিচ্ছিন্ন, ২৯০;
তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়, ৩০৩;
সায়েদ শারি মোহাম্মদ, ২৫৯;
সায়াফ, আব্দুল রব রসুল, ২৮৬, ৩০০;
সায়েদ আকবর শাহ্, ৯৭-৮, ১২৩-৭, ১৫৭, ১৫৯, ২২৯, ২৩১, ২৩৬;
ওয়াহ্হাবিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত, ১৭৭-৮, ১৬৯, ১৮৬-৬;
সায়েদ ফিরোজ শাহ্, ২২৯-৩০
সায়েদ মুবারক শাহ্, ১৭৮, ১৮৭-৮
সায়েদ উমর শাহ্, ১৫৭, ১৭৭, ১৮৬;
সায়িদ আবুলালা মওদুদি, ২৮৩-৪, ২৮৬;
সায়িদ জামাল আল-দিন আল-আফগানি ('বিশিষ্ট আফগান'), ২৬৬-৭;
সায়িদ মুহাম্মদ, ৮৮, ১১৪;
সায়িদ নাজির হুসেইন মুহাদ্দিস, মাওলানা, ১৬৬, ১৫৩-৪, ১৭২-৩, ১৭৫, ২০৮-৯, ২১৬, ২৮৫;
সিন্দিয়া, দৌলত রাও, ৯৫;
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৮১;
সিপাহী বিদ্রোহী, ৩৪, ১২৯, ১৩৩-৭০, ১৮০, ২০৬, ২০৮-৯, ২২৬, ২৩৮;
ওয়াহ্হাবিরা এবং ১৩৬, ১৩৮, ১৪৯-৫৮, ১৯৯;
ব্রিটিশদের ধারণার ফলাফল, ২১২-১৩;
সেরিন গপুতম, ৫৪;
শবকদর, ২৩৭;
শফি, মুহাম্মদ, ২০৩-৫
শাহাবাদ, ১৩৩, ১৬৩
শহীদ, ২৫, ১২৬
শেক্সপিয়ার, উইলিয়াম, ২৬১-৬২, ২৬৩-৫, ১৬৩-৪;
শামলী, ১৭৪;

মসজিদ, ২১৭;
শঙ্করগড়, ২৩৭;
শরিয়া, ২৪, ২৬, ৪১, ৫২, ৫৮, ৬৬, ৭০, ৮৬, ৯০, ২১৫;
ওয়াহ্হাবি, ১০০-৩, ২৭০, ২৭২;
এর অপরিবর্তশীলতা, ২১৯;
ইতজিহাদ, ২২০;
সৌদি আরবে, ২৬৭, ৩০৩;
পাকিস্তানে, ২৮৫;
তালিবান, ৩০২-৩;
শরিয়াত-ই-মোহাম্মদি (ইসলামি বিধান বলবতের জন্য আন্দোলন), ২৮৮;
শরিয়তুল্লাহ্, হাজি, ৮৫-৬;
শরিফ হুসেইন ইবনে আলী, ২৬২-৫, ২৬৭-৮;
শেখ আল ইসলাম, ৭০;
শের আলী, আমির, ২২৪;
শেরে আলী, ১৯৬-৭, ২০৫-২১১;
শিয়া ধর্মতত্ত্ব, ৫৩, ৬৩, ৬৪, ৯১;
মাহ্দিতে বিশ্বাস, ৮৭;
এবং ইমামের খেতাব, ৯৮-৯;
ইমাম-মাহ্দি গল্প, ১১২;
ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ১১৪;
শিয়ারা, ৭১, ১০৭, ১৪৯, ১৫৯, ১৬১;
মুঘলরা, ৫২;
দিকে শত্রুতা, ৫৯, ৭৩, ২১৭, ২১৯, ২৬১, ২৮৮;
এবং শাহিদানের ধর্মম[illegible]
এবং নবী (সা:)র স[illegible] বিরক্ততা নাশ, ৮৫;
ওয়াহ্হাবি বিচারের জবাব, ২১৫;
হাজারা, ২২৬;
মাদ্রাসাসমূহ, ২৮৮;
আয়াতোল্লাহ্রা, ২৯০;
শিনওয়ারিরা, ২৮৬;
শুজা, আমির শাহ্, ১৭৭-৮;
সিদ্দিক হাসান খান, নবাব, ২১৬;
সিকান্দার শাহ্, ২৩১, ২৩৫;
শিখরা, ২৮, ৩৩, ৪৯, ৯০, ১২০, ১২৭;
পাঠানদের বিরুদ্ধে ৪৮, ৯৬-১০০, ১০২-৫, ১১২;
দিকে ওয়াহ্হাবিদেরকে শত্রুতা, ৫৯;
সাম্রাজ্যবাদ, ৯৫;
এবং সিপাহী বিদ্রোহ, ১৩৩-৬, ১৪৬, ১৫০, ১৬০-১, ১৬৩, ১৬৬, ১৭৪, ১৮০, ২৩৫;
জাম্মা মসজিদে চিৎকার ও বিদ্রুপ করে, ১৭৭
আমবেলায়, ১৮৯, ১৯৪;
মহারাজারা, ২১৫;
মালাকান্দে, ২৩৪-৫;
দরগাইয়ে, ২৪০-১;
পঞ্চম জর্জকে সম্মান প্রদর্শন, ২৭৬;
পশমী গর্জ, ২৬;
রেশমী পত্র ষড়যন্ত্র মামলা, ২৮১-২;
সিন্ধু, ৯৬, ১২২, ২১৭, ২৮১, ২৯০;
সিনগেসার, ৩০১;
সিপাহি-এ-শাবা[illegible]দের সৈন্যরা), ২৮৮;
সিরাত-উল-মুস্তাকিম, ৫০, ৫৫;
সরহিন্দি, শেখ আহমদ, ৫৩, ৬৬;

সিত্তানা, ৩২-৪, ৯৭, ১০৩, ১২৯, ২৩১, ২৩৬, ২৯৬;
ওয়াহ্হাবিদের সংগঠিত হওয়া এবং বিতাড়ন, ৪৫, ৪৭-৯, ১০৭, ১০৯, ১১৮-৯, ১২৪-২৯;
বড় গোডাউন, ১২৪, ১৫২, ১৮২. ৩০০;
জিহাদের জন্য ভিত্তি হিসেবে, ১২৭-৯, ১৩৯;
সিপাহী বিদ্রোহের সময়, ১৩৬, ১৫১, ১৫৭-৮, ১৭৭-৯, ১৯৯, ২০৪;
ছয় দিনের যুদ্ধ,
সমাজতন্ত্র, ২৭৪, ২৮৪, ২৯০;
সোমালিয়া, ৩০০;
দক্ষিণ আফ্রিকা, ৩০১;
সোভিয়েত ইউনিয়ন, রুশদের দেখুন
বিশেষ পুলিশ বিভাগ, ২০৭;
স্পিনগড় পর্বতমালা, ২৯৬;
সেন্ট বার্থোলোমিউয়ের শেষ ধ্বংসযজ্ঞ, ১০২-৩;
স্যান্ডর্ড অয়েল কোম্পানি, ২৭৪;
সুদান, ৩০৩;
সুদি বাদল, ২৫৯;
সুয়েজ, ২৬২;
খাল, ২২৮;
সুফিবৃন্দ, ৬৬, ৬৪, ১৩৬;
সাধুরা, ৫২, ১০০;
সুফিবাদ, ৫৬-৭, ৬৩, ২৮৬;
নাকশবন্দি, ৫৩, ৫৭, ২১৬, ২১৮, ২৮৪;
অতীন্দ্রিয়বাদ, ৬৪;
ভবিষ্যদ্বাণী, ১১৪;
মহৎ সুলাইমান, ৪১;
সুলতান, শাহ্জাদা, ৩০০;
সুমাত্রা, ৮৫;
সুন্নি ধর্মতত্ত্ব, ৬৫, ৭৩, ৭৮, ৯১;
হানাফি মতধারা, ৫২, ৮৪, ৯১, ২১৯; ৩০২;
হানবলি মতধারা, ৬৩, ৬৩-৪, ৬৬, ৮৪, ২১৯, ২২১;
তকলিদ, ৬৩;
শফি মতধারা, ৬৬;
পুনর্জাগরণ, ৬৭;
আল-সুন্না, ৬৯
মাহ্দিতে বিশ্বাস, ৮৮;
পুনর্জাগরণী, ৯১;
ভবিষ্যদ্বানীসমূহ, ২১৪
ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে ফতোয়াসমূহ, ২১৪-৫;
সংরক্ষণশীলতার বৃদ্ধি, ২২২, ২৭৭;
আলাওয়াইট সম্প্রদায়, ২৯২-৩;
সুন্নিরা, ২৪, ৫২-৩, ৫৭, ১০৭, ২৮৩;
দিকে ওয়াহ্হাবি শত্রুতা, ৫৯, ২৬১;
নবী (সাঃ)র সমাধিপ্রস্তরের পবিত্রতা নাশের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, ৮৫;
বহরা সম্প্রদায়, ৮১;
মোল্লারা ওয়াহ্হাবিদের প্রত্যাখ্যান করে, ১১৬;
মৌলবাদী, ১৫৪, ২১৭;
ওয়াহ্হাবি বিচারের জবাব, ২১৫;
দেওবন্দিদের প্রত্যাখ্যঅন, ২১৯;
তে ওয়াহ্হাবিবাদের উন্নয়ন, ২১৯;
এবং ইসলামি পুনর্জাগরণ, ২৮৮;
ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ কমিটি,

২৭৪, ২৯০;
সুরাট, ৮৭;
সোয়াত, ১৫৮, ১৮৬, ১৮৭;
উপজাতিদের ২৮, ২৯-৩০;
এ ধর্মান্ধরা প্রতিষ্ঠিত, ৩৪, ৪৪-৫;
মানচিত্র, ২৩২;
ধর্মান্ধরা বহিস্কৃত, ২৭৭;
আহল-ই-হাদিসের উপস্থিতি, ২৯০;
গাফুর, আব্দুল, সোয়াতের আখুন্দও দেখুন
সোয়াত এর, পাদশাহ্, ১৫৮, ১৭৭-৮, ১৮৭,
সোয়াত, এর ওয়ালি, ১৮৭;
সোয়াত নদী, ২৩৩, ২৩৬;
সোয়াতিরা, ১২৬, ১৮৪, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২-৩
বিদ্রোহ, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫-৬,
সৈয়দ আহমদ খান, ১১৬, ১৭৬, ২১৬-৭, ২২০, ২২৬-৭;
সৈয়দ আহমদ, শাহ্, ৩৩, ৫০-১, ৫৪-৬০, ৮৫, ১০২, ১৫০-৫, ১৫৭;
তাঁর ধর্মতত্ত্বে সারাংশ ও দিব্যতন্ত্র, ৯১, ১৭৩;
জিহাদের ঘোষণা, ৯২-৩, ৯৬-৭, ৯৯, ১০৯, ১১২, ১১৮, ১২৬, ১৭২, ২২৮, ২৩৩, ২৭৭, ২৮০-১;
অস্ত্রের জন্য আহ্বান, ৯৮, ১১২;
ইমাম ও আমির হিসেবে পছন্দ করেছে, ৯৮-৯;
নিজেকে পাদশাহ্ বলে ঘোষণা করেন, ১০৭;
মৃত্যু, ১০৫-৭, ১৫[illegible]৩;
অদৃশ্য ও গুপ্ত ইমামের ধর্ম মত, ১০২-
১৬, ১১৮-১২০, ১১২, ১২৫-৬, ২৩০;
এবং ইসলামের স্বর্ণযুগ, ২২৬;
ধারাবাহিক প্রভাব, ২৫৮, ৩০০;
ভারত আক্রমণের ছাঁচ, ২৮১-২;
সফলতার জন্য কারণসমূহ, ৩০৬-৭;
সৈয়দ এমদাদ আলী খান, মৌলভি, ৮৫;
সৈয়দ মুহাম্মদ হুসেইন, ৫৯, ৯০, ১৩৬, ১৫০-১, ১৫৩;
সিরিয়া, ৬৩, ২৫২, ২৬৭, ২৭০, ২৭৭, ৩০৫;
সিরীয়রা, ২৬১;
তাবলিগি জামিয়াত (ধর্মপ্রচারের দল), ২৮৭-৮;
ট্যাকিটাস, ২৫৫;
তাজিকরা, ৩০৩;
তালিব আলী, ১১০;
তালিবান, ২৪, ৪০, ২৮৮, ৩০১-৩;
বিন লাদেনের সঙ্গে মৈত্রী, ৩০৩-৪;
ছুঁড়ে ফেলেছে, ৩০৫;
ইসলামের ব্যাখ্যা, ৩০২; ৩০৫;
তালিবান-উল-উলুম, ৩৮, ১২০, ২২৬, ৩০৩;
তাকউইন-উদ-দীন
(ধর্মের ন্যায়পরায়নতা), ২২৬;
তারবেলা বাঁধ, ৩২;
তরিকা-ই-মুহাম্মদিয়া ৯০-১, ১০৮, ১২২
(মুহাম্মদের পথ),
তারো জবা, ৩০১;
তাশকেন্ত, ২৫৯;
তাওয়ারিখ কাওসির রাম, ১২১;
তৌহিদ ওয়াল জিহাদ (একশ্বরবাদ এবং

ধর্মযোদ্ধা), ৩০৫;
টেইলর, উইলিয়াম, ১৩০-৪, ১৩৫, ১৪৬-৫২, ১৫৮-৭২, ১৯৯, ১৯১-২;
তাঁর বদনাম ঘোচানোর প্রয়াস চালান, ১৭১, ২০৬-৭;
দুর্লভ শিল্প বস্তুর সংগ্রহ, ২০৭;
টেইলর, রেয়নেল, ৩৫, ১৮০, ১৮১-৬, ১৯১-২, ১৯৪-৭, ২০৫;
থানা ভবন, ১৭৩-৫, ২১৭;
থানেশ্বর, ১৮২, ১৯৮-৯-২১১;
থার মরুভূমি, ৮৮
ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধীয় সমাজ, ২২৩;
তিলওয়াই, ২২৯;
টিপু সুলতান, ৫৪;
তিরাহ, ২৩৮-৪০, ২৪২;
তিরহুত, ১৬৬;
তিতু মীর (মীর নাসির আলী), ৭৯, ১০৩-৫, ১১৬;
টড, কর্ণেল জেমস, ৫৬;
টঙ্ক, ৩৪, ৫৬, ৯৪-৫, ১৫৪;
এর নবাব, ২১৫;
তোরাবোড়া, ২২৫;
ট্রান্স-জর্দান, ২৬৬;
ট্রোটার, মি জাস্টিস, ১৬৭;
তুরঙ্গজাই, ২৮১;
তুর্কিস্তান, ১০৩, ২৫৯;
তুর্কী, ৩৭, ৮২, ২২৬, ২১৪, ২৬৬, ২৮০;
তুর্কীরা, ৭১, ১১৪, ২২৮, ২৬০-২;
উলেমা, ৩৮-৮, ৪২, ৬৩, ৬৯ ৮৫, ২৭৮;
ওয়াহ্হাবি, ৭২, ৭৮-৯, ২৫৩-৪, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৯-৭০, ২৯০-১, ২৯৫-৬,
এর পরিচালনার কর্তৃপক্ষ, ২১৯;
সংস্কারক, ২২১;
আব্দুর রহমান কর্তৃক অস্বীকৃত, ২২৬;
কাবুলে আহ্বান, ২২৮
সৌদি আরবে, ২৬৭, ২৬৮;
আফগানিস্তানে, ২৮৬;
পাঠান, ৩০২;
উল-হাসান, মাওলানা মাহমুদ, ২১৮, ২৭৬-৮ ২৮১-৩, ২৮৪;
উল-হক, মৌলভি ওয়েজ, ১৫০;
উম্মা, ৪১, ৫৪, ৮৫, ১২২, ২৮২, ২৯৩, ২৯৭, ৩০৬-৭
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ২৭৪, ২৮৯-৯০, ৩০০-১, ৩০৩;
ইরাকের আক্রমণ, ১০৮, ৩০৫, ৩০৯;
মাদ্রাসাসমূহ, ৩০১;
সৌদের ভবনের জন্য সমর্থন করে, ৩০৬;
উর্দু, ৫৭, ১৬৫, ২১৮;
আমেরিকার কোল জাহাজ, ৩০৫;
উতমানজাইরা, ৩২, ১৯২;
উয়াইনাহ্, ৬১;
উয়ায়না, ২৬০;
উজবেকরা, ৩০৩;
পেশোয়ার উপত্যকা, ২৮-৯-৩০-১, ৪৯, ৯৬, ৯৯, ১০২-৩, ১৫৭, ২৩০-১, ২৩৩, ৩০১;
মানচিত্র, ৩১-২;
ভ্যান ডা[illegible] কর্নেল, ২৭১-২;
ভোগন, [illegible]র, [illegible];

ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ৩০৬;
ভিয়েনা, এর সৈন্যগণ কর্তৃক অবরোধ, ৪১
ওয়াহ্হাবা, শেখ হাফিজ, ৫৭, ৭২, ৯৬৬, ২৯৬;
ওয়াহ্হাবিরা : নাম, ৪০, ৯২;
গাজু ৭২, ৬৯, ৭৭;
উলেমা, ৭২, ৭৮-৯, ৮৪, ০, ২৫৩-৪, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৯-৭০, ২৯০-১, ২৯২;
শহীদের আত্মবলির ধর্মমত, ৭৬;
যুদ্ধযাত্রা, ৭৬-৭;
নিষ্ঠুরতা, ৭৭-৮;
আরবদের প্রতারণা করে, ৭০-১;
পবিত্র স্থান সমূহ লুণ্ঠন করে, ৭৯-৮০;
নবী (সাঃ)র সমাধিপ্রস্তরের পবিত্রত নাশ, ৮০, ৮৫;
ব্রিটিশদের অন্তর্ভুক্তকরণের কথা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, ৮০;
দুস্যরা, ৮১-২;
মিশরীয়দের কাছে পরাজিত, ৮২-৪;
সাহস, ৮৩;
অভীষ্ট সাধনের প্রয়োজনীয়তার জন্য পীরগণ, ৯১, ১৫০-১;
'দিল্লি-বাসীরা', ৯১-২, ১১৫, ১৫২, ১৫৪, ২৭২, ১১৬;
'পাটনা-বাসীরা', ৯১-২, ১১৬, ১৫২;
পোশাক, ১০৮, ২৫৮;
বাছাই, ১২০;
এবং সিপাহী বিদ্রোহ, ১৩৬, ১৪৬-৭, ১৪৮-৫৮, ১৬১, ১৬৯-৭৩, ১৯৯;
বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা আন্দোলন করে, ১৭৭-৯৪, ১৯১-৯৯
নেতাদেরকে গ্রেপ্তার ও বিচার, ১৯১-৯, ২১২, ২১৮, ২৮৮;
গুপ্তহত্যার জন্য দায়িত্ব, ২০৩-২০৬;
এর সম্বন্ধে ব্রিটিশদের ধারণা, ২১২-৩;
মহিলারা, ২৫৯;
ধর্ম প্রচারের কাজে অঙ্গীকার, ২৯০;
হিন্দুস্তানি ধর্মান্ধরাদেরও দেখুন
ওয়াহ্হাবিবাদ ঃ আরবে উৎসসমূহ, ৬১-৭৬;
ধর্মতত্ত্বীয় প্রকৃতি, ৪০-২, ৬৮, ৭২-৫;
ভারতে দূর্গপ্রাচীরের বহির্গত অংশসমূহ, ৫৯;
সহিংসতার দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত, ৬৭, ২৭২-৩;
অভ্রান্ততার ধর্ম মত হিসেবে, ৭০;
রাজনৈতিক ও জাতিগত পরিমাণ প্রকাশ করে, ৮২;
জাভায়, ৮৫-৬;
সৈয়দ আহমদের অধীনে ভারতে আন্দোলন, ৮৫-১০৩;
স্বধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী, ৯৯-১০০;
ভারতে খণ্ড খণ্ড করণ ও পুনর্গঠন, ১০৭-১৫;
ভারতে প্রকাশ্যে নিন্দিত, ১১৬-৭-১২০;
ভারতে বিস্তার, ২১২;
আহল-ই-হাদিসের সঙ্গে সংযুক্ত, ২১৯;
রিয়াদে দূর্গ, ২৫২-৬;
ইবনে সৌদের অধীনে পুনর্জাগরণ, ২৫৮-[illegible]৪;
সৌদি আরবে [illegible] প্রতিষ্ঠানভুক্ত, ২৬৬-[illegible];

আধুনিক উন্নয়নের বিরোধী, ২৭০;
সংগঠনসমূহ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ, ২৭৪-৫, ২৮৫, ২৮৮, ২৯৩;
আফগানিস্তানে প্রভাব, ২৮৭-৮;
ওয়েক, হেয়ার ওয়্যান্ড ক্রফোর্ড, ১৩৫-১৬৩
ওয়ালিউল্লাহ্, শাহ, ৫১-৪, ৫৬, ৫৭, ৬৬-৮, ৮০, ৮৪, ১৫২, ১৭২, ২৭৭;
তাঁর শিক্ষার ধারাবাহিকতা, ১১৬, ২০৮, ২১৬, ২১৮;
ওয়ার্ড, মি, ১৭৪;
যুদ্ধ ডাকব্যবস্থা, ২২৬;
ওয়ার্ডেন, লেফটেন্যান্ট ফ্রান্সিস, ৭২, ৭৯;
ওয়ারিস আলী, ১৫৯-৬০;
ওয়াজিরিস, ১৯১;
ওয়াজিরিস্তান, ২৩৯,২৮৬;
পাশ্চাত্য সভ্যতা, ৪১-২স ২৮৪,৪০৫, ৩০৭;
বেলায়েত আলী, মৌলভি, ৫৭, ৫৯, ৮৫, ৯১, ১৭৮, ২০৭;
এবং ভারতের ওয়াহ্হাবিবাদের উন্নয়ন, ১১০;
মৃত্যু, ১২৭, ১৫২;
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন, ২১১;
বংশধরগণ, ২৯০;
ওয়াইল্ড, কর্ণেল আলফ্রেড, ১৮০-১, ২২৯;
উডকক, মি, ১৬২;
মসজিদসমূহের পক্ষে বিশ্ব সুপ্রিম কাউন্সিল, ২৭৩, ২৯০;
রাইট, সহকারি যুগ্ম-জেনারেল, ১৯৪;
জিং জিয়াং, ২৯৬;
ইয়াহিয়া আলী, ১১০, ১২২, ১২৪, ১৯৯;
গ্রেপ্তার এবং বিচার, ১৯২-৩, ২০৮;
মৃত্যু, ২১১;
ইয়াকুব খান, ২২৫;
ইয়েমেন, ৭৯;
ইউসুফজাই, রহিমুল্লাহ্,২৪-৭, ২০;
ইউসুফজাইরা, ২৮-৩১, ৩২, ৪৯-৫০, ৫৫, ৯৬, ১২৮, ১৮৪;
ধর্মীয় অভীষ্ট সাধনের প্রয়োজনীয়তা ৩৭;
এবং সৈয়দ আহমদের আধীনে ওয়াহ্হাবিরা ৯৬-৭, ১০০, ১০৫-৬;
লশকররা, ৯৭;
সমতল, ১৫৭, ১৮১;
জাইদুল্লা খান, ১৯৬;
জইন-উল-আবদিন, মৌলভি, ১১৯-২০;
জিয়া-উল হক, জেনারেল মুহাম্মদ, ২৮৬, ২৮৮, ৩০৭;
জুরীফ, মল্লিক, ১৫৭;